আমি বিবেকানন্দ বলছি

মুখবন্ধ, সন্ধান ও সম্পাদনা

শংকর

আমি বিবেকানন্দ বলছি

এই আশ্চর্য সংগ্রহে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নিজের মুখে নিজের কথা বলেছেন। চিঠিপত্রে, আলাপ-আলোচনায়, স্মৃতিচারণে, সভাসমিতিতে, বিভিন্ন রচনার হাজার হাজার পাতায় যে আত্মকথা এতদিন লুকিয়েছিল, বাংলায় এই প্রথম তা বিপুল নিষ্ঠায় ও অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে খুঁজে বার করা হল।

নিজের ভাষায় স্বামীজির নিজের জীবনের যে ছবি এখানে ফুটে উঠেছে তা একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে তেমন বেদনাবিধুর। 'আমি বিবেকানন্দ বলছি' নিঃসন্দেহে বিচিত্র এক বিবেকানন্দের সঙ্গে নতুন যুগের পাঠক- পাঠিকাদের নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেবে।

আমি বিবেকানন্দ বলছি

মুখবন্ধ ও সম্পাদনা

শংকর

সন্ধান, সংগ্রহ ও সংকলনে সহযোগিতা
অরুণকুমার দে

সাহিত্যম্ ॥ ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

AMI VIVEKANANDA BOLCHI
with a foreword
by SANKAR

মূল অনুপ্রেরণা ও অনুসরণ
SWAMI VIVEKANANDA
ON HIMSELF
Advaita Ashrama
Mayavati, Champawat 262524
Uttaranchal, India
Also :
5 Dehi Entally Road,
Kolkata 700 014

Sahityam
18B Shyamacharan Dey St
Kolkata 700073
(033) 2241-9238
(033) 2241-4003
Fax (033) 2241 3338
E-mail :
nirmalsahityam@gmail.com
Web : nirmalsahityam.com
ISBN : 81-7267-033-8

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান
নির্মল বুক এজেন্সি
২৪বি কলেজ রো
কলকাতা ৭০০ ০০৯

বর্ণ-সংস্থাপনা
দিলীপ দে
লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক
প্রিন্টিং সেন্টার
১ ছিদাম মুদি লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ
—নভেম্বর ২০০৮
দ্বিতীয় সংস্করণ
—ডিসেম্বর ২০০৮
তৃতীয় সংস্করণ
—জানুয়ারি ২০০৯
চতুর্থ সংস্করণ
—ফেব্রুয়ারি ২০০৯
পঞ্চম সংস্করণ
—সেপ্টেম্বর ২০০৯
ষষ্ঠ সংস্করণ
—মার্চ ২০১০
মোট মুদ্রণ সংখ্যা
৩৪৫০০

বাংলায় এই বইটি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে অদ্বৈত আশ্রমের সভাপতি স্বামী বোধসারানন্দ আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এই কঠিন কাজে সারাক্ষণ আমার পাশে ছিলেন শ্রীঅরুণকুমার দে, তিনি না থাকলে এই পরিকল্পনায় হাত দিতে সাহস পেতাম না।

শংকর

কলকাতা
১০ নভেম্বর ২০০৮

শংকর

বিষয় : শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

অচেনা অজানা বিবেকানন্দ ৮০

স্বামী বিবেকানন্দের বাবা
বিশ্বনাথ দত্ত
যে উপন্যাস লিখেছিলেন
সুলোচনা ১০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত ১০০

শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী-
স্বামী বিবেকানন্দ
দশটি ঐতিহাসিক আলোকচিত্র ৪০

সূচি

শংকর-এর বই

বিষয়

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

আমি বিবেকানন্দ বলছি ১৩০্
অচেনা অজানা
বিবেকানন্দ ১০০্
স্বামী বিবেকানন্দের
বাবা বিশ্বনাথ দত্ত
যে উপন্যাস লিখেছিলেন
'সুলোচনা' ১২০্
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত ১০০্
কথামৃতের অমৃতকথা ১৫০্
অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ ১২৫্

বিশেষ রচনা

কত অজানারে ১২৫্
অনেকদিন আগে ১৫০্
এই তো সেদিন ৫০্
বাঙালির খাওয়াদাওয়া ১০০্
রান্নাঘর, কিচেন কিংবা
রসবতী ৮০্
বাঙালির বিত্তসাধনা :
সাহাবার ইতিকথা ৬০্
লক্ষ্মীর সন্ধানে ৬০্
রত্ন বসুন্ধরা ১০০্
চরণ ছুঁয়ে যাই (১ম) ১৪০্
চরণ ছুঁয়ে যাই (২য়) ১৪০্
চরণ ছুঁয়ে যাই (৩য়) ১৬০্
যোগবিয়োগ গুণ ভাগ ৩৫্
আমাদের চিনচর্চা ২০০্

ভ্রমণ সাহিত্য

এপার বাংলা
ওপার বাংলা ৭০্
যেখানে যেমন ৭০্
জানা দেশ অজানা কথা ৭০্
মানবসাগর তীরে ১৬০্

সংকলন

শংকর ভ্রমণ সমগ্র ১৫০্
চলচ্চিত্রায়িত কাহিনীসংগ্রহ ১৬০্
কিশোর রচনা সমগ্র ১২৫্
শংকর অমনিবাস ১০০্
সাত দশে ১০০্
শংকর সারাদিন ১০০্

ত্রয়ী উপন্যাস

স্বর্গ মর্ত পাতাল ১০০্
(জন-অরণ্য, সীমাবদ্ধ ও
আশা-আকাঙ্ক্ষা)
জন্মভূমি ১২৫্
(স্থানীয় সংবাদ, সুবর্ণসুযোগ
ও বোধোদয়)
কথা-মন্থন ১৩০্
(লক্ষ্যভ্রষ্ট, মনজঙ্গল ও
খবর এখন)

যুগল উপন্যাস

তনয়া ১০০্
(সীমন্তসংবাদ ও নগরনন্দিনী)
তীরন্দাজ ১২০্
(তীরন্দাজ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট)
মনজঙ্গল ১২০্
(মনোভূমি ও মনজঙ্গল)

কথাসাহিত্য

পুরোহিত দর্পণ ৬০্
পাত্রপাত্রী ৪০্
যাবার বেলায় ৫০্
চেনা মুখ জানা মুখ ৪০্
সপ্তরথী ৪০্
এখানে ওখানে ৫০্
মানচিত্র ৪০্
সার্থক জনম ৫০্
এক দুই তিন ৪০্
যা বলো তাই বলো ৪০্
এক যে ছিল ৩২্

উপন্যাস

চৌরঙ্গী ১৫০্
ঘরের মধ্যে ঘর ২০০্
তিন ভুবনের কথা ১০০্
খবর এখন ৭৫্
অবসরিকা ৬০্
সহসা ৪০্
কামনা বাসনা ৬০্
এবিসিডি লিমিটেড ৮০্
পটভূমি ৬০্
বাংলার মেয়ে ৬০্
সুখসাগর ৬০্
দিবস ও যামিনী ৩০্
যেতে যেতে যেতে ৬০্
অনেকদূর ৫০্
কাজ ৬০্
মুক্তির স্বাদ ৫০্
মাথার ওপর ছাদ ৫০্
একদিন হঠাৎ ৪০্
নবীনা ৪০্
মানসম্মান ৬০্
রূপতাপস ৩০্
সোনার সংসার ৬০্
সীমাবদ্ধ ৬০্
জন-অরণ্য ৬০্
মরুভূমি ৬০্
আশা-আকাঙ্ক্ষা ৬০্
সুবর্ণ সুযোগ ৫০্
সম্রাট ও সুন্দরী ৮০্
বিত্তবাসনা ৩০্
বোধোদয় ৫০্
নগর নন্দিনী ৬০্
সীমন্ত সংবাদ ৫০্
স্থানীয় সংবাদ ৪০্
নিবেদিতা রিসার্চ
ল্যাবরেটরি ৫০্
পদ্মপাতায় জল ৫০্

Penguine English Translations
Chowringhee 325/-
The Middleman 200

ছোটদের বই

এক ব্যাগ শংকর ৬০্
চিরকালের উপকথা ৪০্
গল্প হলেও সত্যি ২০্
মনে পড়ে ২০্

মুখবন্ধ

মহাপুরুষ অথবা মহামানবদের জানবার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁদের লিখিত অথবা মুখনিসৃত বাণী—এসব হাতের গোড়ায় থাকতে পরের মুখে ঝাল খাওয়ার কোনো মানে হয় না। এই কথা বলতেন আমার পূজ্যপাদ শিক্ষক, হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়।

দুঃখের বিষয় দেশের অনেক মহামানব স্বহস্তে তেমন কিছু লেখেননি, কালের অবহেলা ও আলস্য পেরিয়ে তাঁদের লেখা চিঠিপত্রও আমাদের সংগ্রহে নেই, তাই অপরের বলা গল্পগাথা ছাড়া তেমন কিছু আমাদের জোটে না। স্বামী বিবেকানন্দর জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী হলেও, সৌভাগ্যক্রমে বিভিন্ন সময়ে লেখা অজস্র পত্রাবলী, আলাপ-আলোচনা, স্মৃতিকথা, রসরসিকতা, ভ্রমণকাহিনি ও রম্যরচনার সম্ভার থেকে আমরা বঞ্চিত হইনি। আরও আনন্দের, তাঁর দেহাবসানের এক শতাব্দী পরেও অনেক অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে নানা বিস্ময়কর তথ্য আজও আবিষ্কৃত হচ্ছে।

যেমন ধরুন, স্বামীজির পত্রাবলী। উদ্বোধন প্রকাশিত পত্রাবলীর তৃতীয় সংস্করণে চিঠির সংখ্যা ছিল ৪৩৪, কিন্তু পৌষ ১৩৩৪-তে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে এই পত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭৬। এর মধ্যে ১৫৩টির ভাষা বাংলা, ৪১৮ খানি ইংরিজি, ৩ খানি সংস্কৃত এবং দু'খানি অনবদ্য ফরাসিতে। বাংলায় প্রকাশিত পত্রাবলী যে শেষকথা নয় তার প্রমাণ ইংরিজি ভাষায় প্রকাশিত 'দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থটির নবম খণ্ড, সম্প্রতি সেখানে ২২৭টি মহামূল্যবান পত্র মুদ্রিত হয়ে আমাদের বিস্ময়ের কারণ হয়েছে। ইংরিজি দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস-এ মুদ্রিত বিবরণ অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত নজরে আসা স্বামীজির পত্রসংখ্যা ৭৭৭।

অভিজ্ঞমহলের কেউ কেউ বলে থাকেন স্বামীজির লেখা চিঠির সংখ্যা সহস্রাধিক।

আরও কিছু লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যেমন পত্রাবলীতে সংকলিত স্বামীজির প্রথম চিঠিটি (বেনারসে শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত) ডাকে ফেলা হয় ১২ আগস্ট ১৮৮৮। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার পরেও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সবিনয়ে সই করছেন 'দাস নরেন্দ্র'।

তাঁর তখনকার অস্থায়ী ঠিকানা কালাবাবুর কুঞ্জ, বৃন্দাবন—বাসনা শীঘ্রই হরিদ্বার যাবেন, তাই খুঁজছেন পরিচয়পত্র : "হরিদ্বারে আপনার আলাপী কেহ যদি থাকে, কৃপা করিয়া তাঁহার উপর এক পত্র দেন, তাহা হইলে বিশেষ অনুগ্রহ করা হয়।"

জীবনের বিভিন্নপর্বে স্বামীজি এইভাবে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেছেন এবং সেইসব চিঠি অপরিচিত জনপদে কপর্দকহীন সন্ন্যাসীকে বিশেষ সাহায্য করেছে।

প্রমদাদাস মিত্রকে পত্র লেখার সময় স্বামীজির বয়স পঁচিশ, এর আগে তিনি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহপাঠী, শিক্ষক কিংবা গুরুভাইদের চিঠি লেখেননি তা সম্ভব নয়। সুযোগ পেলেই তিনি চিঠি লিখতেন, সুতরাং বলা যেতে পারে সমকালের অবহেলায় তাঁর জীবনের প্রথমপর্বে লেখা আরও অনেক চিঠি হয় হারিয়েছে অথবা আজও প্রকাশিত হবার অপেক্ষায় কোথাও লুকিয়ে আছে।

অনুসন্ধানীদের কাছে আরও দুঃখের কারণ তাঁর পারিবারিক পত্রাবলীর উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি। গর্ভধারিণী জননীর প্রতি তাঁর আজীবন অনুরাগের কথা কারও কাছে আজ আর অজানা নয়। দিদি, ভাই, বোনদের সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ও দুশ্চিন্তা ও তাঁদের রক্ষা করার জন্য বিরামহীন প্রচেষ্টা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবনের এক আলোচিত কিন্তু বিতর্কিত অধ্যায়। বিলেত থেকে মেজ ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের আচমকা উধাও হওয়া এবং নিঃসম্বল অবস্থায় পদব্রজে নানা দেশ পরিভ্রমণ করে অবশেষে বেশ কয়েকবছরের ব্যবধানে কলকাতায় ফিরে আসার কথাও এখন আমাদের অজানা নয়। আমরা এও জানি স্বামীজির সেই গভীর দুঃখের ও উদ্বেগের কথা—মহেন্দ্রনাথ উধাও হয়ে বাড়িতে নিজের মাকেও একটা চিঠি লেখেননি। নিরুদ্দেশ ভ্রাতাকে খুঁজে বার করে মাকে চিঠি লিখতে অনুরোধ করার জন্য নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর সেকি ব্যাকুলতা! এই পর্বে সুদূর প্রবাস থেকে সন্ন্যাসী সন্তান তাঁর প্রিয় জননীকে কোনো চিঠি লেখেননি তা বিশ্বাস হয় না।

এখন প্রশ্ন, পারিবারিক চিঠিগুলির কি গতি হলো? সেই সময়ের পত্রাবলী থেকে এক বিস্ময়কর বিবেকানন্দকে খুঁজে পাওয়ার আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে অনুরাগীদের আজও ভালো লাগে না। কিন্তু শরিকী বিবাদে ক্ষতবিক্ষত, মাঝে-মাঝে ভিটেবাড়ি থেকে বিতাড়িত এবং পরবর্তী সময়ে শাসক ইংরেজের বিষনজরে পড়া কনিষ্ঠভ্রাতার কল্যাণে বারবার পুলিসি সার্চের বিড়ম্বনায় আমরা যে দত্তপরিবারের কাগজপত্র ও স্মারকচিহ্নগুলি থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়েছি তার বেদনাদায়ক উল্লেখ পাই ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অনবদ্য বাংলা ও ইংরিজি রচনা থেকে।

শুধু পত্রাবলী বা স্মারক চিহ্ন নয়, ঝঞ্ঝাময় সন্ন্যাসীর অনন্য গৌরব পৃথিবীর নানাপ্রান্তে তাঁর সংখ্যাহীন বক্তৃতামালা। সেইসব তুলনাহীন বক্তৃতা

যাঁরা শুনেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁদের কাছ থেকে কিছু সেকেন্ডহ্যান্ড বিবরণ গবেষক ও গবেষিকারা পরম ধৈর্যসহকারে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু মূল বাণীর বিদ্যুৎপ্রবাহ থেকে আমরা চিরতরে বঞ্চিত হয়েছি। যৎসামান্য সেটুকু জে জে গুডউইন নামক ইংরেজ ক্ষিপ্রলিপিকারের নিষ্ঠা ও অসামান্য নৈপুণ্যে রক্ষা পেয়েছে তার জন্য আমরা এই বিদেশী মানুষটির কাছে চিরঋণী। শোনা যায়, বিবেকানন্দ-ভাষণের যত শর্টহ্যান্ড নোট তিনি আমেরিকায়, ইউরোপে এবং ভারতে নিয়েছিলেন তার একটা বড় অংশ কোনোদিন টাইপ করা হয়নি। সেগুলি উদাসী গুডউইনের ট্রাংকে সযত্নে সংগৃহীত ছিল। দক্ষিণ ভারতে তাঁর আকস্মিক অকালমৃত্যুর পরে সেই ট্রাংক ইংল্যান্ডে তাঁর মায়ের কাছে সকলের অজান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রত্নময় সেই পেটিকার সন্ধানে স্বয়ং সিস্টার নিবেদিতা বিলেতে গিয়ে অনেক খোঁজখবর করেছিলেন, কিন্তু দরিদ্র গুডউইন পরিবারকে খুঁজে বার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ধরে নেওয়া যেতে পারে, এই অমূল্য সংগ্রহ চিরতরে কালসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছে।

স্বামীজিরা ছিলেন দশ ভাইবোন (নরেন্দ্রনাথ ষষ্ঠ সন্তান), এঁদের সম্বন্ধে আজও অনেক কিছু অজানা। আমরা বিশ্বনাথ দত্তের প্রথম পুত্র ও দুই কন্যার নাম জানি না। সম্ভবত নিতান্ত অল্পবয়সে মৃত্যু হওয়ায় এদের নামকরণ হয়নি, অথবা নামকরণ হলেও নামগুলি এখনও আমরা সংগ্রহ করতে সমর্থ হইনি। দিদি স্বর্ণময়ী তাঁর বিশ্ববিজয়ী ভ্রাতার দেহাবসানের তিন দশক পরেও বেঁচেছিলেন (১৯৩২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)। তিনি অথবা মেজভাই মহেন্দ্রনাথ অথবা ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথ কোথাও দাদার লেখা কোনো চিঠির কথা বলে যাননি। দিদির ক্ষেত্রে একটু নাম-বিভ্রাটও আছে, কর্পোরেশনের ডেথ রেজিস্টারে তিনি স্বর্ণবালা, আবার কোথাও স্বর্ণলতা।

ইংরিজি বিবেকানন্দ-জীবনীতে পিতৃদেব বিশ্বনাথ দত্তর দাহকার্য সম্পন্ন করে নরেনের বাড়ি ফেরার বর্ণনা আছে। এই বিবরণ থেকে আন্দাজ হয় ভগ্নীদের কেউ কেউ তখনও অবিবাহিতা, কনিষ্ঠভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ তো দুগ্ধপোষ্য শিশু। ভগ্নীদের বিবাহে কে কি ভূমিকা গ্রহণ করলেন, কোথা থেকে অর্থ এলো তাও বেশ অস্পষ্ট। আরও যা আলো-আঁধারিতে ভরা, একজন নয়, দু'বোনের নিতান্ত অল্পবয়সে শ্বশুরবাড়িতে দুঃখজনক মৃত্যু. কলকাতা সিমলা-অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে বোন যোগীন্দ্রবালা সুদূর সিমলা পাহাড়ে পতিগৃহে আত্মঘাতিনী হন। বালিকা বয়সে মেয়েদের বিবাহের ব্যাপারে স্বামীজি আজীবন কতখানি তিক্ত ও বীতশ্রদ্ধ ছিলেন তা তাঁর চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায়।

ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে, শরিকী সংঘাতে জর্জরিত বিবেকানন্দ সংসার ত্যাগের পরে, এমনকী বিদেশ থেকে ফিরে এসেও কখনও ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের ভিটেবাড়িতে পদার্পণ করেননি। তবে দিদিমা রঘুমণি বসুর ৭ নম্বর রামতনু বসু লেনের বাড়িতে যে বেশ

কয়েকবার গুরুভাই ও শিষ্যদের নিয়ে তিনি এসেছেন তার খবরাখবর রয়েছে।

গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। স্বামীর আকস্মিক অকালমৃত্যু এবং বড় ছেলের গৃহত্যাগের পর নিঃসম্বল অবস্থায় তাঁর একমাত্র আশ্রয়স্থল উত্তর কলকাতায় রামতনু বসু লেনের পিত্রালয়। অসহায় কন্যার পাশে সারাজীবন দাঁড়িয়েছেন জননী রঘুমণি বসু, স্বামীজি তাঁকেও খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু পত্রাবলী, বক্তৃতামালা অথবা কথোপকথনে তার উল্লেখ খুঁজে পাইনি। রঘুমণির আদরিণী কন্যার দেহাবসান কর্পোরেশন মৃত্যু-রেজিস্টার অনুযায়ী ২৪ জুলাই ১৯১১, তার ঠিক দু'দিন পরে রঘুমণির জীবনাবসান। ৪ জুলাই ১৯০২ স্বামীজির দেহাবসানের সংবাদ পেয়ে ভুবনেশ্বরী ও ভূপেন্দ্রনাথ যে পরের দিন ভোরে বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন তার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ আমরা নিবেদিতা ও অন্যান্য সূত্র থেকে পাই। এই শোকের পরেও তিনি যে ন'বছর বেঁচেছিলেন তা হিসেব করতে কষ্ট হয় না।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হলে মায়ের অবস্থা কি হবে, কিভাবে ভরণপোষণ হবে তার মর্মস্পর্শী ইঙ্গিত রয়েছে খেতড়িকে লেখা মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীজির চিঠিতে। এইসব চিঠি আলোকে আনতে যথেষ্ট সময় লেগেছে এবং তার জন্য আমরা ডঃ বেণীশঙ্কর শর্মা ও খেতড়ি সংগ্রহশালার কাছে ঋণী।

সৌভাগ্যবশতঃ স্বামীজির জীবনের বড় বড় সমস্যাগুলির ব্যাপারে পরের মুখে ঝাল খাওয়ার প্রয়োজন নেই, তাঁর পত্রাবলী, আত্মকথন এবং স্পষ্টবাদিতা আমাদের যথেষ্ট দিয়েছে। আর আছে আদালতের নথিপত্র যা মিথ্যা বলে না। যেমন ১১ আগস্ট ১৮৮৬-তে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের মাত্র চারদিন আগে) কলকাতা হাইকোর্টে লেটার্স অফ অ্যাডমিনিসট্রেশনের জন্য ভুবনেশ্বরীর আবেদনপত্রে ভুবনেশ্বরী দাসীর বাংলা স্বাক্ষর ও তার তলায় পুত্র নরেন্দ্রনাথের ইংরিজিতে স্বাক্ষর। এই আবেদনের সময় নরেন্দ্রনাথের বয়স বাইশ। হাইকোর্টে সংরক্ষিত রেকর্ড থেকে আমরা জানতে পারি, এই আবেদনে দত্ত পরিবারের এটর্নি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ দাস, নরেন্দ্র-জননীকে সনাক্ত করেন কালীচন্দ্র দত্ত এবং ইংরিজি আবেদনের বাংলা ব্যাখ্যা করে শোনান অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। আবেদনপত্রে নরেন্দ্রনাথের নামের বানান 'Norendro Nath Dutt', কিন্তু সইতে ইংরিজি বানান 'Narendra Nath Datta'।

পিতৃদেব বিশ্বনাথ দত্তের কোনো ছবি কারও সংগ্রহে নেই, যদিও বিশ্বাস হয় না এমন শৌখিন বিত্তবান আইনজীবী-র কোনো ফটো কলকাতায়, রায়পুরে, লখনৌ অথবা সিমলায় তোলানো হয়নি। থাকবার মধ্যে আদালতের রেকর্ডে বিশ্বনাথ দত্তের ইংরিজি স্বাক্ষর। ১৪ মার্চ ১৮৬৬ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বার্নেস পিককের কাছে এটর্নি ও প্রক্টর হিসেবে তালিকাভুক্ত হবার জন্য তিনি আবেদন করেন। অভিধান অনুযায়ী প্রক্টর

শা.শন অর্থ 'মকদ্দমার তদ্বিরকারি আম-মোক্তার'। এই সময় নরেন্দ্রনাথের বয়স তিনবছর।

কলকাতা হাইকোর্টের রেকর্ড অনুযায়ী পিতৃদেব বিশ্বনাথ দত্তের দেহাবসান ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪। কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশনের খাতা অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুদিন শনিবার ২৩ ফেব্রুয়ারি। এই রেকর্ডে ইংরিজিতে সই করেছেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর পত্রাবলী অথবা আলাপ-আলোচনায় বিশ্বনাথ সম্পর্কে উল্লেখ বেশি নেই, তবে এক জায়গায় তিনি স্বীকার করেছেন পিতৃদেবের কাছ থেকেই তিনি হৃদয় ও মেধা জন্মসূত্রে পেয়েছেন।

আরও একটি বড় ব্যাপারে স্বামীজি সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ বহুবছর পরে তাঁর জীবনসায়াহ্নে 'স্বামী বিবেকানন্দ' বইটির প্রথম সংস্করণের ১০১ পাতায় একটি বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। পিতৃদেব 'সুলোচনা' নামে একটা বাংলা উপন্যাস রচনা করেন, কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য জ্ঞাতি খুড়ো শ্রীগোপালচন্দ্র দত্তর নামে বইটি প্রকাশ করেন। ভূপেন্দ্রনাথের মতে বইটি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু বিভিন্ন সংগ্রহশালায়, এমনকী সুদূর ইউরোপে খোঁজখবর করতে গিয়ে সম্প্রতি হদিশ পাওয়া গেল, বইটির প্রকাশ ১৮৮২--যখন নরেন্দ্রনাথের বয়স ১৯ বছর, তখনও বি এ পরীক্ষা দেননি। উপন্যাসের প্রকাশক ২৫ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের 'বি বানুর্জ্জি কোম্পানি', 'কলিকাতা বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট ৬৯ বাটীতে হিতৈষী যন্ত্রে শ্রীব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত'। এদেশে দুর্লভ এই বইটির বিস্তারিত বিবরণ বিদেশ থেকে আনাবার পরে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নেই—এই উপন্যাসটি কি সিমুলিয়ার দত্তদের অন্দরমহলের কাহিনি? ২০০৬-এ পুনঃপ্রকাশিত এই বইটি অবশ্যই দত্ত পরিবারের ওপর নতুন আলোকপাত করে, যদিও নরেন্দ্রনাথ আজীবন এই লেখাটি সম্বন্ধে নীরব।

দোষ দেওয়া যায় না, কারণ গল্প-উপন্যাস তো পরের মুখে ঝাল খাওয়া। তবু বুঝতে কষ্ট হয় না, একটি নয়, 'সুলোচনা' উপন্যাসের দুটি চরিত্রে পিতৃদেব বিশ্বনাথ দত্ত বারবার উঁকি মারছেন। একটি অবশ্যই নায়ক রামহরি। রামহরির একমাত্র সন্তান সুরথনাথের মধ্যেও লেখক বিশ্বনাথ উঁকি মারছেন। কিন্তু পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অনেক বাধা থেকে যাচ্ছে, এ-যুগের পাঠক চাইবেন মহামানবের শ্রীমুখনিসৃত অভিজ্ঞতার কথা সোজাসুজি শুনতে। সেই সব আত্মকথা স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হলেও, তার সন্ধান, সংগ্রহ ও সংকলন নিতান্ত সহজ কাজ নয়।

২

এবার এই সংগ্রহের কথা। ১৯৬৩ সালে স্বামীজির শতবর্ষে প্রকাশিত একটি ইংরিজি বইয়ের খবর পেয়ে আমি বিস্মিত হই। ওই সময়ে

'বিশ্ববিবেক' নামে একটি বইয়ের সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত ছিলাম, যার প্রধান অনুপ্রেরণা শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ বিষয়ক গবেষণায় যিনি পরবর্তী সময়ে ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। ইংরিজি বইটির নাম 'Swami Vivekananda on Himself'। সংকলক একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী যিনি নিজের নাম প্রকাশেও অনিচ্ছুক। বইটির প্রকাশক স্বামী বিবেকানন্দ সেনটেনারি কমিটির সেক্রেটারি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের রিডিং রুমে এই ইংরিজি সংগ্রহটি আমাকে মুগ্ধ করে। বলাবাহুল্য বহু জায়গায় এই সংকলনটির কথা আমি উল্লেখ করি। বহুবছর দুষ্প্রাপ্য থাকার পরে মে ২০০৬ সালে স্বামী বোধসারানন্দের উৎসাহে অদ্বৈত আশ্রম থেকে বইটি বর্ধিত আকারে পুনর্বার প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা অনুযায়ী, স্বামীজির বিভিন্ন বই থেকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মঠ-মিশনের এক সন্ন্যাসী আত্মজীবনীমূলক কিছু উদ্ধৃতি সংগ্রহ শুরু করেন। এই পাণ্ডুলিপিটি কোনো সময়ে বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনের এক প্রবীণ সন্ন্যাসীর হাতে পৌঁছয়। তিনি প্রফেসর চারুচন্দ্র চ্যাটার্জির সঙ্গে যৌথভাবে লেখাটির যাচাই ও পর্যালোচনা করেন। পরবর্তী কোনো সময়ে প্রফেসর চ্যাটার্জি ইংরিজি বইটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। তাঁকে সহায়তা করেন শ্রীমতী এস ভার্গব।

মূলত যে ছ'টি গ্রন্থের ওপর সংকলকরা নির্ভর করেন, সেগুলি হলো :

১। দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ : ১-৮ খণ্ড
২। দ্য গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ
৩। শ্রীরামকৃষ্ণ, দ্য গ্রেট মাস্টার
৪। দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম
৫। দ্য লাইফ অফ স্বামী বিবেকানন্দ বাই হিজ
ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপ্লস্
৬। নিউ ডিসকভারিজ : স্বামী বিবেকানন্দ ইন আমেরিকা।

'স্বামী বিবেকানন্দ অন হিমসেলফ্' বইটির অদ্বৈত আশ্রম সংস্করণে (মে ২০০৬) নতুন তথ্যসূত্রের কথা বলা হয়েছে। কয়েকটি মূল্যবান বই ১৯৬৩-র পরে প্রকাশিত হয়, যেমন :

১। সংশোধিত সংস্করণ, দ্য লাইফ অফ স্বামী বিবেকানন্দ বাই হিজ ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপ্লস্ : প্রথম খণ্ড (১৯৭৯), দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৮১)।
২। স্বামী বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট : নিউ ডিসকভারিজ—মেরি লুইজ বার্ক : ১-৬ খণ্ড (১৯৮৭-তে সম্পূর্ণ)
৩। দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ, নবম খণ্ড (১৯৯৭)

আমেরিকান ব্রহ্মচারী নির্মলচৈতন্য (এখন স্বামী মহাযোগানন্দ) বিশেষ ধৈর্য সহকারে এই বইগুলি থেকে নতুন তথ্য সংগ্রহ করে বইতে সংযোজন করেন।

এমন এক অভিনব রচনা বাংলা পাঠকদের উপযোগী করে তুলবার ব্যাপারে আমার আগ্রহ লক্ষ্য করে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন শ্রীঅরুণকুমার দে। পেশায় ইঞ্জিনিয়র অরুণবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় 'অচেনা অজানা বিবেকানন্দ'-র তীব্র সমালোচক হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি অনুরাগী কিন্তু নিতান্ত সাবধানী পাঠক।

বঙ্গীয় সংস্করণটির প্রস্তুতি নিতান্ত সহজ কাজ নয়। প্রথম, বিভিন্ন সূত্র থেকে কয়েক সহস্র উদ্ধৃতির সন্ধান। সবক্ষেত্রে বাংলা ভাষান্তর সহজলভ্য নয়। তাই অনুবাদকর্ম প্রয়োজন হয়েছে বারবার। কোথাও কোথাও নতুন তথ্য অথবা উদ্ধৃতি সংযোজন অবশ্যম্ভাবী হয়েছে।

বাংলায় সাধু ও চলিত ভাষার একত্র উপস্থিতি কিছুটা চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। যতখানি সম্ভব তার মোকাবিলা করা গিয়েছে ইংরিজি থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁর মূল বাংলা রচনায় সাধুভাষার ব্যবহার থাকলে তা অবশ্যই স্পর্শ করা হয়নি, গুরুচণ্ডালি দোষের উপস্থিতির কথা মনে রেখেও। নবতম নিবেদনে যেসব স্মৃতি বইয়ের থেকে কিছু কিছু নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

১। যুগনায়ক বিবেকানন্দ : ১-৩ খণ্ড
—স্বামী গম্ভীরানন্দ
২। লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ : ১-৩ খণ্ড
—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
৩। স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি
—সিস্টার নিবেদিতা
৪। স্বামী বিবেকানন্দ : ১-২ খণ্ড
—প্রমথনাথ বসু
৫। স্মৃতির আলোয় স্বামীজি
—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত
৬। স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ
৭। বিবেকানন্দ চরিত
—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
৮। আদালতে বিপন্ন বিবেকানন্দ
—চিত্রগুপ্ত
৯। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায়
—ডঃ বেণীশঙ্কর শর্মা

সত্যিকথা বলতে কী 'আমি বিবেকানন্দ বলছি' নিতান্ত অনুবাদকর্ম নয়, নব কলেবরে স্বামীজির আত্মজীবনী—যেখানে তাঁর নিজের মুখের কথা বা নিজের চিঠি অথবা নিজের রচনা ছাড়া বাড়তি একটি শব্দও ব্যবহার করা হয়নি। ইংরিজিতে প্রথম প্রকাশিত হবার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে বাংলায় ভাষান্তরিত হবার বিষয়ে সারাক্ষণ যিনি উৎসাহ, উপদেশ, আশীর্বাদ ও

অনুমোদন জানিয়েছেন তিনি অদ্বৈত আশ্রমের শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট স্বামী বোধসারানন্দ।

আদিতে বাংলা বইটির নাম রাখবার ইচ্ছে হচ্ছিল 'নিজ মুখে স্বামী বিবেকানন্দ', কিন্তু স্বামীজি যে প্রাণবন্ত ভঙ্গিতে চলিত ভাষার ব্যবহার করে গিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে 'আমি বিবেকানন্দ বলছি' নামটিই আরও উপযোগী বলে মনে হলো।

এই জটিল উক্তি-সংগ্রহ থেকে এক অনন্য জীবনের বিস্ময়কর ও বিচিত্র কথাচিত্র একালের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে এই আমাদের বিশ্বাস। আরও যা বিস্ময়ের, উনচল্লিশ বছর পাঁচ মাস চব্বিশ দিন-এর সংক্ষিপ্ত জীবনে সংখ্যাহীন বাধাবিপত্তি ও বিড়ম্বনা সত্ত্বেও এক মহাজীবনের অবিস্মরণীয় নায়ক হয়ে উঠেছেন আমাদের পরমপ্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ। তেইশ বছরে সন্ন্যাসী হয়ে, বাকি জীবন চার মহাদেশের পথে পথে চরৈবেতি থেকেও, নিজের সম্বন্ধে যেসব কথা ভাবীকালের মানুষের জন্যে তিনি রেখে গিয়েছেন তা না পড়লে বিশ্বাস হয় না। আজও বিবেকানন্দের আপনকথা শুধু আমাদের উদ্দীপ্ত করে না, গভীর বেদনায় আমাদের মনও ভরে ওঠে তাঁর সংখ্যাহীন সীমাহীন যন্ত্রণার কথা ভেবে।

একাল ও আগামীকালের যেসব মানুষ নানাভাবে নানা কারণে দুঃখ-জর্জরিত হবেন, তাঁদের চোখের সামনে যখন নিরাশার অন্ধকার নেমে আসবার আশঙ্কা দেখা দেবে তখন 'আমি বিবেকানন্দ বলছি' যে তাঁদের সকলকে ক্ষণকালের উৎসাহ দেবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দিশাহারাদের পথসন্ধান করবে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

শংকর

দীপাবলী
২৮ অক্টোবর ২০০৮

বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।

'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আমাদের জন্ম।'[১]

আমার জন্মের জন্য আমার বাবা-মা বছরের পর বছর কত পূজা ও উপবাস করেছিলেন![২]

আমি জানি আমার জন্মের আগে, আমার মা উপোস করতেন, প্রার্থনা করতেন এবং আরও হাজারো জিনিস করতেন যা আমি পাঁচ মিনিটের জন্যও করে উঠতে পারব না। দু'বছর ধরে তিনি এসব করেছেন। আমার মধ্যে যতটুকু ধর্মীয় সংস্কৃতি রয়েছে, তার জন্যে মায়ের কাছে আমি ঋণী। আমি আজ যা হয়েছি সেজন্য আমার মা সচেতনভাবেই আমায় এই পৃথিবীতে এনেছেন। আমার মধ্যে যতটুকু আবেগ রয়েছে সেটা আমার মায়েরই দান—এবং সবটুকুই সচেতন ভাবে, অচেতন ভাবে একটুও নয়।[৩]

আমার মা আমাকে যে ভালবাসা দিয়েছেন তার বলেই আজকের আমির সৃষ্টি হয়েছে তাঁর ঋণ আমি কখনই শোধ করতে পারব না।[৪]

'কতবার যে দেখেছি আমার মা দিনের প্রথম খাবার মুখে তুলছেন দুপুর দু'টোয়। আমরা খেতাম সকাল দশটায় আর তিনি বেলা দু'টোয়, এর মধ্যে তাঁকে হাজার কাজ করতে হতো। (যেমন ধরুন), কেউ এসে দরজায় আঘাত করছেন, "অতিথি", আর আমার মায়ের জন্য খাবার ছাড়া রান্নাঘরে কোনো খাবারই নেই। তিনি স্বেচ্ছায় নিজের খাবার দিয়ে দিতেন তারপর নিজের জন্যে কিছু জোগাড়ের চেষ্টা করতেন। এমনই ছিল তাঁর প্রতিদিনের জীবন

এবং তিনি এটা পছন্দ করতেন। আর এই কারণেই আমরা মায়েদের দেবীরূপে পূজা করি।[৫]

আমারও এরকম একটা স্মৃতি আছে। যখন আমি মাত্র দু-বছরের, আমাদের সহিসের সঙ্গে ছাইমাখা, কৌপীনপরা বৈরাগী সেজে খেলা করতাম। আর যদি কোন সাধু ভিক্ষা করতে আসত, তাহ'লে বাড়ির লোকে আমাকে ওপরতলায় দরজা বন্ধ ক'রে রাখত, পাছে আমি তাকে অনেক কিছু দিয়ে ফেলি। আমি মনে প্রাণে অনুভব করতাম, আমিও এরকম সাধু ছিলাম, কোন অপরাধবশতঃ শিবের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়েছি! অবশ্য আমার বাড়ির লোকেরা ঐ ভাবটাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল, কারণ আমি যখন দুষ্টুমি করতাম, তারা ব'লত 'হায়! হায়! এত জপতপ করবার পর শেষে শিব কিনা কোন পুণ্যাত্মাকে না পাঠিয়ে এই ভূতটাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন!' অথবা আমি খুব দুরন্তপনা করলে তারা 'শিব! শিব!' ব'লতে ব'লতে আমার মাথার উপর এক বালতি জল ঢেলে দিত। আর আমিও তৎক্ষণাৎ শান্ত হয়ে যেতাম—এর অন্যথা কখনও হ'ত না। এখনও পর্যন্ত আমার মনে যখন কোন দুষ্টুবুদ্ধি জাগে, ওই কথা মনে পড়ে যায়, আর অমনি আমি শান্ত হয়ে যাই। মনে মনে বলি, 'না, না, এবার আর নয়'।[৬]

ছেলেবেলায় যখন স্কুলে পড়তাম, তখন এক সহপাঠীর সঙ্গে কি একটা মিঠাই নিয়ে কাড়াকাড়ি হয়েছিল; তার গায়ে আমার চেয়ে অনেক বেশি জোর ছিল, তাই সে মিষ্টিটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তখন আমার যে মনোভাব হয়েছিল, তা এখনও ভুলিনি। আমার মনে হল, ওর মতো দুষ্টু ছেলে জগতে আর জন্মায় নি, আমি যখন বড় হব, আমার গায়ে অনেক জোর হবে, তখন ওকে জব্দ করব। মনে হচ্ছিল—সে এত দুষ্ট যে, কোন শাস্তিই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে না, তাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত, তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা উচিত। যথাসময়ে আমরা উভয়েই বড় হয়েছি, দু'জনের মধ্যে এখন বেজায় বন্ধুত্ব। এইভাবে সমগ্র এই জগৎ শিশুতুল্য মানুষে পূর্ণ—খাওয়া এবং উপাদেয় খাবারই তাদের সর্বস্ব, এতটুকু এদিক্ ওদিক্ হলেই সর্বনাশ! তারা কেবল ভাল ভাল মিষ্টান্নের স্বপ্ন দেখছে, আর তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ধারণা—সর্বদা সর্বত্র প্রচুর মিঠাই থাকবে।[৭]

রায়পুরের পথে বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দেখেছিলাম এবং অনুভব করেছিলাম, তা স্মৃতির পটে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে রয়েছে, বিশেষতঃ একটা ঘটনার কথা। পায়ে হেঁটে বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশ দিয়ে সেদিন আমাদের

যেতে হয়েছিল। পথের দুইপাশেই গিরিশৃঙ্গগুলি গগন স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ; নানাজাতীয় গাছ লতা ফল পুষ্প-সম্ভারে অবনত হয়ে পর্বত-পৃষ্ঠের শোভা বৃদ্ধি করছে ; মধুর কাকলিতে দিক পূর্ণ করে নানাবর্ণের পখি কুঞ্জ হতে কুঞ্জান্তরে গমন করছে, অথবা আহার-অন্বেষণে কখন কখন মাটিতে অবতরণ করছে,—ওই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে অপূর্ব শান্তি অনুভব করছিলাম। ধীর মন্থর গতিতে চলতে চলতে গো-যানগুলো ক্রমে ক্রম এমন একজায়গায় উপস্থিত হল যেখানে দুটি পর্বতশৃঙ্গ যেন প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে শীর্ণ বনপথকে বন্ধ করে দিচ্ছে। তখন মিলন বিন্দুকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে দেখি, এক পাশের পর্বতগাত্রে পাদদেশ পর্যন্ত সুবৃহৎ একটি ফাট রয়েছে এবং তারই মধ্যে মৌমাছিদের যুগযুগান্তরের পরিশ্রমের নিদর্শন-স্বরূপ প্রকাণ্ড একটি চাক ঝুলে রয়েছে! বিস্ময়ে মগ্ন হয়ে সেই মক্ষিকা রাজ্যের আদিঅন্তের কথা ভাবতে ভাবতে ত্রিজগৎ-নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির উপলব্ধিতে আমার মন এমনভাবে তলিয়ে গেল যে, কিছুকালের জন্য বাহ্যসংজ্ঞার লোপ পেল। কতক্ষণ ওই ভাবে গোরুর গাড়িতে পড়েছিলাম, স্মরণ নেই ; যখন চেতনা ফিরে এল তখন দেখলাম, ওই জায়গাটা পেরিয়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি। গোরুর গাড়িতে একলা ছিলাম বলে ব্যাপারটা কেউ জানতে পারে নি।[৮]

অবশ্য জগতে যে যথেষ্ট দুঃখ আছে, তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সুতরাং আমরা যত কাজ করি, তার মধ্যে অপরকে সাহায্য করাই সবচেয়ে ভাল কাজ। যদিও আমরা শেষ পর্যন্ত দেখব—পরকে সাহায্য করা মানে নিজেরই উপকার করা। ছোটবেলায় আমার কতকগুলি সাদা ইঁদুর ছিল। সেগুলি থাকত একটা ছোট বাক্সে, তাতে ছোট ছোট চাকা ছিল। ইঁদুরগুলো যেই চাকার উপর দিয়ে পার হতে চেষ্টা করত, অমনি চাকাগুলো ক্রমাগত ঘুরত, ইঁদুরগুলো আর এগোতে পারত না। এই জগৎ এবং তাকে সাহায্য করাও একইরকম। এর থেকে উপকার বলতে, আমাদের কিছু নৈতিক শিক্ষা হয়।[৯]

আমার শিক্ষক বাড়িতে এলে আমি ইংরিজি, বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলো তাঁর কাছে এনে কোন্ বইয়ের কোথা থেকে কতদূর পর্যন্ত সেদিন আয়ত্ত করতে হবে তা তাঁকে দেখিয়ে দিয়ে নিজের খেয়াল মত শুয়ে বা বসে থাকতাম। মাস্টারমশায় যেন নিজেই পাঠাভ্যাস করছেন এইভাবে বইগুলোর ওই সব পাতার বানান, উচ্চারণ এবং অর্থাদি দু-তিন বার আবৃত্তি করে চলে যেতেন। এতেই ওই সব বিষয় আমার আয়ত্ত হয়ে যেত।[১০]

প্রাইমারি স্কুলে যৎসামান্য পাটিগণিত, কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণ, একটু ভাষা এবং হিসাব শিক্ষা দেওয়া হতো।

বাল্যকালে এক বৃদ্ধ আমাদের নীতিবিষয়ক একটি ছোট্ট বই মুখস্থ করিয়েছিলেন, তার একটি শ্লোক এখনও আমার মনে আছে : 'গ্রামের জন্য পরিবার, স্বদেশের জন্য গ্রাম, মানবতার জন্য স্বদেশ এবং জগতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করবে!' এইরকম অনেক শ্লোক ওই বইতে ছিল। আমরা ওইগুলি মুখস্থ করি এবং শিক্ষক ব্যাখা করে দেন, পরে ছাত্রও ব্যাখ্যা করে।[১১]

যে কবিতাটি স্কুলে প্রথম দিকে আমাকে শেখানো হয়, তা হ'লো :

'যে মানুষ সকল নারীর মধ্যে তার জননীকে দেখতে পায়, সকল মানুষের বিষয়-সম্পত্তিকে একগাদা ধুলোর মতন দেখে, যে সমগ্র প্রাণীর মধ্যে তার নিজ-আত্মাকে দেখতে পায়, সেই প্রকৃত জ্ঞানী'।[১২]

কলকাতায় স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমার প্রকৃতি ধর্মপ্রবণ ছিল। কিন্তু তখনই সব জিনিস পরীক্ষা করে নেওয়া আমার স্বভাব ছিল—কেবল কথায় আমার তৃপ্তি হত না।[১৩]

সারাজীবন ঘুমের জন্য চোখ মুদ্রিত করলেই আমি ভ্রূমধ্যে অপূর্ব এক জ্যোতির্বিন্দু দেখতে পেতাম এবং একমনে আমি নানারকম পরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকতাম। দেখবার সুবিধা হবে বলে লোকে যেভাবে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, আমি সেইভাবে শয়ন করতাম। সেই অপূর্ব বিন্দু নানাবর্ণে পরিবর্তিত ও বর্ধিত হয়ে ক্রমে বিম্বাকারে পরিণত হত এবং পরিশেষে ফেটে গিয়ে আপাদমস্তক শুভ্র-তরল জ্যোতিতে আমাকে আবৃত করে ফেলত!—ওইরকম হওয়ামাত্র চেতনালুপ্ত হয়ে আমি নিদ্রাভিভূত হতাম! আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল, ওইভাবেই সকলে ঘুমোয়। বহুকাল পর্যন্ত ওই ভুল ধারণা আমার ছিল। বড় হয়ে যখন ধ্যানাভ্যাস আরম্ভ করলাম, তখন চোখ মুদ্রিত করলেই ওই জ্যোতির্বিন্দু প্রথমেই আমার সামনে এসে উপস্থিত হত এবং ওই বিন্দুতেই আমি চিত্ত একাগ্র করতাম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে কয়েকজন বয়স্যের সঙ্গে যখন নিত্য ধ্যানাভ্যাস করতে লাগলাম, তখন ধ্যান করবার সময় কার কিরকম দর্শন ও উপলব্ধি হয় তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম। ওই সময়ে ওদের কথাতেই বুঝেছিলাম, ওইরকম জ্যোতিদর্শন তাদের কখনও হয়নি এবং কেউই আমার মত উপুড় হয়ে নিদ্রা যায় না![১৪]

ছেলেবেলায় আমি বেদম ডানিপিটে ছিলুম, তা না হলে কি আর একটা কানাকড়ি সঙ্গে না নিয়ে দুনিয়াটা এইভাবে ঘুরে আসতে পারতুম![১৫]

স্কুলে পড়বার সময় একদিন রাতে দরজা বন্ধ ক'রে ধ্যান করতে করতে মন বেশ তন্ময় হয়েছিল। কতক্ষণ ওই ভাবে ধ্যান করেছিলাম বলতে পারি না। ধ্যান শেষ হল, তখনও বসে আছি, এমন সময় ওই ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ ক'রে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি বার হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ, অথচ যেন কোন ভাব নেই। মহাশান্ত সন্ন্যাসী-মূর্তি—মুণ্ডিত মস্তক, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু। আমার প্রতি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, যেন আমায় কিছু বলবেন—এরূপ ভাব। আমিও অবাক হয়ে তাঁর পানে চেয়ে ছিলাম। তারপর মনে কেমন একটা ভয় এল, তাড়াতাড়ি দোর খুলে ঘরের বাইরে গেলাম। পরে মনে হল, কেন এমন নির্বোধের মতো ভয়ে পালালাম, হয়তো তিনি কিছু বলতেন। আর কিন্তু সে মূর্তির কখনও দেখা পাইনি। কতদিন মনে হয়েছে—যদি ফের তাঁর দেখা পাই তো এবার আর ভয় ক'রব না—তার সঙ্গে কথা কইব। কিন্তু আর তাঁর দেখা পাইনি।

ভেবেছিলাম, কিন্তু ভেবে চিন্তে কিছু কূল-কিনারা পাইনি। এখন বোধ হয়, ভগবান্ বুদ্ধদেবকে দেখেছিলুম।[১৬]

ছোটবেলা থেকেই সময়ে সময়ে কোন ব্যক্তি, বস্তু বা জায়গা দেখলে মনে হত, ওসব আমি আগেই কোথাও দেখেছি ; কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কিছুতে স্মরণে আনতে পারতাম না। কোন জায়গায় বন্ধুদের সঙ্গে হয়তো কোন বিষয়ে আলোচনা করছি, তখন তাদের একজন হঠাৎ এমন একটা কথা বলেছে যা শুনেই আমার মনে হয়েছে—তাই তো, এই ঘরে এই সব লোকের সঙ্গে আগেও আমি এইসব আলোচনা করেছি এবং তখনো তো এই লোকটি এই কথাই বলেছিল! কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তেও এর কারণ স্থির করতে পারিনি। পরে যখন পুনর্জন্মবাদের সঙ্গে পরিচিত হলাম, তখন ভেবেছি, বোধ হয় এইসব ঘটনা আমার পূর্বের জন্মে ঘটেছে এবং তারই আংশিক স্মৃতি কখনো কখনো আমার মনে উঁকি মারে। কিন্তু আরও পরে বুঝেছি, এইসব অভিজ্ঞতার এইরকম ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নয়। এখন মনে হয়, এই জন্মে আমার যে সব লোক বা বিষয়ের সঙ্গে আমাকে পরিচিত হতে হবে, তা জন্মাবার আগেই চিত্রপরম্পরায় আমি কোনভাবে দেখতে পেয়েছিলাম এবং ভূমিষ্ঠ হবার পরে সেই স্মৃতিই সময়ে সময়ে আমার মনের মধ্যে উঁকি মারে।[১৭]

এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাত্র দু-তিন দিন আগে দেখি, জ্যামিতির কিছুই শেখা হয় নি। তখন সারা রাত জেগে পড়তে লাগলাম এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জ্যামিতির চারখণ্ড বই আয়ত্ত করে ফেললাম।[১৮]

আমি বারো বছর কঠোর অধ্যয়ন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাশ করেছি।[১৯]

ছাত্রাবস্থায় এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, কোন লেখকের বই লাইন ধরে না পড়েও আমি বুঝতে পারতাম। প্রতি প্যারাগ্রাফের প্রথম ও শেষ লাইন পড়ে তাঁর ভাব আমি ধরতে পারতাম। এই শক্তি ক্রমশ যখন আরও বাড়ল, তখন প্যারাগ্রাফ পড়ারও প্রয়োজন হতো না ; প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ লাইন পড়েই সবটা বুঝতে পারতাম। আবার যেখানে কোন বিষয় বোঝাবার জন্য লেখক চার পাঁচ বা আরও বেশি পাতা জুড়ে আলোচনা আরম্ভ করেছেন, সেখানে গোড়ার দিকে কয়েকটি কথা পড়েই আমি ব্যাপারটা বুঝে নিতাম।[২০]

যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত প্রতিরাত্রে বিছানায় শুলেই দুটি দৃশ্য আমার চোখের সামনে ফুটে উঠত। একটাতে দেখতাম আমার অশেষ ধন-জন-সম্পদ ঐশ্বর্যাদি লাভ হয়েছে, সংসারে যাদের বড় লোক বলে আমি তাদের শীর্ষস্থানে আরোহন করেছি, মনে হত এরকম হবার মতো শক্তি আমার মধ্যে সত্য সত্যই রয়েছে। আবার পরক্ষণে দেখতাম, আমি পৃথিবীর সর্বস্ব ত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভর করে কৌপীনধারী আমি যদৃচ্ছালব্ধ ভোজন এবং বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করে সময় কাটাচ্ছি। মনে হত ইচ্ছা করলে আমি ঐভাবে মুনিঋষিদের মত জীবনযাপনে সমর্থ। দু ভাবে জীবন যাপন করবার ছবি কল্পনায় উদিত হয়ে শেষোক্তটাই অবশেষে হৃদয় অধিকার করে বসত। ভাবতাম এইভাবেই মানুষ পরমানন্দ লাভ করতে পারে, আমি ঐরকমই হবো। তখন ঐ জীবনের সুখ ভাবতে ভাবতে ঈশ্বরচিন্তায় মন নিমগ্ন হত এবং আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। আশ্চর্যের বিষয় অনেক দিন পর্যন্ত ঐরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল।[২১]

মিথ্যা বলা হবে এইভেবে ছেলেদের আমি কখনও জুজুর ভয় দেখাই নি, এবং বাড়িতে কেউ এরকম করছে দেখলে তাকে বিষম বকাবকি করতাম। ইংরিজি পড়ে এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে আমার বাচনিক সত্যনিষ্ঠা তখন এতদূর বেড়ে গিয়েছিল।[২২]

বর্তমান (১৯ শতাব্দী) যুগের প্রারম্ভে অনেকের আশঙ্কা হয়েছিল যে,

ধর্মের ধ্বংস এবার অবশ্যম্ভাবী। বৈজ্ঞানিক গবেষণার তীব্র আঘাতে পুরাতন কুসংস্কারগুলো চীনামাটির বাসনের মতো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। যারা ধর্মকে কেবল মতবাদ ও অর্থশূন্য অনুষ্ঠান বলে মনে করত, তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল ; ধরে রাখার মতো কিছুই তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। এক সময়ে মনে হয়েছিল যে, জড়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদের উত্তাল তরঙ্গ সামনের সব কিছুকে দ্রুতবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

...বাল্যবয়সে এই নাস্তিকতার প্রভাব আমার উপরও পড়েছিল এবং এক সময়ে এমন মনে হয়েছিল যে, আমাকেও ধর্মের সকল আশা-ভরসা ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম অধ্যয়ন করলাম এবং আশ্চর্য হলাম যে আমাদের ধর্ম যে-সব মূলতত্ত্ব শিক্ষা দেয়, অন্যান্য ধর্মও অবিকল সেই শিক্ষাই দেয়। তখন আমার মনে এই রকম প্রশ্নের উদয় হল : তাহলে সত্য কী?[২৩]

বালক-বয়সে এই কলকাতা শহরে আমি সত্যান্বেষণে এখানে-ওখানে ঘুরতাম আর বড় বড় বক্তৃতা শুনবার পর বক্তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, 'আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?' ঈশ্বর-দর্শনের কথায় অনেক বক্তাই চমকিয়ে উঠতেন ; একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে বলেছিলেন, 'আমি ঈশ্বর দর্শন করেছি।' শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমি তোমাকেও তাঁর দর্শনলাভ করবার পথ দেখিয়ে দেব।'[২৪]

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়

আমি বাঙ্গলায় জন্মেছি, অবিবাহিত থেকেছি এবং নিজের ইচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি। আমার জন্মের পরে পিতৃদেব আমার একটা জন্মকুণ্ডলী করান, তিনি কিন্তু সেখানে কি আছে তো আমাকে কখনও বলেননি। বেশ কয়েক বছর পরে আমি যখন বাড়ি যাই আমার বাবার তখন মৃত্যু হয়েছে। কিছু কাগজপত্রের মধ্যে আমার সেই জন্মকুণ্ডলী আমার মায়ের হেফাজতে দেখতে পাই এবং তাতে দেখি যে আমি পৃথিবীর বুকে একজন পরিব্রাজক হব সেটা নির্দিষ্ট ছিলো।[১]

বাল্যবয়স থেকেই ধর্ম ও দর্শন-চর্চায় আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আমাদের

শাস্ত্রের উপদেশ—মানুষের পক্ষে ত্যাগই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। পরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বুঝলাম, আমাদের যা শ্রেষ্ঠ আদর্শ তা তিনি জীবনে পরিণত করেছেন। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ যে-পথের পথিক, সেই পথ অবলম্বন করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যেও জেগে উঠলো, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করবার সংকল্প নিলাম।[২]

আমি যে-সম্প্রদায়ভুক্ত তাকে বলা হয় সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়। 'সন্ন্যাসী' শব্দের অর্থ 'যে-ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করেছে।' এটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়। যীশুর জন্মের ৫৬০ বৎসর আগে বুদ্ধও এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের অন্যতম সংস্কারক মাত্র। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদেও আপনারা সন্ন্যাসীর উল্লেখ পাবেন।

সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় বলতে 'চার্চ' বোঝায় না এবং এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা পুরোহিত নন। পুরোহিত ও সন্ন্যাসীর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

সন্ন্যাসীদের সম্পত্তি থাকে না, তাঁরা বিয়ে করেন না। তাঁদের কোন সংস্থা নেই। তাঁদের একমাত্র বন্ধন গুরুশিষ্যের বন্ধন। এই বন্ধনটি ভারতবর্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শুধু শিক্ষাদানের জন্য যিনি আসেন এবং সেই শিক্ষার জন্য কিছু মূল্য বিনিময় করেই যাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ চুকে যায়, তিনি প্রকৃত শিক্ষক নন। ভারতবর্ষে এটি প্রকৃত অর্থে দত্তকগ্রহণের মতো। শিক্ষাদাতা গুরু আমার পিতার অধিক, আমি তাঁর সন্তান—সব দিক দিয়ে আমি তাঁর সন্তান। সর্বাগ্রে পিতারও আগে, তাঁকে শ্রদ্ধা করব এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকার করব ; কারণ ভারতবাসীরা বলেন, পিতা আমার জন্মদান করছেন কিন্তু গুরু আমাকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, সুতরাং পিতা অপেক্ষা গুরু মহত্তর। আজীবন আমরা গুরুর প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করি। গুরু-শিষ্যের মধ্যে এই সম্বন্ধই বর্তমান। আমি আমার শিষ্যদের দত্তকরূপে গ্রহণ করি। অনেক সময় গুরু হয়তো তরুণ, শিষ্য বয়োবৃদ্ধ।

এক বৃদ্ধকে আমি গুরুরূপে পেয়েছিলাম, তিনি অদ্ভুত লোক। পাণ্ডিত্য তাঁর কিছুই ছিল না, পড়াশুনাও বিশেষ করেন নি। কিন্তু শৈশব থেকেই সত্যের প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জেগেছিল। স্বধর্ম-চর্চার মধ্য দিয়ে তাঁর সাধনার শুরু। পরে তিনি অন্যান্য ধর্মমতের মধ্য দিয়ে সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় একের পর এক অন্য ধর্মসম্প্রদায়ে যোগদান করলেন। কিছুকাল তিনি সম্প্রদায়গুলির নির্দেশ অনুযায়ী সাধন করতেন, সেই সেই সম্প্রদায়ের ভক্তদের সঙ্গে বাস করে তাদের ভাবাদর্শে তন্ময় হয়ে থাকতেন। কয়েক বছর পরে আবার তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ে যেতেন।

এইভাবে সব সাধনার শেষে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন---সব মতই ভালো। কোন ধর্ম্মতেরই তিনি সমালোচনা করতেন না ; তিনি বলতেন, বিভিন্ন ধর্ম্মতগুলো একই সত্যে পৌঁছবার বিভিন্ন পথ মাত্র। তিনি আরও বলতেন : এতগুলো পথ থাকা তো খুবই গৌরবের বিষয়, কারণ, ঈশ্বরলাভের পথ যদি একটিমাত্র হতো, তবে সেটা একজন ব্যক্তির পক্ষেই উপযোগী হতো। পথের সংখ্যা যত বেশী থাকবে, ততই আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে সত্যলাভের বেশী সুযোগ ঘটবে। যদি এক ভাষায় শিখতে না পারি, তবে আর এক ভাষা শিখবার চেষ্টা করব, সব ধর্ম্মতের প্রতি তাঁর এমনই গভীর শ্রদ্ধা ছিল।[৩]

হাজার হাজার লোক এই অপূর্ব মানুষটিকে দেখতে এবং সরল গ্রাম্যভাষায় তাঁর উপদেশ শুনতে আসতে লাগল। তাঁর প্রত্যেকটি কথায় বিশেষ শক্তি মিশ্রিত থাকত, তাঁর প্রত্যেক কথা হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে দিত।

অদ্ভুত এই মানুষটি তখনকার ভারতের রাজধানী এবং আমাদের দেশে শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র, যেখানে প্রতি বছর শত শত সন্দেহবাদী ও জড়বাদীর সৃষ্টি হচ্ছিল, সেই কলকাতা শহরের কাছে বাস করতেন। তবু অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী, অনেক সন্দেহবাদী এবং অনেক নাস্তিক তাঁর কাছে এসে তাঁর কথা শুনতেন।

এই মানুষটির খবর পেয়ে আমিও তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। কিন্তু তাঁকে একজন সাধারণ লোকের মতো বোধ হল, কিছু অসাধারণত্ব খুঁজে পেলাম না।[৪]

প্রশ্ন : তাঁকে প্রথম দেখার দিনটি আপনার বেশ স্মরণ পড়ে?

—হাঁ। প্রথম দর্শন দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে। তাঁরই ঘরে। সেইদিনে দুটি গান আমি গেয়েছিলাম।...

—গান শুনে তাঁর ভাব হয়ে গিছলো। রামবাবুদের* জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ছেলেটি কে? আহা কি গান!' আমাকে আবার আসতে বললেন।[৫]

গান তো গাইলাম! কিন্তু তার পরেই ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) হঠাৎ উঠে আমার হাত ধরে তাঁর ঘরের উত্তরের দিকের বারান্দায় নিয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তখন শীতকাল, উত্তরে-হাওয়া আটকাবার জন্যে বারান্দাটা ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা ছিল। তাই বাইরের কাউকে

---

* শ্রী রামচন্দ্র দত্ত

আর দেখা যাচ্ছিল না। তারপর তিনি সেখানে যা বললেন এবং করলেন তা কল্পনাতীত। তিনি হঠাৎ আমার হাত ধরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে পূর্ব পরিচিতের ন্যায় বলতে লাগলেন, 'এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্যে যে কি ভাবে প্রতীক্ষা করে আছি তা একবার ভাবতে নেই? বিষয়ী লোকের কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝলসে গেল, প্রাণের কথা কাউকে বলতে পাইনে।' এই রকম অনেক কথা বললেন ও কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি আমার সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন—'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি—নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি দূর করবার জন্যে আবার শরীর ধারণ করেছ।' ইত্যাদি।

আমি তো শুনে নির্বাক—স্তম্ভিত! মনে মনে ভাবতে লাগলাম এ আমি কাকে দেখতে এসেছি? এ তো একেবারে উন্মাদ! নইলে আমি বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, আমাকে এই সব কথা বলা! যা হোক চুপ করে রইলাম, পাগল যা ইচ্ছে তাই বলে যেতে লাগলেন। পরে তিনি আমাকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে, ঘরের ভিতর গিয়ে মাখন, মিছরি ও কতকগুলি সন্দেশ এনে আমাকে নিজ হাতে খাওয়াতে লাগলেন। আমি বার বার বললাম, 'খাবারগুলো আমাকে দিন, আমার সঙ্গীদের সঙ্গে ভাগ করে খাব।' কিন্তু তিনি তা কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, 'ওরা খাবে এখন, তুমি খাও।' বলে সবগুলি আমাকে খাইয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরে বললেন, 'বল, তুমি শীঘ্র আর একদিন একা আমার কাছে আসবে।' তাঁর এই একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে বাধ্য হয়ে বলতে হলো, 'আসব'। এবং তখন তাঁর সঙ্গে আবার ঘরে এসে সঙ্গীদের পাশে বসলাম।[৬]

বসেই আমি তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। এই সময়ে তাঁর চালচলন, কথাবার্তা ইত্যাদিতে উন্মাদের কোন লক্ষণ দেখলাম না। বরং ভক্তদের প্রতি তাঁর উপদেশ শুনে ও তাঁর অদ্ভুত ভাবসমাধি দেখে মনে হলো, তিনি সত্য সত্যই একজন ঈশ্বর-জানিত লোক এবং তিনি যা বলছেন তা নিজে অনুভব করেছেন। তাই, ধীরে ধীরে তাঁর দিকে একটু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলাম, 'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?'

তিনি একটুও বিলম্ব না করে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি। তোমাদের যেমন দেখছি, তোমাদের সঙ্গে যে ভাবে কথা বলছি, ঠিক তেমনি ভাবেই তাঁকে দেখা যায় ও তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। কিন্তু কে তা চায়? লোকে স্ত্রী, পুত্র, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির শোকে কত চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বরের

জন্য কে ঐরূপ করে? তাঁকে পাবার জন্যে কেউ যদি তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাকে দেখা দেন।'

তাঁর এই উত্তর শুনে মনে হলো তিনি তাঁর নিজ উপলব্ধি থেকেই এই কথা বলছেন। কিন্তু এই সকল কথার সঙ্গে তার ইতঃপূর্বের উন্মাদের ন্যায় আচরণের কোন সামঞ্জস্য করতে না পেয়ে ভাবলাম, ইনি একজন মনোম্যানিয়াক (এক বিষয়ের পাগল)। তথাপি মনে হতে লাগলো, উন্মাদ হলেও ইনি মহাত্যাগী ও মহাপবিত্র এবং শুধু ওই জন্যই মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাবার যথার্থ অধিকারী। এইরকম চিন্তা করতে করতে সেদিন তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম।[৭]

প্রশ্ন : তারপর কোথায় দেখা হলো?

—তারপর আবার দক্ষিণেশ্বর। সেবারে আমায় দেখে ভাবে আমায় স্তব করতে লাগলেন। স্তব করে বলতে লাগলেন, 'নারায়ণ, তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছ!'

মাকে বলেছিলাম, 'মা, আমি কি যেতে পারি! গেলে কার সঙ্গে কথা কব? মা, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকবো! বললেন, 'তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি, আর আমায় বললি 'আমি এসেছি।' আমি কিন্তু কিছু জানি না, কলকাতার বাড়িতে তোফা ঘুম মারছি।[৮]

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যে কলকাতা থেকে এত বেশি দূরে তা প্রথমবার গাড়িতে এসে কিছু বুঝতে পারিনি। হাঁটাপথে মনে হলো পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। যা হোক, লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে পরিশেষে কালীবাড়িতে পৌঁছে সোজা ঠাকুরের ঘরে গেলাম। দেখলাম তিনি তাঁর ছোট তক্তপোশখানির উপর বসে আছেন। আমাকে দেখেই তিনি আনন্দের সঙ্গে ডেকে তাঁর বিছানার উপর বসালেন।

বসেই দেখলাম তিনি যেন কি রকম ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। এবং আমার উপর স্থির দৃষ্টি রেখে অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলতে বলতে আমার দিকে সরে আসছেন। ভাবলাম আগের দিনের মতো বুঝি আবার একটা পাগলামি করবেন। কিন্তু ঐরূপ ভাবতে না ভাবতে তিনি তাঁর ডান পা আমার গায়ের উপর রাখলেন। এবং ঐ স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা অদ্ভুত উপলব্ধি উপস্থিত হলো। চোখ মেলেই দেখতে লাগলাম, দেয়ালগুলো ও ঘরের সমস্ত জিনিসপত্রই বেগে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং আমার আমিত্ব সহ সারা বিশ্বটাই যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে বিলীন হতে ছুটেছে।

তখন আমি এক মহাভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মনে হলো—আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ আমার সামনে, অতি নিকটে! সামলাতে না পেরে চিৎকার করে উঠলাম, 'ওগো, তুমি আমার এ কি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!'

আমার কথা শুনে ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন এবং হাত দিয়ে বুকে টুক টুক করে চাপড় দিয়ে বললেন, 'তবে এখন থাক, একেবারে (এখনই) কাজ নেই, কালে হবে।' আশ্চর্যের বিষয় তিনি এ কথা বলতে না বলতে আমার ঐ অদ্ভুত উপলব্ধি নিমেষে থেমে গেল। আমি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হলাম এবং ঘরের ভিতরের ও বাইরের জিনিসগুলি পূর্বের ন্যায় অবস্থিত দেখতে পেলাম।

বলতে যে সময় লাগল, ঘটনাটি তার চাইতেও কম সময়ে ঘটে গেল এবং ওর দ্বারা আমার মনে এক যুগান্তর উপস্থিত হলো। স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলাম, এ কি হলো? এ কি 'মেস্মেরিজিম' (ইচ্ছাশক্তি-সৃষ্ট মোহ), না 'হিপনটিজিম' (সম্মোহন বিদ্যা প্রয়োগের ফল)? ও দুই-ই তো শুধু দুর্বল মনের উপরই ক্রিয়া করতে পারে। কিন্তু আমি তো দুর্বলমনা নই। তা ছাড়া, আমি তো ওঁর ভক্তও নই। বরং আমি ওঁকে আংশিক পাগল বলেই ধরে নিয়েছি। তা হলে আমার ঐ উপলব্ধিটা কি? ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির করতে পারলাম না। তবে দৃঢ় সঙ্কল্প করলাম যে ওঁকে আর কখনও আমার মনের উপর এ রকম প্রভাব বিস্তার করতে দেব না।

আর ঐ সঙ্গে এ কথাও মনে হতে লাগল, ওঁর যদি এত বড় ইচ্ছাশক্তিই থেকে থাকে, যার দ্বারা উনি আমার মনের মতো সবল দৃঢ়-সংস্কারযুক্ত মনকেও অবশ করে ফেলতে পারেন, তবে ওঁকে আর পাগলই বা বলা যায় কি করে? অথচ, প্রথম দিন উনি আমাকে বারান্দায় নিয়ে যে সকল কথা বলেছিলেন, তাতে ওঁকে পাগল ছাড়া আর কি-ই বা মনে করতে পারি? ফলে এ বিষয়েও কিছু ঠিক করতে না পেরে স্থির করলাম, যে ভাবে পারি ওঁর স্বভাব ও শক্তির বিষয় সঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে।

এই সব চিন্তাতেই সেদিন আমার সময় কাটতে লাগল। কিন্তু দেখলাম, ঘটনাটির পর ঠাকুর যেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে গেলেন। এবং প্রথম দিনের ন্যায় আমাকে আদর-যত্ন করতে লাগলেন। কোন প্রিয় আত্মীয় বা বন্ধুকে বহুকাল পরে কাছে পেলে লোকে যেমন করে, ঠিক তেমনি করতে লাগলেন। খাইয়ে, আদর করে, কথা বলে ও রঙ্গ-পরিহাস করে তাঁর আশ যেন আর মিটছিল না। এবং তাঁর এই অদ্ভুত স্নেহপূর্ণ ব্যবহারও আমার একটা

ভাববার বিষয় হলো। পরিশেষে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখে আমি তাঁর কাছে সে দিনের মতো বিদায় চাইলাম। এতে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'আবার শীঘ্র আসবে, বল।' তখন পূর্ববারের ন্যায় ঐ প্রতিশ্রুতি দিয়েই আসতে হলো।[৯]

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমায় ছুঁয়ে দিয়েছিলেন ; দেবামাত্র দেখলুম ঘরবাড়ি, দোর-দালান, গাছপালা, চন্দ্র-সূর্য—সব যেন আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে।... তখন ক্রমে আবার দেখলুম—ঘরবাড়ি দোর-দালান যা যেমন সব ছিল, ঠিক সেই রকম রয়েছে! আর একদিন আমেরিকার একটি lake-এর (হ্রদের) ধারে ঠিক ঐরূপ হয়েছিল।...

...যখন রোগের খেয়ালে নয়, নেশা ক'রে নয়, রকম-বেরকমের দম টেনেও নয়, সহজ মানুষের সুস্থাবস্থায় এ অবস্থা হয়ে থাকে, তখন তাকে মস্তিষ্কের বিকার কি ক'রে বলবি, বিশেষতঃ যখন আবার ঐরূপ অবস্থালাভের কথা বেদের সঙ্গে-মিলছে, পূর্বপূর্ব আচার্য ও ঋষিগণের আপ্তবাক্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে? আমায় কি শেষে তুই বিকৃতমস্তিষ্ক ঠাওরালি?...

জানবি, এই একত্বজ্ঞান—যাকে তোদের শাস্ত্রে ব্রহ্মানুভূতি বলে—তা হ'লে জীবের আর ভয় থাকে না, জন্মমৃত্যুর পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। এই হেয় কামকাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে জীব সে ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে পারে না। সেই পরমানন্দ পেলে জগতের সুখদুঃখে জীব আর অভিভূত হয় না।

সে পরমানন্দলাভের ইচ্ছা আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলের ভেতর পূর্ণভাবে রয়েছে। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মও সকলের অন্তরের অন্তরে রয়েছেন। তুইও সেই পূর্ণব্রহ্ম। এই মুহূর্তে—ঠিক ঠিক ভাবলেই ঐ কথার অনুভূতি হয়। কেবল অনুভূতির অভাব মাত্র। তুই যে চাকরি ক'রে স্ত্রী-পুত্রের জন্য এত খাটছিস, তার উদ্দেশ্যও সেই সচ্চিদানন্দলাভ। সেই মোহের মারপেঁচে পড়ে ঘা খেয়ে খেয়ে ক্রমশঃ স্ব-স্বরূপে নজর আসবে। বাসনা আছে বলেই ধাক্কা খাচ্ছিস ও খাবি। ঐরূপে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নিজের দিকে দৃষ্টি পড়বে—সকলেরই এক সময় পড়বেই পড়বে। তবে কারও এ জন্মে, কারও বা লক্ষ জন্ম পরে।[১০]

আমার প্রতি ভালবাসার জন্য তিনি ঐভাবে নিজের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না দেখে তাঁর উপর বিষম কঠোর বাক্য প্রয়োগ করতেও কখনও কুণ্ঠিত হই নি। বলতাম—পুরাণে আছে, ভরত 'হরিণ' ভাবতে ভাবতে মৃত্যুর পরে হরিণ হয়েছিল, একথা যদি সত্য হয়, তাহলে আপনার আমার বিষয়ে অত চিন্তা করার পরিণাম ভেবে সতর্ক হওয়া উচিত!

বালকের ন্যায় সরল ঠাকুর আমার ঐসব কথা শুনে বিষম চিন্তিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন 'ঠিক বলেছিস! তাই তো রে, তা হলে কি হবে, আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি না।'

দারুণ বিমর্ষ হয়ে ঠাকুর মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) ঐ কথা জানাতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে হাসতে হাসতে ফিরে এসে বললেন, 'যা শালা, আমি তোর কথা শুনব না ; মা বললেন,—তুই ওকে, সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস্, তাই ভালবাসিস্, যেদিন ওর ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না।' ঐভাবে আমি এর আগে যত কথা বুঝিয়েছিলাম, ঠাকুর সেদিন এক কথায় সেই সব উড়িয়ে দিয়েছিলেন।[১১]

একদিন বলেছিলেন, তুই যদি মনে করিস, কৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে দেখতে পাস্। আমি বললাম, আমি কিষ্টফিষ্ট মানি না।[১২]

একবার তাঁকে আমি বললাম, আর আমার কথায় এতো বিশ্বাস যে যখন বললাম, আপনি রূপ-টুপ যা দেখেন ও-সব মনের ভুল, তখন মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা নরেন্দ্র এই সব কথা বলেছে, তবে এ সব কি ভুল? তারপর আমাকে বললেন, 'মা বললে, ও-সব সত্য!'

(আবার) বলতেন, 'তোর গান শুনলে (বুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে) এর ভিতর যিনি আছেন, তিনি সাপের ন্যায় ফোঁস ক'রে যেন ফণা ধ'রে স্থির হ'য়ে শুনতে থাকেন!'[১৩]

আমরা আমাদের স্বয়ম্ভূ বেদ, ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, কোরান এবং সকল প্রকার সুপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। আমাদের আলোচনার শেষে সেই সাধুটি আমাকে টেবিল থেকে একখানি বই আনতে আজ্ঞা করলেন। এই বইয়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সেই বৎসরের বর্ষণ-ফলাফলের উল্লেখ ছিল। সাধুটি আমাকে তা থেকে পাঠ করতে বললেন এবং আমি তা থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণটি তাঁকে পড়ে শোনালাম। তখন তিনি বললেন—'এখন তুমি বইটি একবার নিঙড়ে দেখ তো?' তাঁর কথামত আমি ঐরকম করলাম। তিনি বললেন—'কই বৎস! একফোঁটা জলও যে পড়ছে না! যতক্ষণ পর্যন্ত না জল বার হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ওটা বইমাত্র ; সেইরূপ যতদিন পর্যন্ত তোমার ধর্ম তোমাকে ঈশ্বর উপলব্ধি না করায়, ততদিন ওটা বৃথা। যিনি ধর্মের জন্য কেবল গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁর অবস্থা ঠিক যেন একটি গর্দভের মতো, যার পিঠে চিনির বোঝা আছে, কিন্তু সে তার মিষ্টত্বের কোনও খবর রাখে না।'[১৪]

তিনি যা যা বলতেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতুম না। একদিন তিনি বলেছিলেন, 'তবে আসিস্ কেন?'

আমি বললাম, আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়।

তিনি খুব খুশী হলেন।[১৫]

আমাকে একদিন একলা একটি কথা বললেন। আর কেউ ছিল না।

তিনি বললেন, 'আমার ত সিদ্ধাই করবার যো নেই। তোর ভেতর দিয়ে করবো, কি বলিস্?' আমি বললাম—না, তা হবে না।

ওঁর কথা উড়িয়ে দিতাম,— ঈশ্বরের রূপ দর্শন করেন, এ বিষয়ে আমি বলেছিলাম, ও সব মনের ভুল।

তিনি বললেন, 'ওরে, আমি কুঠীর উপর চেঁচিয়ে বলতাম, ওরে কোথায় কে ভক্ত আছিস্ আয়,—তোদের না দেখে আমার প্রাণ যায়! মা বলেছিলেন ভক্তেরা সব আসবে,—তা দেখ, সব ত মিলছে!'

আমি তখন আর কি বলব, চুপ করে রইলাম।[১৬]

আমি নিজের মতে কাজ করতাম, তিনি কিছু বলতেন না। আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেম্বার হয়েছিলাম, তিনি জানতেন। ওখানে মেয়েমানুষেরা যায়। মেয়েদের সামনে রেখে ধ্যান করা যায় না, তাই নিন্দা করতেন। আমায় কিন্তু কিছু বলতেন না! একদিন শুধু বললেন, রাখালকে* ও সব কথা কিছু বলিস নি—যে তুই সমাজের মেম্বার হয়েছিস্। ওরও, তা হলে, হ'তে ইচ্ছা যাবে।[১৭]

ঠাকুর আমাকে গ্রহণ করে ধর্ম-সম্বধীয় শিক্ষাদানে আমার উপর যেরকম কৃপা করতেন, সেইরকম কৃপা অন্যদের না করায় আমি তাঁকে ঐরকম করবার জন্য পীড়াপীড়ি করে ধরে বসতাম। বাল-স্বভাববশতঃ অনেক সময় তাঁর সঙ্গে কোমর বেঁধে তর্ক করতেও উদ্যত হতাম। বলতাম, কেন মশাই, ঈশ্বর তো আর পক্ষপাতী নন যে, একজনকে কৃপা করবেন এবং আর একজনকে কৃপা করবেন না? তবে কেন আপনি ওদের আমার মত গ্রহণ করবেন না? ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে সকলেই যেমন বিদ্বান্ পণ্ডিত হতে পারে, ধর্মলাভ ঈশ্বরলাভও যে তেমনি করতে পারে, এ কথা তো নিশ্চয়।

তাতে ঠাকুর বলতেন, 'কি করবো রে—আমাকে মা যে দেখিয়ে দিচ্চে,

---

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ

ওদের ভেতর ষাঁড়ের মতো পশুভাব রয়েছে, ওদের এ জন্মে ধর্মলাভ হবে না—তা আমি কি করবো? তোর ও কি কথা? ইচ্ছা ও চেষ্টা করলেই কি লোকে এ জন্মে যা ইচ্ছা তাই হতে পারে?'

ঠাকুরের ওকথা তখন শোনে কে? আমি বলতাম, সে কি মশাই, ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে যার যা ইচ্ছা তা হতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। আমি আপনার ওকথায় বিশ্বাস করতে পারছি না। ঠাকুরের তাতেও ঐ কথা—'তুই বিশ্বাস করিস্ আর নাই করিস্, মা যে আমায় দেখিয়ে দিচ্চে!' আমিও তখন তাঁর কথা কিছুতেই স্বীকার করতুম না। তারপর যত দিন যেতে লাগল, দেখে-শুনে তত বুঝতে লাগলুম—ঠাকুর যা বলেছেন তাই সত্য, আমার ধারণাই মিথ্যা।'[১৮]

দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হবামাত্র ঠাকুর অন্য সবাইকে যা পড়তে নিষেধ করতেন, সেই সব বই আমায় পড়তে দিতেন। অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে তাঁর ঘরে একখানি 'অষ্টাবক্র-সংহিতা' ছিল। কেউ সেখানি বার করে পড়ছে দেখতে পেলে ঠাকুর তাকে ঐ বই পড়তে নিষেধ করে 'মুক্তি ও তাহার সাধন', 'ভগবদ্গীতা' বা কোন পুরাণগ্রন্থ পড়বার জন্য দেখিয়ে দিতেন। আমি কিন্তু তাঁর কাছে গেলেই ঐ 'অষ্টাবক্র-সংহিতা' খানি বার করে পড়তে বলতেন। অথবা অদ্বৈতভাবপূর্ণ 'অধ্যাত্মরামায়ণের' কোন অংশ পাঠ করতে বলতেন। যদি বলতাম—ও বই পড়ে কি হবে? আমি ভগবান, একথা মনে করাও পাপ। ঐ পাপকথা এই বইয়ে লেখা আছে। ও বই পুড়িয়ে ফেলা উচিত!' ঠাকুর তাতে হাসতে হাসতে বলতেন, 'আমি কি তোকে পড়তে বলছি? একটু পড়ে আমাকে শুনাতে বলছি। খানিক পড়ে আমাকে শুনা না। তাতে তো আর তোকে মনে করতে হবে না, তুই ভগবান।' কাজেই অনুরোধে পড়ে অল্পবিস্তর পড়ে তাঁকে শুনাতে হত।[১৯]

সেদিনকার ঐ অদ্ভুত স্পর্শে নিমেষের মধ্যে আমার ভিতর এক আশ্চর্য ভাবান্তর উপস্থিত হলো। স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগলাম, সত্য সত্যই ঈশ্বর ছাড়া এ বিশ্বে আর কিছুই নেই। দেখেও নীরব রইলাম, ঐ ভাব কতক্ষণ থাকে তাই দেখবার জন্যে। কিন্তু সে ঘোর সেদিন কিছুমাত্র কমলো না। বাড়ি ফিরে দেখি, সেখানেও তাই—যা কিছু দেখি সবই তিনি। খেতে বসলাম, দেখি ভাত, থালা পরিবেশক এবং আমি নিজেও ঐ তিনিই। দুই এক গ্রাস ভাত খেয়ে আমি স্থির হয়ে বসে রইলাম। মা বললেন—'বসে আছিস কেন রে, খা না?' মার কথায় হুঁস হওয়ায় আবার খেতে আরম্ভ করলাম। এইভাবে

পিতৃদেব বিশ্বনাথ দত্তের কোনো ছবি নেই। আছে কেবল ইংরিজি সই ও জ্ঞাতি ভ্রাতা উকিল তারকনাথকে লখনৌ থেকে পোস্টকার্ডে লেখা একটি চিঠি। উপরের স্বাক্ষরটির তারিখ ২৩ নভেম্বর ১৮৬৮, ওইদিন আইন ব্যবসায় বিশ্বনাথ দত্তের পার্টনার আশুতোষ ধরের সঙ্গে দত্ত অ্যান্ড ধর প্রতিষ্ঠার দলিল সই হয়।

শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দাসী

গর্ভধারিণী জননী ভুবনেশ্বরীর বাংলা সই আছে আদালতের নথিপত্রে। মুক্তোর মতো হস্তলিপিতে বাংলা সইটি নেওয়া হয়েছে প্রয়াত স্বামীর লেটারস অফ অ্যাডমিনিসট্রেশনের আবেদনপত্র থেকে, তারিখ ১১ আগস্ট ১৮৮৫। বাংলায় লিখতেন : ভুবনেশ্বরী দাসী।

নরেন্দ্রজননীর যে দুটি ফটোগ্রাফের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে তা পুত্রের দেহাবসানের পরে তোলা। ভুবনেশ্বরীর জন্ম ১৮৪১, ১০ বছর বয়সে বিবাহ, ছটি কন্যা ও চারটি পুত্রের জননী। শোকেতাপে, বৈধব্যযন্ত্রণা, প্রিয় কন্যাদের আত্মহনন, অতি আদরের সন্তানের সন্ন্যাসগ্রহণ, মামলা-মোকদ্দমায় ও আর্থিক অনটনে জর্জরিত ভুবনেশ্বরীর দুঃখের শেষ ছিল না। এসবই যে তাঁর শরীরকে বিধ্বস্ত করেছিল তার সাক্ষ্য রয়েছে শেষজীবনের এই ছবিটিতে। ছবিটি প্রকাশিত হয়েছিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের স্বরাজ পত্রিকায়, বৈশাখ ১৩১৪ সনে। মেনিনজাইটিস রোগে ভুবনেশ্বরীর দেহাবসান ২৫ জুলাই ১৯১১—বিশ্ববিজয়ী প্রিয়পুত্রের তিরোভাব ৪ জুলাই ১৯০২।

দিদি স্বর্ণময়ী, মেজভাই মহেন্দ্রনাথ ও ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথ ছাড়া আর ভাইবোনদের তেমন খবরাখবর পাওয়া যায় না। শুধু জানা যায় বোন, যোগীন্দ্রবালা ও আর এক বোন শ্বশুরবাড়িতে আত্মহত্যা করেন। দিদি স্বর্ণময়ী এক সময়ে গৌরমোহন স্ট্রিটের ভিটেবাড়িতেই বাস করতেন সত্তর বছর বয়সে তাঁর দেহাবসান ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২।
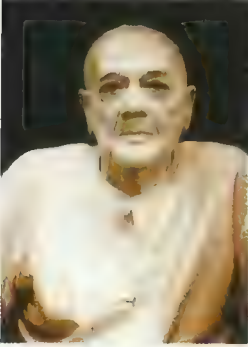
মেজোভাই মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বামীজির আচমকা দেখা হয়ে গিয়েছিল লন্ডনে ১৮৯৬ সালে। পরবর্তীকালে স্বামীজি সম্বন্ধে কয়েকটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থের রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ অভিমানবশে বিলেত থেকে পদব্রজে দেশে ফিরে এসেছিলেন। সময় লেগেছিল বেশ কয়েক বছর। মহেন্দ্রনাথের দেহাবসান ৮৮ বছর বয়সে ১৯৫৬ সালে কলকাতায়।

ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথ পিতার মৃত্যুকালে দুগ্ধপোষ্য শিশু। স্বামীজির তিরোধানের পরে বিপ্লব আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে প্রথমে জেলে যান, পরে মায়ের গহনা বিক্রির টাকায় দেশছাড়া হন। এই ছবিটি গ্রিসের এথেন্সে তোলা ১৯১৫ সালে। ভূপেন্দ্রনাথ ১৯২৫ সালে স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে দেশে ফেরেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'স্বামী বিবেকানন্দ প্যাট্রিয়ট প্রফেট'। ভূপেন্দ্রনাথের মৃত্যু ১৯৬১ সালে।

৩ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিট কলকাতায় দরিয়াটোনার দত্তদের ভিটেবাড়ি এখন তীর্থক্ষেত্র। এই বাড়িতেই নরেন্দ্রনাথের জন্ম ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩। মামলা-মোকদ্দমায় জর্জরিত ও বহুধাবিভক্ত এই বিশাল বাড়িটির পুনরুদ্ধার সম্প্রতি সম্ভব হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। অধিগ্রহণের সময় দত্তবাড়ির প্রধান প্রবেশপথটির কাহিল অবস্থা ছবিতেই বোঝা যাচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ওপরের ছবিটিই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ফটোগ্রাফার সেকালের কলকাতার সবচেয়ে নামকরা আলোকচিত্রী প্রতিষ্ঠান বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের অ্যাপ্রেনটিস অবিনাশ চন্দ্র দাঁ। ছবি তোলার তারিখ ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসের কোন এক রবিবার। স্থান : দক্ষিণেশ্বর বিষ্ণুমন্দিরের রোয়াক। উদ্যোক্তা : গৃহী ভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়। যাঁর সাহায্য ছাড়া এই ছবিটি আদৌ তোলা অসম্ভব হতো না তাঁর নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ঐদিন ঠাকুর ছবি তোলাতে রাজি ছিলেন না। ঠাকুর তখন রাধাকান্তজীর মন্দিরের চাতালে পায়চারি করছিলেন। নরেনের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে অবশেষে ঠাকুর সমাধিমগ্ন হন, তখন নরেন্দ্রনাথের আহ্বানে ও সহায়তায় বিশ্ববিখ্যাত এই ছবিটি তোলা হয়। স্বামী প্রভানন্দ লিখেছেন, "আকস্মিকতায় অবিনাশের হাত থেকে নেগেটিভ কাঁচখানি মাটিতে পড়ে একটি কোণ ভেঙে যায়। এই দোষ ঢাকবার জন্য অবিনাশ চন্দ্র দাঁ কাঁচের উপরাংশ অর্ধচন্দ্রাকৃতি করে কেটে ফেলেন।" চিত্রগ্রহণের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে ভবনাথ আলোকচিত্রখানি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখান। শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে একদিন শ্রীমায়ের সামনে সহাস্য মন্তব্য করেছিলেন, "ওগো, তোমরা কিছু ভেবো না—এরপর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। মাইরি বলছি—বাপান্ত দিব্যি।"

১৮৮৬ সালে ঠাকুরের দেহত্যাগের কাছাকাছি সময়ে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে তোলা দুটি ফটোগ্রাফই স্বামীজির চিত্রসংগ্রহে সবচেয়ে পুরনো। কে এই ছবি তুলেছিলেন, কে তার উদ্যোক্তা তা আজ তেমন স্পষ্ট নয়। এযাবৎ স্বামীজির ১০৫ খানা ফটোর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

বেলগাঁওতে ভক্ত হরিপদ মিত্রের আগ্রহে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের এই ছবি তোলা হয় অক্টোবর ১৮৯২ সালের কোনো এক সময়ে। স্টুডিওর নাম এস মহাদেব অ্যান্ড সন, ফটোগ্রাফার গোবিন্দ শ্রীনিবাস ওয়েলিং। স্বামীজির ডানদিকে যে কাঠের স্ট্যান্ডটি দেখা যাচ্ছে সেটি এই সেদিনও সযত্নে রক্ষিত ছিল। বেলগাঁও ক্যান্টনমেন্টের স্টুডিওটি ১৯৭০ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

বিখ্যাত 'চিকাগো ভঙ্গি'—সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সালে জগদ্বিখ্যাত হবার পরে তোলা ছবি। ফটোগ্রাফার টমাস হ্যারিসনের স্টুডিও ছিল চিকাগোর সেন্ট্রাল মিউজিক হলে। ক্যাবিনেট কার্ড প্রোর্টেট সিরিজে সাতখানা ছবি তোলা হয়। এই ছবির পাঁচটি কপিতে স্বামীজি অটোগ্রাফ করেন।

স্বামীজি এপ্রিল ১৮৯৬ সালে আমেরিকা থেকে দ্বিতীয়বার ইংলন্ডে আসেন। জুলাই মাসে (১৯ তারিখ) ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার ও মিস মুলারের সঙ্গে তিনি ইউরোপভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। সেবার ডিসেম্বরে তাঁর ভারতযাত্রা শুরু হয়। তার আগে অনুরাগিণী মিস সুটার লন্ডনের প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার আলফ্রেড এলিসকে দিয়ে ছ'টি ছবি তোলান। সম্প্রতি এই ছবিগুলির একটি প্রুফশিট উদ্ধার হয়েছে। এলিস সিরিজের তিনটি অরিজিন্যাল প্রিন্ট নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটির দুর্লভ সংগ্রহে রয়েছে।

পাগড়িবিহীন এই মনোহরণ ছবিটিও লন্ডনের এলিস স্টুডিওতে তোলা। সময় ডিসেম্বর ১৮৯৬। এই ফটোর একটি অরিজিন্যাল প্রিন্ট বেদান্ত সোসাইটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার সংগ্রহশালায় আছে।

১৫ জানুয়ারি ১৮৯৭ বিদেশ থেকে কলম্বো প্রত্যাবর্তনের পরে কোনো এক সময়ে এই ছবিটি তোলা হয়। স্বামীজি সেবার কলম্বোতে চারদিন ছিলেন। পুরনো একটি প্রিন্টে ফটোগ্রাফারের নাম লেখা আছে 'এ ডবলু অ্যানড্রি, কলম্বো'। পরবর্তী সময়ে কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মিসেস পুণম্ গুলাসিংগম্ ফটোগ্রাফার অ্যানড্রির বংশধরদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। গবেষিকার ধারণা, কলম্বোর তিনটি ছবির একটি তোলা হয় ১৬ জানুয়ারি ১৮৯৭ এবং অপর দুটি তিনদিন পরে ১৯ জানুয়ারি ১৮৯৭।

চেন্নাইতে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ সালে খ্যাতনামা ফটোগ্রাফার ও স্বামীজির অনুরাগী টি জি আপ্পাবান মুদালিয়র দু'খানি ছবি তোলেন। এর একটি ব্লক করে ছাপিয়ে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার সঙ্গে বিতরণ করা হয় এবং পাঠকদের অনুরোধ করা হয় খরচ বাবদ দু'আনা পাঠাতে। এপ্রিল ১৮৯৭ সংখ্যায় সম্পাদকের দুঃখ, এই পয়সা অনেকে এখনও পাঠাননি। আপ্পাবান মুদালিয়রকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা হয়েছিল পরবর্তী সময়ে, কিন্তু সফল হওয়া যায়নি।

সম্ভবত ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ সালে চেন্নাইতে এই ঐতিহাসিক গ্রুপ ফটোটিও তোলেন টি জি আপ্পাবান মুদালিয়র। মধ্যের সারিতে বাঁদিক থেকে তারাপদ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী সদানন্দ। পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন আলাসিঙ্গা পেরুমল, ক্ষিপ্রলিপিকার জে জে গুডউইন, এম এন ব্যানার্জি ও আরও কয়েকজন স্থানীয় অনুরাগী।

১৮৯৭ সালে কলকাতায় স্বামীজির এই ছবিটি তোলেন আর্ট ওয়ার্কার্স লিগ। এঁদের ঠিকানা ৩৪ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা। এই ছবিটি বিক্রির জন্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, দাম ক্যাবিনেট সাইজ ১ টাকা। চেন্নাই থাকাকালে তিনি যে মুণ্ডিত মস্তক হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত এই পাগড়িপরা ছবিতেও রয়েছে। স্বামীজির দেহাবসানের তিন সপ্তাহ পরে (২৪ জুলাই ১৯০২) বিজ্ঞাপনটি আবার বেরিয়েছিল দ্য বেঙ্গলী পত্রিকায়।

এই ছবিটি তেমন প্রচারিত নয়। তোলার তারিখ সম্বন্ধেও বিভ্রান্তি আছে। মনে হয় ৮ বোসপাড়া লেনে বশীশ্বর সেনের ভাড়াকরা বাড়িতে তোলা, দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রার দিনে (২০ জুন ১৮৯৯)। মূল ছবিটি গ্রুপ ফটোর অংশ, সেই ছবিতে আছেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সদানন্দ। ঐদিন শ্রীমা সারদাদেবী বাগবাজার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে ত্যাগী সন্তানদের মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেন।

স্যানফ্রানসিসকোর বুশনেল স্টুডিওতে ১৯০০ সালে যে সাতটি ছবি তোলা হয়েছিল তার একটি। স্থানীয় সংবাদপত্র স্যানফ্রানসিসকো ক্রনিক্‌ল-এর রিপোর্টার মিস ব্লান্‌স পার্টিংটন স্বামীজিকে ইন্টারভিউ করে একটি ছবি চান এবং এই ছবিটি পছন্দ করেন। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ১৮ মার্চ ১৯০০, অর্থাৎ ছবিটি নিশ্চয় ১৭ মার্চ ১৯০০ সালের আগে তোলা।

৯ ডিসেম্বর ১৯০০ স্বামীজি আচমকা দেশে ফিরে আসেন কায়রো থেকে। সেখানে যে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয় তার ইঙ্গিত রয়েছে সহযাত্রিনীর চিঠিতে। দেশে ফিরে এসে নানা ব্যাধির সঙ্গে নিরন্তর লড়াই, যার উল্লেখ রয়েছে বিভিন্ন চিঠিতে। ১৯০১ সালে স্বামীজি শিলং যান এবং সেখানে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিলং ছবিটিই কি তাঁর শেষ ছবি ? বিশ্বাস হয় না, কারণ এর পরেও তো তিনি চোদ্দ মাস জীবিত ছিলেন। শিলং-এর সেই সময়কার প্রখ্যাত স্টুডিওর নাম ঘোষাল স্টুডিও। তাঁরাই কি এই ছবি তোলেন ?

খেতে, শুতে, কলেজে যেতে এবং সব সময়েই ঐ রকম দেখতে লাগলাম ও কেমন যেন একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। রাস্তায় চলেছি, গাড়ি আসছে দেখছি, কিন্তু সরবার প্রবৃত্তি হতো না। মনে হতো ঐ গাড়ি ও আমি একই বস্তু।

এই সময়ে হাত-পা সর্বদা অসাড় হয়ে থাকত ; ভাবতাম বোধ হয় পক্ষাঘাত হবে। খেয়ে কোন তৃপ্তি হতো না। মনে হতো, যেন আর কেউ খাচ্ছে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে শুয়ে পড়তাম এবং কিছুক্ষণ পরে উঠে আবার খেতাম। ফলে, আমি কোন কোন দিন অনেক বেশি খেয়ে ফেলতাম, কিন্তু তাতে কোন অসুখ হতো না। মা ভয় পেয়ে বলতেন, 'তোর দেখছি ভিতরে ভিতরে একটা বিষম অসুখ হয়েছে।' কখনও বা বলতেন, 'ও আর বাঁচবে না।'

যখন আমার ঐ আচ্ছন্ন ভাবটা কমে যেত, তখন জগৎটাকে একটা স্বপ্ন বলে মনে হতো। হেদুয়া পুকুরের পারে বেড়াতে গিয়ে, রেলিং-এ মাথা ঠুকে দেখতাম এগুলি স্বপ্ন, না সত্য। মনের এই অবস্থা কিছুদিন ধরে চলেছিল। তারপর যখন প্রকৃতিস্থ হলাম, তখন বুঝলাম যে আমি অদ্বৈতজ্ঞানের একটা আভাস পেয়েছি। এবং শাস্ত্রে এ বিষয়ে যা লেখা আছে তা মিথ্যা নয়। এর পর অদ্বৈততত্ত্বের সত্যতা আমি আর কখনও অস্বীকার করতে পারি নি।[২০]

এই প্রথম আমি এমন একজনকে দেখলাম, যিনি সাহস করে বলতে পারেন, 'আমি ঈশ্বর দেখেছি, ধর্ম সত্য, তা অনুভব করা যেতে পারে—আমরা এই জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ করতে পারি, তার থেকে ঈশ্বরকে অনন্তগুণ স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।'

দিনের পর দিন আমি এই মানুষটির কাছে যেতে লাগলাম। অবশ্য সব কথা আমি এখন বলতে পারি না, তবে এইটুকু বলতে পারি—ধর্ম যে দেওয়া যেতে পারে, তা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করলাম। একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হতে পারে। আমি এরকম বারবার হতে দেখেছি।

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও প্রাচীনকালের বিভিন্ন মহাপুরুষের বিষয় পাঠ করেছিলাম : তাঁরা বললেন—সুস্থ হও, আর সে ব্যক্তি সুস্থ হয়ে গেল। দেখলাম, এটা সত্য ; আর যখন আমি এই মানুষটিকে দেখলাম, আমার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। ধর্ম দান করা সম্ভব, আর আমার আচার্যদেব বলতেন, 'জগতের অন্যান্য জিনিস যেমন দেওয়া-নেওয়া যায়, ধর্ম তার থেকে আরও

প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া-নেওয়া যেতে পারে।'[২১]

উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে অক্ষম জনসাধারণের কাছে তিনি 'নারদীয় ভক্তি' প্রচার করতেন।

সাধারণতঃ তিনি দ্বৈতবাদই শিক্ষা দিতেন, অদ্বৈতবাদ শিক্ষা না দেওয়াই ছিল তাঁর নিয়ম। তবে তিনি আমাকে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন—এর আগে আমি ছিলাম দ্বৈতবাদী।[২২]

এক সময় এই মহাপুরুষ আমাকে বলেছিলেন যে, এই জগতে কোটি কোটি লোকের মধ্যে একজনও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, 'মনে কর, এই ঘরে একটি চোর রয়েছে এবং সে জানতে পারল, পাশের ঘরে রাশীকৃত সোনা আছে ; ঘর দুটির মধ্যে একটি খুব পাতলা পরদা রয়েছে। আচ্ছা, সেই চোরটির কি অবস্থা হবে?' আমি উত্তর দিলাম, 'চোরটি একেবারে ঘুমাতে পারবে না ; তার মস্তিষ্ক সক্রিয়ভাবে সেই সোনা হস্তগত করবার উপায় উদ্ভাবন করতে থাকবে এবং তার অন্য কোন চিন্তা থাকবে না।' উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর, কোন মানুষ ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য পাগল হয়ে যাবে না? যদি কোন লোক আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, এক অসীম অনন্ত আনন্দের আকর রয়েছে এবং তা লাভ করা যায়, তা হলে তা লাভ করবার চেষ্টায় সে কি পাগল হবে না?' ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁকে লাভ করবার জন্য অনুরূপ আগ্রহকেই বলে 'শ্রদ্ধা'।[২৩]

ঐ সময়ে এক দিন দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের সান্নিধ্যে রাত্রিযাপন করেছিলাম। পঞ্চবটীতলে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে আছি, এমন সময়ে ঠাকুর হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং আমার হস্তধারণপূর্বক হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, 'আজ তোর বিদ্যা-বুদ্ধি বুঝা যাবে ; তুই তো মোটে আড়াইটা পাশ করেছিস্, আজ সাড়ে তিনটা পাশ করা মাস্টার এসেছে ; চল, তার সঙ্গে কথা কইবি।' অগত্যা ঠাকুরের সঙ্গে যেতে হল এবং ঠাকুরের ঘরে যেয়ে শ্রীযুত ম-র* সঙ্গে পরিচিত হবার পরে নানা বিষয়ে আলাপে প্রবৃত্ত হলাম। ঐভাবে আমাদের কথা বলতে লাগিয়ে দিয়ে ঠাকুর চুপ করে বসে আমাদের আলাপ শুনতে ও আমাদের লক্ষ্য করতে লাগলেন। পরে শ্রীযুত

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকার শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—শ্রীম

ম-সেদিন বিদায় গ্রহণপূর্বক চলে গেলে তিনি বললেন, 'পাশ করলে কি হয়, মাস্টারটার মাদীভাব, কথা কইতেই পারে না!' ঠাকুর ঐভাবে আমাকে সকলের সঙ্গে তর্কে লাগিয়ে দিয়ে রঙ্গ দেখতেন।[২৪]

ধর্ম-কর্ম করতে এসে আর কিছু না হোক ক্রোধটা তাঁর (ঈশ্বরের) কৃপায় আয়ত্ত করতে পেরেছি। আগে ক্রুদ্ধ হলে একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতাম, এবং পরে তার জন্য অনুতাপে দগ্ধ হতাম। এখন কেউ নিষ্কারণে প্রহার করলে অথবা নিতান্ত অপকার করলেও তার উপর আগের মত বিষম ক্রোধ উপস্থিত হয় না।[২৫]

প্রথম প্রথম যখন যাই, তখন একদিন তিনি ভাবে বললেন, 'তুই এসেছিস!'

আমি ভাবলাম, 'কি আশ্চর্য! ইনি যেন আমায় অনেকদিন থেকে চেনেন!' তারপর বললেন, 'তুই কি একটা জ্যোতি দেখতে পাস্?'

আমি বললাম, আজ্ঞা হাঁ। ঘুমাবার আগে কপালের কাছে কি যেন একটি জ্যোতি ঘুরতে থাকে।

আগে খুব দেখতাম। যদু মল্লিকের রান্নাবাড়িতে একদিন আমায় স্পর্শ ক'রে কি মনে মনে বললেন, আমি অজ্ঞান হ'য়ে গেলুম! সেই নেশায় অমন একমাস ছিলুম!

আমার বিয়ে হবে শুনে মা কালীর পা ধ'রে কেঁদেছিলেন। কেঁদে বলেছিলেন, 'মা ওসব ঘুরিয়ে দে মা! নরেন্দ্র যেন ডুবে না!'[২৬]

পাঠগৃহে উপস্থিত হয়ে ঠাকুর প্রথম একদিন ব্রহ্মচর্য-পালনে আমাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন আমার মাতামহী আড়াল থেকে সব কথা শুনে বাবামায়ের কাছে বলে দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিশে পাছে আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাই—এই ভয়ে তাঁরা ঐদিন থেকে আমার বিয়ে দেবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু করলে কি হবে, ঠাকুরের প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের সব চেষ্টা ভেসে গিয়েছিল। সব বিষয় স্থির হবার পরেও কয়েক জায়গায় সামান্য কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়ে বিবাহ-সম্বন্ধ হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়েছিল![২৭]

ঠাকুরের কাছে কি আনন্দে দিন কাটত, তা অপরকে বোঝানো দুষ্কর। খেলা, রঙ্গরস প্রভৃতি সামান্য দৈনন্দিন ব্যাপার-সকলের মধ্য দিয়ে তিনি কি ভাবে নিরন্তর উচ্চশিক্ষা দিয়ে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করে দিয়েছিলেন, তা এখন ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

বালককে শেখাবার সময়ে শক্তিশালী মল্ল যেভাবে আপনাকে সংযত রেখে সেরকম শক্তিমাত্র প্রকাশপূর্বক কখনও তাকে যেমন অশেষ আয়াসে পরাভূত করে এবং কখনও বা তার কাছে স্বয়ং পরাভূত হয়ে তার মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়ে দেয়, আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে ঠাকুর অনেক সময় সেইরকম ভাব অবলম্বন করতেন। তিনি বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর উপস্থিতি সর্বদা প্রত্যক্ষ করতেন। আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার বীজ ফুল-ফলায়িত হয়ে কালে যে আকার ধারণ করবে, তা তখন থেকেই ভাবমুখে প্রত্যক্ষ করে আমাদের প্রশংসা করতেন, উৎসাহিত করতেন, এবং বাসনাবিশেষে আবদ্ধ হয়ে পাছে আমরা জীবনের ঐরকম সফলতা হারিয়ে বসি, সেজন্য বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে আমাদের প্রতি আচরণ লক্ষ্য করে উপদেশ দিয়ে আমাদের সংযত রাখতেন।

কিন্তু তিনি যে ঐভাবে তন্ন তন্ন করে লক্ষ্য করে আমাদের নিত্য নিয়ন্ত্রিত করছেন, একথা আমরা কিছুমাত্র বুঝতে পারতাম না। ওটাই ছিল তাঁর শিক্ষাদান এবং জীবনগঠন করে দেবার অপূর্ব কৌশল। ধ্যান-ধারণাকালে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে মন আরও একাগ্র হবার অবলম্বন পাচ্ছে না অনুভব করে তাঁকে কি কর্তব্য জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঐরকম পরিস্থিতিতে নিজে কি করেছিলেন তা আমাদের জানিয়ে দিতেন এবং ঐ বিষয়ে নানা কৌশল বলে দিতেন।

আমার মনে আছে, শেষ রাত্রিতে ধ্যান করতে বসে আলমবাজারে অবস্থিত চটের কলের বাঁশীর শব্দে মন লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত। তাঁকে ঐ কথা বলায় তিনি ঐ বাঁশীর শব্দতেই মন একাগ্র করতে বলছিলেন এবং ঐপথে করে বিশেষ ফল পেয়েছিলাম। আর এক বার ধ্যান করবার সময়ে শরীর ভুলে মনকে লক্ষ্যে সমাহিত করবার পথে বাধা অনুভব করে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি সমাধিসাধনকালে শ্রীমৎ তোতাপুরী যেভাবে ভ্রূমধ্যে মন একাগ্র করতে আদেশ দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে নিজ নখাগ্র দ্বারা আমার ভ্রূমধ্যে তীব্র আঘাত করেছিলেন। এবং বলেছিলেন, 'ঐ বেদনার উপর মনকে একাগ্র কর।' দেখেছিলাম, আঘাতজনিত বেদনার অনুভবটা যতক্ষণ ইচ্ছা সমভাবে মনে ধারণ করে রাখতে পারা যায়। ঐসময়ে শরীরের অপর কোন অংশে মন বিক্ষিপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, ঐ সব অংশের অস্তিত্বের কথা ভুলে যাওয়া যায়।

ঠাকুরের সাধনার স্থল, নির্জন পঞ্চবটীতলই আমাদের ধ্যানধারণা করবার বিশেষ উপযোগী স্থান ছিল। শুদ্ধ ধ্যান-ধারণা কেন, ক্রীড়াকৌতুকেও আমরা

অনেক সময় অতিবাহিত করতাম। ঐ সব সময়ে ঠাকুর আমাদের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগদান করে আমাদের আনন্দবর্ধন করতেন! আমরা সেখানে দৌড়াদৌড়ি করতাম, গাছে চড়তাম, শক্ত দড়ির মত মাধবীলতার আবেষ্টনে বসে দোল খেতাম এবং কখন কখন নিজেরা রান্না করে চড়ুইভাতি করতাম।

চড়ুইভাতির প্রথম দিনে আমি নিজের হাতে পাক করেছি দেখে ঠাকুর স্বয়ং ঐ অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণেতর বর্ণের হস্তপক্ব অন্ন গ্রহণ করতে পারেন না জেনে আমি তাঁর জন্য ঠাকুরবাড়ির প্রসাদী অন্নের বন্দোবস্ত করেছিলাম। কিন্তু তিনি ঐরকম করতে নিষেধ করে বলেছিলেন, 'তোর মত শুদ্ধসত্ত্বগুণীর হাতে ভাত খেলে কোন দোষ হবে না।' আমি বারবার আপত্তি করলেও তিনি আমার কথা না শুনে আমার হাতের রান্না অন্ন সেদিন গ্রহণ করেছিলেন।'[২৮]

যখন আমার বাবা মারা গেলেন, মা-ভাইরা যখন খেতে পাচ্ছে না তখন একদিন অন্নদা গুহর* সঙ্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।

তিনি অন্নদা গুহকে বললেন, 'নরেন্দ্রের বাবা মারা গেছে, ওদের বড় কষ্ট, এখন বন্ধুবান্ধবরা সাহায্য করে তো বেশ হয়।'

অন্নদা গুহ চলে গেলে আমি তাঁকে বকতে লাগলাম। বললাম, কেন আপনি ওর কাছে ওসব কথা বললেন? তিরস্কৃত হয়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, 'ওরে তোর জন্য যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি!'

তিনি ভালবেসে আমাদের বশীভূত করেছিলেন।[২৯]

মৃতাশৌচের অবসান হবার আগে থেকেই কাজের চেষ্টায় ফিরতে হয়েছিল। অনাহারে নগ্নপদে চাকরির আবেদন হাতে নিয়ে মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে আফিস থেকে আফিসান্তরে ঘুরে বেড়াতাম—অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কেউ কেউ দুঃখের দুঃখী হয়ে কোন দিন সঙ্গে থাকত, কোন দিন থাকতে পারত না, কিন্তু সর্বত্রই বিফলমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়েছিল।

সংসারের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়েই হৃদয়ঙ্গম হচ্ছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্বলের, দরিদ্রের এখানে স্থান নেই। দেখতাম, দু দিন আগে যারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করবার অবসর পেলে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করেছে, সময় বুঝে তারাই এখন আমাকে দেখে মুখ বাঁকাচ্ছে এবং ক্ষমতা থাকলেও সাহায্য করতে পশ্চাৎপদ হচ্ছে। দেখে কখনও কখনও সংসারটা দানবের রচনা বলে মনে হত। মনে হয়, এই সময়ে একদিন

* স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু।

রৌদ্রে ঘুরতে ঘুরতে পায়ের তলায় ফোস্কা হয়েছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গড়ের মাঠে মনুমেন্টের ছায়ায় বসে পড়েছিলাম। দুই-একজন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল, অথবা ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। তার মধ্যে একজন বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য গেয়েছিল—

'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে' ইত্যাদি।

শুনে মনে হয়েছিল মাথায় যেন সে গুরুতর আঘাত করছে। মা ও ভাইদের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে উদয় হয়ে ক্ষোভে, নিরাশায়, অভিমানে বলে উঠেছিলাম, নে, নে, চুপ কর, ক্ষুধার তাড়নায় যাদের আত্মীয়বর্গকে কষ্ট পেতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাদের কখনও সহ্য করতে হয় নি, টানাপাখার হাওয়া খেতে খেতে তাদের কাছে ঐ রকম কল্পনা মধুর লাগতে পারে, আমারও একদিন লাগত ; কঠোর সত্যের সম্মুখে ওটা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলে বোধ হ'চ্ছে।

আমার ঐ রকম কথায় বন্ধু বোধ হয় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিল— দারিদ্র্যের কিরকম কঠোর পেষণে মুখ থেকে ঐ কথা নির্গত হয়েছিল, তা সে বুঝবে কি করে! সকালে উঠে গোপনে অনুসন্ধান করে যেদিন বুঝতাম বাড়িতে সকলের প্রচুর আহার্য নেই এবং হাতে পয়সা নেই, সেদিন মাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' বলে বার হতাম এবং কোন দিন সামান্য কিছু খেয়ে, কোন দিন অনশনে কাটিয়ে দিতাম। অভিমানে, ঘরে বাইরে কারও কাছে ঐ কথা প্রকাশ করতেও পারতাম না।

ধনী বন্ধুগণের অনেকে আগের মত আমাকে তাদের গৃহে বা উদ্যানে নিয়ে গিয়ে সঙ্গীতাদি দ্বারা তাদের আনন্দবর্ধনে অনুরোধ করত। এড়াতে না পেরে মধ্যে মধ্যে তাদের সঙ্গে গিয়ে তাদের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হতাম, কিন্তু অন্তরের কথা তাদের কাছে প্রকাশ করতে প্রবৃত্তি হত না। তারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঐ বিষয় জানতে কখনও সচেষ্ট হয় নি। তাদের মধ্যে বিরল দুই-একজন কখন কখন বলত, 'তোকে আজ এত বিষণ্ণ ও দুর্বল দেখছি কেন, বল দেখি?' একজন কেবল আমার অজ্ঞাতে অন্যের কাছ থেকে আমার অবস্থা জেনে বেনামী পত্রমধ্যে মাকে সময়ে সময়ে টাকা পাঠিয়ে আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করেছিল।

যৌবনে পদার্পণ করে যে-সকল বাল্যবন্ধু চরিত্রহীন হয়ে অসদুপায়ে যৎসামান্য উপার্জন করছিল, তাদের কেউ কেউ আমার দারিদ্র্যের কথা জানতে পেরে সময় বুঝে দলে টানতে সচেষ্ট হয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা ইতিপূর্বে আমার ন্যায় অবস্থার পরিবর্তনে হঠাৎ পতিত হয়ে একরকম বাধ্য হয়েই

জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য হীন পথ অবলম্বন করেছিল, দেখতাম তারা সত্য সত্যই আমার জন্য ব্যথিত হয়েছে।

সময় বুঝে অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও এই কালে পশ্চাতে লাগতে ছাড়েন না। এক সঙ্গতিপন্না রমণীর আগে থেকে আমার উপর নজর পড়েছিল। অবসর বুঝে সে এখন প্রস্তাব করে পাঠাল, তার সঙ্গে তার সম্পত্তি গ্রহণ করে দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান করতে পারি। বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা প্রদর্শনে তাকে নিবৃত্ত করতে হয়েছিল! অন্য এক রমণী ঐরকম প্রলোভিত করতে আসলে তাকে বলেছিলাম, 'বাছা, এই ছাই-ভস্ম শরীরটার তৃপ্তির জন্য এতদিন কত কি তো করলে, মৃত্যু সম্মুখে—তখনকার সম্বল কিছু করেছ কি? হীন বুদ্ধি ছেড়ে ভগবানকে ডাক।'

যাই হোক এত দুঃখকষ্টেও এতদিন আস্তিক্যবুদ্ধির বিলোপ অথবা 'ঈশ্বর মঙ্গলময়'—একথায় সন্দিহান হইনি। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে তাঁকে স্মরণ মননপূর্বক তাঁর নাম করতে করতে শয্যা ত্যাগ করতাম। এবং আশায় বুক বেঁধে উপার্জনের উপায় অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতাম। একদিন ওইরকম শয্যা ত্যাগ করছি, এমন সময়ে পাশের ঘর হতে মা শুনতে পেয়ে বলে উঠলেন, 'চুপ কর্ ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান—ভগবান তো সব করলেন!'

কথাগুলিতে মনে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হলাম। স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলাম, ভগবান কি বাস্তবিক আছেন, এবং থাকলেও মানুষের সকরুণ প্রার্থনা কি শুনে থাকেন? তবে এত যে প্রার্থনা করি তার কোনরকম উত্তর নেই কেন? শিবের সংসারে এত অ-শিব কোথা হতে আসল—মঙ্গলময়ের রাজত্বে এত প্রকার অমঙ্গল কেন? বিদ্যাসাগরমশাই পরদুঃখে কাতর হয়ে এক সময় যা বলেছিলেন—ভগবান যদি দয়াময় ও মঙ্গলময়, তবে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হয়ে লাখ লাখ লোক দুটি অন্ন না পেয়ে মরে কেন?—তা কঠোর ব্যঙ্গস্বরে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হল, অবসর বুঝে সন্দেহ এসে অন্তর অধিকার করল।

গোপনে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হতে কখনও ঐরকম করা দূরে থাকুক, অন্তরের চিন্তাটি পর্যন্ত ভয়ে বা অন্য কোন কারণে কারও কাছে কখনও লুকাবার অভ্যাস করিনি। সুতরাং ঈশ্বর নেই, অথবা যদি থাকেন তো তাঁকে ডাকবার কোন সফলতা এবং প্রয়োজন নেই, একথা হেঁকে ডেকে লোকের কাছে সমপ্রমাণ করতে এখন অগ্রসর হব, এতে বিচিত্র কি? ফলে স্বল্প দিনেই রব উঠল, আমি নাস্তিক হয়েছি এবং দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে মিলিত হয়ে মদ্যপানে ও বেশ্যালয়ে পর্যন্ত গমনে

কুণ্ঠিত নই!

সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবাল্য অনাশ্রব হৃদয় অযথা নিন্দায় কঠিন হয়ে উঠল এবং কেউ জিজ্ঞাসা না করলেও সকলের কাছে বলে বেড়াতে লাগলাম, এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে নিজ দুরদৃষ্টির কথা কিছুক্ষণ ভুলে থাকবার জন্য যদি কেউ মদ্যপান করে, অথবা বেশ্যাগৃহে গমন করে আপনাকে সুখী জ্ঞান করে, তাতে আমার যে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই তাই নয়, কিন্তু ঐরকম করে আমিও তাদের মত ক্ষণিক সুখভোগী হতে পারি—একথা যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারব, সেদিন আমিও ঐরকম করব, কারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হব না।

কথা কানে হাঁটে। আমার সব কথা নানারূপে বিকৃত হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এবং তাঁহার কলকাতাস্থ ভক্তগণের কাছে পৌঁছতে বিলম্ব হল না। কেউ কেউ আমার স্বরূপ অবস্থা নির্ণয় করতে দেখা করতে আসলেন এবং যা রটেছে তা সম্পূর্ণ না হলেও কতকটা তাঁরা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত, ইঙ্গিতে-ইশারায় জানালেন। আমাকে তাঁরা এতদূর হীন ভাবতে পারেন জেনে আমিও দারুণ অভিমানে স্ফীত হয়ে দণ্ড পাবার ভয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বিষয় দুর্বলতা, একথা প্রতিপন্নপূর্বক হিউম, বেন, মিল, কোঁতে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতামত উদ্ধৃত করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নেই বলে তাঁদের সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক জুড়ে দিলাম।

ফলে বুঝতে পারলাম আমার অধঃপতন হয়েছে, একথায় বিশ্বাস দৃঢ়তর করে তাঁরা বিদায়গ্রহণ করলেন বুঝে আনন্দিত হলাম এবং ভাবলাম ঠাকুরও হয়তো এদের মুখে শুনে এরকম বিশ্বাস করবেন। ঐরকম ভাবামাত্র আবার নিদারুণ অভিমানে অন্তর পূর্ণ হল। স্থির করলাম, তা করুন—মানুষের ভালমন্দ মতামতের যখন এতই অল্প মূল্য, তখন তাতে আসে যায় কি? পরে শুনে স্তম্ভিত হলাম, ঠাকুর তাদের মুখে ঐকথা শুনে প্রথমে হাঁ, না কিছুই বলেননি ; পরে ভবনাথ কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে ঐকথা জানিয়ে যখন বলেছিল, 'নরেন্দ্রের এমন হবে একথা স্বপ্নেরও অগোচর!'—তখন বিষম উত্তেজিত হয়ে তিনি তাকে বলেছিলেন, 'চুপ কর্ শালারা, মা বলেছেন সে কখনও ঐরকম হতে পারে না ; আর কখনও আমাকে ঐসব কথা বললে তোদের মুখ দেখতে পারব না!'

ঐরকম অহঙ্কারে অভিমানে নাস্তিকতার পোষণ করলে হবে কি? পরক্ষণেই বাল্যকাল হতে, বিশেষতঃ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে, জীবনে যে-সব অদ্ভুত অনুভূতি উপস্থিত হয়েছিল, সেই সবের কথা উজ্জ্বল বর্ণে মনে উদয় হওয়ায় ভাবতে থাকতাম—ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং তাঁকে লাভ করবার

পথও নিশ্চয় আছে, নতুবা এই সংসারে প্রাণধারণের কোনই আবশ্যকতা নাই ; দুঃখকষ্ট জীবনে যতই আসুক না কেন, সেই পথ খুঁজে বার করতে হবে। ঐভাবে দিনের পর দিন যেতে লাগল এবং সংশয়ে চিত্ত নিরন্তর দোলায়মান হয়ে শান্তি সুদূরপরাহত হয়ে রইল—সাংসারিক অভাবেরও হ্রাস হল না।

গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসল। এখনও আগের মত কর্মের অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একদিন সমস্ত দিন উপবাসে ও বৃষ্টিতে ভিজে রাত্রে অবসন্ন পদে এবং ততোধিক অবসন্ন মনে বাড়িতে ফিরছি এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করলাম যে আর এক পাও অগ্রসর হতে না পেরে পাশের বাড়ীর রকে জড় পদার্থের মত পড়ে রইলাম।

কিছুক্ষণের জন্য চেতনার লোপ হয়েছিল কিনা বলিতে পারি না। এটা কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নানা রং-এর চিন্তা ও ছবি তখন আপনা হতে পর পর উদয় ও লয় হচ্ছিল এবং তাদেরকে তাড়িয়ে কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখব এরূপ সামর্থ্য ছিল না। হঠাৎ উপলব্ধি করলাম, কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে একের পর অন্য এইভাবে ভিতরের অনেকগুলি পর্দা যেন উত্তোলিত হল এবং শিবের সংসারে অ-শিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যে সব বিষয় নির্ণয় করতে না পেরে মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হয়েছিল, সেই সব বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখতে পেলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। অনন্তর বাড়ি ফিরবার সময়ে দেখলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী অবসান হবার সামান্যই দেরী আছে।

সংসারের প্রশংসা ও নিন্দায় এখন হতে এককালে উদাসীন হলাম এবং ইতরসাধারণের মত অর্থোপার্জন করে পরিবারবর্গের সেবা ও ভোগসুখে কালযাপন করবার জন্য আমার জন্ম হয় নি—এ কথায় দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে পিতামহের মত সংসারত্যাগের জন্য গোপনে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

যাবার দিন স্থির হলে সংবাদ পেলাম, ঠাকুর ঐদিন কলকাতায় জনৈক ভক্তের বাড়ীতে আসছেন। ভাবলাম—ভালই হল, গুরুদর্শন করে চিরকালের মত গৃহ ত্যাগ করব। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবামাত্র তিনি ধরে বসলেন, 'তোকে আজ আমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে।' নানা ওজর করলাম। তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না। অগত্যা তাঁর সঙ্গে চললাম। গাড়িতে তাঁর সঙ্গে বিশেষ কোন কথা হল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে অন্য সবার সঙ্গে কিছুক্ষণ তাঁর গৃহমধ্যে বসে রয়েছি, এমন সময়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ হল। দেখতে দেখতে তিনি হঠাৎ

কাছে এসে আমাকে সস্নেহে ধরে সজল নয়নে গাইতে লাগলেন—

কথা কহিতে ডরাই
না কহিতেও ডরাই,
(আমার) মনে সন্দ হয়
বুঝি তোমায় হারাই, হা—রাই!

অন্তরের প্রবল ভাবরাশি এতক্ষণ সযত্নে রুদ্ধ রেখেছিলাম, আর বেগ সংবরণ করতে পারলাম না,—ঠাকুরের মত আমারও বক্ষ নয়নধারায় প্লাবিত হতে লাগল। নিশ্চয় বুঝলাম, ঠাকুর সব কথা জানতে পেরেছেন। ঐরকম আচরণে অন্য সবাই স্তম্ভিত হয়ে রইল। প্রকৃতিস্থ হবার পরে কেউ কেউ ঠাকুরকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, 'আমাদের ও একটা হয়ে গেল।' পরে রাত্রে অন্য সবাইকে সরিয়ে আমাকে কাছে ডেকে বললেন, 'জানি আমি, তুমি মা'র কাজের জন্য এসেছ, সংসারে কখনই থাকতে পারবে না, কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্য থাক!' —বলেই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে, পুনরায় অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন!'

ঠাকুরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করে পরদিন বাড়িতে ফিরলাম, সঙ্গে সংসারের শতচিন্তা এসে অন্তর অধিকার করল। আগেকার মত নানা চেষ্টায় ফিরতে লাগলাম। ফলে 'এটর্নি'র অফিসে পরিশ্রম করে এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতিতে সামান্য উপার্জনে কোনরকমে দিন কেটে যেতে লাগল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনরকম কর্ম জুটল না এবং মা ও ভাইদের ভরণপোষণের একটা সচ্ছল বন্দোবস্তও হয়ে উঠল না।

কিছুকাল পরে মনে হল, ঠাকুরের কথা তো ঈশ্বর শোনেন, —তাঁকে অনুরোধ করে মা ও ভাইদের খাওয়া-পরার কষ্ট যাতে দূর হয়, এরকম প্রার্থনা করিয়ে নেব ; আমার জন্য ঐরকম করতে তিনি কখনই অস্বীকার করবেন না। দক্ষিণেশ্বরে ছুটলাম এবং নাছোড়বান্দা হয়ে ঠাকুরকে ধরে বসলাম, মা-ভাইদের আর্থিক কষ্ট নিবারণের জন্য আপনাকে মাকে জানাতে হবে।

ঠাকুর বললেন, 'ওরে, আমি যে-ওসব কথা বলতে পারি না। তুই যা না কেন? মাকে মানিস্ না—সেই জন্যই তোর এত কষ্ট!' বললাম, আমি তো মাকে জানি না, আপনি আমার জন্য মাকে বলুন,—বলতেই হবে, আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না। ঠাকুর সস্নেহে বললেন, 'ওরে, আমি যে কতবার বলেছি, মা, নরেন্দ্রর দুঃখ-কষ্ট দূর কর ; তুই মাকে মানিস্ না। সেই জন্যই তো মা শোনে না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি, আজ রাত্রে 'কালীঘরে' গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন।

মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছেন,—তিনি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন!'

দৃঢ় বিশ্বাস হল, ঠাকুর যখন ঐরকম বললেন, তখন নিশ্চয় প্রার্থনামাত্র সব দুঃখের অবসান হবে। প্রবল উৎকণ্ঠায় রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ক্রমে রাত্রি হল। এক প্রহর গত হবার পরে ঠাকুর আমাকে শ্রীমন্দিরে যেতে বললেন। যেতে যেতে একটা গাঢ় নেশায় সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, পা টলতে লাগল, এবং মাকে সত্য সত্য দেখতে ও তার শ্রীমুখের বাণী শুনতে পাব, এইরকম স্থির বিশ্বাসে মনে অন্য সব বিষয় ভুলে বিষম একাগ্র ও তন্ময় হয়ে ঐ কথাই ভাবতে লাগলাম।

মন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, সত্য সত্যই মা চিন্ময়ী, সত্য সত্যই জীবিতা এবং অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রস্রবণস্বরূপিণী। ভক্তি-প্রেমে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হল, বিহ্বল হয়ে বারংবার প্রণাম করতে করতে বলতে লাগলাম, 'মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাতে তোমার অবাধ-দর্শন নিত্য লাভ করি এইরকম করে দাও!' —শান্তিতে প্রাণ আপ্লুত হল, জগৎ সংসার নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়ে একমাত্র মা-ই হৃদয় পূর্ণ করে রইলেন!

ঠাকুরের কাছে ফেরামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, মা'র কাছে সাংসারিক অভাব দূর করবার প্রার্থনা করেছিস্ তো?' তাঁর প্রশ্নে চমকিত হয়ে বললাম, 'না মশাই ভুলে গিয়েছি। তাই তো, এখন কি করি?'

তিনি বললেন, 'যা, যা, ফের যা, গিয়ে ঐ কথা জানিয়ে আয়।' পুনরায় মন্দিরে চললাম এবং মা'র সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পুনরায় মোহিত হয়ে সব কথা ভুলে বার বার প্রণাম করে জ্ঞান ভক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করে ফিরলাম। ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'কি রে, এবার বলেছিস্ তো?' আবার চমকিত হয়ে বললাম, 'না মশাই, মাকে দেখামাত্র কি এক দৈবীশক্তিপ্রভাবে সব কথা ভুলে কেবল জ্ঞান ভক্তি লাভের কথাই বলেছি!—কি হবে?'

ঠাকুর বললেন, 'দূর ছোঁড়া, নিজেকে একটু সামলে ঐ প্রার্থনাটা করতে পারলি না? পারিস্ তো আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো জানিয়ে আয়, শীঘ্র যা।' পুনরায় চললাম, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশমাত্র দারুণ লজ্জা এসে হৃদয় অধিকার করল। ভাবলাম, একি তুচ্ছ কথা মাকে বলতে এসেছি! ঠাকুর যে বলেন, রাজার প্রসন্নতা লাভ করে তাঁর কাছে 'লাউ কুমড়া ভিক্ষা করা', এ যে সেইরকম নির্বুদ্ধিতা! এমন হীনবুদ্ধি আমার! লজ্জায় ঘৃণায় পুনঃ প্রণাম করতে করতে বলতে লাগলাম, 'অন্য কিছু চাই না মা, কেবল জ্ঞান ভক্তি দাও!' মন্দিরের বাইরে এসে মনে হল এটা নিশ্চয়ই ঠাকুরের খেলা, নতুবা তিন

তিনবার মা'র কাছে এসেও বলা হল না। অতঃপর তাঁকে ধরে বসলাম, আপনিই নিশ্চিত আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন, এখন আপনাকে বলতে হবে, আমার মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকবে না।

তিনি বললেন, 'ওরে, আমি যে কারও জন্য ঐরকম প্রার্থনা কখনও করতে পারি না, আমার মুখ দিয়ে যে বার হয় না। তোকে বললুম, মার কাছে যা চাইবি তাই পাবি ; তুই চাইতে পারলি না, তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নেই, তা আমি কি করব।' বললাম, তা হবে না মশাই, আপনাকে আমার জন্য ঐ কথা বলতেই হবে ; আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আপনি বললেই তাদের আর কষ্ট থাকবে না। ঐভাবে যখন কিছুতেই ছাড়লাম না, তখন তিনি বললেন, 'আচ্ছা যা, তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না।'[৩০]

আমার জন্য মার কাছে কত কথা বলেছেন। যখন খেতে পাচ্ছি না—বাবার কাল হয়েছে—বাড়িতে খুব কষ্ট—তখন আমার জন্য মার কাছে টাকা প্রার্থনা করেছিলেন।

টাকা হলো না। তিনি বললেন, 'মা বলেছেন, মোটা ভাত, মোটা কাপড় হতে পারে। ভাত ডাল হ'তে পারে।'[২৯]

এতো আমাকে ভালবাসা,—কিন্তু যখন কোন অপবিত্র ভাব এসেছে অমনি টের পেয়েছেন! অন্নদার সঙ্গে যখন বেড়াতাম, অসৎ লোকের সঙ্গে কখন কখন গিয়ে পড়েছিলাম। তাঁর কাছে এলে আমার হাতে আর খেলেন না, খানিকটা হাত উঠে আর উঠলো না। তাঁর ব্যামোর সময় তাঁর মুখ পর্যন্ত উঠে আর উঠলো না। বললেন, তোর এখনও হয় নাই।[৩১]

একা ঠাকুরই কেবল আমাকে প্রথম দেখা থেকে সব সময় সমভাবে বিশ্বাস করে এসেছেন, আর কেউই নয়—নিজের মা-ভাইরাও নয়। তাঁর ঐরকম বিশ্বাস ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বেঁধে ফেলেছে! একা তিনিই ভালবাসতে জানতেন ও পারতেন —সংসারের অন্য সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভান মাত্র করে থাকে।[৩২]

কালী ও কালীর সর্বপ্রকার কার্যকলাপকে আমি কতই না অবজ্ঞা করেছি! আমার ছ বছরের মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ ছিল এই যে, আমি তাঁকে মানতাম না। কিন্তু অবশেষে তাঁকে আমায় মানতে হয়েছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে গিয়েছেন এবং এখন আমার বিশ্বাস যে, সব কিছুতেই মা-কালী আমায় পরিচালিত করছেন এবং তাঁর যা ইচ্ছা, তাই আমার দ্বারা করিয়ে নিচ্ছেন। তবু আমি কতদিনই না তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আসল

কথা এই, আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসতাম, তাই আমাকে ধরে রাখত।

আমি তাঁর অপূর্ব পবিত্রতা দেখেছি। আমি তাঁর আশ্চর্য ভালবাসা অনুভব করেছি। তখনও পর্যন্ত তাঁর মহত্ত্ব আমার কাছে প্রতিভাত হয়নি। পরে যখন আমি তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিলাম, তখন ঐ ভাব এসেছিল। তার আগে আমি তাঁকে বিকৃতমস্তিষ্ক একটি শিশু বলে ভাবতাম, মনে করতাম—এই জন্যই তিনি সর্বদা অলৌকিক দৃশ্য প্রভৃতি দেখেন। এগুলি আমি ঘৃণা করতাম। তারপর আমাকেও মা-কালী মানতে হল।

না, যে কারণে আমাকে মানতে হল, তা একটি গোপন রহস্য, এবং সেটা আমার মৃত্যুর সঙ্গেই লুপ্ত হবে। সে-সময় আমার খুবই ভাগ্য-বিপর্যয় চলছিল।...এটা আমার জীবনে এক সুযোগ হিসাবে এসেছিল। মা (কালী) আমাকে তাঁর ক্রীতদাস করে নিলেন। এই কথাই বলছিলাম, 'আমি তোমার দাস।' রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে তাঁর চরণে অর্পণ করেছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার! এই ঘটনার পর তিনি মাত্র দু-বছর জীবিত ছিলেন এবং ঐ কালের অধিকাংশ সময়ই অসুস্থ ছিলেন। ছয় মাসের মধ্যেই তাঁর স্বাস্থ্য এবং লাবণ্য নষ্ট হয়ে যায়।[৩৩]

কেউ যেন এই ভেবে দুঃখ না করে যে, তাকে বোঝাবার জন্য অপর কাউকে বিলক্ষণ কষ্ট পেতে হয়েছে। আমি দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে আমার গুরুদেবের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি, ফলে পথের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আমার নখদর্পণে।[৩৪]

তোমরা দেখ যে আমার নিষ্ঠাভক্তি কুকুরের মত। কতবারই না আমি ভুল করেছি কিন্তু তিনি সর্বদাই সঠিক ছিলেন, বর্তমানে আমি তাঁর সিদ্ধান্তকে অন্ধের মত বিশ্বাস করি।[৩৫]

শ্যামপুকুর, ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮৫

এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন ভেজিটেবল্ ক্রিয়েশন্ (উদ্ভিদ) ও অ্যানিম্যাল ক্রিয়েশন্ (জীবজন্তুগণ) এদের মাঝামাঝি এমন একটা পয়েন্ট্ (স্থান) আছে যেখানে এটা উদ্ভিদ কি প্রাণী, স্থির করা ভারী কঠিন। সেইরকম Man-world (নরলোক) ও God-world (দেবলোক) এই দুয়ের মধ্যে একটি স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ, না, ঈশ্বর।

আমি 'গড্' (ঈশ্বর) বলছি না, 'গড্ লাইক ম্যান' (ঈশ্বর তুল্য ব্যক্তি) বলছি।

এঁকে আমরা পূজা করি—সে পূজা দেবতার পূজার প্রায় কাছাকাছি।[৩৬]

কাশীপুর, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৮৮৬

ওখানে আজ যাবো মনে করেছি।

দক্ষিণেশ্বরে-বেলতলায়—ওখানে রাত্রে ধুনি জ্বালাবো। আর ধ্যান করব।

—একটা ঔষধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়া-টড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই![৩৭]

কাশীপুর, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৮৮৬

গত শনিবার এখানে ধ্যান করছিলাম। হঠাৎ বুকের ভিতর কি রকম করে এলো!

[কুণ্ডলিনী জাগরণ।]

তাই হবে, বেশ বোধ হ'লো—ইড়া পিঙ্গলা। হাজরাকে বললাম, বুকে হাত দিয়ে দেখতে।

কাল রবিবার, উপরে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা কল্লাম, ওঁকে সব বললাম।

আমি বললাম, 'সব্বাই-এর হ'লো, আমায় কিছু দিন। সব্বাই-এর হ'লো, আমার হবে না?'

তিনি বললেন, 'তুই বাড়ির একটা ঠিক্ করে আয় না, সব হ'বে। তুই কি চাস?'

আমি বললাম, আমার ইচ্ছা অমনি তিন চার দিন সমাধিস্থ হ'য়ে থাকবো! কখন কখন এক একবার খেতে উঠ্‌বো!

তিনি বললেন,—'তুই ত' বড় হীনবুদ্ধি! ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে। তুই ত' গান গাস, 'যো কুচ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।'

উনি বললেন,—'তুই বাড়ির একটা ঠিক ক'রে আয়, সমাধি লাভের অবস্থার চেয়েও উঁচু অবস্থা হ'তে পারবে।'

আজ সকালে বাড়ি গেলাম। সকলে বকতে লাগলো,—আর বললে, 'কি হো হো ক'রে বেড়াচ্ছিস্? আইন এগজামিন (বি এল্) এত নিকটে, পড়া শুনা নাই, হো হো ক'রে বেড়াচ্ছ।

প্রশ্ন : তোমার মা কিছু বললেন?

—না, তিনি খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত, হরিণের মাংস ছিল ; খেলুম, কিন্তু খেতে ইচ্ছা ছিল না।

দিদিমার বাড়িতে, সেই পড়বার ঘরে পড়তে গেলাম। পড়তে গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এলো, পড়াটা যেন কি ভয়ের জিনিস! বুক আটুপাটু করতে লাগলো! অমন কান্না কখনও কাঁদিনি।

তারপর বই-টই ফেলে দৌড়! রাস্তা দিয়ে ছুট! জুতো-টুতো রাস্তায়

কোথায় এক দিকে পড়ে রইলো! খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম,—সারা গায়ে খড়, আমি দৌড়ুচ্চি—কাশীপুরের রাস্তায়!

বিবেক চূড়ামণি শুনে আরও মন খারাপ হয়েছে! শঙ্করাচার্য বলেন—তিনটি জিনিস অনেক তপস্যায়, অনেক ভাগ্যে মেলে,—মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।

ভাবলাম আমার'ত তিনটিই হয়েছে! অনেক তপস্যার ফলে মানুষ জন্ম হয়েছে, অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে, আর অনেক তপস্যার ফলে এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ হয়েছে।

সংসার আর ভালো লাগে না। সংসারে যারা আছে তাদেরও ভাল লাগে না। দুই একজন (ভক্ত) ছাড়া।[৩৮]

কাশীপুর, ২১শে এপ্রিল, ১৮৮৬

—যেমন গাছ দেখছি, অমনি করে কেউ ভগবানকে দেখেছে?

(শ্রীরামকৃষ্ণের অভিজ্ঞতা) —সে মনের ভুল হতে পারে।

—আমি ট্রুথ্ চাই। সেদিন পরমহংস মহাশয়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম।

—উনি আমায় বলেছিলেন, 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' আমি বল্লাম, হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বল্‌বো না।

তিনি বল্লেন—'অনেকে যা বলবে, তাই ত সত্য—তাই ত ধর্ম!'

আমি বল্লাম, নিজে ঠিক না বুঝলে অন্য লোকের কথা শুনব না।[৩৯]

কাশীপুর, ২৩শে এপ্রিল, ১৮৮৬

কি আশ্চর্য। এত বৎসর প'ড়ে তবু বিদ্যা হয় না। কি ক'রে লোকে বলে যে, দু দিন সাধন করেছি, ভগবান লাভ হবে! ভগবান লাভ কি, এত সোজা!

আমার কিন্তু শান্তি হয় নাই।[৪০]

বরানগর, ২৫শে মার্চ, ১৮৮৭ [কাশীপুরে নির্বিকল্প সমাধি প্রসঙ্গে।]

—সেই অবস্থায় বোধ হল যে, আমার শরীর নাই, শুধু মুখটি দেখতে পাচ্ছি। ঠাকুর উপরের ঘরে ছিলেন। আমার নীচে ঐ অবস্থাটি হ'ল! আমি সেই অবস্থাতে কাঁদতে লাগলাম। বলতে লাগলাম আমার কি হ'ল! বুড়োগোপাল উপরে গিয়ে ঠাকুরকে বললেন, 'নরেন্দ্র কাঁদছে।'

তাঁর সঙ্গে দেখা হলে, তিনি বললেন, 'এখন টের পেলি, চাবি আমার কাছে রইল!—আমি বললাম, 'আমার কি হল।'

তিনি অন্য ভক্তদের দিকে চেয়ে বললেন, 'ও আপনাকে জানতে পারলে, দেহ রাখবে না ; আমি ভুলিয়ে রেখেছি।[৪১]

কাশীপুরের বাগানে একদিন ঠাকুরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম। তারপর সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে করতে নিজের দেহ খুঁজে পেলুম না। দেহটা একেবারে নেই মনে হয়েছিল। চন্দ্র, সূর্য, দেশ কাল আকাশ—সব যেন একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, দেহাদি-বুদ্ধির প্রায় অভাব হয়েছিল, প্রায় লীন হয়ে গিছলুম আর কি! একটু 'অহং' ছিল, তাই সে সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরূপ সমাধিকালেই 'আমি' আর 'ব্রহ্মের' ভেদ চলে যায়, সব এক হয়ে যায়, যেন মহাসমুদ্র—জল জল, আর কিছুই নেই, ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়। 'অবাঙ্মনসোগোচরম্' কথাটা ঐ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়।

তারপর ঐরূপ অবস্থালাভের জন্য বারংবার চেষ্টা করেও আনতে পারলুম না। ঠাকুরকে জানাতে বললেন, 'দিবারাত্র ঐ অবস্থাতে থাকলে মা-র কাজ হবে না ; সেজন্য এখন আর ঐ অবস্থা আনতে পারবি না, কাজ করা শেষ হ'লে পর আবার ঐ অবস্থা আসবে।'

ঠাকুর বলতেন, 'একমাত্র অবতারেরাই জীবহিতে ঐ সমাধি থেকে নেবে আসতে পারেন। সাধারণ জীবের আর ব্যুত্থান হয় না ; একুশ দিন-মাত্র জীবিত থেকে তাদের দেহটা শুষ্ক পত্রের মতো সংসাররূপ বৃক্ষ হ'তে খসে পড়ে যায়।'[৪২]

এই জ্ঞাতা-জ্ঞেয় বা জানাজানি-ভাব থেকেই দর্শন-শাস্ত্র বিজ্ঞান সব বেরিয়েছে। কিন্তু মানব-মনের কোন ভাব বা ভাষা জানাজানির পারের বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারছে না। দর্শন-বিজ্ঞানাদি partial truth (আংশিক সত্য)। ওরা সেজন্য পরমার্থতত্ত্বের সম্পূর্ণ expression (প্রকাশ) কখনই হ'তে পারে না। এই জন্য পরমার্থের দিক দিয়ে দেখলে সবই মিথ্যা ব'লে বোধ হয়—ধর্ম মিথ্যা, কর্ম মিথ্যা, আমি মিথ্যা, তুই মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। তখনই বোধ হয় যে আমিই সব, আমিই সর্বগত আত্মা, আমার প্রমাণ আমিই। আমার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য আবার প্রমাণান্তরের অপেক্ষা কোথায়? শাস্ত্রে যেমন বলে, 'নিত্যমস্মৎ-প্রসিদ্ধম্'—নিত্যবস্তুরূপে ইহা স্বতঃসিদ্ধ— আমি এইভাবেই সর্বদা ইহা অনুভব করি। আমি ঐ অবস্থা সত্যসত্যই দেখেছি, অনুভব করেছি।[৪৩]

কাশীপুরে (শ্রীরামকৃষ্ণ) তাঁর শক্তি আমাতে সঞ্চার করলেন...একদিন,

ধ্যান করবার কালে, আমি কালীকে* বললাম, আমার হাত ধর দেখি। কালী বললে, 'কি একটা শক তোমার গা ধরাতে আমার গায়ে লাগল।'

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ একখানা কাগজে লিখে বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষা দিবে।'

আমি কিন্তু বলেছিলাম, 'আমি ওসব পারব না।'

তিনি বললেন, 'তোর হাড় করবে।'[৪৪]

যে-সব ভাব আমি প্রচার করেছি, সবই তাঁর চিন্তারাশির প্রতিধ্বনি মাত্র। মন্দগুলি ছাড়া এদের একটিও আমার নিজস্ব নয়। আমার নিজের বলতে যা কিছু, সবই মিথ্যা ও মন্দ। সত্য ও কল্যাণকর যে-সব কথা আমি উচ্চারণ করেছি, সবই তাঁর বাণীর প্রতিধ্বনিমাত্র।

তাঁরই চরণপ্রান্তে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে একত্রে আমি এই ভাবধারা লাভ করেছি। তখন আমি বালকমাত্র। ষোল বৎসর বয়সে আমি তাঁর নিকট গিয়েছিলাম। অন্যান্য সঙ্গীদের কেউ আরও ছোট, কেউ বা একটু বড়। সবসুদ্ধ বার জন বা ততোধিক। সকলে মিলে এই আদর্শ-প্রচারের কথা ভাবলাম। শুধু প্রচার নয়, এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করতে চাইলাম। এর অর্থ—আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, বৌদ্ধের করুণা, খ্রীষ্টানের কর্মপ্রবণতা ও ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ফুটিয়ে তোলা। প্রতিজ্ঞা করলাম, 'এই মুহূর্তেই আমরা একটি বিশ্বজনীন ধর্ম প্রবর্তন করব ; আর বিলম্ব নয়।'

আমাদের গুরুদেব কখনও মুদ্রাস্পর্শ করতেন না। সামান্য খাদ্য, বস্ত্র যা দেওয়া হত, তাই তিনি গ্রহণ করতেন, তার বেশী কিছু গ্রহণ করতেন না। অন্য কোনরকম দান তিনি গ্রহণ করতেন না। এইসব অপূর্বভাব সত্ত্বেও তিনি অতি কঠোর ছিলেন, এই কঠোরতার ফলে তাঁর কোনরকম বন্ধন ছিল না। ভারতীয় সন্ন্যাসী আজ হয়তো রাজবন্ধু, রাজ-অতিথি—কিন্তু কাল তিনি ভিখারী বৃক্ষতলশায়ী।[৪৫]

ঠাকুর আমাকে খুবই ভালবাসতেন—এজন্য অনেকে আমাকে ঈর্ষা ক'রত। যে-কোন লোককেই দেখামাত্র তিনি তার চরিত্র বুঝে নিতেন এবং এ বিষয়ে তাঁর সে মতের আর পরিবর্তন হ'ত না। আমরা কোন মানুষকে বিচার করি যুক্তি দিয়ে, সেজন্য আমাদের বিচারে থাকে ভুল-ত্রুটি ; তাঁর ছিল ইন্দ্রিয়াতীত

* স্বামী অভেদানন্দ

অনুভূতি। কোন কোন মানুষকে তাঁর অন্তরঙ্গ বা 'ভেতরের লোক' মনে করতেন—তাদের তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে গোপন তত্ত্ব ও যোগশাস্ত্রের রহস্য শেখাতেন। বাইরের লোক বা বহিরঙ্গদের কাছে নানা উপদেশমূলক গল্প বলতেন ; এগুলিই লোকে 'শ্রীরামকৃষ্ণের কথা' ব'লে জানে।

ঐ অন্তরঙ্গ তরুণদের তিনি তাঁর কাজের উপযোগী ক'রে গড়ে তুলতেন, কেউ এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও তাতে তিনি কান দিতেন না। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গদের মধ্যে শেষোক্তদের কাজকর্ম দেখে প্রথমোক্তদের তুলনায় তাদের প্রতিই আমার অনেক বেশি ভাল ধারণা হয়েছিল ; তবে অন্তরঙ্গদের প্রতি আমার ছিল অন্ধ অনুরাগ। লোকে বলে—আমাকে ভালবাসলে আমার কুকুরটিকেও ভালবেসো। আমি ওই ব্রাহ্মণ-পূজারীকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি। সুতরাং তিনি যা ভালবাসেন, যাঁকে তিনি মান্য করেন—আমিও তাই ভালবাসি, তাঁকে আমিও মান্য করি। আমার সম্পর্কে তাঁর ভয় ছিল, পাছে আমাকে স্বাধীনতা দিলে আমি আবার একটা নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি ক'রে বসি।

কোন একজনকে তিনি বললেন, 'এ জীবনে তোমার ধর্ম লাভ হবে না।' সকলের ভূত-ভবিষ্যৎ তিনি যেন দেখতে পেতেন। বাইরে থেকে যে মনে হ'ত—তিনি কারও কারও উপরে পক্ষপাতিত্ব করছেন, এই ছিল তার কারণ। চিকিৎসকেরা যেমন বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা বিভিন্নভাবে করেন, বৈজ্ঞানিক মনোভাব-সম্পন্ন তিনিও তেমনি বিভিন্ন লোকের জন্য বিভিন্ন রকম সাধনা নির্দেশ করতেন। তাঁর ঘরে অন্তরঙ্গদের ছাড়া আর কাউকেই শুতে দেওয়া হ'ত না। যারা তাঁর দর্শন পায়নি, তাদের মুক্তি হবে না, আর যারা তিনবার তাঁর দর্শন পেয়েছে, তাদেরই মুক্তি হবে—এ কথা সত্য নয়।[৪৬]

আজকাল একটি কথা চালু হয়ে গিয়েছে, এবং সকলেই বিনা আপত্তিতে এটি স্বীকার করে থাকেন যে পৌত্তলিকতা অন্যায়। আমিও এক সময়ে এইরকম ভাবতাম এবং এর শাস্তিস্বরূপ আমাকে এমন এক জনের পায়ের তলায় বসে শিক্ষালাভ করতে হয়েছিল, যিনি পুতুলপূজা থেকেই সব পেয়েছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা বলছি। যদি পুতুলপূজা করে এইরকম রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব হয়, তবে তোমরা কি চাও? সংস্কারকগণের ধর্ম চাও, না পুতুলপূজা চাও? আমি এর একটা উত্তর চাই। যদি পুতুলপূজা দ্বারা এইরকম রামকৃষ্ণ পরমহংস সৃষ্টি করতে পারো, তবে আরও হাজার পুতুলের পূজা কর।[৪৭]

মূর্তিপূজার ভিতরে নানাবিধ কুৎসিত ভাব প্রবেশ করে থাকলেও আমি

তাদের নিন্দা করি না। সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি যদি আমি না পেতাম, তবে কোথায় থাকতাম! যে-সব সংস্কারক মূর্তিপূজার নিন্দা করে থাকেন, তাঁদের আমি বলি—ভাই, তুমি যদি নিরাকার-উপাসনার যোগ্য হয়ে থাকো, তা কর ; কিন্তু অপরকে গালি দাও কেন?[৪৮]

আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হয়ে পড়লে এক ব্রাহ্মণ রোগমুক্তির জন্য তাঁকে প্রবল মনঃশক্তি প্রয়োগ করতে বলেছিল। তাঁর মতে, আচার্যদেব যদি দেহের রোগাক্রান্ত অংশটির উপর তাঁর মন একাগ্র করেন, তবে অসুখ সেরে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'কি! যে-মন ঈশ্বরকে দিয়েছি, সেই মন এই তুচ্ছ শরীরে আনব?' দেহ এবং রোগের কথা তিনি ভাবতে চাইলেন না। তাঁর মন সর্বদা ঈশ্বরে তন্ময় হয়ে থাকত। সে-মন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে অর্পিত হয়েছিল। তিনি এই মন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে রাজী ছিলেন না।[৪৯]

বসে থাকবার জো আছে কি! ঐ যে ঠাকুর যাকে 'কালী, কালী' ব'লে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার দু-তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে ; সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়, স্থির হয়ে থাকতে দেয় না, নিজের সুখের দিক দেখতে দেয় না!

প্রশ্ন : শক্তি-প্রবেশের কথাটা কি রূপকচ্ছলে বলছেন?

—না রে। ঠাকুরের দেহ যাবার তিন-চার দিন আগে তিনি আমাকে একাকী একদিন কাছে ডাকলেন। আর সামনে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তখন ঠিক অনুভব করতে লাগলুম, তাঁর শরীর থেকে একটা সূক্ষ্ম তেজ 'ইলেকট্রিক শক' (তড়িৎ-কম্পন)-এর মতো এসে আমার শরীরে ঢুকছে! ক্রমে আমিও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। কতক্ষণ এরূপভাবে ছিলুম, আমার কিছু মনে পড়ে না ; যখন বাহ্য চেতনা হ'ল, দেখি ঠাকুর কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর সস্নেহে বললেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ ক'রে তবে ফিরে যাবি।' আমার বোধ হয়, ঐ শক্তিই আমাকে এ-কাজে সে-কাজে কেবল ঘুরোয়। বসে থাকবার জন্য আমার এ দেহ হয়নি।[৫০]

প্রশ্ন : ঠাকুর যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, এ কথা তিনি আপনাকে নিজ মুখে কখনও বলেছিলেন কি?

—কতবার বলেছেন। আমাদের সবাইকে বলেছেন। তিনি যখন কাশীপুরের বাগানে—যখন তাঁর শরীর যায় যায়, তখন আমি তাঁর বিছানার

পাশে একদিন মনে মনে ভাবছি, এই সময় যদি বলতে পারো 'আমি ভগবান', তবে বিশ্বাস ক'রব, তুমি সত্যসত্যই ভগবান। তখন শরীর যাবার দু-দিন মাত্র বাকি। ঠাকুর তখন হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ—সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।'

আমি শুনে অবাক হয়ে রইলুম। প্রভুর শ্রীমুখে বার বার শুনেও আমাদেরই এখনও পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল না—সন্দেহে, নিরাশায় মন মধ্যে মধ্যে আন্দোলিত হয়—তা অপরের কথা আর কি ব'লব? আমাদেরই মতো দেহবান এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর ব'লে নির্দেশ করা ও বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ—এ-সব ব'লে ভাবা চলে। তা যাই কেন তাঁকে বল না, ভাব না—মহাপুরুষ বল, ব্রহ্মজ্ঞ বল, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মতো এমন পুরুষোত্তম এর আগে জগতে আর কখনও আসেননি। সংসারে ঘোর অন্ধকারে এখন এই মহাপুরুষই জ্যোতিঃস্তম্ভ-স্বরূপ। এঁর আলোতেই মানুষ এখন সংসার-সমুদ্রের পারে চলে যাবে।[৫১]

তাঁর জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেননি—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করেছেন—এত ভালবাসা আমার বাবা-মাও কখনও বাসেননি। এ কবিত্ব নয়, অতিরঞ্জিত নয়, এটা কঠোর সত্য এবং তাঁর শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে 'ভগবান রক্ষা কর' বলে কেঁদে সারা হয়েছি—কেউই উত্তর দেয়নি—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হোন, আমার সব বেদনা জেনে নিজে ডেকে জোর করে সব অপহরণ করেছেন।...

এ জগতে কেবল তাঁকে অহেতুকদয়াসিন্ধু দেখেছি।[৫২]

প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে এ-সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন আঁটবার বস্ত্রও ছিল না, যখন কর্পদকশূন্য হয়ে পৃথিবীভ্রমণে কৃতসংকল্প, তখনও ঠাকুরের দয়ায় সর্ববিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দর্শন করতে চিকাগোর রাস্তায় লাঠালাঠি হয়েছে, যে সম্মানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, ঠাকুরের কৃপায় তখন সে সম্মানও অক্লেশে হজম করেছি—প্রভুর ইচ্ছায় সর্বত্র বিজয়।[৫৩]

পূর্ণ ভক্তি বিনা তিনি কিছু ছিলেন না ; কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন পূর্ণ

জ্ঞান। আমি জ্ঞান ব্যতীত কিছু নই ; কিন্তু আমার অন্তরে সবটাই ভক্তি।[৫৪]

আমার হৃদয়ের আর একটি তন্ত্রীতে—গভীরতম তন্ত্রীতে তোমরা আঘাত করেছ, আমার গুরুদেব, আমার আচার্য আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম উল্লেখ করে। যদি কায়মনোবাক্যে আমি কোন সৎকার্য করে থাকি, যদি আমার মুখ হতে এমন কোন কথা বার হয়ে থাকে, যা দিয়ে জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হয়েছেন, তাতে আমার কোন গৌরব নেই, তা তাঁরই। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখন অভিশাপ বর্ষণ করে থাকে, যদি আমার মুখ থেকে কখন কারও প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বার হয়ে থাকে, তবে তা আমার, তাঁর নয়। যা কিছু দুর্বল, যা কিছু দোষযুক্ত সবই আমার। যা কিছু জীবনপ্রদ, যা কিছু বলপ্রদ, যা কিছু পবিত্র, সবই তাঁর প্রেরণা, তাঁরই বাণী এবং তিনি স্বয়ং।[৫৫]

তাঁর উপমা তিনিই। তাঁর কি তুলনা আছে?

আমার কথা আর কি ব'লব? আমি তাঁর দৈত্যদানার ভেতরকার একটা কেউ হবো। তাঁর সামনেই কখন কখন তাঁকে গালমন্দ করতুম। তিনি শুনে হাসতেন।[৫৬]

তার কারণ, আমি তাঁকে অল্পই বুঝেছি। তাঁকে এত বড় মনে হয় যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার ভয় হয়—পাছে সত্যের অপলাপ হয়, পাছে আমার এই অল্পশক্তিতে না কুলোয়, বড় করতে গিয়ে তাঁর ছবি আমার ঢঙে এঁকে তাঁকে পাছে ছোট ক'রে ফেলি![৫৭]

তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর সঙ্গে কি জীবের তুলনা হয়? তিনি সব মতে সাধন ক'রে দেখিয়েছেন—সবগুলোই এক তত্ত্বে পৌঁছে দেয়। তিনি যা করেছেন, তা কি তুমি আমি করতে পারব? তিনি যে কে ও কত বড়, তা আমরা কেউই এখনও বুঝতে পারিনি! এজন্যই আমি তাঁর কথা যেখানে-সেখানে বলি না। তিনি যে কি ছিলেন, তা তিনিই জানতেন ; তাঁর দেহটাই কেবল মানুষের মতো ছিল, কিন্তু চালচলন সব স্বতন্ত্র অমানবিক ছিল![৫৮]

সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনি তৈরি হ'তে পারে। তবে তিনি তা না ক'রে ইচ্ছা ক'রে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র ক'রে এরূপ করাচ্ছেন।[৫৯]

এ দুনিয়া ঘুরে দেখছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই 'ভাবের ঘরে চুরি'। তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর আমার একান্ত ভালবাসা, একান্ত বিশ্বাস। কি করব? একঘেয়ে বলো বলবে, কিন্তু ঐটি আমার আসল কথা। যে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে, অন্য সকলকে আমি ভালবাসি। আমার মতো অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল, কিন্তু ঐটুকু আমার গোঁড়ামি, মাফ করবেন। তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেবো? আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম, এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।[৬০]

শ্রীরামকৃষ্ণই আমার প্রভু

কোনো এক সময়ে আর্যদের বংশধরেরা সদাচারভ্রষ্ট হয়ে তাঁদের বৈরাগ্যের মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছিলেন ; ক্ষুরধার বুদ্ধি হারিয়ে তাঁরা লোকাচারের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থের মর্মগ্রহণে অসমর্থ হয়ে তাঁদের ধারণা হয়েছিল এগুলি পরস্পরবিরোধী। ফলে তাঁরা সনাতনধর্মকে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে ফেলেছিলেন। এর ফলে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধের আগুনে পরস্পরকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টার শুরু হয়। যখন অধঃপতিত এই আর্যরা ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকে পরিণত করে ফেলেছেন তখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আর্যজাতির সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত ঐক্যকে চোখের সামনে আবার উপস্থিত করেন। এই সময় সাম্প্রদায়িক সংঘাতে হিন্দুধর্ম প্রায় ধ্বংস হতে চলেছে। প্রত্যেকটি সম্প্রদায় তখন অসহনীয় আচারের বন্দী, বিদেশীদের তাচ্ছিল্যের পাত্র। সময়ের স্রোতে ধর্ম যখন চরম অধঃপতনে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সনাতনধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ নিজেকে লোকহিতের জন্য প্রকাশ করলেন। মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয়বাণী প্রচারিত হল। সেই অসীম অনন্তভাব যা শাস্ত্রে ও ধর্মে নিহিত থেকেও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল তা আবার আবিষ্কৃত হয়ে উচ্চ নিনাদে মানুষের মধ্যে ঘোষিত হলো।

এই নবযুগ ধর্ম সমগ্র বিশ্বের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের কল্যাণ করবে। এই নবধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বকালের যুগধর্মপ্রবর্তকদের পুনঃপ্রকাশ।[১]

প্রত্যেক নতুন ধর্ম-তরঙ্গেরই নতুন একটি কেন্দ্র প্রয়োজন। প্রাচীন ধর্ম শুধু নূতন কেন্দ্র-সহায়েই আবার সঞ্জীবিত হতে পারে। গোঁড়া মতবাদ সব গোল্লায় যাক—ওসব দিয়ে কোন কাজ হয় না। একটা খাঁটি চরিত্র, একটা সত্যিকার জীবন, একটি শক্তির কেন্দ্র—একজন দেবমানবই পথ দেখাতে পারেন। এই কেন্দ্রেই বিভিন্ন শক্তি একত্র হবে এবং প্রচণ্ড তরঙ্গের মতো সমাজের উপর পতিত হয়ে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, মুছে দেবে সমস্ত অপবিত্রতা। হিন্দুধর্মের দ্বারাই প্রাচীন হিন্দুধর্মের সংস্কার করতে হবে, নব্য সংস্কার-আন্দোলন দ্বারা নয়। আর সেই সঙ্গে সংস্কারকগণকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়দেশের সংস্কৃতিধারাকে নিজ জীবনে মিলিত করতে হবে। সেই মহা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রকে কি প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছে? অনাগত তরঙ্গের মৃদু গম্ভীর আগমনধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কি? সেই শক্তিকেন্দ্র—সেই পথপ্রদর্শক দেবমানব ভারতবর্ষেই জন্ম নিয়েছেন। তিনিই সেই মহান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।[২]

শঙ্করাচার্যের ছিল বিরাট মস্তিষ্ক আর রামানুজের ছিল বিশাল হৃদয়। এবার এমন এক পুরুষের আবির্ভাবের সময় হয়েছে, যাঁর মধ্যে হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমন্বয়, যিনি একাধারে শঙ্করের উজ্জ্বল মেধা ও শ্রীচৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হবেন যিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একই মহৎভাব দেখাতে পাবেন। যিনি দেখবেন প্রত্যেক প্রাণীতে ঈশ্বর বিদ্যমান, যাঁর হৃদয় ভারতের এবং ভারতের বাইরের প্রতিটি দরিদ্র দুর্বল পতিতের জন্য কাঁদবে, অথচ যার বিশাল মেধা এমন মহৎ তত্ত্ব উদ্ভাবন করবে, যা ভারতে বা ভারতের বাইরে বিরোধী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করবে। এইরকম বিস্ময়কর সমন্বয়ের মাধ্যমে হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সার্বভৌম ধর্ম প্রকাশিত হবে। এইরকম একজন মানুষ সত্যিই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আমি কয়েক বছর তাঁর চরণতলে বসে শিক্ষা পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম।[৩]

ভারতের চারিদিকে একসময় নানাবিধ সংস্কারের চেষ্টা চলছিল। সেই সময়, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি, বাংলার এক পল্লীগ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে একটি শিশুর জন্ম হয়। এর পিতামাতা অতি নিষ্ঠাবান্ প্রাচীনপন্থী লোক ছিলেন।

তাঁরা খুব দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় কোন অতিথিকে খাওয়াতে গিয়ে মা সারাদিন উপবাস করে থাকতেন।

এইরকম পিতামাতার কোলে এই শিশু জন্মগ্রহণ করেন—আর জন্ম হতেই

তার মধ্যে একটু বিশেষত্ব, একটু অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়। জন্মাবধিই তার পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ হত—কি কারণে তিনি জগতে এসেছেন, তা জানতেন, আর সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সমুদয় শক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

নিতান্ত বালক বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয় ; এবং বালকটিকে পাঠশালায় পাঠান হয়। এক সমাবেশে কিছু পণ্ডিতকে তর্কাতর্কি করতে দেখে তাঁর চোখ খুলে গেল। "এই কি সমস্ত জ্ঞানের পরিণতি? এঁরা এইরকম তর্কযুদ্ধ করছেন কেন? শুধুমাত্র অর্থের জন্য। যে লোক সর্বোচ্চ জ্ঞানের পরিচয় দেবে সে সেরা কাপড়টি পাবে, আর সেইজন্য সব লোকগুলো প্রাণপণ লড়াই করছে। ছেলেটি বলল, "আমি আর পড়তে যাব না।" যা বললেন তাই করলেন, চিরদিনের মতো ইস্কুলপর্ব শেষ। এই বালকের এক দাদা ছিলেন। তিনি একজন জ্ঞানবান অধ্যাপক, তিনি রামকৃষ্ণকে কলকাতায় নিয়ে এলেন...তার সঙ্গে থেকে পড়াশুনা করবার জন্য। কিছুকাল পরে বালকটি মেনে নিলেন যে সমস্ত পার্থিব বিদ্যা শুধুমাত্র পার্থিবলাভের জন্য, তিনি পড়াশুনা পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত করলেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণের জন্য মনস্থির করলেন। পিতার মৃত্যু হওয়াতে পরিবারটি খুব গরীব হয়ে গিয়েছিল, আর এই বালককে নিজের অন্ন সংস্থানের জন্য ব্যবস্থা করতে হল। কলকাতার কাছে এক জায়গায় তিনি এক মন্দিরের পুরোহিতের কাজ নিলেন।

এই মন্দিরে আনন্দময়ী জগন্মাতার মূর্তি ছিল। এই বালককে প্রত্যহ সকালে ও সায়াহ্নে তাঁর পূজা করতে হত। পূজা করতে করতে একটি ভাব তাঁর মন অধিকার করল : এই মূর্তির পিছনে সত্যই কিছু আছে কি? বিশ্বসংসারে সত্যই কি কোনো আনন্দময়ী মা আছেন? তিনি কি সত্যই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছেন? অথবা নাকি এসব মায়ামাত্র? ধর্মের মধ্যে কোনো বাস্তবতা আছে?

বালক পুরোহিতের মনে যখন এই ধারণা প্রবেশ করল, তখন সারাদিন কেবল এক ভাবনা। দিনের পর দিন তিনি কেবল কাঁদতেন, বলতেন—'মা, সত্যই কি তুমি আছ, না এ-সব কল্পনা মাত্র?' আগেই বলেছি, যে অর্থে আমরা শিক্ষা শব্দটি ব্যবহার করি, সেরকম শিক্ষা তাঁর কিছুই ছিল না ; তাতে বরং ভালই হয়েছিল। অপরের ভাব—অপরের চিন্তার অনুগামী হয়ে তাঁর মনের স্বাভাবিকতা অথবা মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়নি। কিন্তু এই চিন্তা—ভগবানকে দেখা যায় কি—মনের মধ্যে প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। শেষে এমন অবস্থা হল যে, তিনি আর কিছু ভাবতেই পারতেন না। নিত্য পূজা এবং সব খুঁটিনাটি নিয়ম পালন করা—তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। প্রায়ই তিনি দেবতাকে ভোগ দিতে ভুলে যেতেন, কখন কখন আরতি করতে ভুলতেন,

আবার কখনো সবকিছু ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরতি করতেন।

তাঁর মনে তখন একটিই প্রশ্ন : "মা, তুই কি সত্যিই আছিস? কেন তুই কথা বলিস না? তুই কি মৃত?"...

অবশেষে নবীন পুরোহিতের পক্ষে মন্দিরের পুরোহিতগিরি করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। তিনি দায়িত্ব পরিত্যাগ করে মন্দিরের পাশে পঞ্চবটী বনে বাস করাতে লাগলেন। তাঁর জীবনের এই ভাব সম্বন্ধে তিনি আমাকে অনেকবার বলেছেন, 'কখন যে সূর্য উদিত হচ্ছে, কখন বা অস্ত যাচ্ছে, তা আমি বলতে পারতাম না।' তিনি নিজের শরীরকে একেবারে ভুলে গেলেন, আহার করবার কথাও স্মরণ থাকত না। এই সময়ে তাঁর এক আত্মীয় খুব যত্ন নিয়ে সেবাশুশ্রূষা করতেন, তিনি অনেকসময় মুখে জোর করে খাবার পুরে দিতেন। যন্ত্রের মতো ঐ খাবার তিনি খেয়ে নিতেন।

এইভাবে সেই বালকের দিনরাত্রি কাটছিল। দিনের শেষে সন্ধ্যায় যখন মন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি বনের মধ্যে শুনতে পেতেন, তাঁর মন তখন অতিশয় ব্যাকুল হয়ে উঠতো, তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, 'মা, আরও এক দিন বৃথা চলে গেল, তবু তোমার দেখা পেলাম না! এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আর একটা দিন চলে গেল, অথচ আমি সত্যকে জানতে পারলাম না!" এই দারুণ যন্ত্রণার সময় তিনি মাঝে মাঝে মাটিতে মুখ ঘষে কাঁদতেন। এবং এই একমাত্র প্রার্থনাতে ফেটে পড়তেন : "হে জগন্মাতা, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিতা হও! দ্যাখ, আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছুই চাই না!"

তিনি শুনেছিলেন যে মায়ের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ না করলে তিনি কখনও আসেন না। আরও শুনেছিলেন যে মা প্রত্যেকের কাছেই আসতে চান, কিন্তু তারা তাঁকে চায় না। লোকেরা তাদের সর্বপ্রকার ছোটখাট নিরর্থক চাহিদার জন্য ছোট ছোট মূর্তির কাছে প্রার্থনা করে, তারা আত্মসুখ চায়, তারা মাকে চায় না। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা অন্তর দিয়ে মাকে ছাড়া অন্য কিছু চায় না, সেই মুহূর্তে তিনি আসেন। সুতরাং এই ভাবেতে তিনি বিভোর হতে শুরু করলেন। তাঁর যৎসামান্য সম্পত্তি তিনি পরিত্যাগ করলেন, প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি কখনও অর্থ স্পর্শ করবেন না, "আমি অর্থ স্পর্শ করব না," এই ভাবনা তার জীবনের অংশ হয়ে গেল। পরবর্তী জীবনে যখন তিনি নিদ্রিত থাকতেন, যদি আমি একটা পয়সা দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করতাম, তখন তাঁর দেহ বেঁকে যেত এবং তাঁর সমস্ত শরীর যেন অসাড় হয়ে যেত।

তাঁর মনে অপর যে ভাবনায় উদয় হয়েছিল, তা হল অন্য শত্রুর নাম কাম। মানুষ হচ্ছে আত্মা, আর আত্মা লিঙ্গহীন, নারীও নয় পুরুষও নয়। তিনি

ভেবেছিলেন যে কামের ধারণা আর অর্থের ধারণা দুটি আলাদা জিনিস, এর জন্যেই মাতৃদর্শনে বাধা দিচ্ছিল। সমগ্র বিশ্বই তো মায়ের প্রকাশ এবং তিনি প্রত্যেক নারীর শরীরে বাস করেন। "প্রত্যেক নারী মায়ের প্রতিমূর্তি ; আমি কি করে নারীকে একান্ত যৌন সম্পর্কের জন্য ভাবতে পারি?" এই ছিল তাঁর ভাবনা : প্রত্যেক নারীই তাঁর মা, তিনি নিজেকে সেই পর্যায়ে আনতে চাইতেন যখন প্রত্যেক নারীর মধ্যেই তিনি মাতৃদর্শন করতেন। সারাজীবন ধরে এই ধারণা তিনি পোষণ করে গিয়েছেন।[৪]

ঠাকুরকে দেখেছি, নারীমাত্রেই মাতৃভাব—তা যে-জাতের যেরকম স্ত্রীলোকই হোক।[৫]

এই নিরক্ষর বৈরাগী ছেলেটি সেকালের বুড়ো পণ্ডিতদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরের এক পূজারী বিষ্ণুমূর্তির পা ভেঙে ফেলে। পণ্ডিতরা এসে পাঁজিপুঁথি খুলে মত দিলেন, 'এ ভাঙা মূর্তির সেবা চলবে না, নূতন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' মহা হুলস্থুল ব্যাপার। শেষে পরমহংসমশাইকে ডাকা হ'ল। তিনি বললেন, 'স্বামীর যদি পা খোঁড়া হয়ে যায়, তা হ'লে কি স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে?' এরপরে পণ্ডিত বাবাজীদের টীকে-টিপপুনি চললো না। তা যদি চলবে তো পরমহংসদেব পৃথিবীতে আসবেন কেন? আর বইপড়া বিদ্যাকে এত উপেক্ষা করবেন কেন? বিদ্যাশিক্ষায় তাঁর সেই নূতন যে জীবনশক্তি নিয়ে তিনি পৃথিবীতে এলেন তা জ্ঞানে এবং শিক্ষায় সঞ্চারিত হওয়া চাই।[৬]

পরে একসময় ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মনে কর, একটা ঘরে এক থলি মোহর রয়েছে, আর তার পাশের ঘরে একটা চোর রয়েছে, তুমি কি মনে কর সেই চোরের ঘুম হবে? তার চোখে ঘুম আসতে পারে না। সে সারাক্ষণ ভাববে, কি করে ঐ ঘরে ঢুকে মোহরের থলিটি নেওয়া যায়? তাই যদি হয়, তবে তুমি কি মনে কর, যার এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে, এইসব আপাত-প্রতীয়মান বস্তুর পেছনে সত্য রয়েছে, ঈশ্বর বলে একজন আছেন, একজন অবিনশ্বর অনন্ত-আনন্দস্বরূপ আছেন, যে আনন্দের সঙ্গে তুলনা করলে ইন্দ্রিয়-সুখ ছেলেখেলা বলে বোধ হয়, তবে সে কি তাঁকে পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে না? এক মুহূর্তের জন্যও কি সে এই চেষ্টা পরিত্যাগ করবে? তা কখনই হতে পারে না। তাঁকে পাবার লোভে সে উন্মত্ত হয়ে উঠবে।' আমাদের এই বালকের হৃদয়েও এই উন্মত্ততা প্রবেশ করেছিল। সে-সময়ে তাঁর কোন গুরু ছিলেন না, এমন কেউ ছিল না যে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত

বস্তুর সন্ধান দেবে, বরং সকলেই মনে করত, তাঁর মাথা খারাপ হয়েছে।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সত্যলাভের অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলল। তখন নানাবিধ অলৌকিক ও অদ্ভুত দর্শন হতে লাগল, স্বরূপের রহস্য তাঁর কাছে ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হতে লাগল, যেন আবরণের পর আবরণ অপসারিত হচ্ছে। জগন্মাতা নিজেই গুরু হয়ে এই বালককে আকাঙ্ক্ষিত সত্যলাভের সাধনায় দীক্ষিত করলেন। এই সময়ে এক পরমাসুন্দরী অনুপম বিদুষী আসরে উপস্থিত হলেন। পরবর্তী সময়ে পরমহংস বলতেন, বিদুষী বললে তাঁহাকে ছোট করা হয়—মূর্তিমতী বিদ্যা যেন সশরীরে সামনে উপস্থিত হয়েছেন।

এই রমণীও একজন সন্ন্যাসিনী ছিলেন—ভারতে নারীরাও অবিবাহিত থেকে সংসারত্যাগ করে ঈশ্বরোপাসনায় জীবন সমর্পণ করেন। এই মন্দিরে এসেই তিনি যেমন শুনলেন যে, একটি বালক দিনরাত ঈশ্বরের নামে অশ্রু বিসর্জন করেছে আর লোকে তাঁকে পাগল বলে, অমনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। এই মহিলার কাছেই বালকটি প্রথম সাহায্য পেলেন। সন্ন্যাসিনী বালকটির মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, 'বাছা, তোমার মতো উন্মত্ততা যার এসেছে, সে ধন্য। ভগবানের জন্য যে পাগল সে ভাগ্যবান। এমন লোকের সংখ্যা এই দুনিয়ায় খুবই কম। এই ভৈরবী ছেলেটির কাছে কয়েক বছর রইলেন, তাকে বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা দিলেন, যোগের পথনির্দেশ দিলেন।

কিছুদিন পরে একই বনে আর একজন পরম পণ্ডিত ও দর্শনশাস্ত্রবিৎ সন্ন্যাসী আসলেন। অদ্ভুত আদর্শবাদী এই সন্ন্যাসী বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতপক্ষে জগতের কোন অস্তিত্ব নেই ; এটি প্রমাণ করবার জন্য তিনি গৃহে বাস করতেন না, রৌদ্র ঝঞ্ঝা বর্ষাতেও বাইরে থাকতেন। তিনি আমাদের সাধককে বেদান্ত-শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু শীঘ্রই আশ্চর্য হলেন, গুরু অপেক্ষা শিষ্য অনেক বিষয়ে এগিয়ে রয়েছেন। কয়েক মাস কাছে থেকে তাঁকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়ে তিনি চলে গেলেন। পূর্বোক্ত সাধিকা মহিলা ইতিপূর্বেই দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে গিয়েছেন। যখনই বালকের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হতে আরম্ভ হল, অমনি তিনি বিদায় নিলেন। যথাসময়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে অথবা তিনি এখনও জীবিত আছেন, তা কেউ জানে না। তিনি কিন্তু আর ফেরেননি।

মন্দির পুরোহিতের অভূতপূর্ব পূজাপদ্ধতি লক্ষ্য করে অনেকেই ভাবলেন তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। আত্মীয়রা তাকে গ্রামের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে, একটি বালিকার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন, প্রত্যাশা বিবাহিত হলে মন

ঘুরবে এবং মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসবে। কিন্তু পুরোহিত আবার মন্দিরে ফিরে এলেন...তাঁর পাগলামি যেন আরও বেড়ে গেল... নববিবাহিতা বধূটির কথা তিনি পুরোপুরি বিস্মৃত হলেন।

দূরে গ্রামের বাড়িতে বালিকাবধূটির কানে গেল, তাঁর স্বামীটি পুজোআচ্চায় ডুবে রয়েছেন এবং অনেকেই ভাবছেন তিনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। নিজেই তিনি খোঁজখবর নিতে চাইলেন এবং হঠাৎ পায়ে হেঁটে স্বামীর কর্মস্থল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই, স্বামী তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে গ্রহণ করতে চাইলেন, যদিও ভারতবর্ষে পুরুষ অথবা নারী যে কেউ ধর্ম সাধনাকে অবলম্বন করলেই অন্যসব পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে যান। স্ত্রীর পায়ে পড়ে গেলেন তরুণসাধক এবং বললেন, মা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই তিনি বিরাজ করেন, আমিও শিখে নিয়েছি প্রত্যেক মেয়েকে জননী হিসেবে দেখতে। এইভাবেই আমি তোমাকে দেখতে চাই, কিন্তু তুমি যদি আমাকে টেনে আনতে চাও, আমি তোমার কথা শুনবো, কারণ আমি তোমাকে মন্ত্রসাক্ষী রেখে বিয়ে করেছি।

বিশুদ্ধস্বভাবা মহীয়সী এই মহিলা স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। কালবিলম্ব না করে তিনি বললেন, 'জোর করে আপনাকে সংসারী করবার ইচ্ছে আমার নেই, আমি কেবল কাছে থেকে আপনার সেবা করতে চাই, আপনার কাছে সাধনভজন শিখতে চাই।' এইভাবে তিনি স্বামীর একজন প্রধান অনুগতা শিষ্যা হলেন—তাঁকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি-পূজা করতে লাগলেন। এইভাবে স্ত্রীর অনুমতি পেয়ে তাঁর শেষ বাধা অপসারিত হল এবং তিনি স্বাধীনভাবে নিজের মনোনীত পথ ধরে জীবনযাপন করতে সমর্থ হলেন।[৭]

আশ্চর্য এই মহিলা। সাধনায় মগ্ন হয়ে স্বামী ক্রমে নিজের ভাবে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। সহধর্মিণী পত্নী দূর থেকে যথাশক্তি তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন। পরে স্বামী যখন অধ্যাত্ম-জগতের বিরাট পুরুষ হয়ে দাঁড়ালেন, স্ত্রী আরও কাছে চলে আসলেন। বলতে গেলে তিনিই তো তাঁর প্রথম শিষ্যা। অবশিষ্ট জীবন তিনি স্বামীর দৈহিক সেবায় অতিবাহিত করেছিলেন। মাতৃসন্ধানে বিভোর স্বামীটির খেয়াল থাকতো না তিনি বেঁচে আছেন, কি মরে গিয়েছেন। কথা বলতে বলতে এক একসময় স্বামী এত তন্ময় হয়ে যেতেন যে, জ্বলন্ত কাঠকয়লার ওপর বসে পড়লেও তাঁর হুঁশ হত না। হ্যাঁ, জ্বলন্ত কাঠকয়লা! সদাসর্বদা তিনি এমনি দেহজ্ঞান-রহিত থাকতেন।[৮]

এরপরে তাঁর অন্তরে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগল যে, বিভিন্ন ধর্মের গহনে কি সত্য আছে, তা জানবেন। এ পর্যন্ত তিনি নিজের ধর্ম ছাড়া আর কিছু জানতেন না। এবার তাঁর বাসনা হল, অন্য ধর্মগুলো কিরকম, তা জানতে হবে। যা কিছু তিনি করতেন, মনপ্রাণ ঢেলে সর্বান্তঃকরণে করতেন। সুতরাং অন্য ধর্মের গুরুদের সন্ধান শুরু হয়ে গেল।

গুরু বলতে ভারতে আমরা কি বুঝি, তা স্মরণ রাখতে হবে। শিক্ষক বলতে শুধু গ্রন্থকীট বোঝায় না ; তিনিই গুরু, যিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন, যিনি সত্যকে সাক্ষাৎ জেনেছেন, অপর কারও কাছে শুনে নয়।

একজন মুসলমান সন্তকে পেয়ে তাঁর প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী অনুসারে তিনি সাধন করতে লাগলেন। তিনি মুসলমানদের মতো পোশাক পরতে লাগলেন, মুসলমানদের শাস্ত্রানুযায়ী সমুদয় অনুষ্ঠান করতে লাগলেন, সেই সময়ের জন্য তিনি ইসলাম-ভাবাপন্ন হয়ে গেলেন। আর তিনি আশ্চর্য হলেন যে, এই সব সাধনপ্রণালীর অনুষ্ঠানও তাঁকে তাঁর পূর্ব-উপনীত অবস্থাতেই পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। যীশুখ্রীষ্টের ধর্মের অনুসরণ করেও তিনি একই ফল লাভ করলেন। তিনি যে-কোন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধককে পেতেন, তাঁরই কাছেই নতমস্তকে তাঁর নির্দেশ মতো সাধন-প্রণালী শিক্ষা নিতেন। সর্বান্তঃকরণে গভীর নিষ্ঠায় তিনি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান শিখতেন। বিভিন্ন ধর্মীয় গুরু তাঁকে যা যা করতে বলতেন, তিনি তাই করতেন, আর সব ক্ষেত্রেই তিনি একই অভিজ্ঞতা লাভ করতেন। এইভাবে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, প্রত্যেক ধর্মেরই লক্ষ্য এক, সকলে একই শিক্ষা দিচ্ছে— প্রভেদ শুধু সাধনপ্রণালীতে, প্রভেদ শুধু ভাষায়।

এবার আমার গুরুদেবের দৃঢ় ধারণা হল, সিদ্ধিলাভ করতে হলে বিনম্র হতে হবে। একেবারে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান-বর্জিত হওয়া প্রয়োজন ; কারণ আত্মার কোন লিঙ্গ নেই ; আত্মা পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়। লিঙ্গভেদ কেবল দেহেই উপস্থিত, আর যিনি সেই আত্মাকে বুঝতে ইচ্ছা করেন, তাঁর এই ভেদবুদ্ধি থাকলে চলবে না। পুরুষদেহধারী, মানুষটি তিনি সর্ব আচরণে স্ত্রীভাব আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি নিজেকে নারী বলে ভাবতে লাগলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ ধারণ করলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় কথাবার্তা বলতে লাগলেন, পুরুষের কাজ সব ছেড়ে দিয়ে, নিজ পরিবারস্থ নারীদের মধ্যে বাস করতে লাগলেন—এইভাবে সাধনা করতে করতে তাঁর মন পরিবর্তিত হয়ে গেল, তাঁর স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জ্ঞান একেবারে দূর হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কামের বীজ পর্যন্ত দগ্ধ হয়ে গেল—তাঁর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে

পালটে গেল।

পাশ্চাত্য দেশে নারীপূজার কথা আমরা শুনে থাকি, কিন্তু এই পূজা সাধারণতঃ নারীর সৌন্দর্য ও যৌবনের পূজা। ইনি কিন্তু নারীপূজা বলতে বুঝতেন—মা আনন্দময়ীর পূজা। সকল নারীই সেই আনন্দময়ী মা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আমি নিজে দেখেছি, সমাজ যাদের স্পর্শ করে না, এমন রমণীদের সামনে তিনি করজোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, শেষে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পায়ের তলায় পতিত হয়ে অর্ধ-বাহ্যশূন্য অবস্থায় বলছেন, 'মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছ আর একরূপে তুমি এই জগৎ হয়েছ। আমি তোমাকে বারবার প্রণাম করি।'

ভেবে দেখ, সেই মানুষটির জীবন কেমন ধন্য, যার হৃদয় থেকে সবরকম পশুভাব বিদায় নিয়েছে, যিনি প্রত্যেক নারীকে ভক্তিভাবে দর্শন করছেন, যাঁর কাছে সকল নারীর মুখ অন্য রূপ ধারণ করেছে, কেবল আনন্দময়ী জগন্মাতার মুখ তাতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। যদি প্রকৃত সিদ্ধিলাভ করতে হয়, তবে এইরকম পবিত্রতা নিতান্তই প্রয়োজন।

মানুষটি এইভাবে কঠোর নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা লাভ করলেন। আমাদের জীবনে যে-সব প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের সঙ্গে সংঘাত রয়েছে, তাঁর জীবনে তা আর রইল না। অতি কষ্টে আধ্যাত্মিক রত্নসমূহ সঞ্চয় করে তিনি মানবজাতিকে দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এবার ঈশ্বরনির্দিষ্ট কাজ আরম্ভ হল।

তাঁর প্রচারকার্য ও উপদেশদান আশ্চর্য ধরনের। আমাদের দেশে আচার্যের খুব সম্মান, তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করা হয়। গুরুকে যেরূপ সম্মান দেওয়া হয়, বাবা-মাকেও আমরা সেরকম সম্মান করি না। পিতামাতার কাছ থেকে আমরা শরীর পেয়েছি, কিন্তু গুরু আমাদের মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন ; আমরা তাঁর সন্তান, তাঁর মানসপুত্র।

কোন অসাধারণ আচার্যের অভ্যুদয় হলে সব হিন্দুই তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতে আসে, দলে দলে লোক তাঁকে ঘিরে বসে থাকে। কিন্তু আমাদের এই আচার্যবরকে লোকে সম্মান করল কি না, সে বিষয়ে তাঁর কোন খেয়ালই ছিল না। তিনি যে আচার্য শ্রেষ্ঠ, তা তিনি নিজেই জানতেন না। তিনি জানতেন, মা-ই সব করছেন, তিনি কিছুই নন। তিনি সর্বদাই বলতেন, 'যদি আমার মুখ দিয়ে কোন ভাল কথা বার হয়, তা আমার মায়ের কথা, আমার তাতে কোন গৌরব নেই।' নিজের প্রচারকার্য সম্বন্ধে তিনি এইরূপ ধারণাই পোষণ করতেন এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এ ধারণা ত্যাগ করেননি। তিনি কাউকেও ডাকতে যেতেন না। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল—প্রথমে চরিত্র গঠন কর,

আধ্যাত্মিক ভাব অর্জন কর, ফল আপনি আসবে। তাঁর প্রিয় একটি দৃষ্টান্ত : যখন পদ্মফুল ফোটে, তখন ভ্রমর নিজে নিজেই মধু খুঁজতে আসে। সুতরাং তোমার চরিত্র-পদ্ম পূর্ণ বিকশিত হোক, শত শত লোক তোমার কাছে শিক্ষা নিতে আসবে। এইটি জীবনের এক মহা শিক্ষা। আমার আচার্যদেব শত শতবার আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন, তবু আমি প্রায়ই তা ভুলে যাই।[৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনাও করেছিলেন, কিন্তু প্রাচীন পথে নয়। মদ খাবার বিধি যেখানে, সেখানে তিনি এক ফোঁটা কারণরস কপালে ঠেকাতেন। তন্ত্রসাধনার পথে বড়ই পিছল।[১০]

তিনি কাঁদতে কাঁদতে ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করতেন, 'মা, কথা কইবার জন্যে আমার কাছে এমন একজন লোক এনে দে, যার ভেতর কামকাঞ্চনের লেশমাত্র নেই, সংসারী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার মুখ জ্বলে গেল।' তিনি আরও বলতেন, 'সংসারী এবং অপবিত্র লোকের স্পর্শ আমি সহ্য করতে পারি না।'[১১]

প্রশ্ন : এই যে প্রত্যেক জাতকে তাদের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির দিক থেকে বুঝতে চেষ্টা করার অভ্যাস, এ আপনি কোথা থেকে পেলেন?

—নিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিক্ষার ফল। আমরা সকলেই কতকটা তাঁরই পথে চলেছিলাম। অবশ্য, তিনি নিজে যে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের ততটা করতে হয়নি। তিনি যে-সব মানুষকে বুঝতে চাইতেন, যাদের কাছ থেকে শিখতে চাইতেন, তাদের মতো খাওয়াদাওয়া করতেন, তাদের মতো জামাকাপড় পরতেন, তাদের দীক্ষা গ্রহণ করতেন এবং তাদের ভাষাও ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন, 'অপরের সত্তার মধ্যে নিজেকে প্রবিষ্ট করার শিক্ষা আমাদের নিতে হবে।' এই যে পথ, এ তাঁর নিজস্ব। ভারতবর্ষে এর পূর্বে কেউ এমনভাবে পর পর খৃষ্টান, মুসলমান ও বৈষ্ণব, হননি।"[১২]

আমি একজন মানুষকে জানতাম, লোকে যাঁকে পাগল বলত : তিনি উত্তর দিতেন, 'বন্ধুগণ, সমুদয় জগৎ তো একটা পাগলাগারদ। কেউ সাংসারিক প্রেম নিয়ে উন্মত্ত, কেউ নামের জন্য, কেউ যশের জন্য, কেউ অর্থের জন্য, আবার কেউ বা স্বর্গলাভের জন্য পাগল। বিরাট এই বাতুলালয়ে আমিও পাগল, আমি ভগবানের জন্য পাগল। তুমি যদি টাকার জন্য পাগল, আমি ঈশ্বরের জন্য পাগল। তুমিও পাগল, আমিও পাগল। আমার বোধ হয়, শেষ পর্যন্ত আমার পাগলামিই সবচেয়ে সেরা।'[১৩]

মন কখন কখন কোন ভাব নিয়ে একবৃত্তিস্থ হয়— তারই নাম সবিকল্প ধ্যান। আর মন যখন সর্ববৃত্তিশূন্য হয়ে আসে, তখন নিরাধার এক অখণ্ড বোধস্বরূপ প্রত্যক্‌চৈতন্যে গলে যায়, তার নামই বৃত্তিশূন্য নির্বিকল্প সমাধি। আমরা ঠাকুরের মধ্যে এ উভয় সমাধি মুহুর্মুহুঃ প্রত্যক্ষ করেছি। চেষ্টা ক'রে তাঁকে ঐ অবস্থায় আসতে হ'ত না। আপনি-আপনি সহসা হয়ে যেত। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁকে দেখেই তো এ-সব ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলুম।[১৪]

''মনের বাইরের জড়-শক্তিকে কোন উপায়ে আয়ত্ত ক'রে একটা অদ্ভুত ব্যাপার বা মিরাক্‌ল দেখান বড় বেশী কথা নয়— কিন্তু এই যে পাগলা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মতো হাতে নিয়ে ভাঙতেন, পিটতেন, গড়তেন এবং স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতন ভাবে তৈরি করতেন, এমন 'মিরাক্‌ল' আমি আর দেখি না।''[১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ কারও বিরুদ্ধে কখনও কড়া কথা বলেননি। তাঁর সহিষ্ণুতা এমনই ছিল যে, সব সম্প্রদায়ের মানুষ ভাবত তিনি তাঁদেরই লোক। সকলকেই তিনি ভালবাসতেন। তাঁর দৃষ্টিতে সব ধর্মই সত্য, প্রত্যেক ধর্মকেই তিনি একটা জায়গা দিতে পেরেছিলেন। তিনি মুক্তস্বভাব ছিলেন, কিন্তু সকলের প্রেমেই তাঁর মুক্তি, বজ্রপাতে নয়। এইরকম কোমল থাকের লোকেরাই নূতন ভাব সৃষ্টি করেন, আর 'হাঁক-ডেকে' থাকের লোক বাণীটা চারিদিকে ছড়িয়ে দেন।

তাঁর নিজস্ব ব'লে কখন দাবিও করেননি ; তিনি নামযশের আকাঙ্ক্ষা করতেন না। তাঁর বয়স যখন প্রায় চল্লিশ, সেই সময় তিনি প্রচার করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি ঐ প্রচারের জন্য কখন বাইরে কোথাও যাননি। যারা তাঁর কাছে এসে উপদেশ গ্রহণ করবে, তাদের জন্য তিনি অপেক্ষা করেছিলেন।

ভারতের মহান্ অবতার পুরুষগণের মধ্যে একজন ব'লে শ্রীরামকৃষ্ণ এখন পূজিত হয়ে থাকেন। তাঁর জন্মদিন এখন ধর্মোৎসবে পরিণত হয়েছে।[১৬]

অপরের জন্য সীমাহীন প্রেম তাঁর আর একটি বিশেষত্ব। তাঁর জীবনে আদৌ বিশ্রাম ছিল না। জীবনের প্রথমাংশ ধর্ম-উপার্জনে ও শেষাংশ তিনি বিতরণে ব্যয় করেছিলেন। দলে দলে লোক তাঁর উপদেশ শুনতে আসত, আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ প্রেম ছিল। যারা তাঁর কৃপালাভের জন্য আসত, এইরকম

সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য মানুষও তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হত না।

ক্রমে তাঁর গলায় একটা ঘা হল, অনেক বুঝিয়েও তাঁর কথা বলা বন্ধ করা গেল না। যখনই তিনি শুনতেন, লোকে তাঁকে দেখতে এসেছে, তিনি তাদেরকে তাঁর কাছে আসতে দেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তারা কাছে এলে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যদি কেউ বলত, 'এই সব লোকজনের সঙ্গে কথা কইলে আপনার কষ্ট হবে না?' তিনি হেসে উত্তর দিতেন, 'কি! দেহের কষ্ট! আমার কত দেহ হল, কত দেহ গেল। যদি এ দেহটা পরের সেবায় যায়, তবে তো এটা ধন্য হল। যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, সেজন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।' একবার একজন তাঁকে বলল, 'মশাই, আপনি তো একজন মস্ত যোগী—আপনার দেহের উপর একটু মন রেখে নিজের ব্যারামটা সারিয়ে ফেলুন না।' প্রথমে তিনি কোন উত্তর দিলেন না। ঐ লোকটি যখন আবার সেই কথা তুলল, তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'তোমাকে আমি একজন জ্ঞানী মনে করতাম, কিন্তু দেখছি— তুমি অপরাপর সংসারী লোকদের মতোই কথা বলছ। এই মন ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত হয়েছে— তুমি কি বল, একে ফিরিয়ে নিয়ে আত্মার খাঁচাস্বরূপ দেহে ঢুকিয়ে দেব?'

এইভাবে তিনি সবাইকে উপদেশ দিতেন, আর চারিদিকে এই খবর যখন ছড়িয়ে গেল যে তাঁর দেহাবসান সন্নিকট, তখন আরও অনেক বেশি লোক দলে দলে আসতে লাগল!

নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না রেখে আমাদের গুরুদেব তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। আমরা তাঁকে বারণ করে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারতাম না। অনেক লোক দূর-দূরান্তর থেকে আসত, আর তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শান্তি পেতেন না। তিনি বলতেন, 'যতক্ষণ আমার কথা কইবার শক্তি রয়েছে, ততক্ষণ উপদেশ দেব।' তিনি যা বলতেন, তাই করতেন। একদিন তিনি ইঙ্গিতে আমাদের জানালেন, সেইদিন দেহত্যাগ করবেন এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র 'ওঁ' উচ্চারণ করতে করতে মহাসমাধিস্থ হলেন।[১৭]

পাশ্চাত্যের লোকদের যখন চৈতন্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে শুনি, তখন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারি না। চৈতন্য! কি হয়েছে চৈতন্যে? অবচেতন মনের অতল গভীরতা এবং পূর্ণ চৈতন্যাবস্থার উচ্চতার তুলনায় এটা কিছুই নয়। এ-বিষয়ে আমার কোনদিন তেমন ভুল হবে না, আমি যে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখেছি, তিনি যে কোন মানুষের অবচেতন মনের

খবর দশ মিনিটের মধ্যেই জানতে পারতেন। তারপর ঐ ব্যক্তির ভূত ভবিষ্যৎ এবং শক্তি সম্বন্ধে সবই ব'লে দিতে পারতেন।[১৮]

যার তার হাতে তিনি খেতে পারতেন না। এমন অনেক ঘটনা হয়েছে, যেখানে তিনি কোন কোন লোকের ছোঁয়া খেতে পারেননি। পরে বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানতে পেরেছি—বাস্তবিকই লোকটির ভিতর কোন-না-কোন বিশেষ দোষ লুকনো ছিল।[১৯]

ঠাকুর বলতেন, 'হচ্ছে হবে— ও-সব মেদাটে ভাব।'[২০]

ঠাকুরকে দেখেছি— যাদের আমরা হেয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার ধারাটাই অদ্ভুত!

তিনি জগতে কারও ভাব নষ্ট করেননি। মহা-অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন।[২১]

অতীতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এতদিন ধরে ভারতে আধ্যাত্মিক বা অন্তর্জীবন এবং পাশ্চাত্যদেশে বাহ্য জীবন বা কর্মকুশলতা বিকাশ পেয়ে এসেছে। এ পর্যন্ত উভয়ে বিপরীত পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল ; এখন উভয়ের সম্মিলন-কাল উপস্থিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস গভীর-অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু বহির্জগতেও তাঁর মতো কর্মতৎপরতা আর কার আছে? এইটিই রহস্য। জীবন— সমুদ্রের মতো গভীর হবে বটে, আবার আকাশের মতো বিশাল হওয়াও চাই।'[২২]

আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে শিল্পীসুলভ গুণের বিস্ময়কর প্রকাশ ছিল। তিনি বলতেন এই গুণ ছাড়া কেউ প্রকৃত অর্থে আধ্যাত্মিক হ'তে পারে না।[২৩]

শিখবার অনেক কিছু আছে, আমরণ যত্ন করতে হবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' যে ব্যক্তির বা যে সমাজের কিছু শিখবার নেই, তা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।[২৪]

একটি অল্পবুদ্ধি বালক, শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করত। একবার সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'বুঝি, কোনও ইংরেজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করেছে, তাতে এও প্রশংসা করল।'[২৫]

রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন নূতন তত্ত্ব প্রচার করতে আসেননি— কিন্তু তাঁর

আবির্ভাবে অনেক পুরনো সত্য আবার প্রকাশিত হলো। এক কথায় তিনি ভারতের সমগ্র অতীত চিন্তার মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য, তারা কি প্রণালীতে এবং কি উদ্দেশ্যে রচিত, তা আমি কেবল তাঁর জীবন থেকেই বুঝতে পেরেছি।[২৬]

আশ্চর্য ব্যাপার, তাঁর সমগ্র জীবনের কাজ পাশ্চাত্যভাবে উন্মত্ত এক শহরের কাছে করেছিলেন। ভারতের অন্যান্য শহর থেকে অনেক বেশী পরিমাণে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়েছিল এই নগরী। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর কিছুই ছিল না ; মহামনীষাসম্পন্ন হয়েও তিনি নিজের নামটা পর্যন্ত লিখতে পারতেন না। কিন্তু প্রত্যেকে—বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারীরা পর্যন্ত, তাঁকে দেখে একজন মহামনীষী বলে মেনে নিয়েছিলেন। অদ্ভুত এই মানুষ। ভারতঋষিদের পরিপূর্ণতা ছিল তাঁর মধ্যে, যুগবতার তিনি, এবং তাঁর বাণী সমকালের পক্ষে বিশেষ কল্যাণপ্রদ। মানুষটির পিছনে যে ঐশ্বরিক শক্তি খেলা করত, সেটিও লক্ষ্য করার মতো। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, বাংলার অজ্ঞাত অপরিচিত এক পল্লীতে তাঁর জন্ম। ইতিমধ্যেই ইওরোপ-আমেরিকায় হাজার হাজার মানুষ তাঁকে পুজো করছে এবং পরে আরও হাজার হাজার লোক তাঁর পুজো করবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা কে বুঝতে পারে? এখন কেবল এইটুকু মাত্র বলতে চাই, যদি আমার জীবনে একটিও সত্য কথা বলে থাকি, তবে তা তাঁর— তাঁরই বাণী ; আর যদি এমন অনেক কথা বলে থাকি, যেগুলি অসত্য, ভ্রমাত্মক, যেগুলি মানুষের পক্ষে কল্যাণকর নয়, সেগুলি সবই আমার, সেগুলির জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।[২৭]

এক একটা ভাব নিয়েই সিদ্ধ হ'তে বা ঐ ভাবের চরমাবস্থায় পৌঁছতে কত জন্মের চেষ্টা লাগে! ভাবরাজ্যের রাজা আমাদের ঠাকুর কিন্তু আঠারটি ভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ভাবমুখে না থাকলে তাঁর শরীর থাকত না— এ-কথা ঠাকুরই বলতেন।[২৮]

ধর্মের গ্লানি দূর করতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শরীর ধারণ ক'রে বর্তমান যুগে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর উচ্চারিত বিশ্ববাণী জগতে আরও প্রচারিত হ'লে সারাবিশ্বের এবং জীবের মঙ্গল হবে। এমন অদ্ভুত মহাসমন্বয়াচার্য বহুশতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেননি।[২৯]

রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বলবেন, না দেবতা বলবেন, না অবতার বলবেন, তা আপনাদের ইচ্ছা। নিজের অন্তরের আলোক অনুযায়ী, তাঁকে গ্রহণ করলেই যথেষ্ট। কিন্তু যে

তাঁর কাছে মাথা নত করবে, সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে।[৩০]

যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই আধুনিক ভারতের জয়যাত্রা—স্বর্ণযুগের শুরু।[৩১]

আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে।[৩২]

রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া। আমরা এখনও বুঝতে পারিনি। ...সমগ্র হিন্দুজাতি যুগ যুগ ধরে যেসব চিন্তা করে আসছে, তিনি এক জীবনেই তা উপলব্ধি করেছেন। জগতের সমস্ত শাস্ত্রসমূহের তিনি জীবন্ত ভাষ্য। লোকে ক্রমশঃ এসব বুঝবে।[৩৩]

তোমরা বলছ ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কালীর অবতার বলা হবে কি? হাঁ, আমিও মনে করি, কালী তাঁর ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহযন্ত্র পরিচালিত করেছিলেন।[৩৪]

তিনি শুধু সেই মহৎ জীবন যাপন করেই তৃপ্ত ছিলেন ; তার ব্যাখ্যা অপরে খুঁজে বার করুক![৩৫]

যাঁরাই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেছেন ধর্মানুভূতির পথে তাঁরা এগিয়েছেন। তাঁরা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত। সকলেই কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ নয়। ঠাকুর বলতেন, 'অবতারের সঙ্গে কল্পান্তরের সিদ্ধ ঋষিরা দেহধারণ ক'রে জগতে আগমন করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ। তাঁদের দ্বারাই ভগবান কাজ করেন বা জগতে ধর্মভাব প্রচার করেন।' অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গ একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা পরার্থে সর্বত্যাগী, যাঁরা ভোগসুখ কাকবিষ্ঠার মতো পরিত্যাগ ক'রে 'জগদ্ধিতায়' 'জীবহিতায়' জীবনপাত করেন।

ভাবসিন্ধু একফোঁটাই মানুষকে দেবতা করতে পারে। সর্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়? এই থেকেই বোঝা যায়—তিনি কি দেহ ধ'রে মর্তে এসেছিলেন। অবতার বললে তাঁকে ছোট করা হয়। তিনি যখন তাঁর সন্ন্যাসী ছেলেদের বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, তখন অনেক সময় নিজে উঠে চারিদিক খুঁজে দেখতেন— কোন গেরস্ত সেখানে আছে কি না। যখন দেখতেন—কেউ নেই বা আসছে না, তখনই জ্বলন্ত ভাষায় ত্যাগ-তপস্যার মহিমা বর্ণন করতেন। সেই সংসার-বৈরাগ্যের প্রবল উদ্দীপনাতেই তো আমরা সংসারত্যাগী হয়েছি।[৩৬]

যখন কোনো অবতার আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে মুক্ত ও মুমুক্ষু পুরুষেরা তাঁর লীলায় সহায়তা করতে শরীর ধারণ ক'রে আসেন। কোটি জন্মের অন্ধকার কাটিয়ে এক জন্মে মুক্ত ক'রে দিতে কেবল মাত্র অবতারেরাই পারেন। এরই মানে কৃপা।

পথ?—তাঁকে ডাকা। ডেকে ডেকে অনেকে তাঁর দেখা পায়, ঠিক আমাদের মতো শরীরে তাঁকে দেখতে পায়, তাঁর কৃপা লাভ করে। যারা ঠাকুরের দর্শন পেয়েছে, তারা ধন্য! 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।'

কেউ বুঝতে পারেনি 'রামকৃষ্ণ' নাম ধ'রে কে এসেছিলেন, এই যে তাঁর অন্তরঙ্গ, সাঙ্গোপাঙ্গ— এরাও তাঁর ঠাওর পায়নি। সামান্য কয়েকজন কিছুটা বুঝেছে মাত্র। পরে কিন্তু সকলে বুঝবে।[৩৭]

পরমব্রহ্মতত্ত্বে লিঙ্গভেদ নেই। আমরা 'আমি-তুমি'র পরিপ্রেক্ষিতে লিঙ্গভেদটা দেখতে পাই ; মন যত অন্তর্মুখী হয়, ততই ভেদজ্ঞানটা চলে যায়। শেষে মন যখন সমরস ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবে যায়, তখন 'এ স্ত্রী, ও পুরুষ'— এই জ্ঞান থাকে না। আমরা ঠাকুরের ঐরূপ নিজের চোখে দেখেছি।[৩৮]

জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যরা শাস্ত্রের শ্লোকের বিবিধ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেননি, তাঁরা শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করবার চেষ্টা করেননি, তাঁরা কখনই বলেননি, এই শব্দের এই অর্থ, আর এই শব্দ ও ঐ শব্দের এইরূপ সম্বন্ধ। জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের জীবন ও বাণী পাঠ করুন, দেখবেন— তাঁদের মধ্যে কেউই ঐ পথ ধরেননি। তাঁরাই যথার্থ শিক্ষা দিয়েছেন।[৩৯]

যদি কেউ পরমহংসদেবকে অবতার হিসেবে মানে ভাল কথা, না মানলেও উত্তম কথা। সার সত্যটি এই যে, পরমহংসদেব চরিত্রসম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষাসম্বন্ধে সকলের চেয়ে উদার ও নূতন এবং progressive (প্রগতিশীল) অর্থাৎ পুরানোরা সব একঘেয়ে— এ নূতন অবতার বা শিক্ষকের এই শিক্ষা যে, এখন যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের উৎকৃষ্ট ভাব একত্র ক'রে নূতন সমাজ তৈরি করতে হবে। ...পুরানো অবতাররা বেশ ছিলেন বটে, কিন্তু এ যুগের এই ধর্ম—একাধারে যোগ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম— আচণ্ডালে জ্ঞান-ভক্তি-দান— আবালবৃদ্ধবনিতা। ও সকল কেষ্ট বিষ্টু বেশ ঠাকুর ছিলেন ; কিন্তু রামকৃষ্ণে একাধারে সব ঢুকে গেছেন।[৪০]

রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের অবতার, তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই ; তবে তিনি বলতেন, লোককে বুঝে নিতে দাও ; লোকের ঘাড়ে জোর করে এসব চাপিয়ে দিতে পারো না।

রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না বুঝে বেদ বেদান্ত ভাগবত এবং পুরাণ বোঝা কঠিন। কিছুতেই বোঝা যাবে না।

তাঁর জীবন অনন্তশক্তিপূর্ণ একটি সন্ধানী আলো ; যা ভারতের সমগ্র ধর্মভাবের উপর বিচ্ছুরিত হয়েছে। তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ ছিলেন। মাত্র এক জীবনে তিনি জাতীয় ধর্মজীবনের সমগ্র কল্পটি অনুভব করেছেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস সবচেয়ে আধুনিক এবং সবচেয়ে পূর্ণবিকশিত চরিত্র—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার পূর্ণপ্রকাশ ; কারুর সঙ্গে কি তাঁর তুলনা চলে? তাঁকে যে বুঝতে অক্ষম, তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম সৌভাগ্য, তাঁর মুখের একটা কথা আমার কাছে বেদ এবং বেদান্ত অপেক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমি তস্য দাস-দাস-দাসোঽহং।

যীশুখৃষ্টকে জেলে-মালারা ভগবান বলেছিল, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাকে মেরে ফেললেন। জীবদ্দশায় বুদ্ধকে বেনে এবং রাখালেরা মান্য করেছিল। রামকৃষ্ণ কিন্তু জীবনকালেই পূজিত হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী-পুরুষেরা তাঁকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেছে।[৪১]

অবশ্যই আমাদের আদর্শ 'পরব্রহ্ম'। কিন্তু সকলেই কোন বিমূর্ত আদর্শের (abstract ideal) দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারবে না বলেই একজন আদর্শ পুরুষকে প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সেই আদর্শ পুরুষকে পাওয়া যাচ্ছে।

বেদান্তের বাণী যাতে এ যুগে প্রত্যেকেই গ্রহণ করতে পারে, তারই জন্য আমাদের এমন মানুষের প্রয়োজন, বর্তমান যুগের মানুষের প্রতি যাঁর সহানুভূতি আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই প্রয়োজন পূর্ণ হয়েছে। প্রত্যেকের সামনেই এই আদর্শ তুলে ধরতে হবে। সাধু বা অবতার, যেভাবেই তাঁকে গ্রহণ করা যাক না কেন— তাতে কিছু যায় আসে না।

ঠাকুর একবার বলেছিলেন যে তিনি আমাদের মধ্যে আবার আসবেন। আমার মনে হয়, তার পর তিনি বিদেহ-মুক্তির অবস্থায় ফিরে যাবেন।[৪২]

যারা তাঁর কৃপা পেয়েছে, তাদের মন ও বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত থাকতে পারে না। কৃপার পরীক্ষা হচ্ছে কাম-কাঞ্চনে অনাসক্তি। সেটা যদি কারও না হয়ে থাকে, তবে ঠাকুরের কৃপা সে ঠিক ঠিক লাভ করেনি।[৪৩]

ব্রাহ্ম সমাজের গুরু স্বর্গীয় আচার্য শ্রীকেশবচন্দ্রের শ্রীমুখ থেকে আমরা শুনেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সরল মধুর গ্রাম্য ভাষা ছিল অলৌকিক পবিত্রতা

বিশিষ্ট ; আমরা যাকে অশ্লীল বলি, এমন কথার উপস্থিতি তাতে থাকলেও তাঁর অপূর্ব বালবৎ কামগন্ধহীনতার জন্য ঐ সব শব্দ-প্রয়োগ দোষের না হয়ে বরং ভূষণস্বরূপ হয়েছে।[৪৪]

সত্য কি—তা আগে নিজে জানো, পরে তোমার কাছে অনেকে শিখবে, তারা তোমার কাছে আসবে। আমার গুরুদেবের মনোভাব এইরকমই ছিল, তিনি কারও সমালোচনা করতেন না।

বছরের পর বছর দিনরাত আমি এই মানুষটির সঙ্গে বাস করেছি, কিন্তু কখন শুনিনি, তাঁর জিহ্বা কোন সম্প্রদায়ের নিন্দাসূচক বাক্য উচ্চারণ করেছে। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই তিনি সমভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পেতেন। মানুষ— হয় জ্ঞানপ্রবণ, না হয় ভক্তিপ্রবণ, না হয় যোগপ্রবণ, না হয় কর্মপ্রবণ হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধর্মে এই বিভিন্ন ভাবসমূহের কোন-না-কোনটির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তথাপি একই শরীরে এই চারিটি ভাবের বিকাশ সম্ভব এবং ভবিষ্যতে মানুষ তা করতে পারবে, এই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। তিনি কারও দোষ দেখতেন না, সকলের মধ্যেই ভাল দেখতেন।[৪৫]

বিধাতার ইচ্ছায় আমি যাঁর সঙ্গলাভের সুযোগ পেয়েছিলাম, তিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, অপরদিকে তেমনি একনিষ্ঠ অদ্বৈতবাদী। একদিকে যেমন পরম ভক্ত, অপরদিকে তিনি তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন। এই মানুষটির শিক্ষাতেই আমি অন্ধভাবে ভাষ্যকারদের অনুসরণ না করে স্বাধীনভাবে উপনিষদ্ ও অন্যান্য শাস্ত্র বুঝতে শিখেছি। এ-বিষয়ে যৎসামান্য যা অনুসন্ধান করেছি, তাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এই-সব শাস্ত্রবাক্য পরস্পরবিরোধী নয়।[৪৬]

তাঁর জীবনটা এক অসাধারণ আলোকবর্তিকা, যার তীব্র রশ্মিসম্পাতে লোকে হিন্দুধর্মের সমগ্র রূপ বুঝতে সমর্থ হয়েছে। শাস্ত্রে যে-সব জ্ঞান মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তিনি তার মূর্ত দৃষ্টান্ত। ঋষি ও অবতারেরা যে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তিনি নিজের জীবন দিয়ে তা দেখিয়ে গেছেন। শাস্ত্রগুলি মতবাদ মাত্র— তিনি ছিলেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মানুষটি তাঁর একান্ন বছরের জীবনে পুরো পাঁচ হাজার বছরের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা নতুন করে সঞ্চয় করে গেছেন। ভিন্ন ভিন্ন মত এক একটা অবস্থা বা ক্রম মাত্র। পরধর্ম বা পরমতের প্রতি শুধু বিদ্বেষভাবশূন্য হলেই চলবে না, ঐ ধর্ম বা মতকে আলিঙ্গনও করতে হবে ; সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি—তাঁর এই মতবাদ বেদের

ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রসমূহের সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত করতে পারে।[৪৭]

প্রশ্ন : 'তবে কি তিনি একটি সম্প্রদায় স্থাপন করে গিয়েছেন?

—না, না, সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের সর্বত্র যে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করবার জন্যই তিনি সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন। তিনি নতুন কোন সম্প্রদায় গঠন করেননি, বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীতই করে গিয়েছেন। সাধারণ মানুষ স্বাধীনচিন্তাপরায়ণ হোক, এই আশাই তিনি পোষণ করতেন এবং তার জন্যই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে গিয়েছেন।[৪৮]

যাদের শেখাবার কিছু নেই, তারাই শাস্ত্র থেকে এক একটা শব্দ নিয়ে তারই উপর তিনখণ্ড বই লিখতে পারে। সেই শব্দের আদি কি, কে ঐ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিল, তিনি কি খেতেন, কতক্ষণ ঘুমতেন, এইসব বিষয় নিয়েই কেউ হয়তো আলোচনা করে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলতেন : এক আম-বাগানে কয়েকজন লোক বেড়াতে গিয়েছিল ; বাগানে ঢুকে তারা গুনতে আরম্ভ করল, কটা আম গাছ, কোন্ গাছে কত আম, এক-একটা ডালে কত পাতা। আমের রঙ, আকার, প্রকার ইত্যাদি নানাবিধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার চলতে লাগল। একজন ছিলেন বিচক্ষণ, তিনি এসব গ্রাহ্য না করে আম পাড়তে লাগলেন ও মনের আনন্দে খেতে লাগলেন।[৪৯]

সাধারণ গুরু অপেক্ষা উন্নততর আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন—এঁরা ঈশ্বরের অবতার। স্পর্শ দ্বারা, এমন কি, কেবল মাত্র ইচ্ছা দ্বারাই এঁরা অপরের ভিতর ভগবদ্ভাব সঞ্চার করে দিতে পারেন। তাঁদের ইচ্ছায় অতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও মুহূর্তের মধ্যে সাধু হয়ে যায়। এঁরা গুরুর গুরু, মানুষের ভিতর ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ; আমরা মাধ্যম ছাড়া অন্য পথে ভগবানকে দেখতে পারি না। মানুষ তাঁদের উপাসনা না করে থাকতে পারে না।[৫০]

শিষ্যের পাপের বোঝা গুরুকে বহন করতে হয়। এই কারণেই শক্তিধর গুরু দেহেও অনেক সময় রোগের প্রকাশ হয়...

জীবন্মুক্ত হওয়া অপেক্ষা আচার্য হওয়া অনেক সহজ। জীবন্মুক্ত পুরুষ জানেন যে জগৎ স্বপ্নবৎ, তার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু আচার্য জানেন জগৎ স্বপ্নবৎ, কিন্তু তার মধ্যে থাকতে হবে এবং থেকেই কাজ করতে হবে। সবার পক্ষে আচার্য হওয়া সম্ভব নয়।

তিনিই আচার্য, যাঁর ভিতর দিয়ে দৈব শক্তি কাজ করে। যে শরীর নিয়ে

আচার্য হওয়া যায়, তা অন্যসব শরীর থেকে ভিন্ন। সেই শরীরকে ঠিক রাখবার জন্য বিশেষ যোগ বা বিজ্ঞান আছে। আচার্যের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাধারণত অত্যন্ত কোমল ও মন অতি সংবেদনশীল, ফলে তিনি সুখ ও দুঃখ দুই তীব্রভাবে অনুভব করেন।...

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি শক্তি। মনে না করাই ভাল যে কোনো বিষয়ে তাঁর বিশেষ কোনো মতবাদ ছিল। কিন্তু তিনি বিশেষ শক্তিধর, সেই শক্তি তাঁর শিষ্যদের ভিতর মূর্ত হয়ে রয়েছে এবং এখনও কাজ করছে। আমি দেখতে পাচ্ছি তার চিন্তাভাবনা এখনও বিস্তারিত হচ্ছে। একই দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন্মুক্ত ও আচার্য।[৫১]

মানুষের মন ওই অবতারতত্ত্ব পর্যন্ত বুঝতে পারে—তার উপরের স্তর সম্বন্ধে তেমন কোনো জ্ঞান নেই। তেমন ব্রহ্মজ্ঞানীরা বড় একটা পৃথিবীতে আসেন না। অল্প লোকেই তাঁদের বুঝতে পারে। একমাত্র শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে তাঁরাই তার সাক্ষাৎ প্রমাণ। এঁরাই ভবসমুদ্রে আলোকস্তম্ভস্বরূপ। এইসব অবতারদের সান্নিধ্য তার ও কৃপাদৃষ্টিতে হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার মুহূর্তমধ্যে দূর হয়ে যায়— সহসা ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক বুকের মধ্যে জ্বলে ওঠে। কেন কিংবা কোন পথে এটা হয় তা বলা যায় না কিন্তু সত্যি এটা হয়—আমি নিজে তা হ'তে দেখেছি।[৫২]

জ্ঞানীরা যেসব কাজ করেন তাতে পৃথিবীর মঙ্গল হয়। তাঁরা যা বলেন, যা করেন সবই জগতের মঙ্গলের জন্য। ঠাকুরকে দেখেছি 'দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ—দেহে থেকেও দেহবুদ্ধিশূন্য! সবকিছুই তাঁরা মনুষ্যবৎ করেন, শুধুমাত্র খেলাচ্ছলে। এঁদের কাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলা যায়— 'লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্।'[৫৩]

কে ভেবেছিল যে, সুদূর বাংলার পল্লীগ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণতনয়ের জীবন ও উপদেশ সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে দূরদেশের লোকেও জানতে পারবে, এঁদের কথা আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। আমি অবশ্যই ভগবান রামকৃষ্ণের কথা বলছি।[৫৪]

তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। তখন থেকে সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল ঈশ্বরের প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর ক'রে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন— হিন্দু-

মুসলমান-ভেদ, ক্রিশ্চান-হিন্দু-ভেদ ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের ; সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।'...

মেয়ে বা পুরুষ যে তাঁর পূজা করবে, সে অতি নীচ হলেও মুহূর্তমধ্যে মহান্ হবে।[৫৫]

আচার্যদেবের কাছে থেকে আমি যা বুঝেছি, মানুষ এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে, তাঁর মুখ থেকে কারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয়নি, এমন কি তিনি কারও সমালোচনা পর্যন্ত করতেন না। তাঁর দৃষ্টি জগতে কোন কিছুকে মন্দ বলে চিহ্নিত করবার শক্তি হারিয়েছিল—কোনরকম কুচিন্তা করবার সামর্থ্য তিনি হারিয়েছিলেন। ভাল ছাড়া আর কিছু তিনি দেখতেন না। সেই মহাপবিত্রতা এবং মহাত্যাগই ধর্মলাভের একমাত্র উপায়। বেদ বলে : 'ধন বা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা নয় একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।' যীশু বলেছেন, 'তোমার যা কিছু আছে, তা বিক্রি করে দরিদ্রদের দান কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।'

বড় বড় আচার্য ও মহাপুরুষগণ সবাই এই কথা বলে গিয়েছেন এবং নিজেদের জীবনে তা পরিণত করেছেন। এই ত্যাগ ছাড়া আধ্যাত্মিকতা লাভের সম্ভাবনা কোথায়? যেখানেই হোক না কেন, সব ধর্মভাবের পেছনেই ত্যাগ রয়েছে। ত্যাগের ভাব যত কমে যায় ইন্দ্রিয়পরতা ততই ধর্মের ভিতর ঢুকতে থাকে, ধর্মভাবও সেই পরিমাণে কমে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগের সাকার বিগ্রহ ছিলেন। আমাদের দেশে যাঁরা সন্ন্যাসী হন, সমুদয় ধন-ঐশ্বর্য মান-সম্ভ্রম তাঁদের ত্যাগ করতে হয়। আমার গুরুদেব এই আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে কার্যে পরিণত করেছিলেন। তিনি কাঞ্চন স্পর্শ করতেন না ; তাঁর কাঞ্চনত্যাগ-স্পৃহা তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীর উপর পর্যন্ত এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, নিদ্রিতাবস্থাতেও তাঁর দেহে কোন ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করালে তাঁর মাংসপেশী সঙ্কুচিত হ'য়ে যেত এবং তাঁর সমুদয় দেহ যেন ঐ ধাতুদ্রব্যকে স্পর্শ করতে অস্বীকার করত।

এমন অনেকে ছিল, যাদের কাছ থেকে তিনি কিছু গ্রহণ করলে তারা কৃতার্থ বোধ করত। তারা আনন্দের সঙ্গে তাঁকে হাজার হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল। তাঁর উদার হৃদয় যদিও সকলকে আলিঙ্গন করতে সদা প্রস্তুত ছিল, তবু তিনি এইসব লোকের কাছ থেকে দূরে সরে যেতেন। কাম-কাঞ্চন জয়ের এক জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন তিনি ; কাম-কাঞ্চন ভাব তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না, বর্তমান শতাব্দীর জন্য এইরকম মানুষের অতিশয় প্রয়োজন ছিল।

এযুগে লোকে যাকে 'প্রয়োজনীয় দ্রব্য' মনে করে সেসব ছাড়া তারা একমাসও বাঁচতে পারবে না। প্রয়োজনের তালিকা বেড়েই চলেছে। এমন সময়ে ত্যাগের প্রয়োজন রয়েছে। অন্তত এমন একজন লোকের প্রয়োজন আমাদের, যিনি অবিশ্বাসীদের কাছে প্রমাণ করতে পারেন যে, এখনও এমন একজন মানুষ রয়েছেন, যিনি জগতের ধন-রত্ন ও মান-যশের জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত নন।[৫৬]

এমন একজন মানুষের বিশেষ প্রয়োজন ছিল— এ যুগে এমন ত্যাগের প্রয়োজন রয়েছে।

নিজের জীবন বিসর্জন দাও, মানুষের সেবাদাস হও। একেই তো ত্যাগ বলে, শুধু কথা বলে দিয়ে কাজ হয় না। ওঠো এবং কাজে লেগে যাও। তোমাদের দেখামাত্র সংসারী লোকের মনে এবং কাঞ্চনাসক্ত মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হবে।

উঠে দাঁড়াও, ঈশ্বরকে অনুভব করো। কোন দেশে এরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হবে, সেই দেশ ততই উন্নত হবে। আর যে দেশে এমন লোক একেবারেই নেই, সে দেশের পতন অনিবার্য। তার উদ্ধারের আশা নেই। সেইজন্যে মানবজাতির কাছে আমাদের আচার্যদেবের উপদেশ : 'প্রথমে নিজে ধার্মিক হও এবং সত্য উপলব্ধি কর।' সকল দেশের দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবকদের সম্বোধন করে তিনি বলেছেন, 'তোমাদের ত্যাগের সময় এসেছে। তিনি চান, তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃস্বরূপ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর। তিনি চান, তোমরা মুখে কেবল 'ভাইকে ভালবাসি' না বলে, তোমাদের কথা যে সত্য, তা প্রমাণ করার জন্য কাজে লেগে যাও। যুবকগণের কাছে এখন এই আহ্বান এসেছে, 'কাজ কর, ঝাঁপিয়ে পড়, ত্যাগী হয়ে জগৎকে উদ্ধার কর!'

এস, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর। যদি কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করতে পারো, তোমাকে বাক্যব্যয় করতে হবে না, তোমার হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হবে, তোমার ভাব চারদিকে বিস্তৃত হবে। যে তোমার কাছে আসবে, তাকেই তোমার ধর্মভাব স্পর্শ করবে।

জগতের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষণা : মতামত, সম্প্রদায়, গির্জা বা মন্দিরের অপেক্ষা রেখো না। প্রত্যেক মানুষের ভেতরে যে সারবস্তু অর্থাৎ ধর্ম রয়েছে, তাঁর তুলনায় ওগুলি তুচ্ছ ; আর যতই এই ভাব মানুষের মধ্যে বিকাশিত হয়, ততই তার ভেতর জগতের কল্যাণ করবার শক্তি এসে থাকে। প্রথমে এই ধর্মভাব উপার্জন কর। ...যাঁরা নিজেরা ধর্ম লাভ করেছেন, কেবল

তাঁরাই অপরের ভেতর ধর্মভাব সঞ্চার করতে পারেন। যাঁরা শক্তি অর্জন করেছেন, তাঁরাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আচার্য হতে পারেন—তাঁরাই কেবল জগতে জ্ঞানের সঞ্চার করতে পারেন।[৫৭]

যতদিন আমি এই পৃথিবীতে আছি, ততদিন তিনি আমার মধ্যে কাজ করবেন।[৫৮]

অন্যেরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসেন। কিন্তু তাঁদের ধারণাও নেই যে, তাঁরা আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই জন্য ভালবাসেন। তাঁকে বাদ দিলে আমি কতকগুলো অর্থহীন স্বার্থপূর্ণ ভাবুকতার বোঝা মাত্র।[৫৯]

আদি মঠ বরানগর এবং আমার পরিব্রাজক জীবন

অবশেষে একদিন আমার গুরুদেবের প্রয়াণকাল উপস্থিত হল। সকলে মিলে যথাসাধ্য তাঁর সেবা করলাম। আমাদের বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেউ ছিল না এই সব অদ্ভুত চিন্তায় বিশ্বাসী তরুণদের কথা কেই বা শুনবে? তখনকার ভারতবর্ষে তরুণেরা কিছুই নয়। একবার ভেবে দেখুন, মানুষের কাছে বারোটি বালক বড় বড় আদর্শের কথা বলছে, সেই আদর্শ তারা জীবনে পরিণত করতে দৃঢ়সংকল্প। সবাই তখন হাসত। হাসি—ক্রমে গুরুতর বিষয়ে পরিণত হল। রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ হল। ঠাট্টা-বিদ্রূপ যতই প্রবল হয়ে উঠল, আমরা ততই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠতে লাগলাম।[১]

ঠাকুর বলতেন, 'সকাল-সন্ধ্যায় মন খুব সত্ত্বভাবাপন্ন থাকে, তখনই একমনে ধ্যান করতে হয়।'

ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরানগরের মঠে কত যে জপ ধ্যান করতুম। ভোর তিনটার সময় সব জেগে উঠতুম। শৌচান্তে কেউ চান ক'রে, কেউ না ক'রে ঠাকুরঘরে গিয়ে ব'সে জপধ্যানে ডুবে যেতুম। তখন আমাদের ভেতর কি বৈরাগ্যের ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নেই, তার হুঁশই ছিল না। শশী* চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই থাকত। সে বাড়ির গিন্নীর মতো

---

* স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

ছিল। ভিক্ষা করে সে ঠাকুরের ভোগরাগের ও আমাদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর যোগাড় ক'রত। এমন দিনও গেছে, যখন সকাল থেকে বেলা ৪।৫টা পর্যন্ত জপ-ধ্যান চলেছে। শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ ব'সে থেকে শেষে কোনরূপে টেনে-হিঁচড়ে আমাদের জপধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা! শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি!

আমরা তো সাধু-সন্ন্যাসী লোক। ভিক্ষাশিক্ষা ক'রে যা আসত, তাতেই সব চ'লে যেত। এখন সুরেশবাবু* বলরামবাবু† নেই ; তাঁরা দু-জনে থাকলে এই মঠ দেখে কত আনন্দ করতেন! সুরেশবাবু এই মঠের একরকম প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বরানগরের মঠের সব খরচপত্র বহন করতেন। ঐ সুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্য তখন বেশী ভাবত। তার ভক্তিবিশ্বাসের তুলনা হয় না।

খরচপত্রের অনটনের জন্য কখন কখন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি করতুম। শশীকে কিন্তু কিছুতেই ঐ বিষয়ে রাজী করাতে পারতুম না। শশী আমাদের মধ্যে সেন্ট্রাল ফিগার। এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে, কিছুই নেই। ভিক্ষা ক'রে চাল আনা হ'ল তো নুন নেই। এক একদিন শুধু নুন-ভাত চলেছে, তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই ; জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাসছি। তেলাকুচোপাতা সেদ্ধ, নুন-ভাত—এই মাসাবধি চলেছে!

আহা, সে-সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত—মানুষের কথা কি! এ কথাটা কিন্তু ধ্রুব সত্য যে, কারও ভেতরে যদি বস্তু থাকে তো যত অবস্থা প্রতিকূল হবে, তত ভেতরের শক্তির উন্মেষ হবে। তবে এখন যে মঠে খাট-বিছানা, খাওয়া-দাওয়ার সচ্ছল বন্দোবস্ত করেছি তার কারণ— আমরা যতটা সইতে পেরেছি, তত কি আর এখন যারা সন্ন্যাসী হ'তে আসছে তারা পারবে? আমরা ঠাকুরের জীবন দেখেছি, তাই দুঃখ-কষ্ট বড় একটা গ্রাহ্যের ভেতর আনতুম না। এখনকার ছেলেরা তত কঠোর করতে পারবে না। তাই একটু থাকবার জায়গা ও একমুঠো অন্নের বন্দোবস্ত করা। মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলে ছেলেগুলো সাধন-ভজনে মন দেবে এবং জীবহিতকল্পে জীবনপাত করতে শিখবে।

প্রশ্ন : মঠের এ-সব খাটবিছানা দেখে বাইরের লোক কত কি বলে!

—বলতে দে না। ঠাট্টা করেও তো এখানকার কথা একবার মনে আনবে।

---

* শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে কখন 'সুরেন্দর' ও কখন 'সুরেশ' বলে ডাকতেন। ঠাকুরের অন্যতম রসদদার।

† শ্রীযুক্ত বলরাম বসু– শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত ও সেবক।

শত্রুভাবে শীগগীর মুক্তি হয়।[২]

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর সকলে আমাদের ত্যাগ ক'রে দিলে— হাবাতে গরীব ছোঁড়াগুলো মনে ক'রে। কেবল বলরাম, সুরেশ, মাষ্টার ও চুনীবাবু এরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু। অতএব এদের ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করতে পারব না।[৩]

তারপর এল দারুণ দুঃসময়—আমার পক্ষে এবং অন্যান্য ভাইদের পক্ষেও। আমার পক্ষে সে কি নিদারুণ দুর্ভাগ্য একদিকে মা ও ভায়েরা। বাবার মৃত্যুতে আমরা তখন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছি। বেশির ভাগ দিন না খেয়ে থাকতে হত। পরিবারের একমাত্র আমিই আশা-ভরসা— সাহায্য করবার উপযুক্ত ছিলাম। আমার সামনে তখন দুটি জগৎ। একদিকে মা ও ভাইদের না খেয়ে মরতে দেখতে হবে; অপরদিকে বিশ্বাস করতাম যে, গুরুদেবের (শ্রীরামকৃষ্ণের) ভাবধারা ভারতের তথা জগতের পক্ষে কল্যাণকর, সুতরাং এই আদর্শ জগতে প্রচার করে কার্যে পরিণত করতেই হবে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই দ্বন্দ্ব চলল। কখন কখন পাঁচ ছয় দিন ধরে অবিরত প্রার্থনা করতাম। সে কি হৃদয়-বেদনা! আমি তখন দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম! তরুণ হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ আত্মীয়দের দিকে টানছে—অতি প্রিয়জনদের দুরবস্থা সহ্য করতে পারছি না। সহানুভূতি জানাবার একটি লোকও নেই। বালকের কল্পনার প্রতি কে সহানুভূতি দেখাবে? যে-কল্পনার জন্য এত কষ্ট পেতে হয় সেই কল্পনার প্রতি কেই বা সহানুভূতি জানাবে? একজন (শ্রীমা সারদা দেবী) ছাড়া কেউই সহানুভূতি জানাল না।

একজনের সহানুভূতিই আশা ও আশীর্বাদ বহন করে আনল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী। তিনি ঐ বালকদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন; যদিও কিন্তু তাঁর কোন আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। আমাদের অপেক্ষা তিনি দরিদ্র ছিলেন।

যাই হোক আমরা সংগ্রামে ঝাঁপ দিলাম। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম যে, এই ভাবধারা একদিন সমগ্র ভারতবর্ষকে যুক্তিপরায়ণ করে তুলবে এবং নানাদেশ ও নানা জাতির কল্যাণসাধন করবে। এই বিশ্বাস থেকে স্থির বিশ্বাস জন্মাল যে, এই স্বপ্ন নষ্ট হওয়া অপেক্ষা কয়েকজন লোকের দুঃখ-বরণ করা ভালো। একজন মা ও দুটি ভাই যদি মরে, কি আসে যায়?

এও তো ত্যাগ। ত্যাগ করো—ত্যাগ ছাড়া কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না। বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বার করতে হবে এবং সেই রক্তসিক্ত হৃদয় বেদীমূলে

উৎসর্গ দিতে হবে। তবেই তো মহৎ কার্য সাধিত হতে পারে। অন্য কোন পথ আছে কি? কেউ সেই পথ আবিষ্কার করতে পারেনি। আপনাদের মধ্যে যে-কেউ কোন মহৎ কার্য সাধন করেছেন, তাঁকেই ভেবে দেখতে বলি। সে কী বিরাট মূল্য! সে কী বেদনা! কী নিদারুণ যন্ত্রণা! প্রতিটি জীবনে প্রতিটি সফলতার পিছনে কী ভয়ানক দুঃখভোগ!

এইভাবেই আমাদের সেই তরুণ দলটির দিন কাটতে লাগল। চারপাশের সবার কাছে অপমান ও লাঞ্ছনাই পেলাম! দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে অন্ন সংগ্রহ করতে হত। এখানে ওখানে দু-এক টুকরা রুটি মিলত। একটি অতি পুরাতন ভগ্নপ্রায় বাড়ি বাসস্থান হিসাবে জুটলো। তার তলায় গোখুরা সাপগুলি ফোঁস ফোঁস করত। অল্প ভাড়ায় বাড়ি পাওয়ায় আমরা সেই গৃহে গিয়ে বাস করতে লাগলাম।

এইভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হল। ইতিমধ্যে ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করলাম। উদ্দেশ্য— ক্রমশঃ এই ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা। দশ বছর কেটে গেল— কোন আলোকরেখা দেখতে পেলাম না! বারবার হতাশা আসল ; কিন্তু একটা জিনিস আমাদের সর্বদা আশান্বিত রেখেছিল--সেটি পরস্পরের প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস ও গভীর ভালবাসা। প্রায় একশ নরনারী আমার চারপাশে রয়েছে ; কাল যদি আমি সাক্ষাৎ শয়তান হয়ে যাই, তবু তারা বলবে, 'আমরা এখনও আছি! আমরা তোমাকে কখনই ত্যাগ করব না!' এই ভালবাসাই আমার পরম আশীর্বাদ।

সুখে দুঃখে, দুর্ভিক্ষে যাতনায়, শ্মশানে, স্বর্গে বা নরকে যে আমাকে কখনই ত্যাগ করে না, সেইতো বন্ধু। এ বন্ধুত্ব কি তামাসা? এমন বন্ধুত্বের শক্তিতে মোক্ষ-লাভও সম্ভব। আমরা সবাই যদি এমনভাবে ভালবাসতে পারি, তবে এই ভালবাসাই আমাদের মুক্তি এনে দেবে। এই বিশ্বস্ততার মধ্যেই একাগ্রতার নির্যাস নিহিত। যদি কারুর সেই বিশ্বাস, সেই শক্তি, সেই ভালবাসা থাকে, তবে জগতে তার কোন দেবার্চনার প্রয়োজন নেই। দুঃখের সেই দিনে এই ভালবাসাই আমাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল। সেই ভালবাসাই আমাদের হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা এবং সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত পরিচালিত করেছিল।

তরুণদলটি এইভাবে সমগ্র ভারতে পরিভ্রমণ করতে লাগল। ধীরে ধীরে আমরা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলাম। শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধাচরণ পেলাম, সাহায্য এলো অতি অল্পক্ষেত্রে। কারণ একটা দোষ আমাদের ছিল— আমরা ছিলাম দুঃখদারিদ্র্যে রুক্ষচিত্ত। জীবনে যাকে নিজের

পথ নিজেই করে নিতে হয়, সে একটু রুক্ষ হয় ; শান্ত কোমল ও ভদ্র হবার, 'ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়া' ইত্যাদি বলবার মতো পর্যাপ্ত সময় তার থাকে না। সকলের জীবনেই ওটা লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের মানুষ যেন অযত্নরক্ষিত অমসৃণ হীরকখণ্ড।

আমরা ঠিক সেইরকম ছিলাম। 'কোন আপস চলবে না'— এই ছিল আমাদের মূলমন্ত্র। 'এটাই আদর্শ এবং এ আদর্শ কাজে পরিণত করতে হবে জীবন দিয়ে। রাজার কাছে যেমন এ আদর্শ প্রচার করব, চাষার কাছেও তেমনি এ আদর্শ তুলে ধরব।' স্বভাবতই আমরা বিরোধিতার সম্মুখীন হলাম।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটাই জীবনের অভিজ্ঞতা ; যদি কেউ যথার্থই পরের মঙ্গল কামনা করে, বিশ্বজগৎ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও কিছুই করতে পারবে না। আপনার শক্তির কাছে তারা পরাস্ত হবেই। যদি কেউ আন্তরিক ও প্রকৃতই নিঃস্বার্থ হয়, স্বয়ং ঈশ্বরের সমস্ত শক্তি তার মধ্যে জাগ্রত থেকে সমস্ত বাধা-বিপত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। সেই বালকের দলটি এমনি ছিল। তারা ছিল শিশুর মতো প্রকৃতি-রাজ্যের সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পবিত্র প্রাণ।

গুরুদেব বলতেন, 'ভগবানের বেদীমূলে আমি অনাঘ্রাত পুষ্প ও অস্পৃষ্ট ফলই নিবেদন করতে চাই।' মহাপুরুষের সেই বাণী আমাদের সঞ্জীবিত করত। বলতে গেলে কলকাতার পথে তিনি যে-সব বালককে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তাদের ভবিষ্যৎ তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন। 'এই ছেলেটি বা ঐ ছেলেটি ভবিষ্যতে কী হয়, দেখো'— তাঁর এই ধরনের কথা শুনে লোকে ঠাট্টা করত। অবিচলিত বিশ্বাসে তিনি বলতেন, 'মা আমাকে এটা দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি নিজে দুর্বল হতে পারি, কিন্তু মা যখন এরকম বলেছেন, তখন তাঁর ভুল হওয়া কখনও সম্ভব নয়। এইরকম হবেই।'

দশটি বৎসর কোন আশার আলো ছাড়াই কেটে গেল। ইতিমধ্যে আমার শরীর ভেঙ্গে পড়তে লাগল। কখন রাত্রি নয়টায় একবেলা আহার, কখন ভোরে আটটায় একবেলা আহার, তাও আবার তিনদিন পরে— এবং সর্বদাই অতি সামান্য কদর্য অন্ন। পরিণামে শরীরের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ভিখারীকে কেই বা ভালো খাবার দেয়? আবার ভালো জিনিস দেবার সামর্থ্যও ভারতবাসীর নেই। শুধু একবেলা আহারের জন্য বেশির ভাগ সময় পায়ে হেঁটে, তুষারশৃঙ্গ চড়াই করে, কখন দশ মাইল পথ দুর্গম পর্বত চড়াই করে চলেছি।

ভারতবর্ষে রুটিতে খামির দেয় না। কখন কখন এই খামির না-দেওয়া রুটি বিশ-ত্রিশদিন ধরে সঞ্চিত রাখা হয়, তখন সেটা ইটের চেয়েও শক্ত

হয়ে যায়। ভিখারীকে সেই রুটির অংশ দেওয়া হয়। একবেলা আহারের বন্দোবস্ত করবার জন্য আমাকে দ্বারে দ্বারে ফিরতে হত। তদুপরি এই ইটের মতো শক্ত রুটি চিবাতে গিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত পড়ত। এই রুটি চিবাতে সত্যসত্যই দাঁত ভাঙে। নদী থেকে জল এনে একটি পাত্রে ঐ রুটি ভিজিয়ে রাখতাম। মাসের পর মাস ঐভাবে থাকতে হয়েছে— ফলে শরীর অবশ্যই খারাপ হচ্ছিল।[৪]

যার ঐরকম রোক আছে, তার সব হয়ে যায়, তবে কারো কারো বা একটু দেরিতে— এই যা তফাত। কিন্তু হবেই হবে। আমাদের ওরকম জিদ ছিল, তাই একটু-আধটু যা হয় হয়েছে। নতুবা কি সব দুঃখের দিনই না আমাদের গেছে! এক সময়ে না খেতে পেয়ে রাস্তার ধারে একটা বাড়ির দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, মাথার ওপর দিয়ে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তবে হুঁশ হয়েছিল! অন্য এক সময়ে সারাদিন না খেয়ে কলকাতায় একাজ সেকাজ ক'রে বেড়িয়ে রাত্রি ১০।১১ সময় মঠে গিয়ে তবে খেতে পেয়েছি— এমন এক দিন নয়![৫]

আমাদের ঠাকুর ওস্তাদ মালী ছিলেন। তাই হরেক রকম ফুল দিয়ে এই সংঘরূপ তোড়াটি বানিয়ে গেছেন। যেখানকার যেটি ভাল, সব এতে এসে পড়েছে—কালে আরও কত আসবে। ঠাকুর বলতেন, 'যে একদিনের জন্যও অকপট মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে, তাকে এখানে আসতেই হবে।' যারা সব এখানে রয়েছে, তারা এক একজন মহাসিংহ ; আমার কাছে কুঁচকে থাকে ব'লে এদের সামান্য মানুষ ব'লে মনে করিসনি। এরাই আবার যখন বা'র হবে, তখন এদের দেখে লোকের চৈতন্য হবে। অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরের অংশ ব'লে এদের দেখে লোকের চৈতন্য হবে। অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরের অংশ ব'লে এদের জানবি। আমি এদের ঐ-ভাবে দেখি। ঐ যে রাখাল* রয়েছে, ওর মতো স্পিরিচুয়ালিটি (ধর্মভাব) আমারও নেই। ঠাকুর ছেলে ব'লে ওকে কোলে করতেন, খাওয়াতেন, একত্র শয়ন করতেন। ও আমাদের মঠের শোভা, আমাদের রাজা। ঐ বাবুরাম, হরি, সারদা, গঙ্গাধর, শরৎ, শশী, সুবোধ† প্রভৃতির মতো ঈশ্বরবিশ্বাসী দুনিয়া ঘুরে দেখতে পাবি কি না সন্দেহ। এরা

---

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

† বাবুরাম—স্বামী প্রেমানন্দ, হরি—স্বামী তুরীয়ানন্দ, সারদা—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, গঙ্গাধর—স্বামী অখণ্ডানন্দ, শরৎ—স্বামী সারদানন্দ, শশী—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, সুবোধ—স্বামী সুবোধানন্দ।

প্রত্যেকে ধর্মশক্তির এক একটা কেন্দ্রের মতো। কালে ওদেরও সব শক্তির বিকাশ হবে।[৬]

একদল লোক সৃষ্টি করা, যারা মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য স্নেহ-ভালবাসার সূত্রে আবদ্ধ থাকবে— এটা কি বিস্ময়কর নয়?[৭]

ভগবান ঈশার শিষ্যেরা সকলেই সন্ন্যাসী। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত সঙ্গীরা সকলেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই গুরুপরম্পরাক্রমে জগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার ক'রে আসছেন। কোথায় কবে শুনেছিস— কামকাঞ্চনের দাস হয়ে থেকে মানুষ মানুষকে উদ্ধার করতে বা ঈশ্বরলাভের পথ দেখিয়ে দিতে পেরেছে? আপনি মুক্ত না হ'লে অপরকে কি ক'রে মুক্ত করবে? বেদ-বেদান্ত ইতিহাস-পুরাণ সর্বত্র দেখতে পাবি—সন্ন্যাসীরাই সর্বকালে সর্বদেশে লোকগুরুরূপে ধর্মের উপদেষ্টা হয়েছেন। 'হিসট্রি রিপিট্স ইটসেলফ'—যথা পূর্বং তথা পরম্—এবারও তাই হবে। মহাসমন্বয়াচার্য ঠাকুরের কৃতী সন্ন্যাসী সন্তানগণই লোকগুরুরূপে জগতের সর্বত্র পূজিত হচ্ছে ও হবে।[৮]

আমাদের ঠাকুরের চালচলন ভাব—সবই নূতন ধরনের ছিল, তাই আমরাও সব নূতন রকমের ; কখন সেজে-গুজে বক্তৃতা দিই, আবার কখন 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' ব'লে ছাই মেখে পাহাড়-জঙ্গলে ঘোর তপস্যায় মন দিই।[৯]

নিউ ইয়র্ক, ৯ই আগস্ট, ১৮৯৫

প্রিয় স্টার্ডি, আমার নিজের জীবনের একটু অভিজ্ঞতা জানাচ্ছি। যখন আমার গুরুদেব দেহত্যাগ করলেন, তখন আমরা বারজন অজ্ঞাত অখ্যাত কপর্দকহীন যুবক মাত্র ছিলাম। আর বহু শক্তিশালী সঙ্ঘ আমাদের পিষে ফেলবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে আমরা এক অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হই, কেবল বাক্-সর্বস্ব না হয়ে যথার্থ জীবনযাপনের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বিরামহীন সাধনার অনুপ্রেরণা তাঁর কাছে আমরা লাভ করেছিলাম। আর আজ সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁকে জানে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর পায়ে মাথা নত করে। তাঁর প্রচারিত সত্যসমূহ আজ দাবানলের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দশ বছর আগে তার জন্মতিথি-উৎসবে এক শত মানুষকে একত্র করতে পারিনি, আর গত বছর পঞ্চাশ হাজার লোক তাঁর জন্মতিথিতে সমবেত হয়েছিল।[১০]

তাঁর ভাব ও উপদেশাবলী প্রচার করবার উপযুক্ত ব্যক্তি তখন অতি অল্পই ছিল। গৃহী ভক্তগণ ছাড়া তাঁর কতকগুলি যুবক শিষ্য ছিল, তারা সংসার ত্যাগ করেছিল এবং তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল। তাদের দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হয় ; কিন্তু তাদের সামনে যে মহান্ জীবনাদর্শ দেখেছিল, তার শক্তিতে তারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। বছরের পর বছর দিব্যজীবনের সংস্পর্শে আসাতে প্রবল উৎসাহাগ্নি তাদের ভিতরও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং তারা কিছুমাত্র বিচলিত হল না। এই যুবকগণ সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের নিয়মাবলী প্রতিপালন করতে লাগল, আর যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই সদ্বংশজাত, তথাপি যে শহরে তারা জন্মেছিল, তারই রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করতে লাগল। প্রথম প্রথম প্রবল বাধা সহ্য করতে হয়েছিল, কিন্তু তারা দৃঢ়ব্রত হয়ে রইল, আর দিনের পর দিন ভারতের সর্বত্র এই মহাপুরুষের উপদেশ প্রচার করতে লাগল— অবশেষে সমগ্র দেশ তাঁর প্রচারিত ভাবসমূহে পূর্ণ হয়ে গেল।[১১]

আমি কোন প্রকার গর্ব করে বলছি না, কিন্তু মনে রাখবেন— আমি আপনাদের সেই মুষ্টিমেয় যুবকদের কথা বলছি। আজ ভারতবর্ষে এমন একটি গ্রাম নেই, এমন নরনারী নেই, যারা তাদের কাজ জানে না এবং তাদের আন্তরিক আশীর্বাদ করে না। এমন একটি দুর্ভিক্ষ নেই, যেখানে এই যুবকদল ঝাঁপিয়ে পড়ে যতগুলি মানুষকে পারে বাঁচাবার চেষ্টা করে না।[১২]

এই বিশ্বাস আমি দৃঢ়ভাবে পোষণ করে আসছি এবং এখনও করি যে, যদি আমি সংসার ত্যাগ না করতাম, তবে আমার গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করতে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা প্রকাশিত হতে পারত না। আর তা ছাড়া যে-সব যুবক বর্তমান যুগের বিলাসিতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার তরঙ্গাভিঘাত প্রতিহত করবার জন্য সুদৃঢ় পাষাণভিত্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে—তাদেরই বা কী অবস্থা হত?

এরা ভারতের, বিশেষ করে বাংলার অশেষ কল্যাণসাধন করেছে। আর এই তো সবে আরম্ভ। প্রভুর কৃপায় এরা এমন কাজ করে যাবে, যার জন্য সমস্ত জগৎ যুগের পর যুগ এদের আশীর্বাদ করবে। সুতরাং একদিকে ভারতের ও বিশ্বের ভাবী ধর্মসম্বন্ধীয় আমার পরিকল্পনা, এবং যে উপেক্ষিত লক্ষ লক্ষ নরনারী দিন দিন দুঃখের তমোময় গহ্বরে ধীরে ধীরে ডুবছে, যাদের সাহায্য করবার কিংবা যাদের বিষয় চিন্তা করবারও কেউ নেই, তাদের জন্য আমার সহানুভূতি ও ভালবাসা। আর অন্যদিকে আমার যত নিকট আত্মীয়স্বজন

আছেন, তাঁদের দুঃখ ও দুর্গতির হেতু হওয়া— এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটিকেই আমি ব্রতরূপে গ্রহণ করেছি। বাকি যা কিছু তা প্রভুই সম্পন্ন করবেন।

তিনি যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি যতক্ষণ খাঁটি আছি, ততক্ষণ কেউই আমাকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে না। কারণ তিনিই আমার সহায়। ভারতের অসংখ্য নরনারী আমাকে বুঝতে পারে না। আর কিভাবেই বা পারবে? বেচারীদের চিন্তাধারা দৈনন্দিন খাওয়া-পরার ধরাবাঁধা নিয়মকানুনের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে না!...

আমার সমাদর হোক আর নাই হোক—আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করতেই জন্মগ্রহণ করেছি। আর শুধু এরাই নয়, ভারতের নগরে নগরে আরও শত শত যুবক আমার সঙ্গে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এরা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে। যারা সর্বাপেক্ষা দীন হীন ও পদদলিত—তাদের দ্বারে দ্বারে এরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করে নিয়ে যাবে— এটাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত। এটি আমি সাধন করব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করব।[১৩]

আমাদের সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজের মতামত বা বিশ্বাস অন্যের উপর চাপাবার কোন অধিকার আমরা রাখি না। আমাদের মধ্যে অনেকে কোনপ্রকার মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী নয়। যে গুরু আপনাদের ইতিহাসে বর্ণিত সমুদয় অবতারপ্রথিত পুরুষগণ অপেক্ষা শত শত গুণে অধিক পবিত্র— সেই প্রকার গুরুকে যদি কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে পূজাই করে, তবে তাতে কী ক্ষতি হতে পারে? যদি খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ কিংবা বুদ্ধকে পূজা করলে কোন ক্ষতি না হয়, তবে যে পুরুষপ্রবর জীবনে চিন্তায় বা কর্মে লেশমাত্র অপবিত্র কিছু করেননি, যাঁর অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত তীক্ষ্ণবুদ্ধি অন্য সব একদেশদর্শী ধর্মগুরু অপেক্ষা ঊর্ধ্বতর স্তরে বিদ্যমান— তাঁকে পূজা করলে কী ক্ষতি হতে পারে?[১৪]

পারিবারিক মামলার বিড়ম্বনা

[১৮৮৭ সালের মার্চ মাসের ৮ তারিখে কলকাতা হাইকোর্টে যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন—ইংরেজ ব্যারিস্টার মিস্টার পিউ জেরা করেন।]

প্রশ্ন : তোমার বয়স কত?

—তেইশ চব্বিশ হবে।

প্রশ্ন : তোমার পেশা কি?

—আমি বেকার। বর্তমানে আমি কিছুই করি না। বি.এ পাশ করে আমি আইন পড়তাম। গত আট মাস আমি কিছুই করছি না। প্রায় বছর দুই আগে ১৮৮৫ সালে আমি মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনে হেডমাস্টারের পদে নিযুক্ত হই। কিন্তু মাস তিনেক শিক্ষকতা করার পর আমি সে কাজ ছেড়ে দিই। তারপর ডঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে ও তাঁর অধীনে একটি কলেজে আমি কিছুদিন অধ্যাপনা করি।

প্রশ্ন: তুমি তোমার পৈতৃক বাড়িতে বহুদিন বাস করতে না এবং এখনও কর না। এ কথা কি ঠিক?

—বাবা মারা যাওয়ার পর আমি মায়ের কাছেই ছিলাম। সব সময়ে যে থাকতাম এমন কথা বলতে পারি না। আমার কাকা তারকনাথের মৃত্যুর সময়েও আমি বাড়িতে ছিলাম। সেই সময় থেকে আমি আমার এক গুরুজনের সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তিনি তখন গুরুতর পীড়িত।

প্রশ্ন: তুমি কি কারও চেলা হয়েছ?

—আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না। আপনার প্রশ্নের তাৎপর্য বোঝা আমার পক্ষে শক্ত। চেলা কাকে বলে তা আমি জানি কিন্তু আপনার ইঙ্গিতটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আমি কখনো কোন ভিক্ষাজীবী সাধুর চেলাগিরি করি নি। তবে আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে জানতাম ও চিনতাম।

প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন, তুমি কি কখনো তার চেলা ছিলে?

—এ প্রশ্ন থেকে আপনি আমাকে কি বোঝাতে চাইছেন? আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি আমি কোনদিন তাঁর চেলা ছিলাম না। এবং জেনে রাখুন তিনিও কোন চেলা পোষেন নি।

প্রশ্ন: ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরকম চাঁদা তোলায় তুমি কখনও যুক্ত ছিলে?

—আপনার প্রশ্নগুলো একেবারেই অবান্তর যা এই চলতি মামলার সঙ্গে কোনভাবেই সম্পর্কিত নয়।

প্রশ্ন: হাঁ কি না একটা কথাই আমি জানতে চাই।

—আমি কখনই রামকৃষ্ণের জন্যে কারও কাছে কোন চাঁদা গ্রহণ করিনি। কোথাও আমি নিজেকে তাঁর চেলা বলেও প্রকাশ করিনি।

[পারিবারিক অশান্তির জন্য কিছুদিন মামার বাড়িতে থাকার পর তারকনাথের মৃত্যুর প্রায় একমাস আগে তিনি ও ভাই বোনেরা মায়ের সঙ্গে ফিরে এসেছিলেন নিজেদের বাড়িতে।]

—আমরা জানতে পেরেছিলাম তিনি আমাদের জমির ওপর একটা ঘর তুলছেন। কবে তিনি সে কাজ শুরু করেছিলেন তা আমি সঠিক বলতে পারব না।

প্রশ্ন: তুমি কোন ডাইরি ব্যবহার কর?

- না। আমি ডাইরি বা অন্য কোনরকম রোজনামচা রাখি না। সব কথা আমার মনে আছে। আমার সামনে পারিবারিক যে সব ঘটনা ঘটেছে সব আমার মনে আছে। মামার বাড়ি থেকে ফিরে আমি তারকবাবুর ব্যাপারে সরাসরি আপত্তি তুলি। তখন বাড়ির সব লোক সেখানে এসে জড় হয়। সেই মুহূর্তে আমার মা ঘটনা-স্থলে হাজির ছিলেন না। সেদিনের সেই গণ্ডগোলের সময়ে যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের সকলের নাম আমি বলতে পারব না। সংখ্যায় তারা কম পক্ষে পঁচিশ জন হবে। প্রথমে বচসা শুরু হয় আমাদের বাড়ির দালানে। এবং তারকবাবুর ঘরের কাছে। অন্যান্য শরিকরা দাঁড়িয়ে দেখছিল।

দ্বিতীয়বার বচসার সময়ে তারকবাবু আমাকে বললেন, তাঁর শত্রুপক্ষ আমাদের ইন্ধন জোগাচ্ছে। আমি তাতে ঘোরতর প্রতিবাদ জানাই। কে বা কারা তাঁর শত্রুপক্ষ সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সেখান থেকে চলে এসে আমি আমার মাকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ জানাই। কারণ, তিনিই আমাকে তারকবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। এই ঘটনার কথা আমি আমাদের অ্যাটর্নিকেও জানিয়েছিলাম।

প্রশ্ন: তারকবাবু তো তখনও ঘর তৈরি করেননি। তুমি কি করে ধরে নিলে তিনি কোন বেআইনি ঘর তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন।

--আমি দেখেছি বিতর্কিত জমির বেশ খানিকটা খোঁড়া হয়েছে। সেই অংশটা একটা ঘরের ভিত্তি ও কাঠামো বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল। মাটি থেকে খানিকটা গাঁথনিও তখন শুরু হয়েছিল। তবে আমাদের আপত্তিতে ঘর তৈরির ব্যাপারটা আর অগ্রসর হতে পারেনি। ঘটনার একমাস পরে

তারকবাবু মারা যান। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে আমার মা পিত্রালয়ে চলে যান। আমিও সে সময়ে কলকাতায় পাকাপাকিভাবে ছিলাম না। ইতিমধ্যে ঘরখানা সম্পূর্ণ হয়েছিল কিনা আমি বলতে পারব না। আমি সে সময়ে বেশির ভাগ রামকৃষ্ণ পরমহংসের রোগশয্যার পাশে কাশিপুর উদ্যানে ছিলাম। তাঁর সেবায় আমি ব্যস্ত ছিলাম। সেই মহান পুরুষকে আমি অতিশয় শ্রদ্ধা করতাম। তারকবাবুর সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর আর সাক্ষাৎ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমি বাড়িতে এসেছিলাম। তখন তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন।

তারকনাথ দত্তর মৃত্যুর সময়ে মা স্বগৃহে ফিরে এসেছিলেন। মায়ের নিজের ঘরটি অক্ষত ছিল। অপর একখানি ঘর তারকনাথ ভেঙে দিয়েছিলেন। আমি ও আমার পরের ভাই অন্য একটি ঘরে থাকতাম।[১৪ক]

কিছু চিঠিপত্র, কিছু কথাবার্তা

বরানগর, ২৫শে মার্চ, ১৮৮৭

অনেক দুঃখকষ্ট পেয়ে, তবে এই অবস্থা হয়েছে।

মানি, দুঃখকষ্ট না পেলে ঈশ্বরের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ হয় না—তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা।[১৫]

বরানগর, ৯ই এপ্রিল, ১৮৮৭

সাধন-টাধন যা আমরা করছি, এ সব তাঁর কথায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রামবাবু এই সাধন নিয়ে খোঁটা দেন। রামবাবু বলেন, 'তাঁকে দর্শন করেছি, আবার সাধন কি?'

আমাদের যে তিনি সাধন করতে বলছেন।

এক একবার খুব অবিশ্বাস আসে। বাবুরামদের* বাড়িতে কিছু নেই বোধ হলো। যেন ঈশ্বর-টিশ্বর কিছুই নেই।[১৬]

কলকাতা, ৭ই মে, ১৮৮৭

আমার কিছু ভাল লাগছে না...প্রায়োপবেশন করবো।

---

* স্বামী প্রেমানন্দ

ভগবান নেই বোধ হচ্ছে! যত প্রার্থনা করছি, একবারও জবাব পাইনি।
কত দেখলাম মন্ত্র সোনার অক্ষরে জ্বল জ্বল করছে।
কত কালীরূপ ; আরও অন্যান্য রূপ দেখলুম! তবু শান্তি হচ্ছে না।[১৩]

হৃষীকেশে আমি অনেক মহাপুরুষ দেখেছি। একজনের কথা আমার মনে আছে। তাঁকে দেখে পাগল বলে বোধ হয়েছিল। তিনি উলঙ্গ হয়ে রাস্তা দিয়ে আসছিলেন, আর কতকগুলো ছেলে তাঁর পিছু পিছু পাথর ছুড়তে ছুড়তে আসছিল। তাঁর মুখ ও ঘাড় থেকে দরদর ক'রে রক্ত পড়ছে, তবুও তিনি হেসে কুটি-কুটি হচ্ছেন।

আমি তাঁকে কাছে এনে ক্ষতগুলি ধুয়ে দিলাম এবং রক্তপাত বন্ধ করবার জন্য নেকড়া পুড়িয়ে সেখানে লাগিয়ে দিলাম। যতক্ষণ আমি এইসব কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তিনি উচ্চ হাস্য করতে করতে ছেলেদের পাথর ছোড়া-ছুড়ি নিয়ে কি অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করছিলেন, তাই আমাকে বলতে লাগলেন। বললেন, 'জগৎপিতা এভাবেই খেলা ক'রে থাকেন।'

এঁদের মধ্যে অনেকে লোকসঙ্গ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য লুকিয়ে থাকেন ; লোকজন তাঁদের কাছে উৎপাতের হেতু মাত্র। একজন তাঁর গুহার চারদিকে মানুষের হাড় ছড়িয়ে রেখেছিলেন এবং রটিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি শবমাংসভোজী। আর একজন পাথর ছুড়তেন। তাঁরা এ-রকম নানা উপায় অবলম্বন করে থাকেন।...

কখনও কখনও তাঁদের হঠাৎ চৈতন্যোদয় হয়। একটা ঘটনা বলছি। এক ছোকরা অভেদানন্দের কাছে উপনিষদ্ পড়তে আসত। একদিন সে জিজ্ঞেস ক'রল, 'মশায়, এ-সব কি বাস্তবিকই সত্য?'

অভেদানন্দ বললেন, 'নিশ্চয়ই! এসব অবস্থা লাভ করা শক্ত হ'তে পারে, কিন্তু এ-সব নিশ্চয়ই সত্য।'

পরদিনই সেই বালক নগ্ন সন্ন্যাসীর বেশে মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে কেদারনাথদর্শনে যাত্রা ক'রল![১৪]

বরানগর, ১৯শে নভেম্বর, ১৮৮৮

এই মঠে সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুল চর্চা হয়ে থাকে। বাংলায় বেদশাস্ত্রের একেবারে অপ্রচার বললেই হয়! এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ। তাঁদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করবার একান্ত অভিলাষ। তাঁদের মত, যা করতে হবে তা সম্পূর্ণ করব। অতএব, পাণিনিকৃত সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ

আয়ত্ত না হলে বৈদিক ভাষার সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, এই বিবেচনায় ওই ব্যাকরণ আবশ্যক।...এ মঠে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির অভাব নেই। গুরুর কৃপায় তাঁরা অল্পদিনেই 'অষ্টাধ্যায়ী' অভ্যাস করে বেদশাস্ত্র বাংলায় পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন—ভরসা করি।[১৯]

বরানগর, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯

এমন সময়ে আপনার (আমাকে) অপার্থিব বারাণসীপুরীতে আবাহনপত্র আসিয়া উপস্থিত। ইহা আমি বিশ্বেশ্বরের বাণী বলিয়া গ্রহণ করলাম।

...কাশীপুরী ও কাশীনাথদর্শনে যাহার মন বিগলিত না হয়, সে নিশ্চিত পাষাণে নির্মিত।...যত শীঘ্র পারি মহাশয়ের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইব! পরে বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা![২০]

আঁটপুর ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯

যে উপদেশামৃত ভবিষ্যতে জগতে শান্তি বর্ষণ করিবে, কোন ব্যক্তিকে যখন তাহার ভিতর সম্পূর্ণ ডুবিয়া থাকিতে দেখি, তখন আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে এবং আমি যে আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া যাই না কেন—তাহা আশ্চর্য![২১]

বাগবাজার, ২১শে মার্চ, ১৮৮৯

শরীর এক্ষণে অত্যন্ত অসুস্থ, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়, কিন্তু প্লীহাদি কোন উপসর্গ নাই—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতেছি। অধুনা কাশী যাইবার সংকল্প একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, পরে শরীর-গতিক দেখিয়া ঈশ্বর যাহা করিবেন, হইবে।[২২]

কলকাতা, ৪ঠা জুলাই, ১৮৮৯

ভগবানের ইচ্ছায় গত ৫। ৭ বৎসর আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, অত্যন্ত কষ্ট। বিশেষ, কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোন উপায় দেখি না। আমার মা এবং দুইটি ভাই কলকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্স্ট আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট।

ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখন কখন উপবাসের দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা—দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল ; হাইকোর্টে

মকদ্দমা করিয়া যদিও পৈতৃক বাটীর অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর।

কখন কখন কলিকাতার নিকটে থাকিলে তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর। এবার তাঁহাদের মকদ্দমা শেষ হইয়াছে।[২৩]

বরানগর, ১৭ই আগস্ট, ১৮৮৯

জাত্যাদি সম্বন্ধে আমার কোনও পক্ষে পক্ষপাতিত্ব নাই। কারণ আমি জানি, উহা সামাজিক নিয়ম—গুণ এবং কর্ম প্রসূত। যিনি নৈষ্কর্ম্য ও নির্গুণত্বকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার জাত্যাদি ভাব মনে আনিলেও সমূহ ক্ষতি। এই সব বিষয়ে গুরুকৃপায় আমার এক প্রকার বুদ্ধি আছে।[২৪]

বাগবাজার, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯

আপনি* যে তর্কযুক্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, তাহা অতি যথার্থ বটে এবং প্রত্যেক জীবনেরই উদ্দেশ্য তাহাই—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ' ইত্যাদি। তবে কি না আমার গুরু মহারাজ যে প্রকার বলিতেন, কলসী পুরিবার সময় ভকভক ধ্বনি করে, পূর্ণ হইলে নিস্তব্ধ হইয়া যায়, আমার পক্ষে সেইরূপ জানিবেন।[২৫]

বৈদ্যনাথ, ২৪ শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯

এ স্থানে কলিকাতার একজন বাবুর বাসায় কয়েক দিবস আছি, কিন্তু কাশীর জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল।

ইচ্ছা আছে, তথায় কিছুদিন থাকিব এবং আমার মন্দ ভাগ্যে বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণা কি করেন, দেখিব। এবার 'শরীরং বা পাতরামি, মন্ত্রং বা সাধয়ামি' প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—কাশীনাথ সহায় হউন।[২৬]

প্রয়াগধাম, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯

দুই-এক দিনের মধ্যে কাশী যাইতেছি।

কিন্তু বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডাইবে? যোগেন্দ্র† নামক আমার একটি গুরুভ্রাতা চিত্রকূট ওঙ্কারনাথাদি দর্শন করিয়া এস্থানে আসিয়া বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন সংবাদ পাই, তাঁহার সেবা করিবার জন্য এস্থানে আসিয়া

---

* শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্র

† স্বামী যোগানন্দ

উপস্থিত হই। আমার গুরুভাই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। এখানের কয়েকটি বাঙালীবাবু অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ও অনুরাগী, তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেছেন...দুই-চারি দিবসের মধ্যে যাহাতে বারাণসীপুরপতির পবিত্র রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারি তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছি...শীঘ্রই আমি কাশী যাইতেছি।...দেখি কাশীনাথ কি করেন।[২৭]

গাজীপুর, ৩০শে জানুয়ারী, ১৮৯০

আমি এক্ষণে গাজীপুরে সতীশবাবুর নিকট রহিয়াছি। যে কয়েকটি স্থান দেখিয়া আসিয়াছি তন্মধ্যে এইটি স্বাস্থ্যকর। বৈদ্যনাথের জল বড় খারাপ, হজম হয় না। এলাহাবাদ অত্যন্ত ঘিঞ্জি—কাশীতে যে কয়েকদিন ছিলাম দিনরাত জ্বর হইয়া থাকিত—এত ম্যালেরিয়া! গাজীপুরের বিশেষতঃ আমি যে স্থানে থাকি, জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। পওহারী বাবার বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি। চারদিকে উঁচু প্রাচীর, ইংরেজী বাংলার মতন, ভিতরে বাগান আছে, বড় বড় ঘর, চিমনি ইত্যাদি। কাহাকেও ঢুকিতে দেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারদেশে আসিয়া ভিতর থেকে কথা কন মাত্র। একদিন যাইয়া বসিয়া বসিয়া হিম খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। রবিবারে কাশী যাইব। ইতিমধ্যে বাবাজীর সহিত দেখা হইল তো হইল—নহিলে এই পর্যন্ত।[২৮]

গাজীপুর, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০

বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বাবাজীর ইচ্ছা—কয়েক দিবস এই স্থানে থাকি, তিনি উপকার করিবেন। অতএব এই মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে দিনকয়েক এ স্থানে থাকিব।...

ইঁহাদের লীলা না দেখিলে শাস্ত্রে বিশ্বাস পুরা হয় না।[২৯]

গাজীপুর, ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০

বাবাজী আচারী বৈষ্ণব ; যোগ, ভক্তি এবং বিনয়ের মূর্তি বললেই হয়। তাঁহার কুটীর চতুর্দিকে প্রাচীর দেওয়া, তাহার মধ্যে কয়েকটি দরজা আছে। এই প্রাচীরের মধ্যে এক অতি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ আছে, তন্মধ্যে ইনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়া থাকেন ; যখন উপরে আসেন তখনই লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কহেন। কি খান, কেহই জানে না, এইজন্যেই পওহারী বাবা বলে। মধ্যে একবার পাঁচ বৎসর—একবারও গর্ত হইতে উঠেন নাই। লোকে জানিয়াছিল যে, শরীর ছাড়িয়াছেন ; কিন্তু আবার উঠিয়াছেন।

এবার কিন্তু দেখা দেন না, তবে দ্বারের আড়াল হইতে কথা কহেন। এমন মিষ্ট কথা আমি কখন শুনি নাই। কোন ডাইরেক্ট প্রশ্নের উত্তর দেন না, বলেন 'দাস ক্যা জানে?' তবে কথা কহিতে কহিতে আগুন বাহির হয়। আমি খুব জিদাজিদি করাতে বলিলেন যে, 'আপনি কিছুদিন এ স্থানে থাকিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।' এ প্রকার কখন কহেন না ; ইহাতেই বুঝিলাম, আমাকে আশ্বাস দিলেন এবং যখনই পীড়াপীড়ি করি, তখনই বলেন, কিছুদিন থাকুন। এই আশায় আছি। ইনি অতি পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু কিছুই প্রকাশ পায় না, আবার কর্মকাণ্ডও করেন—পূর্ণিমা হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত হোম হয়। অতএব ইহার মধ্যে গর্তে যাইবেন না নিশ্চিত।[৩০]

ঠাকুরের শরীর যাবার পর, আমি কিছুদিন গাজীপুরে পাওহারী বাবার সঙ্গ করি। পওহারী বাবার আশ্রমের অনতিদূরে একটা বাগানে ঐ সময় আমি থাকতুম। লোকে সেটাকে ভূতের বাগান ব'লত। কিন্তু আমার তাতে ভয় হ'ত না ; জানিস তো আমি ব্রহ্মদৈত্য, ভূত-ফুতের ভয় বড় রাখিনি।

ঐ বাগানে অনেক নেবুগাছ, বিস্তর ফ'লত। আমার তখন অত্যন্ত পেটের অসুখ, আবার তার ওপর সেখানে রুটি ভিন্ন অন্য কিছু ভিক্ষা মিলত না। কাজেই হজমের জন্য খুব নেবু খেতুম। পওহারী বাবার কাছে যাতায়াত ক'রে তাঁকে খুব ভাল লাগলো। তিনিও আমায় খুব ভালবাসতে লাগলেন।

একদিন মনে হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে এত কাল থেকেও এই রুগ্ন শরীরটাকে দৃঢ় করবার কোন উপায়ই তো পাইনি। পওহারী বাবা শুনেছি, হঠযোগ জানেন। এঁর কাছে হটযোগের ক্রিয়া জেনে নিয়ে, শরীরটাকে দৃঢ় ক'রে নেবার জন্য এখন কিছুদিন সাধন ক'রব। জানিস তো আমার বাঙালের মতো রোক। যা মনে ক'রব, তা করবই। যে দিন দীক্ষা নেবো মনে করেছি, তার আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় শুয়ে ভাবছি, এমন সময় দেখি—ঠাকুর আমার দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে আছেন, যেন বিশেষ দুঃখিত হয়েছেন। তাঁর কাছে মাথা বিকিয়েছি, আবার অপর একজনকে গুরু ক'রব—এই কথা মনে হওয়ায় লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। এইরূপে বোধ হয় দু তিন ঘণ্টা গত হ'ল ; তখন কিন্তু আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না। তারপর হঠাৎ তিনি অন্তর্হিত হলেন।

ঠাকুরকে দেখে মন এক-রকম হয়ে গেল, কাজেই সে দিনের মতো দীক্ষা নেবার সঙ্কল্প স্থগিত রাখতে হ'ল। দু-এক দিন বাদে আবার পাওহারী বাবার

নিকট মন্ত্র নেবার সঙ্কল্প উঠল। সেদিন রাত্রেও আবার ঠাকুরের আবির্ভাব হ'ল—ঠিক আগের দিনের মতো। এইভাবে উপর্যুপরি একুশ দিন ঠাকুরের দর্শন পাবার পর, দীক্ষা নেবার সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ করলুম। মনে হ'ল, যখনই মন্ত্র নেব মনে করছি, তখনই যখন এইরূপ দর্শন হচ্ছে, তখন মন্ত্র নিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হবে না।[৩১]

একসময়ে এক অতিবৃদ্ধ যোগীকে জানতাম, যিনি নিজে একাকী একটা মাটিতে গর্ত করে থাকতেন। রান্না এবং আহার করবার জন্য তাঁর কাছে দু'একটা পাত্র ছিলো। তিনি খুব কম আহার করতেন এবং যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান করতেন। আর প্রায় সর্বক্ষণই ধ্যান করে ব্যয় করতেন।

সব মানুষই তাঁর কাছে সমান ছিল। কাউকে আঘাত দেয়া থেকে বিরত থাকতেন। প্রত্যেক দ্রব্যে, প্রত্যেকে মানুষে, প্রত্যেক পশুতে তিনি আত্মাকে দর্শন করতেন এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক পশুই ছিল "আমার প্রভু"। কোনো পশু বা মানুষকে তিনি অন্য কোনোভাবে সম্বোধন করতেন না। একদিন ওঁর আশ্রমে একটা চোর এসে একটা পাত্র চুরি করল। তাকে দেখে তার পেছনে ছুটতে শুরু করলেন। পশ্চাদ্ধাবনটি খুব লম্বা ছিল। অবশেষে চোরটি ক্লান্ত হ'য়ে থামতে বাধ্য হ'লো ; আর যোগী দৌড়ে তার কাছে গিয়ে তার পদপ্রান্তে পতিত হ'য়ে বললেন, "প্রভু আমার, তুমি আমার কাছে এসে আমাকে মহা সম্মানিত করেছ। অন্য পাত্রটিও গ্রহণ করে আমাকে ধন্য কর। এটাও তোমার।" সেই বৃদ্ধ এখন মৃত। বিশ্বের প্রতি বস্তুর প্রতি তাঁর পূর্ণ প্রেম ছিল। একটি পিঁপড়ের জন্যও তিনি জীবন দিতে পারতেন। অন্য পশুরা এই বৃদ্ধকে তাদের বন্ধু ব'লে জানতো। সাপ আর হিংস্র পশুরাও বশীভূত হ'য়ে তাঁর সঙ্গে নিদ্রা যেত সবাই ওঁকে ভালবাসতো, তারা কখনও ওঁর সামনে ঝগড়া করতো না।[৩২]

জীবনে যে-সব শিক্ষা লাভ করেছি, তার একটি হল, কর্মের উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, উপায়গুলির প্রতিও ততটা দেওয়া উচিত। এই শিক্ষা আমি যাঁর কাছ থেকে লাভ করেছি, তিনি একজন মহাপুরুষ। এই একটি নীতি থেকেই আমি সারাক্ষণ মহৎ শিক্ষা লাভ করে আসছি ; আমার মনে হয়, জীবনের সব সাফল্যের রহস্য সেখানেই—অর্থাৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা, উপায়গুলির প্রতিও ততটা মনোযোগ দাও।[৩৩]

তাঁর আর একটি বিশেষত্ব ছিল যখন যে কাজ করতেন, তা যতই তুচ্ছ হোক—তাতেই সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে যেতেন। শ্রীরামচন্দ্রজীর পূজায় তিনি যেরকম

যত্ন ও মনোযোগ দিতেন, একটি তাম্রকুণ্ড মাজতেও ঠিক তাই। তিনি যে আমাদের কর্মরহস্য সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন, 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি' অর্থাৎ সিদ্ধির উপায়কেও এমনভাবে আদর-যত্ন করতে হবে, যেন ওটাই সিদ্ধি-স্বরূপ—তিনি নিজেই এই আদর্শের শ্রেণী দৃষ্টান্ত ছিলেন।

তাঁর বিনয়ও কোনরূপ কষ্ট যন্ত্রণা বা আত্মগ্লানিপূর্ণ ছিল না। একবার তিনি আমাদের কাছে অতি সুন্দরভাবে একটা ভাব ব্যাখ্যা করেছিলেন : হে রাজা, ভগবান অকিঞ্চনের ধন ; যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে, এমন কি নিজের আত্মাকে পর্যন্ত 'আমার' বলে অধিকার করবার ইচ্ছা ত্যাগ করেছে, তিনি তারই।—এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকেই তাঁর এই বিনয় এসেছিল।

তিনি সাক্ষাৎভাবে উপদেশ দিতে পারতেন না ; কারণ, তা হলে আচার্যের পদ গ্রহণ করতে হয়, নিজেকে অপর অপেক্ষা উচ্চতর আসনে বসাতে হয়। কিন্তু একবার তাঁর হৃদয়-প্রস্রবণ খুলে গেলে তা থেকে অনন্ত জ্ঞানবারি উৎসারিত হত, তবু উত্তরগুলো সর্বদা সোজাসুজি না হয়ে পরোক্ষভাবে হত।

পরলোকগত এই মহাত্মার কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী।[৩৪]

গাজীপুর, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০

মাতাঠাকুরানী* যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন ও আশীর্বাদ করিতে বলিবেন—যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয়, কিংবা এ শরীরে যদি তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয়।[৩৫]

গাজীপুর, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০

হয়তো এই মায়ার প্রপঞ্চ দেখে হাসবেন—কথাও তাই বটে। তবে কি না লোহার শিকল ও সোনার শিকল—সোনার শিকলের অনেক উপকার আছে, তা [সেই উপকার] হয়ে গেলে আপনা-আপনি খসে যাবে। আমার গুরুদেবের পুত্রগণ আমার অতি সেবার পাত্র—এই স্থানেই একটু 'ডিউটি' বোধ আছে।[৩৬]

গাজীপুর, মার্চ, ১৮৯০

আমার 'মটো' এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে বরাহনগরের অনেকে মনে করে যে, গুরুভক্তি লাঘব হইবে। আমি ঐ কথা পাগল এবং গোঁড়ার কথা বলিয়া মনে করি। কারণ, সকল গুরুই

---

* শ্রীমা সারদা দেবী

এক এবং জগদ্গুরুর অংশ ও আভাসস্বরূপ।[৩৭]

গাজীপুর, ৩রা মার্চ, ১৮৯০

কঠোর বৈদান্তিক মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক। উহাই আমার সর্বনাশ করিতেছে। একটুতেই এলাইয়া যাই, কত চেষ্টা করি যে, খালি আপনার ভাবনা ভাবি। কিন্তু বারংবার পরের ভাবনা ভাবিয়া ফেলি। এবার বড় কঠোর হইয়া নিজের চেষ্টার জন্য বাহির হইয়াছিলাম—এলাহাবাদে এক ভ্রাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া অমনি ছুটিতে হইল। আবার এই হৃষীকেশের খবর—মন ছুটিয়াছে।...

কোমরের বেদনা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, বড় যন্ত্রণা হইতেছে। পওহারীজীর সঙ্গে আর দেখা করিতে কয়েক দিন যাইতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার বড় দয়া, প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া খবর নেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম!'—কোথায় আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন! বোধ হয় ইনি এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, কর্ম এবং ব্রত এবং আচার অত্যন্ত এবং বড় গুপ্তভাব।

এস্থানে থাকিয়া আমার ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে সকল (উপসর্গ) সারিয়াছে, কেবল কোমরের বেদনায় অস্থির, দিন রাত কনকন করে এবং জ্বালাতন করিতেছে...

বাবাজীর তিতিক্ষা অদ্ভুত, তাই কিছু ভিক্ষা করিতেছি। কিন্তু উপুড় হস্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ, খালি গ্রহণ! অতএব আমিও প্রস্থান।

...আর কোন মিঞার কাছে যাইব না—
'আপনাতে আপনি থেকো মন,'

এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, বদ্ধ-জীবনের জন্য সে প্রগাঢ় সহানুভূতি—এ জগতে আর নাই। হয়, তিনি অবতার—যেমন তিনি নিজে বলিতেন, অথবা বেদান্তদর্শনে যাহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ 'লোক হিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী' বলা হইয়াছে, নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ, এবং তাঁহার উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত 'মহাপুরুষ-প্রণিধানাদ্বা'।[৩৮]

গাজীপুর, ১৫ই মার্চ, ১৮৯০

আমি কল্য এস্থান হইতে চলিলাম—দেখি অদৃষ্ট কোথায় লইয়া যায়।[৩৯]

গাজীপুর ৩১শে মার্চ, ১৮৯০

আমি কয়েক দিবস এস্থানে ছিলাম না এবং অদ্যই পুনর্বার চলিয়া যাইব। গঙ্গাধর* ভায়াকে এস্থানে আসিতে লিখিয়াছি। যদি আইসেন, তাহা হইলে তৎসহ আপনার সন্নিধানে যাইতেছি। কতকগুলি বিশেষ কারণবশতঃ এস্থানের কিছুদূরে এক গ্রামে গুপ্তভাবে কিছুদিন থাকিব।

তাঁহার পৌছানো সংবাদ পাই নাই। তাঁহারও শরীর ভাল নহে, তজ্জন্য অত্যন্ত চিন্তিত আছি। তাঁহার সহিত আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি, অর্থাৎ আমার সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছি। কি করি, আমি বড়ই দুর্বল, বড়ই মায়াসমাচ্ছন্ন—আশীর্বাদ করুন, যেন কঠিন হইতে পারি।

আমার মানসিক অবস্থা আপনাকে কি বলিব, মনের মধ্যে নরক দিবারাত্রি জ্বলিতেছে—কিছুই হইল না, এ জন্ম বুঝি বিফলে গোলমাল করিয়া গেল; কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বাবাজী মিষ্টি মিষ্টি বুলি বলেন, আর আটকাইয়া রাখেন।

আপনাকে† কি বলিব, আমি আপনার চরণে শত শত অপরাধ করিতেছি—অন্তর্যাতনায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তির কৃত বলিয়া সে সকল মার্জনা করিবেন।

আমার গুরুভ্রাতারা আমাকে অতি নির্দয় ও স্বার্থপর বোধ করিতেছেন। কি করি, মনের মধ্যে কে দেখিবে? আমি দিবারাত্রি কি যাতনা ভুগিতেছি, কে জানিবে?

আমার কোমরের বেদনা সেই প্রকারই আছে।[৪০]

বাগবাজার, ২৬শে মে, ১৮৯০

আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু' করিয়াছি। তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না। সেই মহাপুরুষ যদ্যপি চল্লিশ বৎসর যাবৎ এই কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং পবিত্রতা এবং কঠোরতম সাধন করিয়া ও অলৌকিক জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও বিভূতিমান্ হইয়াও অকৃতকার্য হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের আর কি ভরসা? অতএব তাঁহার বাক্য আপ্তবাক্যের ন্যায় আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর

---

* স্বামী অখণ্ডানন্দ

† শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্র

দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যা হইবার হইবে এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজী আছি।

তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত। অবশ্য কেহ-কেহ এদিক-ওদিক বেড়াইতে গেল, সে আলাদা কথা—কিন্তু সে বেড়ানো মাত্র, তাঁহার মত এই ছিল যে এক পূর্ণ সিদ্ধ—তাঁহার ইতস্ততঃ বিচরণ সাজে। তা যতক্ষণ না হয়, এক জায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত। আপনা-আপনি যখন সকল দেহাদি ভাব চলিয়া যাইবে, তখন যাহার যে প্রকার অবস্থা হইবার হইবে, নতুবা প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ক্রমাগত বিচরণ অনিষ্টজনক।

অতএব উক্ত নির্দেশক্রমে তাঁহার সন্ন্যাসিমণ্ডলী বরাহনগরে একটি পুরাতন জীর্ণ বাটীতে একত্রিত আছেন এবং সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বসু নামক তাঁহার দুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদি নির্বাহ এবং বাটী ভাড়া দিতেন।

ভগবান রামকৃষ্ণের শরীর নানা কারণে (অর্থাৎ খৃষ্টিয়ান রাজার অদ্ভুত আইনের জ্বালায়) অগ্নিসমর্পণ করা হইয়াছিল। এই কার্য যে অতি গর্হিত তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে, উহা গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধ হয় মুক্ত হইব। উক্ত অবশেষ এবং তাঁহার গদির এবং প্রতিকৃতির যথানিয়মে আমাদিগের মঠে প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে এবং আমার এক ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব গুরুভ্রাতা উক্ত কার্যে দিবারাত্র লাগিয়া আছেন। উক্ত পূজাদির ব্যয়ও উক্ত দুই মহাত্মা করিতেন।

যাঁহার জন্মে আমাদের বাঙালীকুল পবিত্র ও বঙ্গভূমি পবিত্র হইয়াছে—যিনি এই পাশ্চাত্য বাক্‌ছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—যিনি সেই জন্যই অধিকাংশ ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী 'ইউনিভার্সিটি মেন' হইতেই সংগ্রহ করেছিলেন, এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধনভূমির সন্নিকটে তাঁহার কোন স্মরণচিহ্ন হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে?

পূর্বোক্ত দুই মহাত্মার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দও তথায় বাস করেন এবং সুরেশবাবু তজ্জন্য ১০০০ টাকা দিয়াছিলেন ; এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি কল্য রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বলরামবাবুর মৃত্যুসংবাদ আপনি পূর্ব হইতেই জানেন।

এখানে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায়,

কিছুই স্থিরতা নাই। (বঙ্গদেশের লোকের কথা অনেক, কাজে এগোয় না, আপনি জানেন)। তাঁহারা সন্ন্যাসী ; তাঁহারা এইক্ষণেই যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত ; কিন্তু তাঁহাদিগের এই দাস মর্মান্তিক বেদনা পাইতেছে এবং ভগবান রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য গঙ্গাতীরে একটু স্থান হইল না, ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

আমার প্রভুর জন্য এবং প্রভুর সন্তানদিগের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। আমার বিবেচনায় যদি এই অতি অকপট, বিদ্বান, সৎকুলোদ্ভূত যুবা সন্ন্যাসিগণ স্থানাভাবে এবং সাহায্যাভাবে রামকৃষ্ণের 'আইডিয়াল' ভাব লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের 'অহো দুর্দৈবম্'।

যদি বলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এ সকল বাসনা কেন?'—আমি বলি, আমি রামকৃষ্ণের দাস, তাঁহার নাম তাঁহার জন্ম-ও সাধন-ভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অণুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ডাকাতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজী।

এই জন্যই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।[৪১]

বাগবাজার, ৬ই জুলাই, ১৮৯০

এবারে আমার গাজীপুর পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না, অথবা কলিকাতা আসিবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কালীর* পীড়ার সংবাদে আমাকে কাশী আসিতে হইল এবং বলরাম বাবুর আকস্মিক মৃত্যু আমায় কলিকাতায় টানিয়া আনিল। সুরেশবাবু ও বলরামবাবু দুইজনেই ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন! গিরিশচন্দ্র ঘোষ মঠের খরচ চালাইতেছেন এবং আপাতত ভালয় ভালয় দিন গুজরান হইয়া যাইতেছে।

আমি শীঘ্রই (অর্থাৎ ভাড়ার টাকাটা যোগাড় হইলেই) আলমোড়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সেখান হইতে গঙ্গাতীরে গাড়োয়ালের কোন এক স্থানে গিয়া দীর্ঘকাল ধ্যানে মগ্ন হইবার ইচ্ছা ; গঙ্গাধর আমার সঙ্গে যাইতেছে। বলিতে কি, আমি শুধু এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাহাকে কাশ্মীর হইতে নামাইয়া আনিয়াছি।...এ পর্যন্ত একমাত্র যে জিনিসটি তোমাদের করা উচিত ছিল, সেইটিই কর নাই, অর্থাৎ কোমর বাঁধো এবং বৈঠ্ যাও।

আমার মতে জ্ঞান জিনিসটা এমন কিছু সহজ জিনিস নয় যে, তাকে 'ওঠ

* স্বামী অভেদানন্দ

ছুঁড়ী, তোর বে' ব'লে জাগিয়ে দিলেই হ'ল। আমার দৃঢ় ধারণা যে, কোন যুগেই মুষ্টিমেয় লোকের অধিক কেহ জ্ঞান লাভ করে না ; এবং সেই হেতু আমাদের ক্রমাগত এ বিষয়ে লাগিয়া পড়িয়া থাকা এবং অগ্রসর হইয়া যাওয়া উচিত ; তাহাতে মৃত্যু হয়, সেও স্বীকার। এই আমার পুরানো চাল, জানই তো। আর আজকালকার সন্ন্যাসীদের মধ্যে জ্ঞানের নামে যে ঠকবাজী চলিতেছে, তাহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে।...

আমার স্বাস্থ্য এখন খুব ভাল, আর গাজীপুর থাকার ফলে যে উন্নতি হইয়াছে তাহা কিছুকাল থাকিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

এক দৌড়ে আমি হিমালয়ে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। এবার আর পওহারী বাবা ইত্যাদি কাহারও কাছে নহে, তাহারা কেবল লোককে নিজ উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। একেবারে উপরে যাইতেছি।[৪২]

পরিব্রাজকের ভারতদর্শন

একদা হিমালয়প্রদেশে ভ্রমণ করছিলাম, আমাদের সামনে ছিল সুদীর্ঘ পথ। কপর্দকহীন সন্ন্যাসী আমরা ; কে আমাদের বহন করে নিয়ে যাবে? সুতরাং সমস্ত পথ আমাদের পায়ে হাঁটতে হবে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন এক বৃদ্ধ সাধু। কয়েকশত মাইল চড়াই উৎরাইয়ের পথ তখনও পড়ে আছে—সেই দিকে চেয়ে বৃদ্ধ সাধু বললেন, 'কিভাবে আমি এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করব? আমি আর হাঁটিতে পারছি না ; আমার বুক ভেঙে যাবে।' আমি তাঁকে বললাম, 'আপনার পায়ের দিকে তাকান।' তিনি তাকালে আমি বলিলাম, 'আপনার পায়ের নীচে যে-পথ পড়ে আছে, তা আপনিই অতিক্রম করে এসেছেন এবং সামনে যে-পথ তাও সেই একই পথ। শীঘ্রই সেই পথও আপনার পায়ের নীচে আসবে।' উচ্চতম বস্তুগুলি তোমাদের পায়ের তলায়, কারণ তোমরা দিব্য নক্ষত্র। এ-সব বস্তুই তোমাদের পায়ের তলায়, ইচ্ছা করলে তোমরা নক্ষত্রগুলি মুঠিতে ধরে গিলে ফেলতে পারো, তোমাদের যথার্থ স্বরূপের এমনই শক্তি! বলীয়ান হও, সমস্ত কুসংস্কারের ঊর্ধ্ব ওঠ এবং মুক্ত হও।[৪৩]

বার বার আমি মৃত্যুর কবলে পড়েছি। কতবার দিনের পর দিন অনাহারে

কাটিয়েছি। কতবার পায়ে নিদারুণ ক্ষত দেখা দিয়েছে, হাঁটতে অক্ষম হয়ে ক্লান্তদেহে বৃক্ষতলে পড়ে, মনে হয়েছে এইখানেই জীবনলীলা শেষ হবে। কথা বলতে পারিনি, চিন্তাশক্তি তখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু অবশেষে ঐ মন্ত্র মনে জেগে উঠেছে : আমার ভয় নেই, মৃত্যু নেই ; আমার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই। আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম। বিশ্বপ্রকৃতির সাধ্য নেই যে, আমাকে ধ্বংস করে। প্রকৃতি আমার দাস। হে পরমাত্মন্, হে পরমেশ্বর, তোমার শক্তি বিস্তার কর। তোমার হৃতরাজ্য পুনরধিকার কর। ওঠ, চলো, থেমো না। এই মন্ত্র ভাবতে ভাবতে আমি নবজীবন লাভ করে জেগে উঠেছি এবং আজ এখানে সশরীরে বর্তমান আছি। সুতরাং যখনই অন্ধকার অসবে, তখনই নিজের স্বরূপ প্রকাশ কোর, দেখবে—সব বিরুদ্ধ শক্তি বিলীন হয়ে যাবে।[৪৪]

এক-সময়ে আমি কাশীতে একটা পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তার এক পাশে ছিল একটা প্রকাণ্ড জলাশয় ও অন্য পাশে একটা উঁচু দেওয়াল। মাটিতে অনেকগুলি বানর ছিল; কাশীর বানরগুলি দীর্ঘকায় এবং অনেক সময় অশিষ্ট। বানরগুলির মাথায় হঠাৎ খেয়াল উঠল যে, তারা আমাকে সেই রাস্তা দিয়ে যেতে দেবে না। তারা ভয়ানক চীৎকার করতে লাগল এবং আমার কাছে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরল। তারা আমার আরও কাছে আসতে থাকায় আমি দৌড়াতে লাগলাম ; কিন্তু যতই দৌড়াই, ততই তারা আরও কাছে এসে আমাকে কামড়াতে লাগল। বানরদের হাত এড়ানো অসম্ভব বোধ হল—এমন সময় হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক আমাকে ডাক দিয়ে বলল, 'বানরগুলির সম্মুখীন হও।' আমি ফিরে যেমন তাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম, অমনি তারা পিছু হটে পালাল। সমগ্র জীবন আমাদের এই শিক্ষা পেতে হবে—যা কিছু ভয়ানক, তার সম্মুখীন হতে হবে, সাহসের সঙ্গে তা রুখতে হবে। দুঃখকষ্টের ভয়ে না পালিয়ে তাদের সম্মুখীন হলেই বানরদলের মত সেগুলি হটে যায়।[৪৫]

এক সময়ে আমি ভারত-মহাসাগরের উপকূল পশ্চিমভারতের মরুখণ্ডে ভ্রমণ করছিলাম। আমি অনেক দিন ধরে পদব্রজে মরুভূমিতে ভ্রমণ করলাম, কিন্তু প্রতিদিন দেখে আশ্চর্য হতাম যে, চতুর্দিকে সুন্দর সুন্দর হ্রদ রয়েছে, তাদের সবগুলির চতুর্দিকে বৃক্ষরাজি বিরাজিত, আর ঐ জলে বৃক্ষসমূহের ছায়া বিপরীতভাবে পড়ে নড়ছে। মনে মনে বলতাম : কি অদ্ভুত দৃশ্য! লোকে একে মরুভূমি বলে। এই-সব অদ্ভুত হ্রদ ও বৃক্ষরাজি দেখতে একমাস ভ্রমণ করলাম।

একদিন অতিশয় তৃষ্ণার্ত হয়ে একটু জল খাবার ইচ্ছা হল, আমি ঐ সুন্দর নির্মল হ্রদসমূহের একটির দিকে এগিয়ে গেলাম। অগ্রসর হবামাত্র হঠাৎ ওটা অদৃশ্য হল। আমার মনে তখন এই জ্ঞানের উদয় হল, যে মরীচিকা সম্বন্ধে সারাজীবন যা বইতে পড়ে এসেছি, এ সেই মরীচিকা। আর সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও হল—সারা মাস ধরে প্রত্যহই আমি মরীচিকাই দেখে আসছি, কিন্তু জানতাম না যে, এটা মরীচিকা।

তার পরদিন আবার চলতে আরম্ভ করলাম। আগেকার মতোই হ্রদ দেখা যেতে লাগল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও হতে লাগল যে, ওটা মরীচিকা—সত্য হ্রদ নয়। এই জগৎ সম্বন্ধেও একই কথা। আমরা প্রতিদিন প্রতিমাস প্রতিবৎসর জগৎ-রূপ মরুভূমিতে ভ্রমণ করছি, কিন্তু মরীচিকাকে মরীচিকা বলে বুঝতে পারছি না। একদিন এই মরীচিকা অদৃশ্য হবে, কিন্তু সে আবার দেখা দেবে। শরীর প্রাক্তন কর্মের অধীন থাকবে, সুতরাং ঐ মরীচিকা ফিরে আসবে। যতদিন আমরা কর্মে আবদ্ধ, ততদিন জগৎ আমাদের সামনে আসবে। নর নারী, পশু উদ্ভিদ, আসক্তি কর্তব্য—সব আসবে, কিন্তু তারা আগেকার মতো আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবে না। নতুন জ্ঞানের প্রভাবে কর্মের শক্তি নষ্ট হবে, তার বিষ দূরীভূত হবে। জগৎ একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে ; কারণ যখনই জগৎ দেখা যাবে, তখনই সত্য ও মরীচিকার প্রভেদজ্ঞানও দেখা দেবে।[৪৬]

ঠিক ঠিক সন্ন্যাস কি সহজে হয়? এমন কঠিন আশ্রম আর নেই। একটু বেচালে পা পড়লে তো একেবারে পাহাড় থেকে খাদে পড়ল—হাত-পা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

একদিন আমি আগ্রা থেকে বৃন্দাবন হেঁটে যাচ্ছি। একটা কানাকড়িও সম্বল নেই। বৃন্দাবনের প্রায় ক্রোশাধিক দূরে আছি, রাস্তার ধারে একজন লোক বসে তামাক খাচ্ছে দেখে বড়ই তামাক খেতে ইচ্ছে হ'ল। লোকটাকে বললুম, 'ওরে ছিলিমেটে দিবি?' সে যেন জড়সড় হয়ে বললে, 'মহারাজ, হাম্ ভাঙ্গি (মেথর) হ্যায়।' সংস্কার কিনা!—শুনেই পেছিয়ে এসে তামাক না খেয়ে পুনরায় পথ চলতে লাগলুম। খানিকটা গিয়েই মনে বিচার এল—তাইতো, সন্ন্যাস নিয়েছি ; জাত কুল মান—সব ছেড়েছি, তবুও লোকটা মেথর বলাতে পেছিয়ে এলুম! তার ছোঁয়া তামাক খেতে পারলুম না! এই ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল।

তখন প্রায় এক পো পথ এসেছি, আবার ফিরে গিয়ে সেই মেথরের কাছে এলুম ; দেখি তখনও লোকটা সেখানে ব'সে আছে। গিয়ে তাড়াতাড়ি বললুম, 'ওরে বাপ, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়।' তার আপত্তি গ্রাহ্য করলুম না। বললুম, ছিলিমে তামাক দিতেই হবে। লোকটা কি করে?—অবশেষে তামাক সেজে দিল। তখন আনন্দে ধূমপান ক'রে বৃন্দাবনে এলুম। সন্ন্যাস নিয়ে জাতিবর্ণের পারে চলে গেছি কি-না পরীক্ষা ক'রে নিজেকে দেখতে হয়। ঠিক ঠিক সন্ন্যাস-ব্রত রক্ষা করা কত কঠিন! কথায় ও কাজে একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই।[৪৭]

প্রত্যেক ধর্মেই তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন আছে। ধর্মের এই-দিকটিতে হিন্দুরা সর্বদা চরম সীমায় গিয়ে থাকেন। এমন অনেকে আছে, যারা সারা জীবন ঊর্ধ্বে হাত তুলে রাখে, যে পর্যন্ত না ওটা শুকিয়ে অবশ হয়ে যায়।...

এক ঊর্ধ্ববাহু পুরুষকে আমি একবার দেখেছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'যখন প্রথম প্রথম এটা অভ্যাস করতেন, তখন কিরকম বোধ করতেন?' তিনি বললেন, 'প্রথম প্রথম ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হত। এত যন্ত্রণা হত যে, নদীতে গিয়ে জলে ডুবে থাকতাম ; তাতে কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রণার কতকটা উপশম হত। একমাস পরে আর বিশেষ কষ্ট ছিল না।' এই রকম অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ হয়ে থাকে।[৪৮]

যখন জয়পুরে ছিলুম, তখন এক মহাবৈয়াকরণের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর কাছে ব্যাকরণ পড়তে ইচ্ছা হ'ল। ব্যাকরণে মহাপণ্ডিত হলেও তাঁর অধ্যাপনার তত ক্ষমতা ছিল না। আমাকে প্রথম সূত্রের ভাষ্য তিন দিন ধরে বোঝালেন, তবুও আমি তার কিছুমাত্র ধারণা করতে পারলুম না।

চার দিনের দিন অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'স্বামীজী! তিন দিনেও আপনাকে প্রথম সূত্রের মর্ম বোঝাতে পারলুম না! আমাদ্বারা আপনার অধ্যাপনায় কোন ফল হবে না বোধ হয়।' ঐ কথা শুনে মনে তীব্র ভর্ৎসনা এল। খুব দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে প্রথম সূত্রের ভাষ্য নিজে নিজে পড়তে লাগলুম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ঐ সূত্রভাষ্যের অর্থ যেন 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হয়ে গেল, তারপর অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য কথায় কথায় বুঝিয়ে বললুম। অধ্যাপক শুনে বললেন, 'আমি তিন দিন বুঝিয়ে যা করতে পারলুম না, আপনি তিন ঘণ্টায় তার এমন চমৎকার ব্যাখ্যা কেমন ক'রে উদ্ধার করলেন?' তারপর প্রতিদিন জোয়ারের জলের মতো অধ্যায়ের পর অধ্যায়

পড়ে যেতে লাগলুম। মনের একাগ্রতা থাকলে সব সিদ্ধ হয়—সুমেরুও চূর্ণ করতে পারা যায়। [৪৯]

মালাবার দেশে মেয়েদের সব বিষয়ে প্রাধান্য। সেখানে সর্বত্রই বিশেষভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার দিকে নজর দেখা যায়, আর বিদ্যাচর্চায় যারপর নাই উৎসাহ। ঐ দেশে দেখেছি—অনেক মেয়ে ভাল সংস্কৃত বলতে পারে, কিন্তু ভারতের অন্যত্র দশ লক্ষের মধ্যে একটি মেয়েও সংস্কৃত বলতে পারে কি না সন্দেহ। [৫০]

আমি একবার হিমালয়ে ভ্রমণ করতে করতে কোন পাহাড়ী গ্রামে এক রাত্রের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলাম। সন্ধ্যার খানিক বাদে ঐ গাঁয়ে মাদলের খুব বাজনা শুনতে পেয়ে বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলুম—গ্রামের কোন লোকের উপর 'দেবতার ভর' হয়েছে। বাড়িওয়ালার আগ্রহাতিশয্যে এবং নিজের 'কিউরিয়সিটি' (কৌতূহল) চরিতার্থ করবার জন্য ব্যাপারখানা দেখতে যাওয়া গেল।

গিয়ে দেখি, বহুলোকের সমাবেশ। লম্বা ঝাঁকড়াচুলো একটা পাহাড়ীকে দেখিয়ে বললে, এরই উপর 'দেবতার ভর' হয়েছে। দেখলুম, তার কাছেই একখানি কুঠার আগুনে পোড়াতে দেওয়া হয়েছে। খানিক বাদে দেখি, অগ্নিবর্ণ কুঠারখানা ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার দেহের স্থানে স্থানে লাগিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হচ্ছে, চুলেও লাগানো হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐ কুঠারস্পর্শে তার কোনও অঙ্গ বা চুল দগ্ধ হচ্ছে না বা তার মুখে কোনও কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে না! দেখে অবাক হয়ে গেলুম।

ইতিমধ্যে গাঁয়ের মোড়ল করজোড় আমার কাছে এসে ব'লল, 'মহারাজ, আপনি দয়া ক'রে এর ভূতাবেশ ছাড়িয়ে দিন।' আমি তো ভেবে অস্থির! কি করি, সকলের অনুরোধে ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার কাছে যেতে হ'ল। গিয়েই কিন্তু আগে কুঠারখানা পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হ'ল। যাই হাত দিয়ে ধরা, হাত পুড়ে গেল। তখন কুঠারটা তবু কালো হয়ে গেছে। হাতের জ্বালায় তো অস্থির। থিওরি-মিওরি তখন সব লোপ পেয়ে গেল। কি করি, জ্বালায় অস্থির হয়েও ঐ লোকটার মাথায় হাত দিয়ে খানিকটা জপ করলুম। আশ্চর্যের বিষয়, ঐরকম করার দশ-বার মিনিটের মধ্যেই লোকটা সুস্থ হয়ে গেল।

তখন গাঁয়ের লোকের আমার উপর ভক্তি দেখে কে! আমায় একটা কেষ্ট-বিষ্টু ঠাওরালে। আমি কিন্তু ব্যাপারখানা কিছু বুঝতে পারলুম না। অগত্যা

বিনা বাক্যব্যয়ে আশ্রয়দাতার সঙ্গে তার কুটীরে ফিরে এলুম। তখন রাত বারোটা হবে। এসে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু হাতের জ্বালায়, আর এই ব্যাপারের কিছুমাত্র রহস্যভেদ করতে পারলুম না ব'লে চিন্তায় ঘুম হ'ল না। জ্বলন্ত কুঠারে মানুষের শরীর দগ্ধ হ'ল না দেখে কেবলই মনে হ'তে লাগল, 'There are more things in heaven and earth...than are dreamt of in your philosophy!'—স্বর্গে ও পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যাপার আছে, দর্শনশাস্ত্রে যা কল্পনা করা যায় না।

ঠাকুর কিন্তু সিদ্ধাই-এর বড় নিন্দা করতেন। বলতেন, 'ঐ-সব শক্তিপ্রকাশের দিকে মন দিলে পরমার্থ-তত্ত্বে পৌঁছানো যায় না।' কিন্তু মানুষের এমনি দুর্বল মন, গৃহস্থের তো কথাই নেই, সাধুদের মধ্যেও চৌদ্দ আনা লোক সিদ্ধাই-এর উপাসক হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে এইরকম বুজরুকি দেখলে লোকে অবাক হয়ে যায়। সিদ্ধাই লাভটা যে খারাপ জিনিস, ধর্মপথের অন্তরায়, এ কথা ঠাকুর কৃপা ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই বুঝতে পেরেছি।[৫২]

মান্দ্রাজে যখন মন্মথবাবুর* বাড়ীতে ছিলুম, তখন একদিন স্বপ্ন দেখলুম, মা মারা গেছেন! মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। তখন মঠেও বড় একটা চিঠিপত্র লিখতুম না—তা বাড়িতে লেখা তো দূরের কথা।

মন্মথবাবুকে স্বপ্নের কথা বলায় তিনি তখনই ঐ বিষয়ের সংবাদের জন্য কলকাতায় 'তার' করলেন। কারণ স্বপ্নটা দেখে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

একদিকে মান্দ্রাজের বন্ধুগণ তখন আমার আমেরিকায় যাবার যোগাড় ক'রে তাড়া লাগাচ্ছিল ; কিন্তু মায়ের শারীরিক কুশল সংবাদটা না পেয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমার ভাব বুঝে মন্মথবাবু বললেন যে, শহরের কিছু দূরে একজন পিশাচসিদ্ধ লোক বাস করে, সে জীবের শুভাশুভ ভূত-ভবিষ্যৎ সব খবর ব'লে দিতে পারে।

মন্মথবাবুর অনুরোধে ও নিজের মানসিক উদ্বেগ দূর করতে তার নিকট যেতে রাজী হলুম। মন্মথবাবু, আমি, আলাসিঙ্গা ও আর একজন খানিকটা রেলে ক'রে, পরে পায়ে হেঁটে সেখানে তো গেলুম। গিয়ে দেখি শ্মশানের

---

* ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মাদ্রাজে একাউন্টেন্ট জেনারেল ছিলেন।

পাশে বিকটাকার, শুটকো ভুষ-কালো একটা লোক বসে আছে। তার অনুচরগণ 'কিড়িং মিড়িং' ক'রে মান্দ্রাজি ভাষায় বুঝিয়ে দিলে, উনিই পিশাচসিদ্ধ পুরুষ। প্রথমটা সে তো আমাদের আমলেই আনলে না। তারপর যখন আমরা ফেরবার উদ্যোগ করছি, তখন আমাদের দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করলে। সঙ্গী আলাসিঙ্গাই দোভাষীর কাজ করছিল ; আমাদের দাঁড়াবার কথা বললে। তারপর একটা পেনসিল দিয়ে লোকটা খানিকক্ষণ ধরে কি আঁক পাড়তে লাগল। পরে দেখলুম, লোকটা 'কনসেনট্রেশন' (মন একাগ্র) ক'রে একেবারে স্থির হয়ে প'ড়ল। তারপর প্রথমে আমার নাম গোত্র চৌদ্দপুরুষের খবর বললে ; আর বললে যে, ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত ফিরছেন। মায়ের মঙ্গল সমাচারও বললেন! ধর্মপ্রচার করতে আমাকে যে বহুদূরে অতি শীঘ্র যেতে হবে, তাও বলে দিলে। এইভাবে মায়ের মঙ্গলসংবাদ পেয়ে ভট্টাচার্যের সঙ্গে শহরে ফিরে এলুম। এসে কলকাতার তারেও মায়ের মঙ্গল সংবাদ পেলুম।

ব্যাটা কিন্তু যা যা বলেছিল, ঠিক তাই তাই হয়ে গেল ; তা সেটা 'কাকতালীয়' হোক, বা যাই হোক।

আমি কি না-দেখে, না-শুনে যা তা কতকগুলো বিশ্বাস করি? এমন ছেলেই নই। মহামায়ার রাজ্যে এসে জগৎ-ভেলকির সঙ্গে সঙ্গে কত কি ভেলকিই না দেখলুম। মায়া—মায়া!![৫২]

একবার একটি লোকের কথা শুনেছিলাম ; মনে মনে কোন প্রশ্ন ভেবে তাঁর কাছে যাওয়ামাত্রই তিনি সেই প্রশ্নর উত্তর দিয়ে দিতেন ; আরও শুনেছিলাম, তিনি ভবিষ্যবাণীও করেন। মনে কৌতূহল জাগল ; তাই কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তাঁকে দেখতে গেলাম। প্রত্যেকেই মনে মনে কোন না কোন প্রশ্ন ঠিক করে রাখলাম এবং পাছে ভুল হয় সেজন্য প্রশ্নগুলি এক এক খণ্ড কাগজে লিখে নিজ নিজ জামার পকেটে রেখে দিলাম।

আমাদের এক একজনের সঙ্গে তাঁর যেমনি দেখা হতে লাগল, অমনি তিনি তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে উত্তর বলে দিতে লাগলেন। পরে একখণ্ড কাগজে কি লিখে কাগজটি ভাঁজ করে আমার হাতে দিলেন, এবং তার অপর পিঠে আমাকে নাম স্বাক্ষর করতে অনুরোধ করে বললেন, 'এটি দেখবেন না, পকেটে রেখে দিন ; যখন বলব, তখন বার করবেন।' আমাদের সকলের সঙ্গেই এই রকম করলেন। তারপর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে ঘটবে, এমন কয়েকটি ঘটনার কথা বললেন।

অবশেষে বললেন, 'আপনাদের যে ভাষায় খুশি, কোন শব্দ বা বাক্য চিন্তা করুন। আমি সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রকাণ্ড বাক্য মনে মনে আওড়ালাম ; সংস্কৃতের বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানতেন না। তিনি বললেন, 'পকেট থেকে কাগজটি বার করুন তো!' দেখি, তাতে সেই সংস্কৃত বাক্যটিই লেখা রয়েছে। একঘণ্টা আগে তিনি এটি লিখেছিলেন, আর নীচে মন্তব্য দিয়েছিলেন, 'যা লিখে রাখলাম, ইনি পরে সেই বাক্যটিই ভাববেন'—ঠিক তাই হল। আমাদের অন্য একজন বন্ধুকেও অনুরূপ একখানি কাগজ দিয়েছিলেন এবং তিনিও তা স্বাক্ষর করে পকেটে রেখেছিলেন। এখন বন্ধুটিকেও একটি বাক্য চিন্তা করতে বললে তিনি কোরানের একাংশ থেকে আরবী ভাষায় একটি বাক্য ভাবলেন। ঐ লোকটিও সে ভাষা জানবার সম্ভাবনা ছিল আরও কম। বন্ধুটি দেখলেন, সেই বাক্যটিই কাগজে লেখা আছে।

সঙ্গীদের মধ্যে আর একজন ছিলেন ডাক্তার। তিনি জার্মান ভাষায় লিখিত কোন ডাক্তারি বই থেকে একটি বাক্য ভাবলেন। তাঁর কাগজে তাই পাওয়া গেল।

সেদিন হয়তো কোনরকমে প্রতারিত হয়েছি ভেবে কিছুদিন পরে আমি আবার সেই লোকটির কাছে গেলাম। সেদিন আমার সঙ্গে নূতন আর একদল বন্ধু ছিলেন। সেদিনও তিনি অদ্ভুত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।[৫৩]

আর একবার—হায়দ্রাবাদ শহরে থাকার সময় শুনলাম যে, সেখানে একজন ব্রাহ্মণ আছেন ; তিনি হরেক রকমের জিনিস বার করে দিতে পারেন। কোথা থেকে যে আসে সেগুলি, কেউই জানে না। তিনি একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। আমি তাঁর কৌশল দেখতে চাইলাম। ঘটনাচক্রে তখন তাঁর জ্বর।

ভারতে একটা সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, কোন সাধু অসুস্থ লোকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তার অসুখ সেরে যায়। ব্রাহ্মণটি সেজন্যে আমার কাছে এসে বললেন, 'মশাই, মাথায় হাত বুলিয়ে আমার জ্বর সারিয়ে দিন।'

আমি বললাম, 'ভাল কথা ; তবে আমাকে আপনার কৌশল দেখাতে হবে।' তিনি রাজী হলেন। তাঁর ইচ্ছামত আমি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম ; তিনিও তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বাইরে আসলেন। তাঁর কটিদেশে জড়ানো একফালি কাপড় ছাড়া আমরা তাঁর দেহ থেকে আর সব পোশাকই খুলে নিলাম। বেশ শীত পড়ে ছিল, সেজন্য আমার কম্বলখানি

তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিলাম ; ঘরের এককোণে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হল, আর পাঁচশ জোড়া চোখ চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

তিনি বললেন, 'যে যা চান, কাগজে তা লিখে ফেলুন।' সে অঞ্চলে কখনও জন্মে না, এমন সব ফলের নাম আমরা লিখলাম—আঙুর, কমলালেবু, এই-সব ফল। লেখার পর কাগজগুলো তাঁকে দিলাম। তারপর কম্বলের ভিতর থেকে আঙুরের থোলো, কমলালেবু ইত্যাদি সবই বার হল। এত ফল জমে গেল যে, ওজন করলে সব মিলিয়ে তাঁর দেহের ওজনের দ্বিগুণ হয়ে যেত। সে-সব ফল আমাদের খেতে বললেন। আমাদের ভিতর কেউ-কেউ আপত্তি জানালেন, ভাবলেন এতে সম্মোহনের ব্যাপার আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ নিজেই খেতে শুরু করলেন দেখে আমরাও সবাই ওগুলো খেলাম। আসল ফলই ছিল সেগুলি।

সব শেষে তিনি একরাশ গোলাপফুল বার করলেন। প্রত্যেকটি ফুলই নিখুঁত—শিশিরবিন্দু পর্যন্ত রয়েছে পাপড়ির উপর ; একটাও থেঁতলানো নয়, একটাও নষ্ট হয় নি। একটা দুটো নয়, রাশি রাশি ফুল! কি করে এটা সম্ভব হল—জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'সবই হাত-সাফাই এর ব্যাপার।'

তা যেভাবেই ঘটুক, এটা বেশ বোঝা গেল যে, শুধু হাত-সাফাই-এর দ্বারা এরকম ঘটানো অসম্ভব। এত বিপুল পরিমাণ জিনিস তিনি আনলেন কোথা থেকে?

যাই হোক, এরকম বহু ঘটনা আমি দেখেছি।...

মানুষের মনের মধ্যেই এই সব অসাধারণ শক্তি নিহিত আছে। [৫৪]

মনোবিজ্ঞানের অতি অল্পই আমি জানি ; কিন্তু যেটুকু জানি, সেটুকু শিখতেই আমাকে জীবনের ত্রিশ বছর ধরে খাটতে হয়েছে, তারপর যেটুকু শিখেছি, ছয় বছর ধরে লোকের কাছে তা বলে বেড়াচ্ছি। এই শিখতেই আমার ত্রিশ বছর লেগেছে—কঠোর পরিশ্রম সহকারে ত্রিশ বছর কাটাতে হয়েছে। কখন কখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়িঘণ্টা খেটেছি, কখন রাত্রে মাত্র একঘণ্টা ঘুমিয়েছি, কখন বা সারারাতই পরিশ্রম করেছি ; কখন কখন এমন সব জায়গায় বাস করেছি, যাকে প্রায় শব্দহীন, বায়ুহীন বলা চলে ; কখন বা গুহায় বাস করতে হয়েছে। কথাগুলি ভেবে দেখ। এ-সব সত্ত্বেও আমি অতি অল্প জানি বা কিছুই জানি না ; আমি যেন এ-বিজ্ঞানের বহির্বাসের স্পর্শ পেয়েছি। কিন্তু আমি ধারণা করতে পারি যে, এ-বিজ্ঞানটি সত্য, সুবিশাল এবং অত্যাশ্চর্য। [৫৫]

প্রথমে কোন একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। এক সময় আমি একটা কালো বিন্দুতে মনঃসংযম করতাম। ঐ পর্বে শেষে আর বিন্দুটাকে দেখতে পেতুম না, বা সামনে যে রয়েছে তা বুঝতে পারতুম না, মন নিরোধ হয়ে যেত, কোন বৃত্তির তরঙ্গ উঠত না—যেন নিবাত সাগর। ঐ অবস্থায় অতীন্দ্রিয় সত্যের কিছু ছায়া দেখতে পেতুম। তাই মনে হয়, যে-কোন সামান্য বিষয় ধরে ধ্যান অভ্যাস করলেও একাগ্র বা ধ্যানস্থ হওয়া যায়। তবে যাতে যার মন বসে, সেটা মেনে নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করলে মন শীঘ্র স্থির হয়ে যায়। তাই এদেশে এত দেবদেবীমূর্তির পূজা।[৫৬]

এমন কয়েক জন মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, যাঁরা আমাকে বলেছেন, পূর্বজন্মের কথা তাঁদের স্মরণ আছে। তাঁরা এমন এক অবস্থা লাভ করেছেন, যাতে তাঁদের পূর্বজন্মের স্মৃতি উদিত হয়েছে।[৫৭]

প্রশ্ন : আপনি কি আপনার পূর্ব জন্মগুলি জানেন?

—হ্যাঁ, পারি।

জানতে পারি—জানি-ও, কিন্তু 'ডিটেলস' ব'লব না।[৫৮]

"আমার ভারত-ভ্রমণকালে একজায়গায় দলে দলে অনেক মানুষ আমার কাছে ভিড় করত ও উপদেশ চাইত।

যদিও বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য, তারা আসত এবং তিন দিন ধরে দিনরাত আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হতাম। তারা আমাকে মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম দিত না। এমন কি, আমি কিছু খেয়েছি কিনা তাও তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। তৃতীয় রাত্রে সকলে চলে গেলে, একটি ছোট জাতের দরিদ্র মানুষ এসে আমাকে বলল, 'স্বামীজী, আমি লক্ষ্য করেছি আজ তিন দিন আপনি কিছু আহার করেন নি, এমন কি, এক গ্লাস জলও খান নি। এতে আমি খুবই কষ্ট বোধ করছি।'

শুনে আমার মনে হলো, স্বয়ং ভগবানই এই দীন লোকটির বেশে আমাকে পরীক্ষা করছেন। আমি তাকে বললাম, 'তুমি আমাকে কিছু খেতে দিতে পার কি।' সে বললে, 'স্বামীজী, দেবার জন্য আমার প্রাণ তো ব্যাকুল। কিন্তু আমার তৈরি চাপাটি আপনি খাবেন কি করে? আমি আটা ডাল, ইত্যাদি এনে দি, আপনি নিজে তৈরি করে খান।'

সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়মানুসারে আমি তখন অগ্নি স্পর্শ করতাম না। তাই আমি তাকে বললাম, 'তোমার হাতের তৈরি চাপাটিই আমাকে দাও, আমি তাই

খাব।' শুনে লোকটি বিষম ভয় পেল। সে ছিল খেতড়ির মহারাজার প্রজা। তাই তার ভয়, মহারাজা যদি শোনেন যে সে মুচি হয়ে একজন সাধুকে তার হাতে তৈরি চাপাটি দিয়েছে, তাহলে তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন এবং হয়তো রাজ্য থেকে নির্বাসিত করবেন।

আমি তাকে বললাম, 'তোমার ভয় নেই, এ জন্যে মহারাজা তোমাকে কোন শাস্তি দেবেন না।' কিন্তু সে এ কথা বিশ্বাস করতে পারল না। তবু অন্তরের দয়ার বশেই সে তার তৈরি চাপাটি আমাকে এনে দিল।

খেয়ে আমার মনে হলো, দেবরাজ ইন্দ্র যদি আমাকে স্বর্ণপাত্রে করে স্বর্গের সুধা এনে দিতেন তাও এত সুস্বাদু লাগত না। লোকটির দয়ার কথা স্মরণ করে চোখে জল এল এবং ভাবলাম, 'দীন কুটিরগুলিতে এইরকম উদার-হৃদয় হাজার হাজার লোক বাস করে, কিন্তু আমরা তাদের নীচ জাতি ও অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করি।' পরে আমি যখন খেতড়ির মহারাজার সঙ্গে সুপরিচিত হলাম, তখন আমি তাকে এই লোকটির এই মহৎ কাজের কথা বলি। দুচার দিনের মধ্যেই মহারাজা লোকটিকে ডাকালেন। খুব বড় রকমের একটা শাস্তির ভয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে মহারাজার কাছে এল। মহারাজা কিন্তু তার কাজের জন্য তাকে প্রশংসা করলেন ও সে যাতে স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিলেন।" [৫৯]

আমার জন্য আপনি ভয় পাবেন না। এটা সত্যি আমাকে প্রায়ই বটগাছের তলায় শুয়ে, কোনও দয়ালু চাষির দেওয়া দু-মুঠো অন্ন খেয়ে দিন কাটাতে হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও একই রকম সত্য যে, এই আমিই আবার কোনও মহারাজার অতিথি হয়ে বিশাল প্রাসাদে দিনের পর দিন বাস করি আর যুবতী দাসী ময়ূর-পাখা দিয়ে আমাকে সারারাত বাতাস করে। আমার জীবনে অনেক প্রলোভন এসেছে। ওতে আমি বিলক্ষণ অভ্যস্ত। আপনি আমাকে নিয়ে বৃথা চিন্তা করবেন না।" [৬০]

ওঃ কি কষ্টের মধ্য দিয়েই না দিন গিয়েছে! একবার উপর্যুপরি তিন দিন খেতে না পেয়ে রাস্তা উপর মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। যখন জ্ঞান হলো, দেখলাম, সর্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে। জলে ভিজে শরীরটা একটু সুস্থ বোধ হয়েছিল। তখন উঠে আস্তে আস্তে আবার পথ হাঁটি ও এক আশ্রমে পৌঁছে কিছু মুখে দিই, তবে প্রাণ বাঁচে। [৬১]

তখন আমি হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করছি। বেশির ভাগ সময় ধ্যান-জপের মধ্যেই ডুবে থাকতাম। খিদে পেলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে যা জোটে তাই দিয়েই উদরপূর্তি করতাম। কিন্তু অধিকাংশ সময় যা পেতাম তাতে পেটও ভরতো না, মনও না। এতটাই নিকৃষ্ট সেগুলির স্বাদ!

একদিন মনে হলো—ধিক্ এ জীবন! এই গরিব পাহাড়ী লোকগুলো নিজেরাই পেট ভরে খেতে পায় না, তাদের ছোটছোট ছেলে-মেয়ে ও পরিবারের মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে পারে না ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের খাবার থেকে বাঁচিয়ে আমার জন্য কিছু না কিছু রেখে দেয়। এভাবে বেঁচে থেকে কি লাভ? এর চেয়ে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করাই ভালো।

যেই একথা মনে হলো, অমনি মাধুকরীতে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। এইভাবে দু-দুটো দিন না খেয়েই কেটে গেল। তেষ্টা পেলে আঁজলা ভরে ঝরনার জল খেতুম। তিনদিনের দিন এক গভীর জঙ্গলে ঢুকে একটা পাথরের ওপর বসে ধ্যান করতে লাগলুম। চোখ খোলাই ছিল। হঠাৎ কেমন যেন গা-টা ছম্ছম্ করে উঠলো। দেখলাম, ডোরাকাটা বিশাল একটা বাঘ আমার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ভাবলুম, যাক বাঁচা গেল! এতদিন পর আমি নিজেও একটু শান্তি পাবো, আর এই বাঘটারও পেট ভরবে। এ তুচ্ছ দেহটা যে একটা জীবের কিছুমাত্র সেবাতেও লাগবে তাতেই আমি ধন্য। চোখ বন্ধ করে বাঘটার ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষা করছি, মনে মনে চিন্তা করছি—কয়েক মুহূর্ত তো কেটে গেল ; কিন্তু কই, এখনো তো বাঘটা আমাকে আক্রমণ করলো না! একটু অবাকই হলাম! তখন চোখ খুলে দেখি বাঘবাবাজী জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। প্রথমটা দুঃখই হলো। কিন্তু তারপরে অত দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল। বুঝলাম—গুরুদেব আমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেবেন ; তাই তিনিই আমাকে রক্ষা করছেন।' [৬২]

কাকড়িঘাট, আলমোড়ার কাছে, আগস্ট, ১৮৯০ (প্রগাঢ় ধ্যানের পর)

এই বৃক্ষতলে একটা মহা শুভমুহূর্ত কেটে গেল ; আজ একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল! বুঝলাম সমষ্টি ও ব্যষ্টি (বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও অণু-ব্রহ্মাণ্ড) একই নিয়মে পরিচালিত।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও অণু-ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মে সংগঠিত। ব্যষ্টি জীবাত্মা যেমন একটি চেতন দেহের দ্বারা আবৃত, বিশ্বাত্মাও তেমনি চেতনাময়ী প্রকৃতির মধ্যে বা দৃশ্য জগতের মধ্যে অবস্থিত। [৬৩]

পশ্চিমে যাবার প্রস্তুতি

হায়দরাবাদ, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩

আমার সব মতলব ফেঁসে চুরমার হয়ে গেল ; আর এই জন্যে আমি গোড়াতেই মান্দ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলাম। সে ক্ষেত্রে আমাকে আমেরিকা পাঠাবার জন্য, আর্যাবর্তের কোন রাজাকে ধরবার যথেষ্ট সময় হাতে পেতাম। কিন্তু হায়, এখন অনেক দেরি হয়ে গেল।

প্রথমতঃ এই গরমে আমি ঘুরে বেড়াতে পারব না—তা করতে গেলে মারা যাব, দ্বিতীয়তঃ আমার রাজপুতানার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ আমাকে পেলে তাঁদের কাছে ধরে রেখে দেবেন, পাশ্চাত্য দেশে যেতে দেবেন না। সুতরাং আমার মতলব ছিল, আমার বন্ধুদের অজ্ঞাতসারে কোন নূতন লোককে ধরা। কিন্তু মান্দ্রাজে এই বিলম্ব হওয়ার দরুন আমার সব আশাভরসা চুরমার হয়ে গেছে ; অতি দুঃখের সঙ্গে আমি ঐ চেষ্টা ছেড়ে দিলাম--ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক।...যাই হোক, 'যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি'। অভিজ্ঞতাই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। [৬৪]

খেতড়ি, মে, ১৮৯৩

আগে থেকেই আমার চিকাগো যাবার অভিলাষ ছিল ; এমন সময় মান্দ্রাজের লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এবং মহীশূর ও রামনাদের মহারাজার সাহায্যে আমাকে পাঠাবার সব রকম আয়োজন ক'রে ফেললো।

খেতড়ির রাজা ও আমার মধ্যে প্রগাঢ় প্রেম বিদ্যমান। তাই কথাচ্ছলে তাঁকে লিখেছিলাম যে, আমি আমেরিকায় চলে যাচ্ছি। এখন খেতড়ির রাজা মনে করলেন যে, যাবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবই ; আরও বিশেষ কারণ এই যে, ভগবান তাঁকে সিংহাসনের একটি উত্তরাধিকারী দিয়েছেন এবং সেজন্য এখানে খুব আমোদ আহ্লাদ চলেছে। অধিকন্তু আমার আসা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্য তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে অত দূর মান্দ্রাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। [৬৫]

বম্বে, ২২শে মে, ১৮৯৩

কয়েকদিন হল বম্বে পৌঁছেছি। আবার দুই চার দিনের মধ্যে এখান থেকে বার হব।'

...খেতড়ির মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ও আমি বর্তমানে একত্র আছি। আমার প্রতি তাঁর ভালবাসা ও সহৃদয়তার জন্য আমি যে কত কৃতজ্ঞ, তা

ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। রাজপুতানার জনসাধারণ যে শ্রেণীর লোককে 'তাজিমি সর্দার' বলে অভিহিত করে থাকে এবং যাঁদের অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং রাজাকেও আসন ত্যাগ করে উঠতে হয়, ইনি সেই সর্দারশ্রেণীর লোক। অথচ ইনি এত অনাড়ম্বর এবং এমনভাবে আমার সেবা করেন যে, আমি সময় সময় অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি।...

এই ব্যবহারিক জগতে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায় যে, যাঁরা খুব সৎলোক তাঁরাও নানা প্রকার দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে পতিত হন। এই রহস্য দুর্জ্ঞেয় হতে পারে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, এ জগতের সব কিছুই মূলতঃ সৎ—উপরের তরঙ্গমালা যে-রূপই হোক, তার অন্তরালে, গভীরতম প্রদেশে প্রেম ও সৌন্দর্যের এক অনন্ত বিস্তৃত স্তর বিরাজিত। যতক্ষণ সেই স্তরে আমরা পৌঁছতে না পারি, ততক্ষণই অশান্তি ; কিন্তু যদি একবার শান্তিমণ্ডলে পৌঁছনো যায়, তবে ঝঞ্ঝার গর্জন ও বায়ুর তর্জন যতই হোক—পাষাণ-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত গৃহ তাতে কিছুমাত্র কম্পিত হয় না।[৬৬]

বম্বে, ২৪শে মে, ১৮৯৩

৩১ তারিখে এখান হইতে আমেরিকায় রওনা হইবার সকল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।...

সর্বদা মনে রাখিবে যে, প্রভুর হস্তে আমরা পুত্তলিকামাত্র। সর্বদা পবিত্র থাকিবে। কায়মনোবাক্যেও যেন অপবিত্র না হও এবং সদা যথাসাধ্য পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। মনে রাখিও, কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করা স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম। নিত্য যথাশক্তি গীতাপাঠ করিও। তুমি ইন্দুমতী 'দাসী' কেন লিখিয়াছ? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 'দেব' ও 'দেবী' লিখিবে, বৈশ্য ও শূদ্রেরা 'দাস' ও 'দাসী' লিখিবে।...

আমেরিকা হইতে সেখানকার আশ্চর্যবিবরণপূর্ণ পত্র আমি মধ্যে মধ্যে লিখিব। খেতড়ি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী আমায় জাহাজে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন।[৬৭]

দেশ আহ্বান ও বিশ্বধর্মসভা

আমি এখন কাশী পরিত্যাগ করছি।

আবার যখন এখানে ফিরব, তখন আমি সমাজের উপর একটা বোমার মতো ফেটে পড়ব, আর সমাজ আমাকে অনুগত কুকুরের মতো অনুসরণ করবে।[১]

আমি এমন এক ধর্ম প্রচার করতে যাচ্ছি, বৌদ্ধধর্ম যার বিদ্রোহী সন্তান, এবং খৃষ্টধর্ম সকল দাবি সত্ত্বেও যার দূরাগত প্রতিধ্বনি মাত্র।[২]

প্রভু আমাকে এই কাজের জন্য ডেকেছেন। সারা জীবন আমার নানা দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে। আমি প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে একরকম অনাহারে মরতে দেখেছি। লোকে আমাকে উপহাস ও অবজ্ঞা করেছে, জুয়াচোর বদমাশ বলেছে।

আমি এ সমস্তই সহ্য করেছি তাদেরই জন্য, যারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করেছে। বৎস! এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু এটি মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। এই দুঃখ হতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলেও একটু কম্পিত হয় না।[৩]

আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না; আমি লাখ নরকে যাব, 'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ' (বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ ক'রে)— এই আমার ধর্ম।[৪]

তাঁর নাম লোকে নেয় বা না নেয়, আমি কোনও খাতিরে আনি না, তবে তাঁর উপদেশ জীবন শিক্ষা যাতে জগতে ছড়ায়, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে প্রস্তুত।[৫]

সত্য বটে, আমার নিজের জীবন এক মহাপুরুষের প্রতি প্রগাঢ় ভাবাবেগের অনুপ্রেরণায় পরিচালিত, কিন্তু তাতে কি? অতীন্দ্রিয় তত্ত্বগুলি শুধু এক ব্যক্তির মধ্য দিয়েই প্রচারিত হয় না!

সত্য বটে, আমি বিশ্বাস করি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন একজন আপ্তপুরুষ—ঐশীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু, আমিও ঐশীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তোমরাও ঐরূপ অনুপ্রাণিত। আর তোমাদের শিষ্যেরাও ঐরূপ হবে, তারপরে তাদের শিষ্যেরাও—এইভাবে অনন্তকাল ধরে চলতে

থাকবে![৬]

কারও কথায় আমি চলব না। আমার জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি, আর কোন জাতিবিশেষের ওপর আমার বিদ্বেষ নেই। আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের। কোন্ দেশের আমার উপর বিশেষ দাবি আছে? আমি জাতিবিশেষের ক্রীতদাস না কি?[৭]

আমার পেছনে এমন একটা শক্তি দেখছি, যা মানুষ, দেবতা বা শয়তানের শক্তির চেয়ে অনেকগুণ বড়।[৮]

আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি। আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে চাই না। আমি কোন প্রকার পলিটিক্‌সে বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর ও সত্যই জগতের একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।[৯]

সত্য আমার ঈশ্বর সমগ্র জগৎ আমার দেশ।[১০]

আমেরিকা আসবার আগে মাকে* আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ্ ক'রে পগার পার।[১১]

আমার মন বলছে, ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এরই (নিজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে) জন্যে। শীঘ্র দিনের মধ্যে তুমি এটা মিলিয়ে দেখে নিতে পারবে।[১২]

আমি শুষ্ক সুকঠিন যুক্তিকে প্রেমের মধুরতম রসে কোমল ক'রে, তীব্র কর্মের মসলাতে সুস্বাদু ক'রে, যোগের পাকশালায় রান্না ক'রে পরিবেশন করতে চাই, যাতে শিশুরা পর্যন্ত তা হজম করতে পারে।[১৩]

হিন্দুভাবগুলি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা, আবার শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ ও অদ্ভুত মনোবিজ্ঞানের মধ্য থেকে এমন ধর্ম বের করা, যা একদিকে সহজ সরল ও সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হবে, আবার অন্যদিকে বড় বড় মনীষিগণের উপযোগী হবে! এ চেষ্টা যারা করেছে, তারাই বলতে পারে কি কঠিন ব্যাপার! সূক্ষ্ম অদ্বৈত তত্ত্বকে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী জীবন্ত ও কবিত্বময় করতে হবে। অসম্ভব জটিল পৌরাণিক তত্ত্বগুলোর মধ্য থেকে জীবন্ত দৃষ্টান্তগুলি বের করতে হবে। আর বিভ্রান্তিকর যোগশাস্ত্রের মধ্য থেকে

---

* শ্রীমা সারদা দেবী

বৈজ্ঞানিক ও কাজে পরিণত করবার উপযোগী মনস্তত্ত্ব খুঁজে বের করতে হবে, এগুলিকে এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে একটা শিশুও বুঝতে পারে। এই আমার জীবনব্রত।[১৪]

তারপর ভাবলাম, ভারতবর্ষে চেষ্টা করেছি, এবার অন্য দেশে দেখা যাক। এমনি সময় ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন হবার কথা ছিল। ভারতবর্ষ থেকে একজনকে ঐ সভায় প্রেরণ করতে হবে। আমি তখন একজন ভবঘুরে। তবু বললাম, 'ভারতবাসী, তোমরা আমাকে প্রেরণ করলে আমি যাব। আমার কোন ক্ষতির ভয় নেই, ক্ষতি যদি হয় তাও গ্রাহ্য করি না।' অর্থ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। অনেকদিনের আপ্রাণ চেষ্টায় শুধু বিদেশে আসবার খরচ যোগাড় হল ; এবং আমি এদেশে আসলাম। ধর্ম-মহাসভার দুই-এক মাস আগে আমি আসলাম এবং পরিচয়হীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম।[১৫]

আমি যে আমেরিকায় গিয়েছিলাম, তা আমার ইচ্ছায় বা তোমাদের ইচ্ছায় হয়নি। কিন্তু ভারতের ঈশ্বর, যিনি এর অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করছেন, তিনিই আমায় পাঠিয়েছেন। তিনিই এইরকম শত শত মানুষকে জগতের সকল জাতির কাছে প্রেরণ করবেন। পার্থিব কোন শক্তিই এর প্রতিরোধে সমর্থ নয়।[১৬]

আমেরিকার পথে

ইয়োকোহামা, জাপান ১০ই জুলাই, ১৮৯৩

আমার গতিবিধি সম্বন্ধে তোমাদের সর্বদা খবর দেওয়া আমার উচিত ছিল, আমি তা করিনি, সেজন্য আমায় ক্ষমা করবে। এরূপ দীর্ঘ ভ্রমণে প্রত্যহই বিশেষ ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়। বিশেষতঃ আমার তো কখন নানা জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে ঘোরা অভ্যাস ছিল না। এখন এই সব যা সঙ্গে নিতে হয়েছে, তার তত্ত্বাবধানেই আমার সব শক্তি খরচ হচ্ছে। বাস্তবিক, এ এক বিষম ঝঞ্ঝাট!

বোম্বাই ছেড়ে এক সপ্তাহের মধ্যে কলম্বো পৌঁছলাম। জাহাজ প্রায় সারাদিন বন্দরে ছিল। এই সুযোগে আমি নেমে শহর দেখতে গেলাম। গাড়ী ক'রে কলম্বোর রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম। সেখানকার কেবল বুদ্ধ-ভগবানের মন্দিরটির কথা আমার স্মরণ আছে ; তথায় বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ পরিনির্বাণ-মূর্তি শয়ান অবস্থায় রয়েছে।

পরে জাহাজ পিনাঙে লাগলো ; ওটা মালয় উপদ্বীপে সমুদ্রের উপরে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড মাত্র।

পিনাং থেকে সিঙ্গাপুর চললাম। পথে দূর হ'তে উচ্চশৈল-সমন্বিত সুমাত্রা দেখতে পেলাম ; আর কাপ্তেন আমাকে প্রাচীনকালে জলদস্যুগণের কয়েকটি আড্ডা অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে দেখাতে লাগলেন।

সিঙ্গাপুর...এখানে একটি সুন্দর উদ্ভিদ-উদ্যান আছে, সেখানে অনেক জাতীয় ভাল 'পাম' সংগৃহীত। 'ভ্রমণকারীর পাম' (traveller's palm) নামক সুন্দর তালবৃন্তবৎ পাম এখানে অপর্যাপ্ত জন্মায়, আর 'রুটিফল' (ব্রেড ফ্রুটস্) বৃক্ষ তো এখানে সর্বত্র। মান্দ্রাজে যেমন আম অপর্যাপ্ত, এখানে তেমন ম্যাঙ্গোষ্টিন অপর্যাপ্ত, তবে আমের সঙ্গে আর কিসের তুলনা হ'তে পারে?...

তারপর হংকং। সিঙ্গাপুর মালয় উপদ্বীপের অন্তর্গত হলেও সেখান থেকেই মনে হয় যেন চীনে এসেছি—চীনের ভাব সেখানে এতই প্রবল। সকল মজুরের কাজ, সকল ব্যবসা-বাণিজ্য বোধ হয় তাদেরই হাতে। আর হংকং তো খাঁটী চীন ; যাই জাহাজ কিনারায় নোঙর করে, অমনি শত শত চীনে নৌকা এসে ডাঙ্গায় নিয়ে যাবার জন্য তোমায় ঘিরে ফেলবে।...

আমরা হংকঙে তিন দিন ছিলাম। সেখানে থেকে ক্যান্টন দেখতে গিয়েছিলাম, হংকং থেকে একটি নদী ধরে ৮০ মাইল উজিয়ে ক্যান্টনে যেতে হয়। প্রাণের স্ফূর্তি ও কর্মব্যস্ততা মিলে এখানে কি হইচই! নৌকার ভিড়ই বা কি! জল যেন ছেয়ে ফেলেছে! এ শুধু মাল ও যাত্রী নিয়ে যাবার নৌকা নয়, হাজার হাজার নৌকা রয়েছে গৃহের মতো বাসোপযোগী। তাদের মধ্যে অনেকগুলো অতি সুন্দর, অতি বৃহৎ। বাস্তবিক সেগুলো দুতলা তেতলা বাড়ীর মতো, চারিদিকে বারাণ্ডা রয়েছে, মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে ; কিন্তু সব জলে ভাসছে!!

আমরা যেখানে নামলাম, সেই জায়গাটুকু চীন গভর্নমেণ্ট বৈদেশিকদের বাস করবার জন্য দিয়েছেন। এর চতুর্দিকে, নদীর দু' পাশে অনেক মাইল জুড়ে এই বৃহৎ শহর অবস্থিত—এখানে অগণিত মানুষ বাস করছে, জীবন-সংগ্রামে একজন আর একজনকে ঠেলে ফেলে চলেছে—প্রাণপণে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার চেষ্টা করছে। মহা কলরব—মহা ব্যস্ততা! কিন্তু এখানকার অধিবাসিসংখ্যা যতই হোক, এখানকার কর্মপ্রবণতা যতই হোক, এর মতো ময়লা শহর আমি দেখিনি। তবে ভারতবর্ষের কোন শহরকে যে হিসেবে আবর্জনাপূর্ণ বলে, সে হিসেবে বলছি না, চীনেরা তো এতটুকু ময়লা পর্যন্ত

বৃথা নষ্ট হ'তে দেয় না ; চীনেদের গা থেকে যে বিষম দুর্গন্ধ বেরোয়, তার কথাই বলছি ; তারা যেন ব্রত নিয়েছে, কখন স্নান করবে না।...

আমি কতগুলো চীনে মন্দির দেখতে গেলাম। ক্যান্টনে যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটি আছে, তা প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট এবং সর্বপ্রথম ৫০০ বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীর স্মরণার্থ উৎসর্গীকৃত। অবশ্য স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রধান মূর্তি ; তাঁর নীচেই সম্রাট বসেছেন, আর দুধারে শিষ্যগণের মূর্তি—সব মূর্তিগুলিই কাঠে সুন্দররূপে ক্ষোদিত।

ক্যান্টন হ'তে আমি হংকঙে ফিরলাম। সেখান থেকে জাপানে গেলাম। নাগাসাকি বন্দরে প্রথমেই কিছুক্ষণের জন্য আমাদের জাহাজ লাগলো। আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্য জাহাজ থেকে নেমে শহরের মধ্যে গাড়ী ক'রে বেড়ালাম। চীনের সঙ্গে কি প্রভেদ! পৃথিবীর মধ্যে যত পরিষ্কার জাত আছে, জাপানীরা তাদের অন্যতম। এদের সবই কেমন পরিষ্কার! রাস্তাগুলো প্রায় সবই চওড়া সিধে ও বরাবর সমানভাবে বাঁধানো। খাঁচার মতো এদের ছোট ছোট দিব্যি বাড়ীগুলো, প্রায় প্রতি শহর ও পল্লীর পশ্চাতে অবস্থিত চিড়গাছে ঢাকা চিরহরিৎ ছোট ছোট পাহাড়গুলো...জাপান 'সৌন্দর্যভূমি'। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর পেছনে এক একখানি বাগান আছে—তা জাপানী ফ্যাশনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মতৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড, ছোট ছোট কৃত্রিম জলপ্রণালী এবং পাথরের সাঁকো দিয়ে ভালরূপে সাজানো।

নাগাসাকি থেকে কোবি গেলাম। কোবি গিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিলাম, স্থলপথে ইয়োকোহামায় এলাম—জাপানের মধ্যবর্তী প্রদেশসমূহ দেখবার জন্য।...

আমি এদের অনেকগুলি মন্দির দেখলাম। প্রত্যেক মন্দিরে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লেখা আছে।[১১]

এবার আমেরিকায়

মেটকাফ, মাসাচুসেটস, ২০শে আগস্ট, ১৮৯৩

জাপান থেকে আমি বঙ্কুবরে (Vancouver) পৌঁছলাম। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল। খুব শীত ছিল। গরম কাপড়ের অভাবে বড় কষ্ট পেতে হয়েছিল। যাই হোক, কোনরকমে বঙ্কুবরে পৌঁছে সেখান থেকে কানাডা দিয়ে চিকাগোয় পৌঁছলাম। সেখানে আন্দাজ বারো দিন রইলাম। এখানে প্রায় প্রতিদিনই মেলা দেখতে যেতাম। সে এক বিরাট

ব্যাপার। অন্ততঃ দশ দিন না ঘুরলে সমুদয় দেখা অসম্ভব।

এখানে আমার খরচ ভয়ানক হচ্ছে। গড়ে আমার এক পাউণ্ড করে প্রত্যহ খরচ পড়ছে। এখানে একটা চুরুটের দামই আমাদের দেশের আট আনা। আমেরিকানরা এত ধনী যে, তারা জলের মতো টাকা খরচ করে, আর তারা আইন করে সব জিনিসের মূল্য এত বেশী রেখেছে যে, জগতের অপর কোন জাতি যেন কোনমতে এদেশে ঘেঁষতে না পারে। সাধারণ কুলি গড়ে প্রতিদিন ৯/১০ টাকা করে রোজগার করে ও তা খরচ করে থাকে। এখানে আসবার আগে যে-সব সোনার স্বপ্ন দেখতাম, তা ভেঙ্গেছে। এখন অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। শত শত বার মনে হয়েছে, এ দেশ হতে চলে যাই ; কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের কাছে আদেশ পেয়েছি। আমি কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তাঁর চক্ষু তো সব দেখছে। মরি বাঁচি, উদ্দেশ্য ছাড়ছি না।

জেনে রাখ, এই দেশ খ্রীষ্টানের দেশ। এখানে আর কোন ধর্ম বা মতের প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র নেই বললেই হয়। আমি জগতে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার ভয় করি না। আমি এখানে মেরী-তনয়ের সন্তানগণের মধ্যে বাস করছি ; প্রভু ঈশাই আমাকে সাহায্য করবেন। একটি জিনিস দেখতে পাচ্ছি, এঁরা আমার হিন্দুধর্মসম্বন্ধীয় উদার মত ও নাজারাথের অবতারের প্রতি ভালবাসা দেখে খুব আকৃষ্ট হচ্ছেন। আমি তাঁদের বলে থাকি যে, আমি সেই গালিলীয় মহাপুরুষের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বলি না, কেবল তাঁরা যেমন যীশুকে মানেন, সেই সঙ্গে ভারতীয় মহাপুরুষগণকেও মানা উচিত। এ কথা এঁরা আদরপূর্বক গ্রহণ করছেন।

এখন শীত আসছে। আমাকে সব রকম গরম কাপড় যোগাড় করতে হবে।

চিকাগোয় সম্প্রতি একটা বড় মজা হয়ে গিয়েছে। কপূরতলার রাজা এখানে এসেছিলেন, আর চিকাগো সমাজের কতকাংশ তাঁকে কেষ্ট-বিষ্টু করে তুলেছিল। মেলার জায়গায় এই রাজার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, কিন্তু তিনি বড় লোক, আমার মতো ফকিরের সঙ্গে কথা বলবেন কেন?

এখানে একটি পাগলাটে, ধুতিপরা মারাঠা ব্রাহ্মণ মেলায় কাগজের উপর নখের সাহায্যে প্রস্তুত ছবি বিক্রয় করছিল। এ লোকটা খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কাছে রাজার বিরুদ্ধে নানা কথা বলেছিল ; সে বলেছিল—এ ব্যক্তি খুব নীচ জাতি, এই রাজারা ক্রীতদাসস্বরূপ, এরা দুর্নীতিপরায়ণ ইত্যাদি। আর এই সত্যবাদী (?) সম্পাদকেরা—যার জন্য আমেরিকাবিখ্যাত—এই

লোকটার কথায় কিছু গুরুত্ব-আরোপের ইচ্ছায় তার পরদিন সংবাদপত্রে বড় বড় স্তম্ভ বার করল, তারা ভারতাগত একজন জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করল অবশ্য আমাকেই লক্ষ্য করেছিল!

আমাকে স্বর্গে তুলে দিয়ে আমার মুখ দিয়ে তারা এমন সব কথা বার করল, যা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিনি ; তারপর এই রাজার সম্বন্ধে মারাঠা ব্রাহ্মণটি যা যা বলেছিল, সব আমার মুখে বসাল। আর তাতেই চিকাগোসমাজ একটা ধাক্কা খেয়ে তাড়াতাড়ি রাজাকে পরিত্যাগ করল। এই মিথ্যাবাদী সম্পাদকেরা আমাকে দিয়ে আমার দেশের লোককে বেশ ধাক্কা দিলেন। যাই হোক—এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এই দেশে টাকা অথবা উপাধির জাঁক-জমক অপেক্ষা বুদ্ধির আদর বেশী।

কাল নারী-কারাগারের অধ্যক্ষা মিসেস্ জন্সন্ মহোদয়া এখানে এসেছিলেন ; এখানে কারাগার বলে না, বলে সংশোধনাগার। আমেরিকায় যা যা দেখলাম, তার মধ্যে এটা এক অতি অদ্ভুত জিনিস। কারাবাসিগণের সঙ্গে কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তারা ফিরে গিয়ে সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়! কি অদ্ভুত, কি সুন্দর! না দেখলে তোমাদের বিশ্বাস হবে না।

এটা দেখে তারপর যখন দেশের কথা ভাবলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল। ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভেবে থাকি! তাদের কোন উপায় নাই, পালাবার কোন রাস্তা নাই, উঠবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠবার উপায় নাই। তারা দিন দিন ডুবে যাচ্ছে, রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করছে, তার বেদনা তারা বিলক্ষণ অনুভব করছে, কিন্তু তারা জানে না—কোথা থেকে ঐ আঘাত আসছে। তারাও যে মানুষ, তা ভুলে গিয়েছে।

এর ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন থেকে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা হিন্দুধর্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তম ধর্মের নাশই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়।

শোন বন্ধু, প্রভুর কৃপায় আমি এর রহস্য আবিষ্কার করেছি। হিন্দুধর্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম তো শেখাচ্ছেন জগতে যত প্রাণী আছে, সবই

তোমার আত্মারই বহু রূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ কেবল এই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। প্রভু তোমাদের কাছে বুদ্ধরূপে এসে শিখালেন তোমাদেরকে গরীবের জন্য, দুঃখীর জন্য, পাপীর জন্য প্রাণ কাঁদাতে, তাদের সঙ্গে সহানুভূতি করতে, কিন্তু তোমরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলে না।

বালাজী ও জি, জি-র স্মরণ থাকতে পারে, একদিন সায়ংকালে পণ্ডিচেরিতে এক পণ্ডিতের সঙ্গে আমাদের সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হচ্ছিল। তার সেই বিকট ভঙ্গী ও তার 'কদাপি ন' (কখনও না)—এই কথা চিরকাল আমার স্মরণ থাকবে। এদের অজ্ঞতার গভীরতা দেখে অবাক্ হতে হয়। তারা জানে না, ভারত জগতের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ। সমাজের এই অবস্থাকে দূর করতে হবে ধর্মকে বিনষ্ট করে নয়, পরন্তু হিন্দুধর্মের মহান উপদেশসমূহ অনুসরণ করে এবং তার সঙ্গে হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা নিয়ে।

আমি বার বৎসর হৃদয়ে এই ভার নিয়ে ও মাথায় এই চিন্তা নিয়ে বেড়িয়েছি। আমি তথাকথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি, তারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভেবেছে। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করতে করতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করে এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হয়েছি।

ভগবান অনন্তশক্তিমান্ ; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরতে পারি ; কিন্তু হে মান্দ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের কাছে এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা—দায়স্বরূপ অর্পণ করছি।

এ এক দিনের কাজ নয়। পথ ভীষণ কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের জয় হোক—আমরা সিদ্ধিলাভ করবই করব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করবে, আবার শত শত লোক তাতে ব্রতী হতে প্রস্তুত থাকবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য হয়ে মরতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করবে!

রোগ কি বুঝলে, ঔষধ কি তাও জানলে, কেবল বিশ্বাসী হও। আমরা ধনী বা বড়লোক গ্রাহ্য করি না। আমরা হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে ও তাদের নিস্তেজ সংবাদপত্রের প্রবন্ধসমূহকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ

জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু!

অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে তাকিও না। কে পড়ল দেখতে যেও না। এগিয়ে যাও, সামনে, সামনে। এইভাবেই আমরা অগ্রগামী হব—একজন পড়বে আর একজন তার স্থান অধিকার করবে।

বস্টনে গিয়ে আমাকে প্রথমে কাপড় কিনতে হবে। সেখানে যদি বেশী দিন থাকতে হয়, তবে আমার এ অপূর্ব পোশাক চলবে না। রাস্তায় আমাকে দেখবার জন্য শত শত লোক দাঁড়িয়ে যায়। সুতরাং আমাকে কাল রঙের লম্বা জামা পরতে হবে। কেবল বক্তৃতায় সময় গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ি পরব।

কানাডা ব্যতীত সমগ্র আমেরিকায় রেলগাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস নেই। সুতরাং আমাকে ফার্স্ট ক্লাসে ভ্রমণ করতে হয়েছে, কারণ ওটা ছাড়া আর ক্লাস নাই। আমি কিন্তু পুলমান গাড়ীতে (Pullmans) চড়তে ভরসা করি না। এগুলি খুব আরামপ্রদ ; এখানে আহার, পান, নিদ্রা, এমন কি স্নানের পর্যন্ত সুবন্দোবস্ত আছে। তুমি যেন হোটেলে রয়েছ, বোধ করবে। কিন্তু এতে বেজায় খরচ।

এখানে সমাজের মধ্যে ঢুকে তাদের শিক্ষা দেওয়া মহা কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ এখন কেউ শহরে নেই, সকলেই গ্রীষ্মাবাসে গিয়েছে। শীতে আবার সব শহরে আসবে, তখন তাদের পাব। সুতরাং আমাকে এখানে কিছুদিন থাকতে হবে। এত চেষ্টার পর আমি সহজে ছাড়ছি না। তোমরা কেবল যতটা পারো, আমায় সাহায্য কর। আর যদি তোমরা নাই পারো, আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখব। আর যদিই আমি এখানে রোগে, শীতে বা অনাহারে মরে যাই, তোমরা এই ব্রত নিয়ে উঠে পড়ে লাগবে। পবিত্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার নামে যে-কোন চিঠি বা টাকা আসবে, কুক কোম্পানিকে তা আমার কাছে পাঠাতে বলে দিয়েছি। 'রোম এক দিনে নির্মিত হয়নি।' যদি তোমরা টাকা পাঠিয়ে আমাকে অন্ততঃ ছয় মাস এখানে রাখতে পারো, আশা করি সব সুবিধা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আমিও যে-কোন কাষ্ঠখণ্ড সামনে পাই, তাই ধরে ভাসতে চেষ্টা করছি। যদি আমার ভরণপোষণের কোন উপায় করতে পারি, তৎক্ষণাৎ তোমায় তার করব।

প্রথমে আমেরিকায় চেষ্টা করব, এখানে অকৃতকার্য হলে ইংলণ্ডে চেষ্টা করব। তাতেও কৃতকার্য না হলে ভারতে ফিরব ও ভগবানের পুনরাদেশের প্রতীক্ষা করব।[১৮]

আমি হচ্ছি ইতিহাসে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসী, যে সমুদ্র পেরিয়ে এই পাশ্চাত্য দেশে এসেছে।[১৯]

যখন আমি একজন দরিদ্র অপরিচিত সন্ন্যাসী মাত্র, একজনও বন্ধু-বান্ধব নেই, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে আমাকে আমেরিকায় যেতে হবে, কিন্তু কারও নামে লিখিত কোন প্রকার পরিচয়পত্র নেই। আমি স্বভাবতই ভেবেছিলাম, ঐ নেতা যখন একজন মার্কিন এবং ভারতপ্রেমিক, তখন সম্ভবতঃ তিনি আমাকে আমেরিকায় কারও কাছে পরিচয়পত্র দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে ঐরকম পরিচয়পত্র প্রার্থনা করায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি আমাদের সোসাইটিতে যোগ দেবে?' আমি উত্তর দিলাম, 'না, আমি কিভাবে আপনাদের সোসাইটিতে যোগ দিতে পারি? আমি আপনাদের অনেক মতই যে বিশ্বাস করি না।' 'তবে যাও, তোমার জন্য আমি কিছু করতে পারব না।' এই কি আমার পথ করে দেওয়া? আমার থিওজফিস্ট বন্ধুগণের কেউ যদি এখানে থাকেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, এই কি আমার পথ করে দেওয়া?

যাই হোক, আমি মাদ্রাজের কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে আমেরিকায় পৌঁছলাম।

পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ন আরম্ভ হবার কয়েক মাস আগে আমি আমেরিকায় পৌঁছুলাম। টাকা আমার কাছে অতি স্বল্পই ছিল—আর ধর্মমহাসভা বসবার আগেই সব খরচ হয়ে গেল। এদিকে শীত আসছে। আমার শুধু গ্রীষ্মোপযোগী পাতলা বস্ত্রখানি ছিল—একদিন আমার হাত হিমে আড়ষ্ট হয়ে গেল। এই ঘোরতর শীতপ্রধান দেশে আমি যে কি করব, তা ভেবে পেলাম না। কারণ যদি রাস্তায় ভিক্ষায় বার হই, তবে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দেবে। তখন আমার কাছে শেষ সম্বল কয়েকটি ডলার মাত্র ছিল। আমি মাদ্রাজে কয়েকটি বন্ধুর কাছে তার করলাম। থিওজফিস্টরা এই ব্যাপারটি জানতে পারলেন ; তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখেছিলেন, 'শয়তানটা শীঘ্র মরবে—ঈশ্বরেচ্ছায় বাঁচা গেল।' এই কি আমার জন্য পথ করে দেওয়া?

আমি এখন এ-সব কথা বলতাম না, কিন্তু হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আপনারা জোর করে এটা বার করলেন। আমি তিন বৎসর এ-বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিনি। নীরবতাই আমার মূলমন্ত্র ছিল, কিন্তু আজ এটা বার হয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, আমি ধর্মমহাসভায় কয়েকজন থিওজফিস্টকে দেখলাম। আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে—তাঁদের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করলাম। তাঁরা প্রত্যেকেই যে-অবজ্ঞাদৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন, তা এখনও আমার স্মরণ

আছে। তাঁদের সেই অবজ্ঞাদৃষ্টিতে যেন প্রকাশ পাচ্ছিল—'এ একটা ক্ষুদ্র কীট ; এ আবার দেবতার মধ্যে কিভাবে এলো?'[২০]

এটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, সব সমাজে ও সব দেশে একরকম আদর্শ ও কার্যপ্রণালী প্রচলিত নয়। এই বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতাই এক জাতির প্রতি অপর জাতির ঘৃণার প্রধান কারণ। একজন মার্কিন ভাবেন, তাঁর দেশের রীতিনীতি অনুসারে তিনি যা কিছু করেন, তাই সর্বাপেক্ষা ভাল এবং যে-ঐ রীতি অনুসরণ করে না, সে অতি দুষ্ট লোক। একজন হিন্দু (ভারতবাসী) ভাবে, তার আচার-ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ ও সত্য, সুতরাং যে তা অনুসরণ করে না, সে অতি দুষ্ট লোক। আমরা সহজেই এই স্বাভাবিক ভ্রমে পড়ে থাকি। এটা বড়ই অনিষ্টকর ; সংসারে যে সহানুভূতির অভাব দেখা যায়, তার অর্ধেক এই ভ্রম থেকেই উৎপন্ন।

আমি যখন প্রথম এদেশে (আমেরিকা) আসি, তখন একদিন চিকাগো মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, পিছন থেকে একজন লোক আমার পাগড়ি ধরে এক টান মারল। আমি পিছু ফিরে দেখি, লোকটির বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়, তাঁকে বেশ ভদ্রলোকের মতো দেখতে। আমি তার সঙ্গে দুএকটি কথা বললাম ; আমি ইংরেজী জানি বুঝবামাত্র লোকটি খুব লজ্জিত হল। আর একবার ঐ মেলাতেই আর একজন লোক আমাকে ইচ্ছা করে ধাক্কা দেয়। এরকম করবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সেও লজ্জিত হল, শেষে আমতা আমতা করতে করতে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, 'আপনি এরকম পোশাক পরেছেন কেন?'

এই-সব ব্যক্তির সহানুভূতি তাঁদের মাতৃভাষা ও নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। দুর্বল জাতির উপর সবল জাতি যে-সব অত্যাচার করে, সেগুলির অধিকাংশেরই কারণ এই কুসংস্কার-সঞ্জাত। এর দ্বারা মানুষের প্রতি মানুষের সৌহার্দ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি তাঁর মতো পোশাক পরি না কেন এবং আমার বেশের জন্য আমার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করতে চাইলেন, তিনি হয়তো খুব ভাল লোক ; হয়তো তিনি সন্তানবৎসল পিতা ও একজন সজ্জন ব্যক্তি। কিন্তু যখনই তিনি ভিন্নবেশপরিহিত কাকেও দেখলেন, তখনই তাঁর স্বাভাবিক সহৃদয়তা লুপ্ত হয়ে গেল।

সব দেশেই আগন্তুক বিদেশীদের শোষণ করা হয়। কারণ তারা যে জানে না, নূতন অবস্থায় পড়ে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়। এইজন্য তারাও ঐ

দেশের লোকদের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা নিয়ে যায়। নাবিক, সৈন্য ও বণিকগণ বিদেশে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবহার করে থাকে। নিজেদের দেশে ঐরকম করবার কথা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। এই কারণেই বোধ হয় চীনারা ইওরোপীয় ও মার্কিনগণকে 'বিদেশী শয়তান' বলে থাকে। পাশ্চাত্য জীবনের ভাল দিকগুলি দেখলে তারা এরকম বলতে পারত না।[২১]

বস্টনে পৌঁছলাম—অজ্ঞাত স্থানে অপরিচিত ব্যক্তি হিসাবে। আমার গায়ে এইরকম লাল কোট, মাথায় পাগড়ি। শহরের ব্যস্ত অঞ্চলের একটি রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। দেখতে পেলাম, একদল বয়স্ক মানুষ ও কিছু ছেলে-ছোকরা আমাকে অনুসরণ করছে। আমি দ্রুত পা চালালাম, তারাও গতি দ্রুততর করল। তখন একটা কিছু কাঁধের ওপর এসে পড়ল। আমি ছুটতে শুরু করলাম, একটা গলির মধ্যে একটি কোণ লক্ষ্য করে—আর তখনই আমার প্রায় সামনে দিয়ে জনতা পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল—আমি বেঁচে গেলাম।[২২]

যখন আপনাদের দেশের প্রথা জানতাম না, তখন একটি খুবই মার্জিত-রুচি পরিবারের পুত্রকে জননীর নাম ধরে ডাকতে দেখে আমি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলাম। যাইহোক, পরে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। বুঝলাম, এটাই এ-দেশের রীতি। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা কখনই পিতামাতার উপস্থিতিতে তাঁদের নাম উচ্চারণ করি না।[২৩]

আমি এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত, যারা অনেকটা আপনাদের রোমান ক্যাথলিক চার্চের ভিক্ষুক সাধুদের মতো। অর্থাৎ আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করতে হয়। জনসাধারণ যখন চায়, তখন ধর্মকথা শোনাতে হয়। যেখানে আশ্রয় পাই, সেখানে ঘুমাই। আমাদের এই ধরনের জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। আমাদের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নিয়ম এই যে, প্রত্যেক নারীকে এমন কি ক্ষুদ্র বালিকাকেও 'মা' সম্বোধন করতে হয়। এটাই আমাদের প্রথা। পাশ্চাত্যে এসেও আমার পুরোন অভ্যাস ছাড়তে পারিনি। মহিলাদের 'মা' বলে সম্বোধন করলে দেখতাম, তাঁরা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে উঠতেন। প্রথম প্রথম এর কারণ বুঝতে পারিনি। পরে কারণ আবিষ্কার করলাম। বুঝলাম 'মা' হলে তাঁরা যে 'বুড়ী' হয়ে যাবেন।[২৪]

চিকাগো, ২রা অক্টোবর, ১৮৯৩

মহাসভায় আমি শেষ মুহূর্তে একেবারে বিনা প্রস্তুতিতে হাজির হয়েছিলাম।

কিছু সময় তার জন্য নিদারুণভাবে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

মহাসভায় প্রায় প্রতিদিন আমাকে বক্তৃতা করতে হয়েছে,...যেখানে সারা পৃথিবীর বিশিষ্ট বক্তা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উপস্থিত, সেখানে তাঁদের সামনে দাঁড়াতে এবং বক্তৃতা দিতে আমার যে কী ভয় হচ্ছিল! কিন্তু প্রভু আমাকে শক্তি দিয়েছেন। প্রায় প্রতিদিন আমি বীরের মতো (?) সভাকক্ষে শ্রোতাদের সম্মুখীন হয়েছি। যদি আমি সফল হয়ে থাকি, তিনিই শক্তিসঞ্চার করেছেন ; যদি আমি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে থাকি—তা যে হবো আমি আগে থেকেই জানতাম—ক'র কারণ আমি নিতান্ত অজ্ঞান।

অধ্যাপক ব্র্যাডলি আমার প্রতি খুবই দয়া প্রকাশ করেছেন এবং সব সময় আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আহা! সকলে আমার প্রতি— আমার মতো নগণ্যের প্রতি কী না প্রীতিপরায়ণ, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না! প্রভু ধন্য, জয় হোক তাঁর, তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে ভারতের দরিদ্র অজ্ঞ এক সন্ন্যাসী এই মহাশক্তির দেশে পণ্ডিত ধর্মযাজকদের সমতুল্য গণ্য হয়েছে। প্রিয় ভ্রাতা, জীবনের প্রতিটি দিনে আমি যেভাবে প্রভুর করুণা পাচ্ছি, আমার ইচ্ছা হয়, ছিন্নবস্ত্রে ও মুষ্টিভিক্ষায় যাপিত লক্ষ লক্ষ যুগব্যাপী জীবন দিয়ে তাঁর কাজ ক'রে যাই—কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর সেবা ক'রে যাই।

আমি এখন এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। সমস্ত জীবন সকল অবস্থাকে তাঁরই দান ব'লে গ্রহণ করেছি এবং শান্তভাবে চেষ্টা করেছি তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। আমেরিকায় প্রথম দিকে আমার অবস্থা ছিল ডাঙায় তোলা মাছের মতো। আমি প্রভুর দ্বারা চালিত হয়ে এসেছি—আমার আশঙ্কা হ'ল, সেই এতদিনের অভ্যস্ত জীবনের ধারা এবার বোধহয় ত্যাগ করতে হবে, এবার বোধহয় নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

এই ধারণাটা কী জঘন্য অন্যায় আর অকৃতজ্ঞতা! আমি এখন স্পষ্ট বুঝেছি যে, যিনি আমাকে হিমালয়ের তুষার-শৈলে কিংবা ভারতের দগ্ধ প্রান্তরে পথ দেখিয়েছেন, তিনিই এখানে পথ দেখাবেন, সাহায্য করবেন। তাঁর জয় হোক, অশেষ জয় হোক। সুতরাং আমি আবার আমার পুরাতন রীতিতে শান্তভাবে গা ঢেলে দিয়েছি। কেউ এগিয়ে এসে আমাকে খেতে দেয়, হয়তো কেউ দেয় আশ্রয়, কেউ বলে—তাঁর কথা শোনাও আমাদের। আমি জানি তিনিই তাদের পাঠিয়েছেন, আমি শুধু নির্দেশ পালন ক'রে যাব : তিনি আমাকে সব যোগাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।। গীতা, ৯।২২

এমনি এশিয়াতে, এমনি ইউরোপে, এমনি আমেরিকায়, ভারতের মরুভূমির মধ্যেও একই জিনিস। আমেরিকার বাণিজ্য-ব্যস্ততার মধ্যেও অন্য কিছু নয়। তিনি এখানে নেই—সে কি সম্ভব? আর যদি তিনি আমার পাশে সত্যি এখানে না থাকেন, তাহলে নিশ্চিত ধ'রে নেব, তিনি চান যে, এই তিন মিনিটের মাটির শরীর আমি যেন ছেড়ে দিই ;—হ্যাঁ, তাহলে তাই তিনি চান, এবং আমি তা সানন্দে পালন করবার ভরসা রাখি।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো।
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ।।

নৈয়ায়িক বা দ্বৈতবাদী বিখ্যাত দার্শনিক উদয়নাচার্য এই শ্লোকটি রচনা করেছেন।[২৫]

চিকাগো, ১০ই অক্টোবর, ১৮৯৩

এখন আমি চিকাগোর বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি। আমার বিবেচনায় তা বেশ ভালই হচ্ছে। ৩০ থেকে ৮০ ডলারের মধ্যে প্রতি বক্তৃতায় পাওয়া যাচ্ছে, সম্প্রতি ধর্মমহাসভার দরুন চিকাগোয় আমার নাম এমনই ছড়িয়ে পড়েছে যে, এই ক্ষেত্রটি ত্যাগ করা বর্তমানে যুক্তিযুক্ত হবে না। মনে হয়, এ ব্যাপারে আপনিও নিশ্চয় একমত হবেন। যাই হোক, আমি শীঘ্রই বস্টনে যেতে পারি ; ঠিক কবে, তা অবশ্য বলতে পারি না। গতকাল স্ট্রীটর থেকে ফিরেছি, সেখানে একটি বক্তৃতায় ৮৭ ডলার মিলেছে। এই সপ্তাহে প্রতিদিনই আমার বক্তৃতা আছে।[২৬]

চিকাগো, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৯৩

এখানে আমার কাজ ভালই চলেছে এবং এখানে প্রায় সকলেই আমার প্রতি খুব সহৃদয়, অবশ্য নিতান্ত গোঁড়াদের বাদ দিয়ে। নানা দূরদেশ থেকে বহু মানুষ এখানে বহু পরিকল্পনা, ভাব ও আদর্শ প্রচার করবার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে এবং আমেরিকাই একমাত্র স্থান, যেখানে সব কিছুর সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। তবে আমার পরিকল্পনার বিষয় একদম আর কিছু না বলাই ঠিক করেছি। সেই ভাল।...পরিকল্পনার জন্য একাগ্রভাবে খেটে যাওয়াই আমার ইচ্ছা। পরিকল্পনাটা থাকবে আড়ালে, বাইরে কাজ ক'রে যাব, অন্যান্য বক্তার মতো।

আমাকে যিনি এখানে এনেছেন এবং এখনও পর্যন্ত যিনি আমাকে ত্যাগ করেননি, তিনি নিশ্চয় যে অবধি আমি এখানে থাকব, আমাকে ত্যাগ করবেন না। আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, আমি ভালই করছি—এবং টাকাকড়ি পাওয়ার ব্যাপার যদি বলেন, খুবই ভাল করার আশা রাখি। অবশ্য আমি এ ব্যাপারে একেবারেই কাঁচা, কিন্তু শীঘ্রই এ ব্যবসার কৌশল শিখে নেব। চিকাগোয় আমি খুবই জনপ্রিয়, সুতরাং এখানে আরও কিছু সময় থাকতে ও টাকা সংগ্রহ করতে চাই।

আগামী কাল শহরের সবচেয়ে প্রভাবসম্পন্ন মহিলাদের 'ফর্টনাইটলি ক্লাবে' বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে যাব। এখন আমার কাছে পরিকল্পনার সাফল্য সম্ভব বোধ হচ্ছে।[২৭]

চিকাগো, ২রা নভেম্বর, ১৮৯৩

ভগবান আমাকে অনেক বন্ধু ও সহায় দিয়েছেন। বস্টনের নিকটবর্তী এক গ্রামে ডক্টর রাইটের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক। তিনি আমার প্রতি অতিশয় সহানুভূতি দেখালেন, ধর্মমহাসভায় যাবার বিশেষ আবশ্যকতা বুঝালেন। তিনি বললেন, ওতে সমুদয় আমেরিকান জাতির সঙ্গে আমার পরিচয় হবে। আমার সঙ্গে কারও আলাপ ছিল না, সুতরাং ঐ অধ্যাপক আমার জন্য সব বন্দোবস্ত করবার ভার স্বয়ং নিলেন। অবশেষে আমি পুনরায় চিকাগোয় আসলাম। এখানে এক ভদ্রলোকের গৃহে—ধর্মমহাসভার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রতিনিধির সঙ্গে আমারও থাকবার ব্যবস্থা হল।

'মহাসভা' খুলবার দিন প্রাতে আমরা সকলে 'শিল্পপ্রাসাদ' (আর্ট প্যালেস) নামক বাড়ীতে সমবেত হলাম। সেখানে মহাসভার অধিবেশনের জন্য একটি বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী হল নির্মিত হয়েছিল। এখানে সর্বজাতীয় লোক সমবেত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বোম্বাই-এর নগরকার ; বীরচাঁদ গান্ধী জৈনসমাজের প্রতিনিধিরূপে এবং এনি বেসান্ট ও চক্রবর্তী থিয়সফির প্রতিনিধিরূপে এসেছিলেন।

এঁদের মধ্যে মজুমদারের সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল, আর চক্রবর্তী আমার নাম জানতেন। বাসা থেকে 'শিল্পপ্রাসাদ' পর্যন্ত খুব শোভাযাত্রা করে যাওয়া হল এবং আমাদের সকলকেই প্লাটফর্মের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে বসানো হল। কল্পনা করে দেখ, নীচে একটি হল, আর উপরে এক প্রকাণ্ড গ্যালারি ;

তাতে আমেরিকার সুশিক্ষিত সমাজের বাছা বাছা ৬।৭ হাজার নরনারী ঘেঁষাঘেঁষা করে উপবিষ্ট, আর প্লাটফর্মের উপর পৃথিবীর সর্বজাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ। আর আমি, যে জীবনে কখন সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করবে!

সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথারীতি ধুমধামের সঙ্গে সম্পন্ন হবার পর সভা আরম্ভ হল। তখন একজন একজন করে প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করে দেওয়া হল ; তাঁরাও অগ্রসর হয়ে কিছু কিছু বললেন। অবশ্য আমার বুক দুরদুর করছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হয়েছিল। আমি এতদূর ঘাবড়ে গেলাম যে, পূর্বাহ্ণে বক্তৃতা করতে ভরসা করলাম না।

মজুমদার বেশ বললেন, চক্রবর্তী আরও সুন্দর বললেন। খুব করতালিধ্বনি হতে লাগল। তাঁরা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করে এনেছিলেন। আমি নির্বোধ, কিছুই প্রস্তুত করিনি। দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করে অগ্রসর হলাম। ডক্টর ব্যারোজ আমার পরিচয় দিলেন।

আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হয়েছিল ; আমেরিকাবাসীদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং আরও দু-এক কথা বলে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করলাম।

যখন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলে সভাকে সম্বোধন করলাম, তখন দুই মিনিট ধরে এমন করতালিধ্বনি হতে লাগল যে, কানে যেন তালা ধরে যায়। তারপর আমি বলতে আরম্ভ করলাম। যখন আমার বলা শেষ হল, তখন হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হয়ে বসে পড়লাম।

পরদিন সব খবরের কাগজে বলতে লাগল, আমার বক্তৃতাই সেই দিন সকলের প্রাণে লেগেছিল ; সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানতে পারল! শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর সত্যই বলেছেন, 'মূকং করোতি বাচালং'—ভগবান বোবাকেও মহাবক্তা করে তোলেন। তাঁর নাম জয়যুক্ত হোক! সেই দিন হতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হয়ে পড়লাম, আর যে দিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করলাম, সেই দিন 'হলে' এত লোক হয়েছিল যে, আর কখনও সেরকম হয়নি। একটি সংবাদপত্র হতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :

'মহিলা—মহিলা—কেবল মহিলা—সমস্ত জায়গা জুড়ে, কোণ পর্যন্ত ফাঁক নাই, বিবেকানন্দের বক্তৃতা হবার আগে অন্য যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হচ্ছিল,

তা ভাল না লাগলেও কেবল বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনবার জন্যই অতিশয় সাগ্রহে তার সঙ্গে বসেছিল, ইত্যাদি।'

যদি সংবাদপত্রে আমার সম্বন্ধে যে সব কথা বার হয়েছে, তা কেটে পাঠিয়ে দিই, তুমি আশ্চর্য হবে। কিন্তু তুমি তো জানই, নাম-যশকে আমি ঘৃণা করি। এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে, যখনই আমি প্লাটফর্মে দাঁড়াতাম, তখনই আমার জন্য কর্ণবধিরকারী করতালি পড়ে যেত। প্রায় সব কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা করেছে। খুব গোঁড়াদের পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছে, 'এই সুন্দরমুখ বৈদ্যুতিক শক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এইটুকু জানলেই তোমাদের যথেষ্ট হবে যে, প্রাচ্যদেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিকান সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি!

আমেরিকানদের দয়ার কথা কি বলব! আমার এখন আর কোন অভাব নেই। আমি খুব সুখে আছি, আর ইউরোপ যেতে আমার যে খরচ লাগবে, তা আমি এখান হতেই পাব।

আর আমার বাড়ীভাড়া বা খাইখরচের জন্য এক পয়সাও লাগে না। কারণ ইচ্ছা করলেই এই শহরের অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ীতে আমি থাকতে পারি। আর আমি বরাবরই কারও না কারও অতিথি হয়ে রয়েছি।

আমি দিন দিন বুঝছি, প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, আর আমি তাঁর আদেশ অনুসরণ করবার চেষ্টা করছি। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। এই পত্রখানি খেতড়ির মহারাজাকে পাঠিয়ে দিও, আর এটা প্রকাশ কোরো না। আমরা জগতের জন্য অনেক মহৎ কার্য করব, আর তা নিঃস্বার্থভাবে করব, নামযশের জন্য নয়।

অনেকটা ভাব খুব অল্প কথার ভিতর প্রকাশ করা একটা বিশেষ শিল্পকলা বলতে হবে। এমন কি, মণিলাল দ্বিবেদীর প্রবন্ধও অনেক কাটছাঁট করতে হয়েছিল। প্রায় এক হাজারের বেশী প্রবন্ধ পড়া হয়েছিল, সুতরাং তাদের ওরকম আবোল-তাবোল বক্তৃতা শুনবার সময়ই ছিল না। অন্যান্য বক্তাদের সাধারণতঃ যে আধ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল, তা অপেক্ষা আমাকে অনেকটা বেশী সময় দেওয়া হয়েছিল, কারণ শ্রোতৃবৃন্দকে ধরে রাখবার জন্য সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় বক্তাদেরকে সর্বশেষে রাখা হত। আর আমার প্রতি এঁদের কি সহানুভূতি! এবং এদের ধৈর্যই বা কত! ভগবান্ তাদের আশীর্বাদ করুন। প্রাতে বেলা দশটা হতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তারা বসে থাকত, মধ্যে কেবল

খাবার জন্য আধ ঘণ্টা ছুটি—ইতিমধ্যে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পাঠ হত, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বাজে ও অসার, কিন্তু তারা তাদের প্রিয় বক্তাদের বক্তৃতা শুনবার অপেক্ষায় এতক্ষণ বসেই থাকত! সিংহলের ধর্মপালও তাদের অন্যতম প্রিয় বক্তা ছিলেন। তিনি বড়ই অমায়িক, আর এই মহাসভার অধিবেশনের সময় আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

এ দেশে বক্তৃতা করা খুব লাভজনক ব্যবসা, অনেক সময় এতে প্রচুর টাকা পাওয়া যায়। মিঃ ইঙ্গারসোল প্রতি বক্তৃতায় ৫০০ থেকে ৬০০ ডলার পর্যন্ত পেয়ে থাকেন। তিনি এই দেশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বক্তা।[২৮]

ধর্মমহাসভায়

হে আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ আপনারা আমাদিগকে যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার উত্তর দানের জন্য আমি ... হইয়াছি—ইহাতে আজ আমার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ... পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসি-সমাজের পক্ষ হইতে ...গকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ যে সনাতন ..., তাহার প্রতিনিধি হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান ...রিতেছি এবং কি বলিব—পৃথিবীর যাবতীয় হিন্দুজাতির ও যাবতীয় হিন্দু-সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই সভামঞ্চে সেই কয়েকজন বক্তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, যাঁহারা প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, অতি-দূর-দেশবাসী জাতিসমূহের মধ্য হইতে যাঁহারা এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন দেশে পরধর্মসহিষ্ণুতার ভাব-প্রচারের গৌরব দাবি করিতে পারেন। যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল সমদর্শন ও সর্ববিধ মত-গ্রহণের বিষয় শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা যে কেবল অন্য ধর্মাবলম্বী মত সহ্য করি, তাহা নহে—সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সক্লুশন' (অর্থাৎ হেয় বা পরিত্যাজ্য) শব্দটি কোনমতে অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত। যে জাতি পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম ও জাতিকে

যাবতীয় ত্রস্ত উপদ্রুত ও আশ্রয়লিপ্সু জনগণকে চিরকাল অকাতরে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমি আপনাদিগকে বলিতে গর্ব বোধ করিতেছি যে, যে বৎসর রোমানদিগের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে ইহুদীজাতির পবিত্র দেবালয় চূর্ণীকৃত হয়, সেই বৎসর তাহাদের কিয়দংশ দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয়লাভার্থ আসিলে আমরাই তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আজও তাহাদিগকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি। জরথুষ্ট্রের অনুগামী সবৃহৎ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্ম আশ্রয় দান করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত যে ধর্ম তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত।

কোটি কোটি নরনারী যে স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন, এবং যাহা আমি অতি বাল্যকাল হইতে আবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, তাহার একটি শ্লোকের অংশ আজ আপনাদের নিকট উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি—"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানাপথজুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥" অর্থাৎ, হে প্রভো, বিভিন্ন পথে গিয়াও যেরূপ সকল নদী একই সমুদ্রে পতিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন রুচি হেতু সরল ও কুটিল প্রভৃতি নানা পথগামীদেরও তুমিই সেইরূপ একমাত্র গম্য স্থান।[২৯]

আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীর জন্য তোমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলাম, খ্রীষ্টান দেশে খ্রীষ্টানদের কাছে থেকে অখ্রীষ্টানদের জন্য সাহায্য লাভ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার, বিশেষরূপে তা উপলব্ধি করছি।[৩০]

মনে পড়ে বাল্যকালে একদা এক খ্রীষ্টান পাদ্রীকে ভারতে এক ভিড়ের মধ্যে বক্তৃতা করতে শুনেছিলাম। নানাবিধ মধুর কথা বলতে বলতে তিনি বলে উঠলেন, 'আমি যদি তোমাদের বিগ্রহ-পুতুলকে এই লাঠি দ্বারা আঘাত করি, তবে তা আমার কি করতে পারে?' জনতার মধ্য হতে একজন বলল, 'আমি যদি তোমার ভগবান্‌কে গালাগালি দিই, তিনিই বা আমার কি করতে পারেন?' পাদ্রী উত্তর দিলেন, 'মৃত্যুর পর তোমার শাস্তি হবে।' সেই ব্যক্তিও বলল, 'তুমি মরলে পর আমার দেবতাও তোমাকে শাস্তি দেবেন।'

ফলেই বৃক্ষের পরিচয়। যখন দেখি যে, যাঁদেরকে পৌত্তলিক বলা হয়, তাঁদের মধ্যে এমন মানুষ আছেন, যাদের মতো নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম কখনও কোথাও দেখিনি, তখন মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় : পাপ হতে কি কখন পবিত্রতা জন্মাতে পারে?[৩১]

আমি একজন সন্ন্যাসী—আমার পরিচিতি দেওয়া হয়েছে ভিক্ষুকতুল্য বলে। এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অহঙ্কার। এদিক দিয়ে আমি খ্রীস্টতুল্য বলে গর্বিত। আজ আমার যা জোটে তাই খাই, কিন্তু আগামীকালের জন্যে চিন্তা করি না। 'পুষ্পক্ষেত্রে লিলিফুলের দিকে তাকিয়ে দেখ—তারা কখনো পরিশ্রম করে না, তকলিও ঘোরায় না।' হিন্দুদের ক্ষেত্রে এটা আক্ষরিকভাবে সত্য। এখানে, চিকাগোর এই মঞ্চে অনেক ভদ্রলোক উপবিষ্ট আছেন যাঁরা সাক্ষ্য দিতে পারেন যে গত দ্বাদশবর্ষ ধরে আমি জানি না আমার পরবর্তী আহার কিভাবে জুটবে। প্রভুর জন্যে ভিখারি হতে আমার গর্ব।[৩২]

এই দেশে আমার প্রথম বক্তৃতার সময়, চিকাগোতে, আমি শ্রোতৃমণ্ডলীকে 'আমার ভ্রাতা এবং ভগিনিগণ' সম্বোধন করেছিলাম এবং তোমরা জান যে, তারা সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তোমরা হয়তো অবাক হ'চ্ছ যে কেন তারা ঐরকম করেছিলেন। হয়তো ভেবেছ যে আমার কোন অলৌকিক শক্তি ছিল। তোমাদের আমি বলছি যে আমার একটা শক্তিই ছিল। সেটা হ'চ্ছে এই যে—আমি জীবনে কখনও নিজেকে কোনো যৌনতাসূচক চিন্তাতে প্রশ্রয় দিইনি। আমার চিন্তা, আমার মনকে এবং শক্তিকে আমি শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে, সব মানুষেরা সাধারণতঃ যে স্তরে চিন্তা করে, তার চেয়ে আমি উচ্চতর স্তরে প্রবাহিত করতাম এবং যার ফলে এমন দৃঢ় প্রবল একটা বেগ তৈরি হ'লো যাকে কোন কিছুই রোধ করতে পারেনি।[৩৩]

ধর্মমহাসভায় আমি কিছু বলেছিলাম এবং তা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল তার নিদর্শনস্বরূপ আমার হাতের কাছে যে দু-চারটি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা পড়ে আছে, তা থেকেই কিছু কিছু পাঠাই। নিজের ঢাক নিজে পিটানো আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু আপনি আমাকে স্নেহ করেন, সেই সূত্রে আপনার কাছে বিশ্বাস করে আমি একথা অবশ্য বলব যে, ইতিপূর্বে কোন হিন্দু এদেশে এরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। আমার আমেরিকা আগমনে যদি অন্য কোন কাজ নাও হয়ে থাকে, আমেরিকাবাসিগণ অন্ততঃ এটুকু উপলব্ধি করেছে যে, আজও ভারতবর্ষে এমন মানুষের আবির্ভাব হয়ে থাকে যাঁদের পাদমূলে বসে জগতের সর্বাপেক্ষা সভ্য জাতিও ধর্ম এবং নীতি শিক্ষা লাভ করতে পারে। আর হিন্দুজাতি যে একজন সন্ন্যাসীকে প্রতিনিধিরূপে এদেশে প্রেরণ করেছিল, তার সার্থকতা তাতেই যথেষ্টরূপে সাধিত হয়েছে বলে কি আপনার মনে হয় না?...

কয়েকটি পত্রিকার অংশবিশেষ আমি উদ্ধৃত করছি :

'সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার অনেকগুলিই বিশেষ বাগ্মিতাপূর্ণ হয়েছিল সত্য, কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসী ধর্মমহাসভার মূল নীতি ও তার সীমাবদ্ধতা যেমন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, অন্য কেউই তা করতে পারেনি। তাঁর বক্তৃতার সবটুকু আমি উদ্ধৃত করছি এবং শ্রোতাবৃন্দের উপর তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, দৈবশক্তিসম্পন্ন বক্তা তিনি এবং তাঁর অকপট উক্তিসমূহ যে মধুর ভাষার মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেন, তা তদীয় গৈরিক বসন এবং বুদ্ধিদীপ্ত দৃঢ় মুখমণ্ডল অপেক্ষা কম আকর্ষণীয় নয়।' —(নিউইয়র্ক ক্রিটিক)

ঐ পৃষ্ঠাতেই পুনর্বার লিখিত হয়েছে :

'তাঁর শিক্ষা, বাগ্মিতা এবং মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব আমাদের সামনে হিন্দু সভ্যতার এক নূতন ধারা উন্মুক্ত করেছে। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল, গম্ভীর ও সুললিত কণ্ঠস্বর স্বতই মানুষকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে এবং ঐ বিধিদত্ত সম্পদ্‌সহায়ে এদেশের বহু ক্লাব ও গির্জায় প্রচারের ফলে আজ আমরা তাঁর মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কোন প্রকার নোট প্রস্তুত করে তিনি বক্তৃতা করেন না। কিন্তু নিজ বক্তব্য বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে অপূর্ব কৌশল ও ঐকান্তিকতা সহকারে তিনি মীমাংসায় উপনীত হন এবং অন্তরের গভীর প্রেরণা তাঁর বাগ্মিতাকে অপূর্বভাবে সার্থক করে তোলে।'

'ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দই অবিসংবাদিরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর বক্তৃতা শুনে আমরা বুঝতে পারছি যে, এই শিক্ষিত জাতির মধ্যে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা কত নির্বুদ্ধিতার কাজ।'—(হেরাল্ড, এখানকার শ্রেষ্ঠ কাগজ)

আর অধিক উদ্ধৃত করলাম না। পাছে আমায় দাম্ভিক বলে মনে করেন।

আমি ভারতবর্ষে যেমন ছিলাম এখানেও ঠিক তেমন আছি, কেবল এই বিশেষ উন্নত ও মার্জিত দেশে যথেষ্ট সমাদর ও সহানুভূতি লাভ করছি—যা আমাদের দেশের নির্বোধগণ স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারে না। আমাদের দেশে সাধুকে এক টুকরা রুটি দিতেও সবাই কুণ্ঠিত হয় আর এখানে একটি বক্তৃতার জন্য এক হাজার টাকা দিতেও সকলে প্রস্তুত ; এবং যে উপদেশ এরা লাভ করল, তার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকে।

এই অপরিচিত দেশের নরনারী আমাকে যতটুকু বুঝতে পারছে, ভারতবর্ষে কেউ কখন ততটুকু বোঝেনি। আমি ইচ্ছা করলে এখন এখানে পরম আরামের মধ্যে জীবন কাটাতে পারি, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী এবং সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও

ভারতবর্ষকে ভালবাসি। অতএব দু-চার মাস পরেই দেশে ফিরছি এবং যারা কৃতজ্ঞতার ধারও ধারে না, তাদেরই মধ্যে আগেকার মতো নগরে নগরে ধর্ম ও উন্নতির বীজ বপন করতে থাকব।...

এখন এইসব উদ্ধৃত অংশ পাঠ করবার পর, ভারতবর্ষ থেকে একজন সন্ন্যাসী এদেশে প্রেরণ করা সমীচীন হয়েছে বলে আপনার মনে হয় কি?

অনুগ্রহপূর্বক এই চিঠি প্রকাশ করবেন না। ভারতবর্ষে থাকতেও যেমন, এখানেও ঠিক তেমনি—অপকৌশল দ্বারা নাম করাকে আমি ঘৃণা করি।

আমি প্রভুর কার্য করে যাচ্ছি এবং তিনি যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাব। 'মূকং করোতি বাচালং' ইত্যাদি। যাঁর কৃপা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়, তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। আমি মানুষের সাহায্যের অপেক্ষা রাখি না। যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, তবে ভারতবর্ষে কিংবা আমেরিকায় কিংবা উত্তর মেরুতে সর্বত্র তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। আর যদি তিনি সাহায্য না করেন, তবে অন্য কেউই করতে পারবে না। চিরকাল প্রভুর জয় হোক।[৩৪]

এখানকার ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল সব ধর্মের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা, কিন্তু তা সত্ত্বেও দার্শনিক হিন্দুধর্ম আপন মর্যাদা রক্ষা করতে সমর্থ।[৩৫]

আমার ধারণা চিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল—জগতের সামনে অ-খ্রীষ্টান ধর্মগুলিকে হীন প্রতিপন্ন করা। কিন্তু দাঁড়ালো অ-খ্রীষ্টান ধর্মের প্রাধান্য। সুতরাং খ্রীষ্টানদের দৃষ্টিতে ঐ মহাসভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। দেখ না কেন, এখন প্যারিসে আর একটা মহাসভা হবার কথা হচ্ছে, কিন্তু রোমান ক্যাথলিকরা যাঁরা চিকাগো মহাসভার উদ্যোক্তা ছিলেন, তাঁরাই এখন যাতে প্যারিসে ধর্মমহাসভা না হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন। কিন্তু চিকাগো সভা দ্বারা ভারতীয় চিন্তার বিশেষরূপ বিস্তারের সুবিধা হয়েছে! ওতে বেদান্তের চিন্তাধারা বিস্তার হবারও সুবিধে হয়েছে—এখন সমগ্র জগৎ বেদান্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। অবশ্য আমেরিকানরা চিকাগো সভার এই পরিণামে বিশেষ সুখী—কেবল গোঁড়া পুরোহিত আর 'চার্চের মেয়েরা' ছাড়া।[৩৬]

চিকাগোর সেই বিশ্ব-মহামেলা কী অদ্ভুত ব্যাপার! আর সেই ধর্মমহামেলা, যাতে পৃথিবীর সব দেশ থেকে লোক এসে নিজ নিজ ধর্মমত ব্যক্ত করেছিল, তাও কী অদ্ভুত! ডাক্তার ব্যারোজ ও মিষ্টার বনির অনুগ্রহে আমিও আমার

ভাবগুলি সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। মিষ্টার বনি কী অদ্ভুত লোক! একবার ভেবে দেখ দেখি, তিনি কিরকম দৃঢ়চেতা ব্যক্তি, যিনি মানসনেত্রে এই বিরাট অনুষ্ঠানটির কল্পনা করেছিলেন এবং তাকে কাজে পরিণত করতেও প্রভূত সফলতা লাভ করেছিলেন। তিনি আবার যাজক ছিলেন না ; তিনি নিজে একজন উকীল হয়েও যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের পরিচালকগণের নেতা ছিলেন। তিনি মধুরস্বভাব, বিদ্বান ও সহিষ্ণু—তাঁর হৃদয়ের গভীরতা, মর্মস্পর্শী ভাবসমূহ তাঁর উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে ব্যক্ত হত।[৩৭]

ঘটনার ঘনঘটা

আমার আমেরিকা-যাত্রা ধর্ম-মহাসভার জন্য নয়। এই সভার দ্বারা আমাদের পথ অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে, কাজেরও সুবিধা হয়েছে বটে। সেইজন্য আমরাও মহাসভার সভ্যগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু ঠিক ঠিক বলতে গেলে আমাদের ধন্যবাদ যুক্তরাষ্ট্রনিবাসী সহৃদয় অতিথিবৎসল উন্নত মার্কিনজাতির প্রাপ্য—যাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব অপর জাতি অপেক্ষা বিশেষরূপে বিকশিত হয়েছে। কোন মার্কিনের সঙ্গে ট্রেনে পাঁচ মিনিটের জন্য আলাপ হলেই তিনি তোমার বন্ধু হবেন এবং অতিথিরূপে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে প্রাণের কথা খুলে বলবেন। এই মার্কিন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—এটাই তাঁদের পরিচয়। তাঁদের ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ম নয়। আমার প্রতি তাঁদের সহৃদয়তা বর্ণনাতীত, আমার প্রতি তাঁরা যে অপূর্ব সদয় ব্যবহার করেছেন, তা প্রকাশ করতে আমার বহু বৎসর লাগবে।[১]

আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনেছি। শুনেছি সেখানে নাকি নারীগণের চালচলন নারীর মতো নয়, তারা নাকি স্বাধীনতা-তাণ্ডবে উন্মত্ত হয়ে পারিবারিক জীবনের সব সুখশান্তি পদদলিত করে চূর্ণ বিচূর্ণ করে এবং আরও ঐ প্রকারের নানা আজগুবি কথা শুনেছি। কিন্তু একবৎসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নরনারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে দেখছি, ঐরকম মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত! আমেরিকার নারীগণ! তোমাদের ঋণ আমি শত জন্মেও পরিশোধ

করতে পারব না। তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করে উঠতে পারি না। প্রাচ্য অতিশয়োক্তিই প্রাচ্য মানবের সুগভীর কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের একমাত্র উপযুক্ত ভাষা—

'অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং—'

'যদি সাগর মস্যাধার, হিমালয় পর্বত মসী, পারিজাতশাখা লেখনী, পৃথিবী পত্র হয়, এবং স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা হয়ে অনন্তকাল লিখতে থাকেন,' তথাপি তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে অসমর্থ হবে।

আমি গত বৎসর গ্রীষ্মকালে বহু দূরদেশ থেকে আগত, নাম-যশ ধন-বিদ্যাহীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দকশূন্য পরিব্রাজক প্রচারকরূপে এদেশে আসি। সেই সময় আমেরিকার নারীগণ আমাকে সাহায্য করেন, আহার ও প্রশ্রয় দেন, তাঁদের গৃহে নিয়ে যান এবং আমাকে তাঁদের পুত্ররূপে, সহোদররূপে যত্ন করেন। যখন তাঁদের নিজেদের যাজককুল এই 'বিপজ্জনক বিধর্মী'কে ত্যাগ করবার জন্য তাঁদের প্ররোচিত করছিলেন, যখন তাঁদের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই 'অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর, হয়তো বা সাংঘাতিক চরিত্রের লোকটির' সঙ্গ ত্যাগ করতে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখনও তাঁরা আমার বন্ধুরূপে বর্তমান ছিলেন। এই মহামনা নিঃস্বার্থ পবিত্র নারীগণই—চরিত্র ও অন্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করতে অধিকতর নিপুণা, কারণ নির্মল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়ে থাকে।

কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দেখেছি। কত শত জননী দেখেছি, যাঁদের নির্মল চরিত্রের, যাঁদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করবার ভাষা আমার নেই। কত শত কন্যা ও কুমারী দেখেছি, যারা 'ডায়ানা দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার ন্যায় নির্মল'—আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না। তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীস্বরূপা? তা নয়, ভাল মন্দ সব স্থানেই আছে। কিন্তু যাদের আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই দুর্বল মানুষগুলির দ্বারা সে সম্বন্ধে ধারণা করলে চলবে না; কারণ ওরা তো আগাছার মতো পড়ে থাকে। যা সৎ উদার ও পবিত্র, তা দ্বারাই জাতীয় জীবনের নির্মল ও সতেজ প্রবাহ নিরূপিত হয়।

আমি আমেরিকার আধুনিক রমণীগণের উদার মনের প্রশংসা করি। আমি

এদেশে অনেক উদারমনা পুরুষও দেখেছি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণভাবাপন্ন সম্প্রদায়ের। তবে একটি প্রভেদ আছে—পুরুষগণের পক্ষে একটি বিপদাশঙ্কা এই যে, তাঁরা উদার হতে গিয়ে নিজেদের ধর্ম খুইয়ে বসতে পারেন, কিন্তু নারীগণ যেখানে যা কিছু ভাল আছে, তার প্রতি সহানুভূতিহেতু উদারতা লাভ করে থাকেন, অথচ নিজেদের ধর্ম হতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না।[২]

এদেশের মেয়ের মতো মেয়ে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী—মেয়েরাই এদেশের সব। বিদ্যে বুদ্ধি সব তাদের ভেতর। এদেশের বরফ যেমনি সাদা, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন পবিত্র।[৩]

এদেশে এসে আমি বহু উদার প্রকৃতির পুরুষ ও নারীকে দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু ধর্মমহাসভার পর এক বিখ্যাত প্রেসবিটেরিয়ান সংবাদপত্র একটি তীব্র আক্রমণাত্মক রচনা দ্বারা আমাকে অভ্যর্থনা করেছিল। সম্পাদক এটাকে বলেন– 'উৎসাহ'।[৪]

ভেবে দেখ, তোমাদের এত সভ্যতার গর্ব সত্ত্বেও আমি নিতান্ত হিন্দু বলেই কোন এক অনুষ্ঠানে আমাকে বসতে আসন দেওয়া হয়নি।[৫]

পরধর্মবিদ্বেষ অনেক স্থানে এমন প্রবল যে, অনেক সময় মনে হয়েছে, আমাকে হয়তো বিদেশে হাড়-কখানা দিয়ে যেতে হবে।[৬]

ইঙ্গারসোল আমাকে বলেছিলেন, 'পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে প্রচার করতে আসলে আপনাকে এখানে ফাঁসি দেওয়া হত, আপনাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হত, অথবা ঢিল ছুঁড়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত।'[৭]

যীশুখ্রীষ্টের চরিত্রের সৌন্দর্য যে-হিন্দু দেখতে পায় না, তাকে আমি করুণার পাত্র ব'লে মনে করি। হিন্দু-খ্রীষ্টকে যে-খ্রীষ্টান শ্রদ্ধা করে না, তাকেও আমি করুণা করি।[৮]

যদি আমি ন্যাজারেথবাসী ঈশার সময়ে প্যালেস্টাইনে বাস করতাম, তাহলে চোখের জলে নয়, হৃদয়ের শোণিত দিয়ে আমি তাঁর পা-দুখানি ধুয়ে দিতাম।[৯]

সংগ্রাম সংবাদ

চিকাগো, ১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৩

আমি এখানে বহু চমকপ্রদ এবং অপূর্ব দৃশ্যাদি দেখছি। ...আমেরিকা একটি অদ্ভুত দেশ। দরিদ্র ও স্ত্রীজাতির পক্ষে এদেশ যেন স্বর্গের মতো। এদেশে দরিদ্র একরকম নেই বললেই চলে এবং অন্য কোথাও মেয়েরা এদেশে মেয়েদের মতো স্বাধীন, শিক্ষিত ও উন্নত নয়। সমাজে এরাই সব।

এ এক অপূর্ব শিক্ষা। সন্ন্যাসজীবনের কোন ধর্ম—এমন কি দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি জিনিসগুলি পর্যন্ত আমাকে পরিবর্তিত করতে হয়নি, অথচ এই অতিথিবৎসল দেশে প্রত্যেকটি গৃহদ্বারই আমার জন্য উন্মুক্ত। যে প্রভু ভারতবর্ষে আমাকে পরিচালিত করেছেন, তিনি কি আর এখানে আমাকে পরিচালিত করবেন না? তিনি তো করছেনই! একজন সন্ন্যাসীর এদেশে আসবার কী প্রয়োজন ছিল, আপনি হয়তো তা বুঝতে পারেন না, কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল। জগতের কাছে আমাদের পরিচয়ের একমাত্র দাবী—ধর্ম। সেই ধর্মের পতাকাবাহী যথার্থ খাঁটি লোক ভারতের বাইরে প্রেরণ করতে হবে। তা হলেই ভারতবর্ষ যে আজও বেঁচে আছে, এ কথা জগতের অন্যান্য জাতি বুঝতে পারবে।...

যে সন্ন্যাসীর অন্তরে অপরের কল্যাণ-সাধন-স্পৃহা নেই, সে সন্ন্যাসীই নয়—সে তো পশুমাত্র!

আমি অলস পর্যটক নই, কিংবা দৃশ্য দেখে বেড়ানোও আমার পেশা নয়। যদি বেঁচে থাকেন, তবে আমার কার্যকলাপ দেখতে পাবেন এবং আমাকে আজীবন আশীর্বাদ করবেন।[১০]

চিকাগো, নভেম্বর, ১৮৯৪

এদেশে '—'রা বক্তৃতা করে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করছিল এবং কিছু সাফল্য লাভ যে করেনি—এমন নয়, কিন্তু তার চাইতে অধিকতর সাফল্য আমি লাভ করেছিলাম। আমি কোনপ্রকারে তাদের বিঘ্নস্বরূপ হইনি। তবে কি কারণে আমার সাফল্য অধিক হয়েছিল? কারণ ওটাই ভগবানের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু এইসব নিয়ে আমার সম্পর্কে ভয়ানক মিথ্যা অতিরঞ্জিত করে এইদেশে এরা আমার পিছনে প্রচারিত করছে।

লোকে কি বলল—সেদিকে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। আমার ভগবানকে, আমার ধর্মকে, আমার দেশকে—সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষুককে আমি ভালবাসি।

নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি ভালবাসি। তাদের বেদনা অন্তরে অনুভব করি, কত তীব্রভাবে অনুভব করি, তা প্রভুই জানেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। মানুষের স্তুতি-নিন্দায় আমি দৃকপাতও করি না, তাদের অধিকাংশকেই অজ্ঞ কলরবকারী শিশুর মতো মনে করি। সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার মর্মকথাটি এরা কখনও বুঝতে পারে না।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে আমার সে অন্তর্দৃষ্টি আছে। মুষ্টিমেয় সহকর্মীদের নিয়ে এখন আমি কাজ করতে চেষ্টা করছি, আর তাদের প্রত্যেকে আমারই মতো দরিদ্র ভিক্ষুক। তাদের আপনি দেখেছেন। প্রভুর কাজ চিরদিন দীন-দরিদ্রগণই সম্পন্ন করেছেন। আশীর্বাদ করবেন যেন ঈশ্বরের প্রতি, গুরুর প্রতি এবং নিজের প্রতি আমার বিশ্বাস অটুট থাকে।

প্রেম এবং সহানুভূতিই একমাত্র পথ। ভালবাসাই একমাত্র উপাসনা।[১১]

মিনিয়াপোলিস, মিনেসোটা, ২৪শে নভেম্বর, ১৮৯৩

প্রথম যেদিন আমি এখানে এলাম, সেইবার এখানে প্রথম তুষারপাত হ'য়েছে, আর সারা দিন সারা রাত ধরে তুষারপাত হয়েছিলো। আর আমার 'আরক্‌টিক্‌স' (জল-কাদা-বরফ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এক ধরনের রবারের জুতো) দারুণভাবে কাজে আসে। আমি বরফে পরিণত মিনেহাহা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলাম। সে বড় সুন্দর। আজ তাপমাত্রা শূন্যের চাইতে ২১ ডিগ্রি কম, কিন্তু আমি স্লেজ গাড়িতে বেরিয়ে পড়ে এটা খুবই উপভোগ করেছিলাম। এর থেকে কান আর নাকের ডগা জ্বালা করতে পারে ভেবেও এতটুকু ভয় পাইনি।

বরফে ঢাকা এই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে যে আনন্দ আমি পেয়েছি, সেটা এই দেশের অন্য কোনো দৃশ্য দেখে আনন্দ পাবার চাইতেও বেশী।

গতকাল কিছু লোককে দেখলাম এক বরফাবৃত হ্রদের ওপরে স্কেটিং জুতো পায়ে স্কেট করছে।[১২]

ডেট্রয়েট, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪

এখানে আমার বক্তৃতা শেষ হ'য়েছে। এখানে আমার সঙ্গে কিছু ভাল লোকের বন্ধুত্ব হ'য়েছে, যাদের মধ্যে বিগত বিশ্বমেলার সভাপতি মিস্টার পামার অন্যতম। আমি স্লেটনের বিষয়ে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ, প্রবল চেষ্টা করছি তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য। এই লোকের পাল্লায় পড়ে আমি প্রায় ৫০০ ডলার খুইয়ে বসেছি...

ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকা এইসব অভ্যর্থনা-ভোজন বড়ই ক্লান্তিকর।

আবার তার ওপরে এদের বিরক্তির আহার—শতশত খাবারের পদ একইসঙ্গে পরিবেশন আর পুরুষদের ক্লাবে, কেনই যে প্রত্যেক পদের মাঝে ধূমপান করা, আর নতুনভাবে আবার শুরু করা।

আমার ধারণা ছিল, চীনারাই একমাত্র অর্ধেক দিন ধরে আহার গ্রহণ করে আর, তারই মাঝে মাঝে চলে ধূমপান। যাইহোক, এঁরা কিন্তু অতি ভদ্রলোক। বলতে অবাক লাগে যে বিশপ পর্যায়ের এক পাদরী এবং এক ইহুদি চিকিৎসক আমার প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হন এবং আমার উচ্চ প্রশংসা করেন। এখানে যারা যারা বক্তৃতা দিতে উঠেছে অন্ততঃ পক্ষে হাজার ডলার করে পেয়েছে। সব জায়গাতেই এটা হ'য়েছে। এবং আমার জন্য এগুলো করাই স্লেটনের কাজ। তার পরিবর্তে সেই মিথ্যাবাদী আমাকে প্রায়ই বলে যে সর্বস্থলেই তার প্রতিনিধিরা র'য়েছেন এবং আমার হ'য়ে বিজ্ঞাপন করবে। আর সব ব্যবস্থাও করবে।

আমি বাড়ী ফিরছি। আমার প্রতি আমেরিকান মানুষজনের ভালবাসা দেখে, আমি এতদিনে হ'য়তো প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতাম। কিন্তু আমার পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবার জন্য প্রভু বোধ হয় জিমি মিল্‌স এবং স্লেটন্‌কে পাঠিয়েছেন। তাঁর পন্থা দুর্জ্ঞেয়!

যাই হোক, এটা একটা গোপনীয় ব্যাপার। প্রেসিডেন্ট পামার চিকাগোতে গিয়েছেন, যাতে স্লেটনকে মিথ্যাকথন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। প্রার্থনা কর তিনি যেন কৃতকার্য হন। এখানে অনেক বিচারক আমার চুক্তিপত্র দেখেছেন, তাঁরা বলেছেন যে এটা একটা নিন্দনীয় প্রতারণা, যে কোনো মুহূর্তে ছিন্ন করা যায়। কিন্তু আমি একজন সন্ন্যাসী—কোন আত্মপক্ষ সমর্থন নেই। আমি বরং সমস্ত কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভারতে ফিরে যাই। [১৩]

ডেট্রয়েট, ১২ই মার্চ, ১৮৯৪

আমি এখন মিঃ পামারের অতিথি। ইনি বড় চমৎকার লোক।...

...এক নাট্যশালায় বক্তৃতা দিলাম আড়াই ঘণ্টা ; সকলেই খুব খুশী। এইবার বস্টন আর নিউইয়র্কে যাচ্ছি। এখানকার আয় থেকেই ওখানকার খরচ কুলিয়ে যাবে। ফ্ল্যাগ ও অধ্যাপক রাইটের ঠিকানা মনে নাই। মিশিগানে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি না। মিঃ হলডেন আজ প্রাতে খুব বোঝাচ্ছিলেন আমাকে—মিশিগানে বক্তৃতা দেবার জন্য। আমার কিন্তু এখন বস্টন ও নিউইয়র্ক একটু ঘুরে দেখবার আগ্রহ। সত্য কথা বলতে কি, যতই আমি জনপ্রিয় হচ্ছি এবং আমার বাগ্মিতার উৎকর্ষ বাড়ছে, ততই আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। [১৪]

ডেট্রয়েট, ১৫ই মার্চ, ১৮৯৪

বুড়ো পামারের সঙ্গে আমার বেশ জমেছে। বৃদ্ধ সজ্জন ও সদানন্দ।...আমার সম্বন্ধে সব চেয়ে মজার কথা লিখেছে এখানকার এক সংবাদপত্র : ঝঞ্ঝা-সদৃশ হিন্দুটি এখানে মিঃ পামারের অতিথি, মিঃ পামার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন, ভারতবর্ষে যাচ্ছেন। তবে তাঁর জেদ, দুটি বিষয়ে কিছু অদল-বদল চাই—জগন্নাথদেবের রথ টানবে তাঁর লগ্ হাউস ফার্মের 'পারচেরন্' জাতীয় অশ্ব, আর তাঁর জার্সি গাভীগুলিকে হিন্দুর গোদেবী-সম্প্রদায়ভুক্ত ক'রে নিতে হবে। এই জাতীয় অশ্ব ও গাভী মিঃ পামারের লগ্ হাউস ফার্মে বহু আছে এবং এগুলি তাঁর খুব আদরের।

প্রথম বক্তৃতা সম্পর্কে আয়োজনগুলো ঠিক হয়নি' হলের ভাড়াই লেগেছিল একশো পঞ্চাশ ডলার। হলডেনকে ছেড়ে দিয়েছি। অন্য একজন জুটেছে, দেখি এতে ব্যবস্থা ভাল হয় কি না। মিঃ পামার আমায় সারাদিন হাসান। আগামী কাল ফের এক নৈশভোজ হবে। এ পর্যন্ত সব ভালই যাচ্ছে, কিন্তু জানি না কেন, এখানে আসা অবধি আমার মন বড় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

বক্তৃতা প্রভৃতি বাজে কাজে একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছি। শত শত রকমের মনুষ্যনামধারী কতকগুলি জীবের সঙ্গে মিশে মিশে উত্যক্ত হয়ে উঠেছি। আমার বিশেষ পছন্দের বস্তুটি যে কি, তা বলছি। আমি লিখতেও পারি না, বক্তৃতা করতেও পারি না; কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করতে পারি, আর যখন উদ্দীপ্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠি, তখন কথার অগ্নি বর্ষণ করতে পারি ; কিন্তু তা অল্প, অতি অল্পসংখ্যক পছন্দসই লোকের সামনে হওয়া দরকার। যদি তাদের ইচ্ছা হয় তো আমার ভাবগুলো জগতে প্রচার করুক—আমি এসব ক'রব না। কাজের এ একটা যুক্তিযুক্ত বিভাগ মাত্র।

একই মানুষ চিন্তা ক'রে তারপর সেই চিন্তালব্ধ ভাব নিজে প্রচার ক'রে কখনও সফল হ'তে পারেনি। ঐরূপে প্রচারিত ভাবের মূল্য কিছুই নয়। চিন্তা করবার, বিশেষ ক'রে আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন।

স্বাধীনতার এই দাবী এবং মানুষ যে যন্ত্র নয়—এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাই সব ধর্মচিন্তার সার কথা, সুতরাং যন্ত্রের মতন রুটিনমাফিক চিন্তা সম্ভব নয়। সব কিছুকে যন্ত্রের স্তরে টেনে নামাবার এই প্রবৃত্তিই পাশ্চাত্যকে অপূর্ব সম্পদশালী করেছে সত্য, কিন্তু এই প্রবৃত্তিই আবার সব রকম ধর্মকে তার দ্বারপ্রান্ত থেকে বিতাড়িত করেছে। যৎসামান্য যা কিছু অবশিষ্ট আছে, পাশ্চাত্য তাকেও পদ্ধতিগত কসরতে পর্যবসিত করেছে।

আমি মোটেই 'ঝঞ্ঝাসদৃশ' নই, বরং ঠিক তাঁর বিপরীত। আমার যা কাম্য, তা এখানে লভ্য নয়। এই 'ঝঞ্ঝাবর্তময়' আবহাওয়াও আমি আর সহ্য করতে পারছি না। পূর্ণত্বলাভের পথ এই যে, নিজেকে 'পারফেক্ট' করতে হবে। কিছু পুরুষ ও রমণীকে পারফেক্ট করার জন্যে যথাশক্তি চেষ্টা করতে হবে। বেনাবনে মুক্তা ছড়িয়ে সময়, স্বাস্থ্য ও শক্তির অপব্যয় করা আমার কর্ম নয়—মুষ্টিমেয় কয়েকটি বড় আকারের মানুষ তৈরি করাই আমার ব্রত।

এইমাত্র ফ্ল্যাগের এক চিঠি পেলাম। বক্তৃতা-ব্যাপারে তিনি আমাকে সাহায্য করতে অক্ষম। তিনি বলছেন, 'আগে বস্টনে যাও।' বক্তৃতা দেবার সাধ আমার আর নেই। আমাকে দিয়ে কোন ব্যক্তি বা শ্রোতাদের খুশী করবার চেষ্টা—এটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না...[১৫]

ডেট্রয়েট, ১৬ই মার্চ, ১৮৯৪

আমি কোনোরকমভাবেই উদ্বিগ্ন নই। জীবনকে আমি সহজভাবে আমার স্বভাব মতন গ্রহণ করছি। কোথাও যাবার বিশেষ ইচ্ছা আমার নেই, সে বস্টন হোক বা না হোক। যা-হয়-তা-হবে এই মেজাজে রয়েছি। ভাল বা মন্দ কিছু একটা হয়ে যাবে। আমার কাছে এখন যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ রয়েছে যা দিয়ে দেশে ফেরত যাবার এবং একটু আধটু দেশদর্শন সম্ভব। 'কাজ'-সংক্রান্ত কিছু পরিকল্পনা আমার র'য়েছে, যে গতিতে সব এগুচ্ছে, তাতে আরও চার-পাঁচ বার আমাকে এখানে ফেরত আসতে হবে।

সবাইকে জানানো আর সেভাবে সবার ভাল করতে যাবার ব্যাপারে বলব যে জগৎকে আমার বলবার কিছু নেই। সুতরাং এই মুহূর্তে আমি খুব খুশী এবং বেশ আরামেই রয়েছি। বিশাল প্রায়-জনমানবহীন এই বাড়ীতে আমি একাকী দুই ঠোঁটের মধ্যে চুরুট গুঁজে স্বপ্ন দেখছি এবং যে কর্মজ্বর এতদিন শরীরে ছিল তার সম্বন্ধে একটু দার্শনিক চিন্তা করছি। এ সবই অর্থহীন। আমি কিছুই নই এই পৃথিবীও কিছু নয়, ঈশ্বরই একমাত্র কাজের লোক। আমরা তাঁর হাতের পুতুলমাত্র।...[১৬]

ডেট্রয়েট, ১৭ই মার্চ, ১৮৯৪

মিঃ পামারের সঙ্গে বেশীসময় থাকার জন্য মিসেস ব্যাগলি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় আমি আজ তাঁর কাছে ফিরেছি। পামারের বাড়ীতে বেশ ভালই কেটেছে। পামার সত্যি আমুদে দিলখোলা মজলিশী লোক, একটু বেশীমাত্রার 'ঝাঁঝালো স্কচ'-এর ভক্ত ; কিন্তু মানুষটি নিতান্ত নির্মল আর শিশুর মতো সরল।

আমি চলে আসছি জেনে খুব দুঃখিত হলেন। কিন্তু আমার অন্য কিছু করবার ছিল না।[১৭]

ডেট্রয়েট, ১৮ই মার্চ, ১৮৯৪ [মেরী হেলকে লেখা চিঠি]

কলকাতার চিঠিখানা আমাকে পাঠানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানবে। চিঠিটা আমার গুরুভাইরা পাঠিয়েছেন, গুরুদেব সম্বন্ধে অনেক কথাই তুমি আমার কাছে শুনেছ। তাঁরই জন্মতিথি অনুষ্ঠানের একটি ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণপত্র কলকাতার গুরুভায়েরা আমাকে পাঠিয়েছেন। চিঠিটি তোমাকে ফেরত পাঠাচ্ছি।

মজুমদার কলকাতায় ফিরেছেন এবং ওখানে বলে বেড়াচ্ছেন যে, বিবেকানন্দ ওদেশে যতরকম সম্ভব পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছে, বিশেষ করে সর্বনিম্নস্তরের চরিত্রহীনতায়!!! ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে আশীর্বাদ করুন। আপনি দুঃখ পাবেন না—আমার দেশে আমার চরিত্র সকলে অত্যন্ত ভাল করে জানে, বিশেষ করে আমার আজীবন সঙ্গী ভ্রাতৃবৃন্দ আমাকে এত ভাল করে জানে যে, তারা এইসব জঘন্য বাজে কথা কখনও বিশ্বাস করবে না। মজুমদারের এ প্রচেষ্টাকে তারা অত্যন্ত কৌশলহীন বলে হাসবে। এই হচ্ছেন, 'আমেরিকার আশ্চর্য আধ্যাত্মিক মানুষ'!!—এ অবশ্য মার্কিনীদের ত্রুটি নয়। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি সত্যই আধ্যাত্মিক হয়ে উঠেছে, যতক্ষণ না তার নিজের ভিতরে আত্মার স্বরূপ এবং সত্যকারের অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভুষি থেকে আসল বীজের পার্থক্য, বুঝে ওঠা সম্ভব নয়...। এতটা নিচে নেমে যাবার জন্য হতভাগ্য মজুমদারের ওপর আমার মায়া হচ্ছে। এই বৃদ্ধ বালককে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন।

চিঠিতে ইংরেজীতে আমার যে নামটি রয়েছে সেটি বহু আগেকার ; পত্র লেখক আমার শৈশবের সাথী ; এখন আমার মতো সন্ন্যাসী। বেশ কবিত্বপূর্ণ নাম! আমার ছোট নামটি ব্যবহার করেছে। পুরোনামটা হচ্ছে 'নরেন্দ্র,' অর্থাৎ 'মানুষের সেরা' ('নর' মানে মানুষ, আর 'ইন্দ্র' মানে রাজা, অধিপতি)—হাস্যাস্পদ নয় কি? আমাদের দেশে এই রকম নামই হয়। আমাদের কিছু করবার নেই। সে নামটি যে ছাড়তে পেরেছি, তাতেই আমি খুশী।[১৮]

চিকাগো, ১৯শে মার্চ, ১৮৯৪

এদেশে আমার কোন অভাব নাই; তবে ভিক্ষা চলে না, পরিশ্রম অর্থাৎ উপদেশ করিতে হয় স্থানে স্থানে। এদেশে যেমন গরম তেমনি শীত। গরমি

কলকাতা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। শীতের কথা কি বলিব, সমস্ত দেশ দু-হাত তিন হাত কোথাও চার পাঁচ হাত বরফে ঢাকা। দক্ষিণভাগে বরফ নাই! বরফ তা ছোট জিনিস। যখন পারা জিরোর উপর বত্রিশ দাগ থাকে, তখন বরফ পড়ে। কলকাতায় কদাচ ৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট হয়—জিরোর উপর, ইংলণ্ডে কদাচ জিরোর কাছে যায়। এখানে পারার পো জিরোর নিচে ৪ ডিগ্রি অথবা ৫ ডিগ্রি তক নেবে যান। উত্তরভাগে কানাডায় পারা জমে যায়। তখন আলকোহল থারমোমিটার ব্যবহার করিতে হয়। যখন বড্ড ঠাণ্ডা, অর্থাৎ যখন পারা জিরোর উপর ২০ ডিগ্রিরও নিচে থাকে, তখন বরফ পড়ে না।

আমার বোধ ছিল—বরফ পড়া একটা বড় ঠাণ্ডা। তা নয়, বরফ অপেক্ষাকৃত গরম দিনে পড়ে। বেজায় ঠাণ্ডায় এক রকম নেশা হয়। গাড়ী চলে না, শ্লেজ চক্রহীন—ঘসড়ে যায়। সব জমে কাঠ—নদী নালা লেকের (হ্রদের) উপর হাতী চলে যেতে পারে! নায়াগারার প্রচণ্ড প্রবাহশালী বিশাল নির্ঝর জমে পাথর!!! আমি কিন্তু বেশ আছি। প্রথমে একটু ভয় হয়েছিল, তারপর গরজের দায়ে একদিন রেলে করে কানাডার কাছে, দ্বিতীয় দিন দক্ষিণ আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র) লেকচার করে বেড়াচ্চি! গাড়ী ঘরের মতো, স্টিম্ পাইপ (নলবাহিত বাষ্প)-যোগে খুব গরম, আর চারিদিকে বরফের রাশি ধপধপে সাদা, সে অপূর্ব শোভা!

বড় ভয় ছিল যে, আমার নাক কান খসে যাবে, কিন্তু আজিও কিছু হয় নাই। তবে রাশীকৃত গরম কাপড়, তার উপর সলোম চামড়ার কোট, জুতো, জুতোর উপর পশমের জুতো ইত্যাদি আবৃত হয়ে বাইরে যেতে হয়। নিঃশ্বাস বেরুতে না বেরুতেই দাড়িতে জমে যাচ্চেন। তাতে তামাসা কি জান? বাড়ির ভেতর জলে এক ডেলা বরফ না দিয়ে এরা পান করে না। বাড়ির ভেতর গরম কিনা, তাই। প্রত্যেক ঘরে, সিঁড়িতে স্টিম্ পাইপ গরম রাখছে।

কলা-কৌশলে এরা অদ্বিতীয়, ভোগে-বিলাসে এরা অদ্বিতীয়, পয়সা রোজগারে অদ্বিতীয়, খরচে অদ্বিতীয়। কুলীর রোজ ৬ টাকা, চাকরের তাই, ৩ টাকার কম ঠিকা গাড়ী পাওয়া যায় না। চারি আনার কম চুরুট নাই। ২৪ টাকায় মধ্যবিৎ জুতো একজোড়া। ৫০০ টাকায় একটা পোশাক। যেমন রোজগার, তেমনই খরচ। একটা লেকচার ২০০। ৩০০। ৫০০। ২০০০। ৩০০০ টাকা পর্যন্ত। আমি ৫০০ টাকা পর্যন্ত পাইয়াছি। অবশ্য—আমার এখানে এখন পোয়াবারো। এরা আমায় ভালবাসে, হাজার হাজার লোক

আমার কথা শুনিতে আসে।

প্রভুর ইচ্ছায় মজুমদার মশায়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি, পরে যখন চিকাগোসুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙে পড়তে লাগলো তখন মজুমদার ভায়ার মনে আগুন জ্বলল!... আমি দেখেশুনে অবাক! বল্ বাবা, আমি কি তোর অন্নে ব্যাঘাত করেছি? তোর খাতির তো যথেষ্ট এদেশে। তবে আমার মতো তোমাদের হলো না, তা আমার কি দোষ?... আর মজুমদার পার্লামেন্ট অব্ রিলিজিয়নের পাদ্রীদের কাছে আর যথেষ্ট নিন্দা করে, 'ও কেউ নয়, ঠক জোচ্চোর; ও তোমাদের দেশে এসে বলে—আমি ফকির' ইত্যাদি বলে তাদের মন আমার উপর যথেষ্ট বিগড়ে দিলে। ব্যারোজ প্রেসিডেন্টকে এমনি বিগড়ালে যে, সে আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও কয় না। তাদের পুস্তকে প্যাম্ফলেটে যথাসাধ্য আমায় দাবাবার চেষ্টা; কিন্তু গুরু সহায় বাবা! মজুমদার কি বলে? সমস্ত আমেরিকান নেশন যে আমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, টাকা দেয়, গুরুর মতো মানে—মজুমদার করবে কি? পাদ্রী-ফাদ্রীর কি কর্ম? আর এরা বিদ্বানের জাত। এখানে 'আমরা বিধবার বে দিই, আর পুতুলপূজা করি না'—এসব আর চলে না—পাদ্রীদের কাছে কেবল চলে, এরা চায় ফিলসফি, লার্নিং (বিদ্যা), ফাঁকা গপ্পি আর চলে না।

ধর্মপাল ছোকরা বেশ, ...ভাল মানুষ। তার এদেশে যথেষ্ট আদর হয়েছিল। মজুমদারকে দেখে আমার আক্কেল এসে গেল। বুঝতে পারলুম, 'যে নিঘ্নন্তি পরহিতং নিরর্থকং তে কে ন জানীমহে'—ভর্তৃহরি। (যারা নিরর্থক পরের অনিষ্টসাধন করে, তারা যে কেমন লোক, তা বলতে পারি না।)

সব যায়, ওই পোড়া হিংসেটা যায় না। আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা। হামবড়া, আর কেউ বড় হবে না।

এদেশের মেয়ের মতো মেয়ে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী—মেয়েরাই এদেশের সব। বিদ্যে বুদ্ধি সব তাদের ভেতর। 'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু' (যিনি পুণ্যবানদের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিণী) এদেশে, আর 'পাপাত্মনাং হৃদয়েষ্বলক্ষ্মীঃ' (পাপাত্মাগণের হৃদয়ে অলক্ষ্মীস্বরূপিণী) আমাদের দেশে, এই বোঝ। হরে, হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। 'ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীঃ' ইত্যাদি—(তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমি লজ্জাস্বরূপিণী)। 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ

সংস্থিতা' (যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা) ইত্যাদি। এদেশের বরফ যেমনি সাদা, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন পবিত্র। আর আমাদের দশ বৎসরের বেটা-বিউনিরা!! প্রভো, এখন বুঝতে পারছি। আরে দাদা, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' (যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দ করেন)—বুড়ো মনু বলেছে।

আমরা মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে। বাপ, আকাশ-পাতাল ভেদ!! 'যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ' (যথোপযুক্তভাবে কর্মফল বিধান করেন)। প্রভু কি গপ্পিবাজিতে ভোলেন? প্রভু বলেছেন, 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী' ইত্যাদি—(তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই বালক ও তুমিই বালিকা)। আর আমরা বলছি—'দূরমপসর রে চণ্ডাল' (ওরে চণ্ডাল, দূরে সরিয়া যা), 'কেনৈষা নির্মিতা নারী মোহিনী' ইত্যাদি (কে এই মোহিনী নারীকে নির্মাণ করিয়াছে?)।

ওরে ভাই, দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি, উচ্চজাতির নীচের উপর যে অত্যাচার! মন্দিরে যে দেবদাসীদের নাচার ধুম! যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের 'ছুঁৎমার্গ', খালি 'আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না'। হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু-হাজার বৎসর খালি বিচার করছে—ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে; ডান দিক থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক থেকে এবং ফট্ ফট্ স্বাহা, ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ করে, তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে? 'কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ' (সকলে নিদ্রিত হয়ে থাকলেও কাল জাগরিত থাকেন, কালকে অতিক্রম করা বড় কঠিন)। তিনি জানছেন, তাঁর চক্ষে কে ধুলো দেয় বাবা!

যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ-বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরিবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য! দাদা, এটি তলিয়ে বোঝ—ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এ দেশ দেখেছি। কারণ বিনা কার্য হয় কি? পাপ বিনা সাজা মিলে কি? সর্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্। পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥ (সমুদয় শাস্ত্র ও পুরাণে ব্যাসের দুটি বাক্য—পরোপকার করিলে পুণ্য ও পরপীড়ন করিলে পাপ উৎপন্ন হয়।) সত্য নয় কি?

এইসব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না;

একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম কেপ কমোরিন্ (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে মেটা ফিসিক্স (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরিবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু-পা দিয়ে দলেছে।

মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কোন্ কাজ করে?—তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্যু সন্ন্যাসী—গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, ম্যাপ, ক্যামেরা, গ্লোব (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না। এ সমস্ত প্ল্যান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখতে পারি না। ফলকথা—If the mountain does not come to Mahomed, Mahomed must come to the mountain. গরিবেরা এত গরিব, তারা স্কুল পাঠশালে আসতে পারে না, আর কবিতা-ফবিতা পড়ে তাদের কোনও উপকার নাই। We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and *raise the massess*. The Hindu, the Mahommedan, the Christian, all have trampled them under foot. Again the force to raise them must come from inside, i.e., from the orthodox Hindus. In every country the evils exist not with but against religion. Religion, therfore, is not to blame, but men.

এই করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গুরুর কৃপায় প্রতি শহরে আমি ১০।১৫ জন লোক পাব। পয়সার চেষ্টায় তার পর ঘুরলাম। ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে!!! Fools and dotards and Selfishness personified—তারা দেবে! তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার করব, করে দেশে যাব and devote the rest of my life to the realization of this one aim of my life.

যেমন আমাদের দেশে সোসাল ভার্চুর অভাব, তেমনি এ দেশে স্পিরিচুয়ালিটি নাই, এদের স্পিরিচুয়ালিটি দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে। কত দিনে সিদ্ধকাম হবো জানি না, আমাদের মতো এরা 'হিপক্রিট' নয়, আর জিলাসি একেবারে নাই। হিন্দুস্থানের কারও উপর ডিপেন্ড করি না। নিজে প্রাণপণ করে রোজগার করে নিজের প্ল্যানস ক্যারি আউট করব 'অর ডাই ইন দ্য অ্যাটেম্পট' (কিংবা ঐ চেষ্টায় মরব)। 'সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে

নিয়তে সতি'—(যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন সৎ উদ্দেশ্যে দেহত্যাগ করাই ভাল)।

তোমরা হয়তো মনে করতে পার, কি ইউটোপিয়ান্ ননসেন্স (অসম্ভব বাজে কথা)। You little know what is in me (আমার ভিতর কি আছে, তোমরা মোটেই জানো না)। আমাদের ভেতর যদি কেউ আমায় সহায়তা করে ইন্ মাই প্লান (আমার পরিকল্পনা সফল করতে)—অল রাইট (খুব উত্তম); নইলে কিন্তু গুরুদেব উইল শো মি দ্য ওয়ে আউট (আমাকে পথ দেখাইবেন)।

সকলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিও—সকলে jealousy ত্যাগ করে এককাট্টা হয়ে থাকতে পারবে কি না। যদি না পারে, যারা হিংসুটেপনা না করে থাকতে পারে না, তাদের ঘরে যাওয়াই ভাল, আর সকলের কল্যাণের জন্য। ঐটে আমাদের জাতের দোষ, ন্যাশনল সিন (জাতিগত পাপ)!! এদেশে ঐটে নাই, তাই এরা এত বড়।[১৯]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রীষ্মকাল, ১৮৯৪

এ বড় মজার দেশ। গরমি পড়েছে—আজ সকালবেলা আমাদের বৈশাখের গরমি, আর এখন এলাহাবাদের মাঘ মাসের শীত!! চার ঘণ্টার ভেতর এত পরিবর্তন! এখানে হোটেলের কথা কি বলব। নিউইয়র্কে এক হোটেল আছেন, যেখানে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত রোজ ঘরভাড়া, খাওয়া-দাওয়া ছাড়া। ভোগবিলাসের দেশ ইউরোপেও এমন নেই—এরা হ'ল পৃথিবীর মধ্যে ধনী দেশ—টাকা খোলামকুচির মতো খরচ হয়ে যায়। আমি কদাচ হোটেলে থাকি, আমি প্রায়ই এদের বড় বড় লোকের অতিথি—আমি এদের একজন নামজাদা মানুষ এখন। মুলুক সুদ্ধ লোকে আমায় জানে, সুতরাং যেখানে যাই, আগ বাড়িয়ে আমায় ঘরে তুলে নেয়। মিঃ হেল, যাঁর বাড়ীতে চিকাগোয় আমার centre (কেন্দ্র), তাঁর স্ত্রীকে আমি 'মা' বলি, আর তাঁর মেয়েরা আমাকে 'দাদা' বলে ; এমন মহা পবিত্র দয়ালু পরিবার আমি তো আর দেখি না। আরে ভাই, তা নইলে কি এদের উপর ভগবানের এত কৃপা? কি দয়া এদের। যদি খবর পেলে যে, একজন গরীব ফলানা জায়গায় কষ্টে রয়েছে, মেয়েমদ্দ চ'লল—তাকে খাবার, কাপড় দিতে, কাজ জুটিয়ে দিতে।...

...ভাল কথা, এখানে ইলিস মাছ অপর্যাপ্ত আজকাল। ভরপেট খাও, সব হজম। ফল অনেক—কলা, নেবু, পেয়ারা, আপেল, বাদাম, কিসমিস, আঙ্গুর যথেষ্ট, আরও অনেক ফল ক্যালিফর্নিয়া হ'তে আসে। আনারস ঢের—তবে আম, নিচু ইত্যাদি নাই!

এক রকম শাক আছে, Spinach—যা রাঁধলে ঠিক আমাদের নটে শাকের মতো খেতে লাগে, আর যেগুলোকে এরা 'অ্যাসপারাগাস' বলে, তা ঠিক যেন কচি ডেঙ্গোর ডাঁটা, তবে 'গোপালের মার চচ্চড়ি' নেই বাবা। কলায়ের দাল কি কোনও দাল নেই, এরা জানেও না। ভাত আছে, পাউরুটি আছেন, হর-রঙের নানা রকমের মাছমাংস আছেন। এদের খানা ফরাসীদের মতো। দুধ আছেন, দই কদাচ, ঘোল অপর্যাপ্ত। মাঠা 'ক্রিম' সর্বদাই ব্যবহার। চায়ে, কাফিতে, সকল তাতেই ঐ মাঠা (ক্রিম)—সর নয়, দুধের মাঠা। আর মাখন তো আছেন, আর বরফ-জল—শীত কি গ্রীষ্ম, দিন কি রাত্রি, ঘোর সর্দি কি জ্বর—এন্তের বরফ-জল। এরা সায়েন্টিফিক (বিজ্ঞানমনস্ক) মানুষ, সর্দিতে বরফ-জল খেলে বাড়ে শুনলে হাসে। খুব খাও, খুব ভাল। আর কুলপি এন্তের নানা আকারের।

নায়াগারা ফল্‌স্ (জলপ্রপাত) হরির ইচ্ছায় ৭। ৮ বার তো দেখলুম। খুব গ্র্যান্ড (উচ্চভাবোদ্দীপক) বটে, তবে যত শুনেছ, তা নয়। একদিন শীতকালে Aurora Borealis হয়েছিল।...

লেকচার ফেক্‌চার তো কিছু লিখে দিই না, একটা লিখে দিয়েছিলুম, যা ছাপিয়েছ। বাকি সব দাঁড়াঝাঁপ, যা মুখে আসে গুরুদেব জুটিয়ে দেন। কাগজপত্রের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। একবার ডেট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়েছিলুম। আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে ; 'মধো, তোর পেটে এতও ছিল'!! [২০]

যে ভগবানের জন্য বারো বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করবে, তারই ও-ক্ষমতা হবে। আমি ঐরূপ করেছি, তাই আমার মাথার ভেতর একটা পর্দা খুলে গিয়েছে। তাই আর আমাকে দর্শনের মতো জটিল বিষয়ের বক্তৃতা ভেবে বার করতে হয় না। মনে করা যাক, কাল বক্তৃতা দিতে হবে, যা বক্তৃতা দেবো তার সমস্ত ছবি আজ রাত্রে, পর পর চোখের সামনে দিয়ে যেতে থাকে। পরদিন বক্তৃতার সময় সেই-সব বলি। [২১]

যারা বড় 'ইমোসনাল' (ভাবপ্রবণ), তাদের কুণ্ডলিনী ফড়ফড় ক'রে ওপরে ওঠে বটে, কিন্তু উঠতেও যতক্ষণ নাবতেও ততক্ষণ। যখন নাবেন, তখন একেবার সাধককে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন। এজন্য ভাবসাধনার সহায় কীর্তন-ফীর্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে। নেচেকুঁদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ঐ শক্তির ঊর্ধ্বগতি হয় যদি কিন্তু স্থায়ী হয় না, নিম্নগামিনী হবার কালে জীবের

ভয়ানক কামবৃত্তির আধিক্য হয়। আমার আমেরিকার বক্তৃতা শুনে সাময়িক উচ্ছ্বাসে অনেকের ভাব হ'ত—কেউ বা জড়বৎ হয়ে যেত। অনুসন্ধানে পরে জানতে পেরেছিলাম, ঐ অবস্থার পরই অনেকের কাম-প্রবৃত্তির আধিক্য হ'ত। ঠিকঠিক ধ্যানধারণার অনভ্যাসেই ওরূপ হয়।[২২]

আমার বক্তৃতায় ইওরোপীয় দর্শন ও ধর্মের অনেক শব্দ ব্যবহারের জন্য কোন বন্ধু সমালোচনাচ্ছলে অনুযোগ করেছেন। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে পারলে আমার পরম আনন্দ হত। ওটা অপেক্ষাকৃত সহজ হত, কারণ সংস্কৃত ভাষাই ধর্মভাব প্রকাশের একমাত্র সঠিক বাহন। কিন্তু বন্ধুটি ভুলে গিয়েছিলেন যে, পাশ্চাত্য নরনারীগণ আমার শ্রোতা ছিলেন। যদিও কোন ভারতীয় খ্রীষ্টান মিশনারী বলেছিলেন, হিন্দুরা তাদের সংস্কৃতগ্রন্থের অর্থ ভুলে গিয়েছে, মিশনারীগণই তার অর্থ আবিষ্কার করেছেন, তথাপি আমি সেই সমবেত বৃহৎ মিশনারীমণ্ডলীর মধ্যে একজনকেও দেখতে পেলাম না, যিনি সংস্কৃত ভাষায় একটি পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত বুঝেন ; কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকে বেদ, বেদান্ত ও হিন্দুধর্মের যাবতীয় পবিত্র শাস্ত্র সম্বন্ধে সমালোচনা করে বড় বড় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।[২৩]

ডেট্রয়েট, ৩০শে মার্চ, ১৮৯৪ [মিস মেরী হেলকে লেখা]

ইতিমধ্যে যদি আমি চলে না যাই—মিসেস ব্যাগলির আগ্রহও তাই, তাহলে আগামী গ্রীষ্মে সম্ভবতঃ এনিস্কোয়ামে যাব। মিসেস ব্যাগলি সেখানে এক সুন্দর বাড়ী বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছেন। মহিলাটি বেশ ধর্মপ্রাণা 'স্পিরিচুয়াল', মিঃ পামার কিন্তু বেশ একটু পানাসক্ত 'স্পিরিচুয়াল'—তাহলেও সজ্জন। অধিক আর কি? আমি শারীরিক ও মানসিক বেশ ভাল আছি। স্নেহের ভগিনীগণ! তোমরা সুখী—চিরসুখী হও।

ভাল কথা, মিসেস শার্মান নানা রকমের উপহার দিয়েছেন—নখ কাটবার ও চিঠি রাখবার সরঞ্জাম, একটি ছোট ব্যাগ, ইত্যাদি ইত্যাদি—যদিও ওগুলি নিতে আমার আপত্তি ছিল, বিশেষ ক'রে ঝিনুকের হাতলওয়ালা শৌখীন নখকাটা সরঞ্জামটার বিষয়ে, তবুও তাঁর আগ্রহের জন্য নিতে হ'ল। ঐ ব্রাশ নিয়ে কি যে ক'রব, তা জানি না। ভগবান ওদের রক্ষা করুন। তিনি উপদেশও দিয়েছেন—আমি যেন এই আফ্রিকী পরিচ্ছদে ভদ্রসমাজে না যাই। তবে আর কি! আমিও একজন ভদ্রসমাজের সভ্য! হা ভগবান, আরও কি দেখতে হবে! বেশী দিন বেঁচে থাকলে কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই না হয়![২৪]

নিউইয়র্ক, ৯ই এপ্রিল, ১৮৯৪

সেক্রেটারি সাহেব আমায় লিখেছেন, আমার ভারতে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য—কারণ ভারতই আমার কর্মক্ষেত্র। এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের এখন একটা মশাল জ্বালতে হবে, যা সমগ্র ভারতকে আলো দেবে। অতএব ব্যস্ত হয়ো না, ঈশ্বরেচ্ছায় সময়ে সবই হবে।

আমি আমেরিকায় অনেক বড় বড় শহরে বক্তৃতা দিয়েছি এবং ওতে যে টাকা পেয়েছি, তাতে এখানকার অত্যধিক খরচ মিটিয়েও ফেরবার ভাড়া যথেষ্ট থাকবে। আমার এখানে অনেক ভাল ভাল বন্ধু হয়েছে—তার মধ্যে কয়েকজনের সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি। অবশ্য গোঁড়া পাদ্রীরা আমার বিপক্ষে, আর তাঁরা আমার সঙ্গে সোজা রাস্তায় সহজে পেরে উঠবেন না দেখে আমাকে গালমন্দ নিন্দাবাদ করতে আরম্ভ করেছেন, আর 'ম—' বাবু তাঁদের সাহায্য করছেন। তিনি নিশ্চয় হিংসায় পাগল হয়ে গেছেন।

তিনি তাঁদের বলেছেন, আমি একটা ভয়ানক জোচ্চোর ও বদমাশ, আবার কলকাতায় গিয়ে সেখানকার লোকদের বলছেন, আমি ঘোর পাপে মগ্ন, বিশেষতঃ আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছি!! প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করুন। ভ্রাতৃগণ, কোন ভাল কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। কেবল যারা শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকে, তারাই কৃতকার্য হয়। তোমার ভগিনীপতির* লিখিত পুস্তিকাগুলি এবং তোমার পাগলা বন্ধুর আর একখানি পত্র পেয়েছি। 'যুগ' সম্বন্ধে প্রবন্ধটি বড় সুন্দর—তাতে যুগের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই তো ঠিক ব্যাখ্যা ; তবে আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসে পড়েছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমস্ত জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে। এতে বিশ্বাস স্থাপন কর।

পুনঃ—চিঠি লেখবার সময় আমার নামের আগে 'হিজ হোলিনেস' লিখো না। এখানে ওটা অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার শোনায়।[২৫]

চিকাগো, বসন্তকাল, ১৮৯৪

মজুমদারের লীলা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত। গুরুমারা বিদ্যে করতে গেলে ঐ-রকম হয়। আমার অপরাধ বড় নাই; মজুমদার দশ বৎসর আগে এখানে

---

* অধ্যাপক রঙ্গাচার্য

এসেছিল—বড় খাতির ও সম্মান ; এবার আমার পোয়াবারো। গুরুদেবের ইচ্ছা, আমি কি করিব? এতে চটে যাওয়া মজুমদারের ছেলেমানুষি। যাক. উপেক্ষিতব্যং তদ্বচনং ভবৎসদৃশানাং মহাত্মনাম্। অপি কীটদংশনভীরুকাঃ বয়ং রামকৃষ্ণতনয়াঃ তদ্ধৃদয়রুধিরপোষিতাঃ? 'অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং' ইত্যাদয়ঃ সংস্মৃত্য ক্ষন্তব্যোঽয়ং জাল্মঃ মজুমদারাখ্যঃ। প্রভুর ইচ্ছা—এ দেশের লোকের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি প্রবোধিত হয় মজুমদার—ফজুমদারের কর্ম তাঁর গতি রোধ করে? আমার নামের আবশ্যক নাই—I want to be a voice without a form. কাহারও আমাকে সমর্থন করিবার আবশ্যক নাই।[২৬]

নিউইয়র্ক, ১০ই এপ্রিল, ১৮৯৪

বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলি, আমি টাকা তোলা ছেড়ে দিয়েছি। আমি নিজেকে আর অধঃপতিত করতে পারব না। সামনে যখন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, তখন কাজ করেছি ; সেটা না থাকাতে আমি নিজের জন্য আর রোজগার করতে পারব না; আমার কাছে যা আছে তা ফিরে যাবার জন্য যথেষ্ট। এখানে আমি একটি পেনিও রোজগার করবার চেষ্টা করিনি, এখনকার বন্ধুরা আমাকে যেসব উপহারাদি দিতে চেয়েছে যা আমি প্রত্যাখ্যান করেছি।...ডেট্রয়েটে যারা দান করেছিলেন তাদের অর্থ আমি ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, এবং তাঁদের বলেছি যে আমার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবার প্রায় কোন সুযোগই নেই, তাঁদের অর্থ নিজের কাছে রেখে দেবার কোন অধিকারই আমার নেই ; কিন্তু তাঁরা অরাজী আমাকে বলেছেন যে, আমি ইচ্ছা করলে ঐ টাকা জলে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু আমি জেনে শুনে আর কিছু নিতে পারি না। মাগো, আমি খুব ভাল আছি। প্রত্যেক জায়গায় প্রভু আমার জন্য দয়ালু মানুষদের এবং আশ্রয় স্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন ; সুতরাং অতিমাত্রায় হিসেবী হবার প্রয়োজন নেই।

বস্টনবাসীদের মতো যদিও তেমন বুদ্ধিদীপ্ত নাহলেও, নিউ ইয়র্কের লোকেরা অনেক সিনসিয়ার। বস্টনবাসীরা ভাল করেই জানে যে প্রত্যেকের কাছ থেকে কি ভাবে সুযোগ নিতে হয়। এবং আমার আশঙ্কা তাঁদের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে জলও গলবে না!!! ভগবান ওঁদের মঙ্গল করুন!!! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে চলে যাব এবং আমি অবশ্যই যাব। হে প্রভু আমাকে অকপট, সরলপ্রকৃতি এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকতে দাও, আমাকে যেন হামবড়া, বড় বড় কথার মানুষদের ছায়া না মাড়াতে হয়। আমার প্রভু বলতেন যে

ওরা যেন শকুনের পালের মত, বাক্যালাপে অতি উঁচুতে বিচরণ করে, কিন্তু হৃদয় ভূমিতলে মাটিতে রাখা একখণ্ড পচা মাংসপিণ্ডের ওপর রয়েছে।...

ইতিমধ্যে একদিন বারনামে সার্কাস দেখতে গিয়েছিলাম। নিঃসন্দেহে এটা ভাল জিনিস। আমি এখনও ডাউনটাউনে যাই নি। এই রাস্তাটি খুব সুন্দর এবং নিরিবিলি।

একদিন বারনামে গান শুনলাম বলে স্প্যানিস্ সিরিনাডা। ওটা যাই হোক, আমার খুবই ভাল লেগেছে।[২৭]

(পাশ্চাত্য সঙ্গীত) খুব ভাল, হারমনির চূড়ান্ত, আমরা সেখানে পৌঁছতে পারিনি, তবে আমাদের অনভ্যস্ত কানে ভাল লাগে না। তাই ধারণা যে, ওরা কেবল শেয়ালের ডাক ডাকে। কিন্তু বেশ মন দিয়ে শুনতে শুনতে বুঝতে লাগলুম, তখন অবাক হলুম। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেতাম।[২৮]

নিউইয়র্ক, ২৬শে এপ্রিল, ১৮৯৪

প্রিয় ইসাবেল, তুমি ভারতের কাগজপত্রের যে ডাক গতকাল পাঠিয়েছ...দীর্ঘ বিরতির পর তা সত্যি সুসংবাদ।

...ওর মধ্যে কলকাতায় প্রকাশিত আমার সম্বন্ধে একটি ছোট্ট পুস্তিকা আছে, যাতে দেখা গেল—'প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি' তাঁর নিজ দেশে মর্যাদা পেলেন ; আমার জীবনে অন্তত একবারের জন্য এটা দেখতে পেলাম।

আমেরিকান ও ভারতীয় পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত আমার বিষয়ক অংশগুলি তার মধ্যে রয়েছে। কলকাতার পত্রাদির অংশগুলি বিশেষভাবে তৃপ্তিকর, কিন্তু প্রশংসাবাহুল্যের জন্য সেগুলি তোমাকে পাঠাব না।

তারা আমার সম্বন্ধে 'অপূর্ব', 'অদ্ভুত', 'সুবিখ্যাত' এইসব নানা আজে-বাজে কথা বলেছে, কিন্তু তারা বহন ক'রে এনেছে সমগ্র জাতির হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা। এখন আমি লোকের কথা আর গ্রাহ্য করি না, আমার নিজের দেশের লোক বললেও না—কেবল একটি কথা। আমার বুড়ী মা এখনও বেঁচে আছেন, সারা জীবন তিনি অসীম কষ্ট পেয়েছেন, সে সব সত্ত্বেও মানুষ আর ভগবানের সেবায় আমাকে উৎসর্গ করবার বেদনা তিনি সহ্য করেছেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ আশার, তাঁর সবচেয়ে ভালবাসার যে ছেলেটিকে তিনি দান করেছেন, সে দূরদেশে গিয়ে—কলকাতায় মজুমদার যেমন রটাচ্ছে তেমনিভাবে—জঘন্য নোংরা জীবন যাপন করছে, এ সংবাদ তাঁকে একেবারে শেষ ক'রে দেবে। কিন্তু প্রভু মহান্, তাঁর সন্তানের ক্ষতি কেউ করতে পারে না।

ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে—আমি না চাইতেই। ঐ সম্পাদকটি

কে জানো?—আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদক, যিনি আমার অত প্রশংসা করেছেন এবং আমেরিকায় আমি হিন্দুধর্মের পক্ষ-সমর্থনে এসেছি ব'লে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তিনি মজুমদারের সম্পর্কিত ভাই!! হতভাগ্য মজুমদার! ঈর্ষায় জ্বলে মিথ্যা কথা ব'লে নিজের উদ্দেশ্যেরই ক্ষতি করলে। প্রভু জানেন আমি আত্মসমর্থনের কিছুমাত্র চেষ্টা করিনি। [২৯]

নিউইয়র্ক ; ১লা মে, ১৮৯৪

প্রিয় ইসাবেল, আমার কোটের ঠিক কমলা রংটি এখানে খুঁজে বার করতে পারলাম না। সুতরাং তার কাছাকাছি ভাল রং যা মিললো—পীতাভ রক্তিম—তাতেই খুশী থাকতে হ'ল। কয়েকদিনের মধ্যেই কোটটি তৈরি হয়ে যাবে।

সেদিন ওয়ালডর্ফের বক্তৃতা থেকে ৭০ ডলার পেয়েছি। আগামীকালের বক্তৃতা থেকে আরও কিছু পাবার আশা রাখি। ৭ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত বস্টনে বক্তৃতাদি আছে, তবে সেখানে তারা খুব কমই পয়সা দেয়।

গতকাল ১৩ ডলার দিয়ে একটা পাইপ কিনেছি—দোহাই, ফাদার পোপকে [মিঃ জর্জ হেল, যাঁর জন্য পাইপটি কেনা হয়] কথাটি ব'লো না যেন। কোটের খরচ পড়বে ৩০ ডলার। খাবার-দাবার পানীয়, ঠিকই মিলছে...এবং যথেষ্ট টাকা। আশা হয়, আগামী বক্তৃতার পরেই অবিলম্বে ব্যাঙ্কে কিছু রাখতে পারব। আমি খেয়ে নিয়েছি এক্ষুনি, কারণ সন্ধ্যায় এক নিরামিষ ডিনারে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি।

ঠিক, যখন নিরামিষ জোটে তখন আমি নিরামিষাশী কারণ ওইটাই আমার পছন্দ। লাইম্যান অ্যাবট-এর কাছে আগামী পরশু মধ্যাহ্ন-ভোজের আর একটি নিমন্ত্রণ আছে। সময় মোটের উপর চমৎকার কাটছে। বস্টনেও তেমনি সুন্দর কাটবে আশা হয়—কেবল ঐ জঘন্য, অতি জঘন্য বিরক্তিকর বক্তৃতা বাদে। যা হোক, ১৯ তারিখ পার হলেই এক লাফে বস্টন থেকে...চিকাগোয়, ...তারপরে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেব, আর টানা বিশ্রাম—দু-তিন সপ্তাহের। তখন গ্যাঁট হয়ে বসে শুধু গল্প ক'রব—আর পাইপ টানব।

ভাল কথা, তোমার নিউ ইয়র্কীরা লোক খুবই ভাল, যদিও মগজের চেয়ে তাদের টাকা বেশী।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে আমি বক্তৃতা দিতে যাব। বস্টনে তিনটি বক্তৃতা এবং হার্ভার্ডে তিনটি—সকলেরই ব্যবস্থা করেছেন মিসেস ব্রীড। এখনেও ওঁরা কিছু ব্যবস্থা করছেন। যাতে চিকাগোর পথে আমি আর

একবার নিউইয়র্কে আসতে পারি—কিছু কড়া বাণী শুনিয়ে টাকাকড়ি পকেটস্থ ক'রে সাঁ ক'রে চিকাগোয় উড়ে যাব।...

পৃথিবীতে একটি জিনিসই আমি ঘৃণা করি—বুজরুকি।[৩০]

বস্টন, মে, ১৮৯৪

আমাদের কর্তব্য শুধু ত্যাগ—গ্রহণ নয়। যদি আমার মাথায় খেয়াল না চাপত, তাহলে কখনই এখানে আসতাম না। এতে আমার কাজের সহায়তা হবে, এই আশায় আমি ধর্মমহাসভায় যোগদান করেছি, যদিও আমার দেশবাসী যখন আমাকে পাঠাতে চেয়েছিল, তখন আমি সর্বদা আপত্তি করেছি। আমি তাদের ব'লে এসেছি, 'আমি মহাসভায় যোগদান করতে পারি, বা নাও পারি, তোমাদের যদি খুশি হয়, আমাকে পাঠাতে পার।' তাঁরা আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে পাঠিয়েছেন।...

বুড়ো মিশনারিগুলোর আক্রমণকে আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। কিন্তু আমি দারুণ আঘাত পেয়েছি মজুমদারের ঈর্ষার জ্বালা দেখে। প্রার্থনা করি তাঁর যেন চৈতন্য হয়। তিনি উত্তম ও মহান্ ব্যক্তি, সারা জীবন অপরের মঙ্গল করতে চেয়েছেন। অবশ্য এর দ্বারা আমার গুরুদেবের একটি কথাই আবার প্রমাণিত হ'ল—'কাজলের ঘরে থাকলে তুমি যত সেয়ানাই হও না কেন, গায়ে ছিটেফোঁটা কালি লাগবেই।' সাধু ও পবিত্র হবার যত চেষ্টাই কেউ করুক না কেন, মানুষ যতক্ষণ এই পৃথিবীতে আছে তার স্বভাব কিছু পরিমাণে নিম্নগামী হবেই।

ভগবানের দিকে যাবার পথ সাংসারিক পথের ঠিক বিপরীত। ঈশ্বর ও ধনৈশ্বর্য একই সঙ্গে কেউ কখনও পেয়েছে?

আমি কোনদিন 'মিশনারি' ছিলাম না, কোনদিন হবও না—আমার স্বস্থান হিমালয়ে। পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে অন্ততঃ এই কথা আজ আমি বলতে পারি, 'হে প্রভু, আমার ভ্রাতৃগণের ভয়ঙ্কর যাতনা আমি দেখেছি, যন্ত্রণামুক্তির পথ আমি খুঁজেছি এবং পেয়েছি—প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, প্রভু।'[৩১]

বস্টন, ১৪ই মে, ১৮৯৪

ওঃ, এরা এত নীরস—এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত শুকনো মেটাফিজিক্স্ নিয়ে কথা বলে। অনেকটা আমাদের বারাণসীর মত যেখানে সবকিছু শুকনো দর্শন। এখানে কেউই 'প্রিয় আমার' কথার মানে বোঝে ন। এঁদের কাছে ধর্ম হ'চ্ছে যুক্তির ব্যাপার, একেবারে প্রস্তরবৎ। আমার 'প্রিয়তম' কথার মানে যাদের

কাছে প্রিয় নয়, আমি তাদের গ্রাহ্যও করি না।

আমাদের লোকেরা ব্রাহ্ম সমাজকে এত অপছন্দ করে যে তারা সবসময় ওদের কাছে এটা প্রকাশের সুযোগ খোঁজে। আমি এটা অপছন্দ করি। কোনো লোকের প্রতি শত্রুতা, জীবনেব সব ভাল কাজকে মুছে দিতে পারে না। ধর্মক্ষেত্রে, এরা ছোট্ট শিশুমাত্র। এরা কখনও খুব ধর্মপ্রবণ লোক ছিল না—এরা শুধুমাত্র চেয়েছে যুক্তি আর কথা বলতে, প্রিয়তমকে খুঁজে পাবার জন্য কোনো এরা চেষ্টা করেনি ; যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এটা না করছে ততক্ষণ আমি মনে করি না যে তার মধ্যে কোনো ধর্ম আছে। তাঁর কাছে বইপত্তর, সংজ্ঞা, আদর্শ, কথা, যুক্তি ইত্যাদি যথেষ্ট থাকতে পারে, কিন্তু ধর্ম নেই। তার শুরু হয় যখন অন্তরাত্মা প্রিয়তমের জন্য প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুভব করে, কখনই তার আগে নয়।[৩২]

চিকাগো, ২৪শে মে, ১৮৯৪

এই সঙ্গে আমি আপনাকে রাজপুতানার অন্যতম শাসক মহামান্য খেতড়ির মহারাজের চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে ভারতের অন্যতম দেশীয় রাজ্য জুনাগড়ের প্রাক্তন মন্ত্রীর পত্রও পাঠালাম। ইনি আফিং কমিশনের একজন সদস্য এবং ভারতের গ্ল্যাডস্টোন নামে খ্যাত। মনে হয় এগুলি পড়লে আপনার বিশ্বাস হবে যে—আমি প্রতারক নই।...

প্রিয় বন্ধু, আমি যে যথার্থই সন্ন্যাসী, এ বিষয়ে সর্বপ্রকারে আপনাকে আশ্বস্ত করতে আমি দায়বদ্ধ। কিন্তু সে কেবল 'আপনাকেই'। বাকি নিকৃষ্ট লোকেরা কি বলে না বলে, আমি তার পরোয়া করি না।

'কেউ তোমাকে বলবে সাধু, কেউ বলবে চণ্ডাল, কেউ বলবে উন্মাদ, কেউ বলবে দানব, কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের পথে চলে যাও,'—এই কথা বলেছিলেন বার্ধক্যে সন্ন্যাসগ্রহণকারী রাজা ভর্তৃহরি—ভারতের একজন প্রাচীন সম্রাট ও মহান সন্ন্যাসী।[৩৩]

চিকাগো, ২৮শে মে ১৮৯৪

আমি নিউইয়র্ক ও বস্টনের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।...

জানি না, কবে ভারতে যাব। সমুদয় ভার তাঁর উপর ফেলে দেওয়া ভাল, তিনি পেছনে থেকে আমাকে চালাচ্ছেন।

আমাকে ছাড়া কাজ করবার চেষ্টা কর, মনে কর যেন আমি কখনো ছিলাম না। কারুর জন্য বা কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা কোরো না। যা পারো করে

যাও, কারও ওপর কোন আশা রেখ না।...আমি এদেশ থেকে যত ইচ্ছা টাকা পেতে পারি, সে কথা ঠিক নয়। এ বছরটা এদেশের বড়ই দুর্বৎসর—এরা নিজের দরিদ্রদেরই সব অভাব দূর করতে পারছে না। এমন সময়ে আমি যে ওদের নিজেদের বক্তাদের থেকে অনেক সুবিধে করতে পেরেছি, তার জন্য ওদের ধন্যবাদ দিতে হয়।

কিন্তু এখানে ভয়ানক খরচ হয়। যদিও প্রায় সর্বদাই ও সর্বত্রই আমি ভাল ভাল ও বড় বড় পরিবারের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছি, তথাপি টাকা যেন উড়ে যায়।[৩৪]

চিকাগো, ১৮ই জুন, ১৮৯৪

সপ্তাহখানেকের মধ্যে নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি।

বস্টনের কাগজে আমার বিরুদ্ধে লেখা রচনাটি দেখে মিসেস ব্যাগলি খুবই বিচলিত হয়েছেন। ডেট্রয়েট থেকে তিনি আমার কাছে তার একটা কপি পাঠিয়েছেন এবং চিঠিপত্র লেখা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করুন, তিনি আমার প্রতি সব সময়েই খুব সদয় ছিলেন।

একটা আজব জায়গা—আমাদের এই দুনিয়াটা। সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং সামান্য 'পরিচয়পত্র' হীন হয়েও এখানকার মানুষের কাছ থেকে যে পরিমাণে সহৃদয়তা পেয়েছি, তার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ; শেষ পর্যন্ত সব কিছুই মঙ্গলমুখী।[৩৫]

চিকাগো, বসন্তকাল, ১৮৯৪

এ দেশে দু-তিন বছর ধরে বক্তৃতা দিলে টাকা তোলা যেতে পারে। আমি কিছুটা চেষ্টা করেছি, জনগণের প্রশস্তি পেয়েছে, কিন্তু আমার প্রকৃতিতে এটা একেবারে খাপ খাচ্ছে না।[৩৬]

চিকাগো ২০শে জুন, ১৮৯৪

দেওয়ানজী সাহেব, অসাক্ষাতে যারা আমার দুর্নাম রটাচ্ছে, তারা পরোক্ষভাবেও আমার উপকার করে নি। আমাদের হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে আমেরিকার জনসাধারণের কাছে আমার প্রতিনিধিত্ব-বিষয়ে একটি কথাও বলা না হওয়ায় ঐ সব দুর্নাম যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়েছে। আমি যে তাদের প্রতিনিধি—আমার দেশবাসী কেউ এ বিষয়ে কি একটি কথাও লিখেছিল? কিংবা আমার প্রতি আমেরিকাবাসীদের সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপক একটি বাক্যও কি তারা পাঠিয়েছে? পক্ষান্তরে মজুমদার, বম্বের নাগরকর এবং

সোরাবজী নামে এক খ্রীষ্টান নারী আমেরিকাবাসীর কাছে তারস্বরে এই কথাই ঘোষণা করেছে যে, আমি একটি পাকা ভণ্ড এবং আমেরিকায় পদার্পণ করেই আমি প্রথম গেরুয়া ধারণ করেছি।

অভ্যর্থনার ব্যাপারে অবশ্য এই সব প্রচারের ফলে আমেরিকায় কোন ক্ষতি হয় নি; কিন্তু অর্থসাহায্যের ব্যাপারে এই ভয়াবহ ফল ঘটেছে যে, আমেরিকাবাসীগণ আমার কাছে একেবারে হাত গুটিয়ে ফেলেছে। এই যে এক বৎসর যাবৎ আমি এখানে আছি—এর মধ্যে ভারতবর্ষের একজন খ্যাতনামা লোকও এ দেশবাসীকে এ কথাটি জানানো উচিত মনে করেন নি যে, আমি প্রতারক নই। এর ওপর আবার মিশনারি সম্প্রদায় সর্বদা আমার ছিদ্রানুসন্ধানে তৎপর হয়েই আছে এবং ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান পত্রিকাগুলিতে আমার বিরুদ্ধে যা প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সংগ্রহ করে এখানকার কাগজে ছাপা হয়েছে। আর আপনারা এইটুকু জেনে রাখুন যে, এদেশের জনসাধারণ—ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান ও হিন্দুতে যে কি পার্থক্য, তার খুব বেশী সংবাদ রাখে না।...আমাদের দেশে একজন মহৎ লোক মারা গেলে বহু শতাব্দী ধরে আর একজনের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়, আর এদেশে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান পূর্ণ হয়ে যায়।...এদেশের শিক্ষিত নরনারীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।

...পথপ্রদর্শক দেবমানব ভারতবর্ষেই জন্মেছিলেন। তিনি সেই মহান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁকেই কেন্দ্র করে এই যুবকদল ধীরে ধীরে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠছে। তারাই এ মহাব্রত উদ্‌যাপন করবে।

এ কাজের জন্য সঙ্ঘের প্রয়োজন এবং অন্ততঃ প্রথম দিকটায় সামান্য কিছু অর্থেরও প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষে কে আমাদের অর্থ দেবে?... আমি সেই জন্য আমেরিকায় চলে এসেছি। আপনার স্মরণ থাকতে পারে, আমি সমস্ত অর্থ দরিদ্রগণের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলাম; ধনী-সম্প্রদায়ের দান আমি গ্রহণ করতে পারিনি, কারণ তারা আমার ভাব বুঝতে পারেনি। এদেশে এক বৎসর ক্রমান্বয়ে বক্তৃতা দিয়েও আমি বিশেষ কিছু করতে পারিনি—অবশ্য আমার ব্যক্তিগত কোন অভাব নেই, কিন্তু আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ করে উঠতে পারিনি।

তার প্রথম কারণ, এবার আমেরিকায় বড় দুর্বৎসর চলছে, হাজার হাজার গরীব বেকার। দ্বিতীয়তঃ মিশনারীরা এবং ব্রাহ্ম সমাজবাদীগণ আমার মতবাদ ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে। তৃতীয়তঃ একটা বছর অতীত হয়ে গেল, কিন্তু

আমার দেশের কেউ এই কথাটুকু আমেরিকাবাসীদের বলতে পারল না যে, আমি সত্যই সন্ন্যাসী, প্রতারক নই এবং আমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি। শুধু এই কয়টি কথামাত্র, তাও তারা বলতে পারল না! আমার দেশবাসীগণকে সেজন্য আমি 'বাহবা' দিচ্ছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তাদের ভালবাসি।

মানুষের সাহায্য আমি অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করি। যিনি গিরিগুহায়, দুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন—আমার বিশ্বাস, তিনি আমার সঙ্গেই থাকবেন আর যদি তা না হয়, তবে আমার থেকে শক্তিমান কোন পুরুষ কোনদিন জন্মগ্রহণ করে এই মহৎ কার্য সম্পন্ন করবেন।... আমি সম্পূর্ণ অকপট ; আর আমার চরিত্রের সর্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, আমি আমার দেশকে ভালবাসি, বড় একান্তভাবেই ভালবাসি।[৩৭]

চিকাগো, ২৮শে জুন, ১৮৯৪

এখানে আমার কাজের প্রসারের আশা প্রায় শূন্য বললেই হয়। কারণ—যদিও প্রসারের খুব সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে সে আশা একেবারে নির্মূল হয়েছে :

ভারতের খবর আমি যা কিছু পাচ্ছি, তা মান্দ্রাজের চিঠি থেকে। তোমাদের পত্রে ক্রমাগত শুনছি, ভারতে আমাকে সকলে খুব সুখ্যাতি করছে, কিন্তু সে তো—তুমি জেনেছ আর আমি জানছি, কারণ আলাসিঙ্গার প্রেরিত একটা তিন বর্গ ইঞ্চি কাগজের টুকরো ছাড়া আমি একখানা ভারতীয় খবরের কাগজে আমার সম্বন্ধে কিছু বেরিয়েছে, তা দেখিনি।

অন্যদিকে ভারতের খ্রীস্টানরা যা কিছু বলছে, মিশনারীরা তা খুব সযত্নে সংগ্রহ ক'রে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে এবং বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমার বন্ধুরা যাতে আমায় ত্যাগ করেন, তার চেষ্টা করছে। তাদের উদ্দেশ্য খুব ভালরকমেই সিদ্ধ হয়েছে, যেহেতু ভারত থেকে কেউ একটা কথাও আমার জন্য বলছে না। ভারতের হিন্দু পত্রিকাগুলো আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা করতে পারে, কিন্তু তার একটা কথাও আমেরিকায় পৌঁছয়নি। তার জন্য এদেশের অনেকে মনে করছে, আমি একটা জুয়াচোর। একে তো মিশনারিরা আমার পিছু লেগেছে, তার উপর এখানকার হিন্দুরা হিংসা ক'রে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ; এক্ষেত্রে আমার একটা কথাও জবাব দেবার নেই।

এখন মনে হচ্ছে, কেবল মান্দ্রাজের কতকগুলি ছোকরার পীড়াপীড়ির জন্য ধর্মমহাসভায় যাওয়া আমার আহাম্মকি হয়েছিল, কারণ তারা তো ছোকরা

বই আর কিছুই নয়। অবশ্য আমি অনন্ত কালের জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু তারা তো গুটিকতক উৎসাহী যুবক ছাড়া আর কিছু নয়—কাজের ক্ষমতা তাদের যে একদম নেই। আমি কোন নিদর্শনপত্র নিয়ে আসিনি, আর যখন কারও অর্থসাহায্যের আবশ্যক হয়, তার নিদর্শনপত্র থাকা দরকার, তা না হ'লে মিশনারি ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধাচরণের সামনে—আমি যে জুয়াচোর নই, তা কি ক'রে প্রমাণ ক'রব?...

এক বছরের ভেতর ভারত থেকে কেউ আমার জন্য একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করল না, আর এখানে সকলেই আমার বিপক্ষে। তোমরা নিজেদের ঘরে বসে আমার সম্বন্ধে যা খুশি বলো না কেন, এখানে তার কে কি জানে? দুমাসেরও উপর হ'ল আলাসিঙ্গাকে আমি এ বিষয়ে লিখেছিলাম, কিন্তু সে আমার পত্রের জবাব পর্যন্ত দিল না। আমার আশঙ্কা হয়, তার উৎসাহ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে...

এদিকে আমার গুরুভাইরা ছেলেমানুষের মতো কেশব সেন সম্বন্ধে অনেক বাজে কথা বলছে, আর মান্দ্রাজীরা থিওসফিস্টদের সম্বন্ধে আমি চিঠিতে যা কিছু লিখছি, তাই তাদের বলছে—এতে শুধু শত্রুর সৃষ্টি করা হচ্ছে।...হায়। যদি ভারতে একটা মাথাওয়ালা কাজের লোক আমার সহায়তা করবার জন্য পেতাম! কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে আমি এদেশে জুয়াচোর ব'লে গণ্য হলাম। আমারই আহাম্মকি হয়েছিল, কোন নিদর্শনপত্র না নিয়ে ধর্ম মহাসভায় যাওয়া—আশা করেছিলাম, অনেক জুটে যাবে। এখন দেখছি, আমাকে একলা ধীরে ধীরে কাজ করতে হবে।...যাই হোক, আমাকে কর্ম ক'রে আমার প্রারব্ধ ক্ষয় করতে হবে। আমার আর্থিক অবস্থার কথা যদি বলতে হয়, তবে বলি, আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছলই আছে এবং সচ্ছলই থাকবে।...

প্রতি মুহূর্তে আমি আশা করেছিলাম, ভারত থেকে কিছু আসবে, কিন্তু কিছুই এল না। বিশেষতঃ গত দুমাস প্রতি মুহূর্ত আমার উদ্বেগ ও যন্ত্রণার সীমা ছিল না—ভারত থেকে একখানা খবরের কাগজ পর্যন্ত এল না!! আমার বন্ধুরা মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে লাগল, কিছুই এল না—একটা আওয়াজ পর্যন্ত এল না ; কাজেই আনেকের উৎসাহ চলে গেল, অনেকে আমায় ত্যাগ করলে। কিন্তু এ আমার মানুষের উপর নির্ভর করার শাস্তি, ...মান্দ্রাজী যুবকগণকে আমার অনন্তকালের জন্য ধন্যবাদ...

আমি সর্বদা তাদের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি তাদের উপর কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইনি—আমি নিজেরই প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি জীবনে এই একবার

অপরের সাহায্যে নির্ভর করা-রূপ ভয়ানক ভুল করেছি; আর তার শাস্তিভোগও করেছি। এ আমারই দোষ, তাদের কিছু দোষ নেই। প্রভু মাদ্রাজীদের আশীর্বাদ করুন—

...আমি এখন সমুদ্রবক্ষে আমার তরণী ভাসিয়েছি—যা হবার হোক। কঠোর সমালোচনার জন্য আমাকে ক্ষমা করো। বাস্তবিক তো আমার কোন দাবি-দাওয়া নেই।...আমার যেরূপ কর্ম, আমি তেমনি ফল পাব, আর যা ঘটুক আমাকে চুপটি ক'রে মুখ বুজে সয়ে যেতে হবে।[৩৮]

নিউইয়র্ক, ১লা জুলাই, ১৮৯৪

আমি জানি না এরপরে আমাকে কি করতে হবে? আমার সংক্ষিপ্ত নীতিবাক্য হ'চ্ছে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা এবং তাঁর নির্দেশমতো নিজেকে সমর্পণ করা।[৩৯]

ইউ. এস. এ, ১১ই জুলাই, ১৮৯৪

গত বছর আমি কেবল বীজ বপন করেছি—এই বছর ফসল কাটতে চাই। ইতিমধ্যে ভারতে যতটা সম্ভব আন্দোলন চালাও।

...ডেট্রয়েটের বক্তৃতায় আমি ৯০০ ডলার অর্থাৎ ২৭০০ টাকা পেয়েছিলাম। অন্যান্য বক্তৃতায় একটাতে এক ঘণ্টায় আমি ২৫০০ ডলার অর্থাৎ ৭৫০০ টাকা রোজগার করি, কিন্তু পাই মাত্র ২০০ ডলার। একটা জুয়াচোর বক্তৃতা কোম্পানি আমায় ঠকিয়েছিল। আমি তাদের সংস্রব ছেড়ে দিয়েছি। এখানে খরচও হয়ে গেছে অনেক টাকা—হাতে আছে মাত্র ৩০০০ ডলার।[৪০]

বেকন, নিউইয়র্ক, ১৭ই জুলাই, ১৮৯৪

কাল এখানে এসেছি। কয়েক দিন থাকব। নিউ ইয়র্কে আপনার এক পত্র পেয়েছিলাম, কিন্তু 'ইন্টিরিয়র' পাইনি। তাতে খুশীই হয়েছি; কারণ আমি এখনও নিখুঁত হইনি; আর প্রেসবিটিরিয়ন ধর্মযাজকদের—বিশেষতঃ 'ইন্টিরিয়র'দের—আমার প্রতি যে নিঃস্বার্থ ভালবাসা আছে, তা জেনে পাছে এই 'প্রেমিক' খ্রীষ্টান মহোদয়গণের উপর আমার বিদ্বেষ উদ্বুদ্ধ হয়, এই জন্য তফাতেই থাকতে চাই।

আমাদের ধর্মের শিক্ষা—ক্রোধ সঙ্গত হলেও মহাপাপ। নিজ নিজ ধর্মই অনুসরণীয়। 'সাধারণ' ও 'ধর্মসংক্রান্ত' ভেদে ক্রোধ, হত্যা, অপবাদ প্রভৃতির মধ্যে কোন তফাত করতে পারি না—শত চেষ্টা সত্ত্বেও। এই সূক্ষ্ম নৈতিক পার্থক্যবোধ যেন আমার স্বজাতীয়গণের মধ্যে কখনও প্রবেশ না করে। ঠাট্টা

থাক, শুনুন মাদার চার্চ, আপনাকে বলছি—এরা যে কপট, ভণ্ড, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাপ্রিয়—তা বেশ স্পষ্ট দেখে এদের উন্মত্ত আস্ফালন আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না।...

এখানকার গরম আমার বেশ সহ্য হচ্ছে। এক অতি ধনী মহিলা সমুদ্রতীরে সোয়ামস্কটে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন ; গত শীতে নিউ ইয়র্কে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়। ধন্যবাদ সহ প্রত্যাখ্যান জানিয়েছি। এ দেশে কারও আতিথ্যগ্রহণ বিষয়ে আমি এখন খুব সতর্ক—বিশেষ ক'রে ধনী লোকের। খুব ধনবানদের কাছ থেকে আরও কয়েকটি নিমন্ত্রণ আসে, সেগুলিও প্রত্যাখ্যান করেছি। এতদিনে এদের কার্যকলাপ বেশ বুঝলাম।[৪১]

ফিশকিল-অন-দি হাডসন, নিউইয়র্ক, ১৯শে জুলাই ১৮৯৪

এই গ্রীষ্মে গার্নেসীদের সিডার বাগান অতি মনোরম স্থান। মিস্ গার্নেসী সোয়ামস্কটে গিয়েছেন। ওখানে আমার জন্যও নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু আমি ভেবেছি যে প্রচুর গাছে ভরা এই নির্জন এবং শান্ত পরিবেশ অধিকতর শ্রেয়। পাশে সুন্দর হাডসন্ বয়ে চলেছে আর পশ্চাৎদেশে পাহাড়...

খুব সম্ভব শীঘ্রই আমি ইংল্যান্ডে যাব। কিন্তু শুধু তোমাকেই জানাই, আমি কিছুটা রহস্যময়, প্রত্যাদেশ ছাড়া নড়চড়া করতে পারি না—সেটা এখনও পৌঁছয় নি।...

আমার ব্যাপারে তুমি সামান্যতমও বিচলিত হ'য়ো না। চিরটা কালই আমার ভবঘুরের জীবন—গৃহহীন, ইতস্ততঃ পরিব্রাজক যে কোনো দেশের ভাল মন্দ সবই আমার পক্ষে যথেষ্ট।[৪২]

সোয়ামস্কট, মাসাচুসেটস, ২৬শে জুলাই ১৮৯৪

ভগিনী মেরীর এক সুন্দর চিঠি পেয়েছি। দেখছ তো সমাজে আমি কি রকম বেড়ে চলেছি। এ-সব ভগিনী জিনীর শিক্ষার ফলে। খেলা দৌড়ঝাঁপে সে ধুরন্ধর, মিনিটে ৫০০ হিসাবে ইতরভাষা ব্যবহারে দক্ষ, কথার তোড়ে অদ্বিতীয়, ধর্মের বড় ধার ধারে না, তবে ঐ যা একটু আধটু। সে আজ বাড়ি গেল, আমি গ্রীনএকারে যাচ্ছি।

মিসেস ব্রীডের কাছে গিয়েছিলাম, মিসেস স্টোন সেখানে ছিলেন। মিসেস পুলম্যান প্রভৃতি আমার এখানকার হোমরাচোমরা বন্ধুরা মিসেস স্টোনের কাছে আছেন। তাঁদের সৌজন্য আগের মতই। গ্রীণএকার থেকে ফেরবার পথে কয়েক দিনের জন্য এনিস্কোয়ামে যাব মিসেস ব্যাগলির সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

দূর ছাই, সব ভুলে যাই; সমুদ্রে স্নান করছি ডুবে ডুবে মাছের মতো—বেশ লাগছে। 'প্রান্তর মাঝে'...('dans la plaine') ইত্যাদি কি ছাইভস্ম গানটি হ্যারিয়েট আমায় শিখিয়েছিল; জাহান্নামে যাক! এক ফরাসী পণ্ডিত আমার অদ্ভুত অনুবাদ শুনে হেসে কুটিপাটি। এইরকম ক'রে তোমরা আমায় ফরাসী শিখিয়েছিলে, বেকুফের দল। তোমরা ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছ তো? বেশ হয়েছে, গরমে ভাজা হয়ে যাচ্ছ। আঃ এখানে কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা! যখন ভাবি তোমরা চার জনে গরমে ভাজা পোড়া সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছ, আর আমি এখানে কি তোফা ঠাণ্ডা উপভোগ করছি, তখন আমার আনন্দ শতগুণ বেড়ে যায়। আ হা হা হা।

নিউ ইয়র্ক রাজ্যের কোথাও মিস ফিলিপসের পাহাড় হ্রদ নদী জঙ্গলে ঘেরা সুন্দর একটি জায়গা আছে। আর কি চাই! আমি যাচ্ছি স্থানটিকে হিমালয়ে পরিণত ক'রে সেখানে একটি মঠ খুলতে—নিশ্চয়ই। তর্জন গর্জন, লাথি ঝগড়ায় তোলপাড় এই আমেরিকায় ধর্মের মতভেদের আবর্তে আর একটি নূতন বিরোধের সৃষ্টি না ক'রে এদেশ থেকে যাচ্ছি না।[৪৩]

গ্রীনএকার ইন, ইলিয়ট, মেন, ৩১শে জুলাই ১৮৯৪

এটা একটা বড় সরাই ও খামার বাড়ী; এখানে ক্রিশ্চান সায়ান্টিস্টগণ তাদের সমিতির বৈঠক বসিয়েছে। যে মহিলাটির মাথায় এই বৈঠকের কল্পনাটা প্রথম আসে, তিনি গত বসন্তকালে নিউ ইয়র্কে আমাকে এখানে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, তাই এখানে এসেছি। জায়গাটি বেশ সুন্দর ও ঠাণ্ডা, তাতে কোন সন্দেহ নাই, আর আমার চিকাগোর অনেক পুরাতন বন্ধু এখানে রয়েছেন। মিসেস মিল্স্ ও মিস স্টকহ্যামের কথা তোমাদের স্মরণ থাকতে পারে। তাঁরা এবং আর কতকগুলি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা নদীতীরে খোলা জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে বাস করছেন। তাঁরা খুব স্ফূর্তিতে আছেন এবং কখন কখন তাঁরা সকলেই সারাদিন, যাকে তোমরা বৈজ্ঞানিক পোশাক বল, তাই পরে থাকেন।

বক্তৃতা প্রায় প্রত্যহই হয়। বস্টন থেকে মিঃ কলভিল নামে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। লোকে বলে, তিনি প্রত্যহ ভাবাবিষ্ট হয়ে বক্তৃতা ক'রে থাকেন—'ইউনিভার্সাল ট্রুথের' সম্পাদিকা, যিনি 'জিমি মিলস্' প্রাসাদের উপর তলায় থাকতেন—এখানে এসে বসবাস করছেন। তিনি উপাসনা পরিচালনা করছেন আর মনঃশক্তিবলে সব রকমের ব্যারাম ভাল করবার শিক্ষা দিচ্ছেন—মনে হয়, এঁরা শীঘ্রই অন্ধকে চক্ষুদান এবং এই ধরনের নানা কর্ম সম্পাদন করবেন।

মোট কথা, এই সম্মিলনটি এক অদ্ভুত রকমের। এরা সামাজিক বাঁধাবাঁধি নিয়ম বড় গ্রাহ্য করে না—সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও বেশ আনন্দে আছে। মিসেস মিল্‌স্‌ বেশ প্রতিভাসম্পন্না, অন্যান্য অনেক মহিলাও তদ্রূপ।...ডেট্রয়েটবাসিনী আর এক উচ্চশিক্ষিতা মহিলা সমুদ্রতীর থেকে পনের মাইল দূরবর্তী এক দ্বীপে আমায় নিয়ে যাবেন—আশা করি তথায় আমাদের পরমানন্দে সময় কাটবে। মিস আর্থার স্মিথ এখানে রয়েছেন। মিস গার্নসি সোয়াম্‌স্কট থেকে বাড়ি গেছেন। আমি এখান থেকে এনিস্কোয়াম যেতে পারি বোধ হয়।

এ স্থানটি সুন্দর ও মনোরম—এখানে স্নান করার ভারি সুবিধা। কোরা স্টকহ্যাম আমার জন্য একটি স্নানের পোশাক ক'রে দিয়েছেন—আমিও ঠিক হাঁসের মত জলে নেমে স্নান ক'রে মজা করছি।...

বস্টনের মিঃ উড এখানে রয়েছেন—তিনি তোমাদের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান পাণ্ডা। তবে 'হোয়ার্লপুল' মহোদয়ার সম্প্রদায়ভুক্ত হ'তে তাঁর বিশেষ আপত্তি—সেই জন্য তিনি দার্শনিক-রাসায়নিক-ভৌতিক-আধ্যাত্মিক আরও কত কি বিশেষণ দিয়ে নিজেকে একজন মনঃশক্তি-প্রভাবে আরোগ্যকারী ব'লে পরিচিত করতে চান। কাল এখানে একটা ভয়ানক ঝড় উঠেছিল—তাতে তাঁবুগুলোর উত্তমমধ্যম 'চিকিৎসা' হয়ে গেছে। যে বড় তাঁবুর নীচে তাঁদের এইসব বক্তৃতা চলছিল, ঐ 'চিকিৎসার' চোটে সেটির এত আধ্যাত্মিকতা বেড়ে উঠেছিল যে, সেটি মর্ত্যলোকের দৃষ্টি হ'তে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। প্রায় দুশ' চেয়ার আধ্যাত্মিক ভাবে গদগদ হয়ে জমির চারিদিকে নৃত্য আরম্ভ করেছিল!

মিল্‌স্‌ কোম্পানির মিসেস ফিগ্‌স্‌ প্রত্যহ প্রাতে একটা ক'রে ক্লাস ক'রে থাকেন, আর মিসেস মিল্‌স্‌ ব্যস্তসমস্ত হয়ে সমস্ত জায়গাটায় যেন লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন—ওরা সকলেই খুব আনন্দে মেতে আছে। আমি বিশেষতঃ কোরাকে দেখে ভারি খুশি হয়েছি, গত শীত ঋতুতে ওরা বিশেষ কষ্ট পেয়েছে—একটু আনন্দ করলে ওর পক্ষে ভালই হবে।

তাঁবুতে ওরা যে রকম স্বাধীনভাবে রয়েছে, শুনলে তোমরা বিস্মিত হবে। তবে এরা সকলেই বড় ভাল ও শুদ্ধাত্মা, একটু খেয়ালী—এই যা।

আমি এখানে আগামী শনিবার পর্যন্ত আছি।

...এই সেদিন রাত্রিতে ছাউনির সকলে একটা পাইন গাছের তলায় শুতে গিয়েছিল—আমি রোজ প্রাতে ঐ গাছতলাটায় হিন্দু ধরনে বসে এদের উপদেশ দিয়ে থাকি। অবশ্য আমিও তাদের সঙ্গে গেছলাম—তারকাখচিত

আকাশের নীচে জননী ধরিত্রীর কোলে শুয়ে রাতটা বড় আনন্দেই কেটেছিল—আমি তো এই আনন্দের সবটুকু উপভোগ করেছি।

এক বৎসর হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই রাত্রিটা যে কি আনন্দে কেটেছিল—মাটিতে শোওয়া, বনে গাছতলায় বসে ধ্যান—তা তোমাদের কি বলব! সরাইয়ে যারা রয়েছে তারা অল্পবিত্তর অবস্থাপন্ন, আর তাঁবুর লোকেরা সুস্থ সবল শুদ্ধ অকপট নরনারী। আমি তাদের সকলকে 'শিবোঽহং' করতে শেখাই, আর তারা তাই আবৃত্তি করতে থাকে—সকলেই কি সরল ও শুদ্ধ এবং অসীম সাহসী! সুতরাং এদের শিক্ষা দিয়ে আমিও পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি।

ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে নিঃস্ব করেছেন ; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি এই তাঁবুবাসীদের দরিদ্র করেছেন। শৌখীন বাবুরা ও শৌখীন মেয়েরা রয়েছেন হোটেলে ; কিন্তু তাঁবুবাসীদের স্নায়ুগুলি যেন লোহা দিয়ে বাঁধানো, মন তিন-পুরু ইস্পাতের তৈরি আর আত্মা অগ্নিময়। কাল যখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল আর ঝড়ে সব উলটে পালটে ফেলছিল, তখন এই নির্ভীক বীরহৃদয় ব্যক্তিগণ আত্মার অনন্ত মহিমায় বিশ্বাস দৃঢ় রেখে ঝড়ে যাতে উড়িয়ে না নিয়ে যায়, সেজন্য তাদের তাঁবুর দড়ি ধরে কেমন ঝুলছিল, তা দেখলে তোমাদের হৃদয় প্রশস্ত ও উন্নত হ'ত। আমি এঁদের জুড়ি দেখতে ৫০ ক্রোশ যেতে প্রস্তুত আছি। প্রভু তাদের আশীর্বাদ করুন।

আশা করি, তোমরা তোমাদের সুন্দর পল্লীনিবাসে বেশ আনন্দে আছ। আমার জন্য এক মুহূর্তও ভেবো না—আমাকে তিনি দেখবেনই দেখবেন, আর যদি না দেখেন নিশ্চিত জানব আমার যাবার সময় হয়েছে—আমি আনন্দে চলে যাব।

'হে মাধব, অনেকে তোমায় অনেক জিনিস দেয়—আমি গরীব—আমার আর কিছু নেই, কেবল এই শরীর মন ও আত্মা আছে—এইগুলি সব তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করলাম—হে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, দয়া ক'রে এইগুলি গ্রহণ করতেই হবে—নিতে অস্বীকার করলে চলবে না।' আমি তাই আমার সর্বস্ব চিরকালের জন্য দিয়েছি।

একটা কথা—এরা কতকটা শুষ্ক ধরনের লোক, আর সমগ্র জগতে খুব কম লোকই আছে, যারা শুষ্ক নয়। তারা 'মাধব' অর্থাৎ ভগবান যে রসস্বরূপ, তা একেবারে বোঝে না। তারা হয় জ্ঞান-চচ্চড়ি অথবা ঝাড়ফুঁক ক'রে রোগ আরাম করা, টেবিলে ভূত নাবানো, ডাইনী-বিদ্যা ইত্যাদির পিছনে ছোটে।

এদেশে যত প্রেম, স্বাধীনতা, তেজের কথা শোনা যায়, আর কোথাও অত শুনিনি, কিন্তু এখানকার লোকে এগুলি যত কম বোঝে, তত আর কোথাও নয়। এখানে ঈশ্বরের ধারণা—হয় 'সভয়ং বজ্রমুদ্যতং' অথবা রোগ-আরামকারী শক্তিবিশেষ অথবা কোন প্রকার স্পন্দন, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রভু এদের মঙ্গল করুন। এরা আবার দিনরাত তোতা পাখীর মতো, 'প্রেম প্রেম প্রেম' ক'রে চেঁচাচ্ছে! [৪৪]

গ্রীনএকার, মেন, ১১ই আগস্ট, ১৮৯৪

এ যাবৎ গ্রীনএকারেই আছি। জায়গাটি বেশ লাগলো। সকলেই খুব সহৃদয়। কেনিলওয়ার্থের মিসেস প্র্যাট নাম্নী এক চিকাগোবাসিনী মহিলা আমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পাঁচশত ডলার দিতে চান। আমি প্রত্যাখান করেছি। আমার কিন্তু কথা দিতে হয়েছে যে, অর্থের প্রয়োজন হলেই তাঁকে জানাব। আশা করি, ভগবান আমাকে তেমন অবস্থায় ফেলবেন না। একমাত্র তাঁর সহায়তাই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত। ...কলকাতা থেকে ফনোগ্রাফটির পৌছনো সংবাদও আসেনি।

...আগামী শরৎকালে নিউ ইয়র্কে থাকব। নিউ ইয়র্ক চমৎকার জায়গা। সেখানকার লোকের যে অধ্যবসায়, অন্যান্য নগরবাসিগণের মধ্যে তা দেখা যায় না। [৪৫]

এনিস্কোয়াম, মাসাচুসেটস ২০শে আগস্ট, ১৮৯৪

আমি একটু নীরবতা চাই, কিন্তু মনে হয় এটা প্রভুর ইচ্ছা নয়। গ্রীনএকারে গড়ে প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘণ্টা বকতে হয়েছে—এটাই ছিল বিশ্রাম। কিন্তু, এসব তো প্রভুরই কাজ, তাই উদ্যমে অভাব হয়নি। [৪৬]

এনিস্কোয়াম, ২০শে আগস্ট, ১৮৯৪

আমি পুনরায় ব্যাগলিদের সঙ্গে আছি। তাঁরা যথারীতি সহৃদয়। অধ্যাপক রাইট এখানে ছিলেন না। তবে গত পরশু তিনি এসেছেন এবং একসঙ্গে আমাদের খুব ভাল কাটছে। এভানস্টনের মিঃ ব্র্যাডলি, যাঁর সঙ্গে তোমার এভানস্টনে সাক্ষাৎ হয়েছিল, এখানে ছিলেন। কয়েকদিন বেশ নৌকাভ্রমণ করা গেছে এবং একদিন সন্ধ্যায় নৌকা উল্টিয়ে কাপড় জামা ও সবকিছু ভিজে একশেষ।

গ্রীনএকারে আমার চমৎকার কেটেছে। তাঁরা সকলেই নিষ্ঠাপরায়ণ ও সহৃদয়।...

ভাবছি এখান থেকে নিউ ইয়র্ক ফিরে যাব, অথবা বস্টনে মিসেস ওলি বুলের কাছেও যেতে পারি। সম্ভবতঃ তুমি এদেশের বিখ্যাত বেহালা-বাদক মিস্টার ওলি বুলের কথা শুনেছ। ইনি তাঁর বিধবা পত্নী। মহিলাটি খুবই ধর্মশীলা। তিনি কেম্ব্রিজে বাস করেন এবং ভারত থেকে আনা কারুকার্যময় কাঠ দিয়ে তৈরী তাঁর একখানা সুন্দর বৈঠকখানা আছে। তিনি চান আমি যে-কোন সময়ে তাঁর কাছে যাই এবং তাঁর বৈঠকখানাটি বক্তৃতার জন্য ব্যবহার করি।

বস্টন অবশ্য সব-কিছুর জন্যই একটি বৃহৎ ক্ষেত্র, কিন্তু বস্টনের লোকেরা কোন-কিছু যেমন তৎপরতার সঙ্গে গ্রহণ করে, আবার তেমনি তৎপরতার সঙ্গে ত্যাগ করে। অন্য দিকে নিউইয়র্কবাসীরা একটু ঢিলে হলেও যখন তারা কোন জিনিস ধরে, তখন খুব শক্ত করেই ধরে।

আমার স্বাস্থ্য বরাবর বেশ ভাল যাচ্ছে এবং আশা করি, ভবিষ্যতেও যাবে। আমার সঞ্চয় থেকে খরচ করবার কোন কারণ এখনও ঘটেনি, তবু আমি বেশ ভালোভাবেই কাটাচ্ছি। অর্থকরী সকল পরিকল্পনা আমি ত্যাগ করেছি, এখন শুধু সামান্য খাদ্য ও মাথার ওপরে একটু আচ্ছাদন পেলেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত থাকব এবং কাজ ক'রে যাব।...

সম্ভবতঃ পূর্বের চিঠিতে তোমাকে বলা হয়নি যে, আমি কেমন ক'রে গাছের নীচে ঘুমিয়েছি, থেকেছি এবং ধর্মপ্রচার করেছি এবং অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য আর একবার স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্যে নিজেকে পেয়েছি। [৪৭]

এনিস্কোয়াম, ২৩শে আগস্ট, ১৮৯৪

সর্বজনের জন্য এই জীবন বেশ বিরক্তিকর। আমি প্রায় অক্ষম। কোথায় পালাব? ভারতে আমি জনগণ দ্বারা বেষ্টিত হব—ভীড় আমার পেছনে ছুটে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে দেবে।...এক আউন্স যশের জন্য দিতে হয় এক পাউন্ড শান্তি আর পবিত্রতা। আমি আগে কখনও এবিষয়কে চিন্তা করিনি। এই জাতীয় প্রচারে আমি সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত। আমি বিরক্ত নিজের ওপরেও। প্রভু নিশ্চয় আমাকে শান্তি এবং পবিত্রতার পথ দেখাবেন। কেন? মা আমি তোমার কাছে অকপটে স্বীকার করছি : কোনো লোকই জনতার মধ্যে জীবন কাটাতে পারে না, এমন কি ধর্মজগতেও। প্রতিযোগিতার দৈত্য সবসময়েই হৃদয়ের প্রশান্তির মধ্যে মাথা গলাচ্ছে। যারা একটা বিশেষ মতবাদ প্রচারের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তারা কখনও এটা অনুভব করবে না, তারা তো জানে

না ধর্ম কি! কিন্তু যারা ঈশ্বরের সন্ধানে ঘুরছে এবং জাগতিক স্বার্থ যাদের মাথায় নেই তারা কিন্তু সারাক্ষণ অনুভব করবে যে নাম যশের প্রত্যেকটা ফোঁটা পবিত্রতার বিনিময়ে সংগৃহীত হয়। প্রভু আমাকে সাহায্য করুন।...নিজের ওপরেও আমি খুব বিরক্ত। ওহো, পৃথিবীটা এমন কেন যে নিজেকে সবার সামনে না ঠেলে দিলে কিছু কাজ হয় না? গোপনে, অদৃশ্য থেকে, কারও নজরে না পড়ে মানুষ কেন কাজ করতে পারে না?

ওহো বলে রাখি, আমি টমাস এ কেম্পিসের বইয়ের একটা মনোরম সংস্করণ হাতে পেয়েছি। সেই প্রবীণ সন্ন্যাসী আমার অতি প্রিয়। অবগুণ্ঠনের আড়ালে যা হয় তার চকিত দর্শন লাভ তিনি করেছিলেন—খুব কম জনই এই সুযোগ পায়। আমার কাছে এটাই ধর্ম। বাক্যবাগীশের কর্ম এটা নয়—এটাই আমি মনে করি এবং আমি বিশ্বাস করি। এই জাতীয় মুখোশধারী বাক্যবাগীশদের থেকে আমি দূরে থাকতে চাই, টমাস এ কেম্পিসের সুন্দর জগৎ থেকে এরা অনেক দূরে।...[৪৮]

ম্যাগনোলিয়া, মাসাচুসেটস, ২৮শে আগস্ট, ১৮৯৪

আমি ভারতে লিখেছি ওরা যেন অনবরত চিঠি লিখে আমাকে বিরক্ত না করে। কি জন্য? যখন ভারত পরিভ্রমণ করেছি তখন কেউই তো আমাকে চিঠি লেখেনি। তারা সব আমেরিকাতে কেন আমাকে কতকগুলো তাড়াতাড়িতে হিজিবিজি লেখা লিখে তাদের বাড়তি শক্তি খরচা করবে? আমার সমস্ত জীবনটাই একজন পরিব্রাজকের—এখানে, ওখানে, যেখানেই হোক। আমার কোনো তাড়া নেই। আমার মাথায় যেটা মূর্খের পরিকল্পনা ছিল—তা সন্ন্যাসীকে মানায় না। সেটা পরিত্যাগ করেছি এবং জীবনকে এবার সহজভাবে নিতে চাই। কোনো অশোভন তাড়া নেই।...মা, তুমি মনে রেখো... উত্তর মেরুতে গিয়েও আমি স্থিত হতে পারব না—আমাকে ঘুরে বেড়াতেই হবে।—এটাই আমার পণ, এটাই আমার ধর্ম। সুতরাং ভারতবর্ষ, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু—কিছুতেই কোনো আমার পরোয়া নেই। গত দুবছর ধরে আমি এমন সব জাতির মধ্যে বিচরণ করেছি যাদের ভাষা পর্যন্ত আমি বলতে পারি না। "আমার বাবা নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, বন্ধু নেই, শত্রু নেই, ঘর নেই, দেশ নেই—শাশ্বতের সন্ধানে আমি একজন পরিব্রাজক মাত্র, ঈশ্বর ছাড়া যে কারুর সাহায্য চায় না।" [৪৯]

এনিস্কোয়াম, মাসাচুসেটস্ ৩১শে আগস্ট, ১৮৯৪

তুমি তো জান টাকা রাখা—এমন কি, টাকা ছোঁয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে

বড় মুশকিল। ওটা আমার পক্ষে বেজায় বিরক্তিকর আর ওতে মন বড় নীচু হয়ে যায়। সেই কারণে নিজের দিকটা এবং টাকাকড়ি-সংক্রান্ত ব্যাপারটার বন্দোবস্ত করবার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের একটা সমিতি স্থাপন করতেই হবে।

এখানে আমার যে-সব বন্ধু আছেন, তাঁরাই আমার সব টাকাকড়ির বন্দোবস্ত ক'রে থাকেন—এই ভয়ানক টাকাকড়ির হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচব।[৫০]

হোটেল বেল ভিউ, বস্টন, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

স্বদেশবাসীর কাছ থেকে স্বীকৃতি এসেছে বলে, প্রভু তাঁর সেবককে অহংকারে ফুলিয়ে তুলবেন বলে আমি মনে করি না। আমি আনন্দিত যে তারা আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছে—আমার নিজের জন্যে নয়, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে তিরস্কারে নয় প্রশংসাতেই মানুষের উন্নতি হয়, দেশের পক্ষেও একই কথা। ভেবে দ্যাখ, আমার দরিদ্র দেশের প্রতি কত তিরস্কার অকারণে কারণে বর্ষিত হ'য়েছে? এরা তো খ্রীষ্টীয়দের, তাদের ধর্মমতকে বা তাদের প্রচারকদের কোনো ক্ষতি করেনি। এরা তো সর্বসমস্ত সকলের বন্ধুর মত থেকেছে। সুতরাং মা, তুমি দেখো, কোন বিদেশী দেশ একটা ভাল কথা বললে ভারতের কত মঙ্গল হয়। আমার সামান্য কাজের জন্য আমেরিকাবাসীরা যে যে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাতেও তাদের উপকার হয়েছে। লক্ষ লক্ষ দলিত, নিন্দিত, দরিদ্র ভারতবাসীকে দিবারাত্র তিরস্কার না করে—দু'একটা ভাল কথা বলা হোক। প্রত্যেক দেশের কাছ থেকে আমি এটাই ভিক্ষা চাইছি। সম্ভব হলে ওদের সাহায্য কর; যদি না পার তবে অন্ততঃ গালাগালি দেয়া বন্ধ কর।[৫১]

বস্টন, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রায় সপ্তাহখানেক হ'ল এই হোটেলে আছি। আরও কিছুকাল বস্টনে থাকব। গাউন তো এতগুলো রয়েছে, সেগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। এনিস্কোয়ামে যখন খুব ভিজে যাই, তখন পরনে ছিল সেই ভালো কালো পোশাক—যেটি তোমার খুব পছন্দ। মনে হয়, এটি আর নষ্ট হচ্ছে না ; আমার নির্গুণ ব্রহ্মধ্যান এর ভিতরেও প্রবিষ্ট হয়েছে!... আমি তো ভবঘুরের মতো ঘুরেই বেড়াচ্ছি। এবহিউ-লিখিত তিব্বতদেশীয় ভবঘুরে লামাদের বর্ণনা সম্প্রতি পড়ে খুব আমোদ পেলাম—আমাদের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের যথার্থ চিত্র। লেখক বলেন এরা অদ্ভুত লোক, খুশিমত এসে হাজির হয়, যার সঙ্গে

হোক, খায়—নিমন্ত্রিত বা অনিমন্ত্রিত। যেখানে খুশি থাকবে, যেখানে খুশি চলে যাবে। এমন পাহাড় নেই যা তারা আরোহণ করেনি, এমন নদী নেই যা তারা অতিক্রম করেনি। তাদের অবিদিত কোন জাতি নেই, অকথিত কোন ভাষা নেই। লেখকের অভিমত, যে শক্তিবশে গ্রহগুলি সদা ঘূর্ণায়মান তারই কিয়দংশ ভগবান এদের দিয়ে থাকবেন।

আজ এই ভবঘুরে লামাটি লেখবার আগ্রহ দ্বারা আবিষ্ট হয়ে সোজা একটি দোকানে গিয়ে লেখবার যাবতীয় উপকরণ সহ বোতাম-লাগানো কাঠের ছোট দোয়াত সমেত একটি পোর্টফলিও কিনে এনেছে। শুভ সঙ্কল্প। মনে হয়, গত মাসে ভারত থেকে প্রচুর চিঠিপত্র এসেছে। আমার দেশবাসিগণ আমার কাজের এরূপ তারিফ করায় খুব খুশী হলাম। তারা যথেষ্ট করেছে। আর কিছু তো লেখবার দেখতে পাচ্ছি না। অধ্যাপক রাইট, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা খুব খাতির যত্ন করেছিলেন, সর্বদা যেমন ক'রে থাকেন। ভাষায় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছি না। এ পর্যন্ত সবই ভাল যাচ্ছে। তবে একটু বিশ্রী সর্দি হয়েছিল। এখন প্রায় নেই। অনিদ্রার জন্য ক্রিশ্চান সায়ান্স অনুসরণে বেশ ফল পেয়েছি।[৫২]

বস্টন, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

মা সারা, এখন আমি বস্টনে কয়েক জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছি। এখন চাই এমন একটা জায়গা, যেখানে বসে আমার ভাবরাশি লিপিবদ্ধ করতে পারি। বক্তৃতা যথেষ্ট হ'ল, এখন আমি লিখতে চাই। আমার বোধ হয়, তার জন্য আমাকে নিউ ইয়র্কে যেতে হবে। মিসেস গার্নসি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছিলেন এবং তিনি সদাই আমায় সাহায্য করতে ইচ্ছুক। আমি মনে করছি, তাঁর ওখানে গিয়ে বসে বসে বই লিখব।[৫৩]

বস্টন, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

আমি ক্রমাগত এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, সর্বদা কাজ করছি, বক্তৃতা দিচ্ছি, ক্লাস করছি এবং লোককে নানা রকমে বেদান্ত শিক্ষা দিচ্ছি।

আমি যে বই লেখবার সঙ্কল্প করেছিলাম, এখনও তার এক পঙ্ক্তি লিখতে পারিনি। সম্ভবতঃ পরে এ কাজ হাতে নিতে পারব। এখানে উদার মতাবলম্বীদের মধ্যে আমি কয়েকজন পরম বন্ধু পেয়েছি, গোঁড়া খ্রীষ্টানদের মধ্যেও কয়েক জনকে পেয়েছি, আশা করি, শীঘ্রই ভারতে ফিরব। এ দেশ

তো যথেষ্ট ঘাঁটা হ'ল, বিশেষতঃ অতিরিক্ত পরিশ্রম আমাকে দুর্বল ক'রে ফেলেছে। সাধারণের সামনে বিস্তর বক্তৃতা করায় এবং এক জায়গায় স্থিরভাবে না থেকে ক্রমাগত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সেখানে ঘোরার দরুন এই দুর্বলতা এসেছে।

...সুতরাং বুঝছ আমি শীঘ্রই ফিরছি। কতকগুলি লোকের আমি খুব প্রিয় হয়ে উঠেছি, আর তাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে ; তারা অবশ্যই চাইবে, আমি বরাবর এখানে থেকে যাই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—খবরের কাগজে নাম বেরনো এবং সর্বসাধরণের ভেতর কাজ করার দরুন ভুয়ো লোকমান্য তো যথেষ্ট হ'ল—আর কেন? আমার ও-সবের একদম ইচ্ছা নেই।

...কোন দেশের অধিকাংশ লোকই কখনও কেবল সহানুভূতির বশে লোকের উপকার করে না।...

আমাদের জাতের তুলনায় পাশ্চাত্যেরা বেশি কৃপণ। আমি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, এশিয়াবাসীরা জগতের সকল জাতের চেয়ে বেশী দানশীল জাত, তবে তারা যে বড় গরিব।

নিউইয়র্ক ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪—মঠের সকলকে লেখা

এ দেশে গরমির দিনে সকলে দরিয়ার কিনারায় যায়— আমিও গিয়েছিলাম, অবশ্য পরের স্কন্ধে। এদের নৌকা আর জাহাজ চালাবার বড়ই বাতিক। ইয়াট বলে ছোট ছোট জাহাজ ছেলে-বুড়ো যার পয়সা আছে, তারই একটা আছে। তাইতে পাল তুলে দরিয়ায় যায়, আর ঘরে আসে, খায় দায়— নাচে কোঁদে— গান বাজনা তো দিবারাত্র। পিয়ানোর জ্বালায় ঘরে তিষ্ঠাবার জো নাই।

ঐ যে জি ডবলু হেল (হেল)-এর ঠিকানায় চিঠি দাও, তাদের কথা কিছু বলি। হেল আর তার স্ত্রী, বুড়ো-বুড়ি। আর দুই মেয়ে, দুই ভাইঝি, এক ছেলে। ছেলে রোজগার করতে দোসরা জায়গায় থাকে। মেয়েরা ঘরে থাকে। এদের দেশে মেয়ের সম্বন্ধেই সম্বন্ধ। ছেলে বে ক'রে পর হয়ে যায়— মেয়ের স্বামী ঘন ঘন স্ত্রীর বাপের বাড়ী যায়। এরা বলে—

'Son is son till he gets a wife,
The daughter is daughter all her life.'

—পুত্রের যতদিন না বিবাহ হয় ততদিনই সে পুত্র, কিন্তু কন্যা চিরদিনই কন্যা থাকে।

চারজনেই যুবতী— বে থা করেনি। বে হওয়া এদেশে বড়ই হাঙ্গাম। প্রথম

মনের মতো বর চাই। দ্বিতীয় পয়সা চাই। ছোঁড়া বেটারা ইয়ারকি দিতে বড়ই মজবুত— ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়ীরা নেচে কুঁদে একটা স্বামী যোগাড় করে, ছোঁড়া বেটারা ফাঁদে পা দিতে বড়ই নারাজ। এই রকম করতে করতে একটা 'লভ্' হয়ে পড়ে— তখন সাদি হয়। এই হ'ল সাধারণ— তবে হেলের মেয়েরা রূপসী, বড়মানষের ঝি, ইউনিভার্সিটি 'গার্ল' (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী)—নাচতে গাইতে পিয়ানো বাজাতে অদ্বিতীয়া— অনেক ছোঁড়া ফেঁ ফেঁ করে— তাদের বড় পসন্দয় আসে না। তারা বোধ হয় বে থা করবে না— তার উপর আমার সংস্রবে ঘোর বৈরিগ্যি উপস্থিত। তারা এখন ব্রহ্মচিন্তায় ব্যস্ত।

মেরী আর হ্যারিয়েট হ'ল মেয়ে, আর এক হ্যারিয়েট আর ইসাবেল হল ভাইঝি। মেয়ে দুটির চুল সোনালি অর্থাৎ [তারা] ব্লণ্ড, আর ভাইঝি দুটি ব্রূনেট অর্থাৎ কালো চুল। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ— এরা সব জানে ভাইঝিদের তত পয়সা নেই— তারা একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুল করে ; মেয়েরা কিছু রোজগার করে না। এদের দেশের অনেক মেয়ে রোজগার করে। কেউ কারুর উপর নির্ভর করে না। ক্রোড়পতির ছেলেও রোজগার করে, তবে বে করে, আর আপনার বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকে। মেয়েরা আমাকে দাদা বলে. আমি তাদের মাকে মা বলি। আমার মালপত্র সব তাদের বাড়িতে— আমি যেখানেই কেন যাই না। তারা সব ঠিকানা করে। এদেশের ছেলেরা ছোটবেলা থেকেই রোজগার করতে যায়, আর মেয়েরা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেখে— তাইতে ক'রে একটা সভায় দেখবে যে শতকরা ৯০ জন মেয়ে ছোঁড়ারা তাদের কাছে কলকেও পায় না।

এদেশে ভূতুড়ে অনেক। মিডিয়ম হ'ল যে ভূত আনে। মিডিয়ম একটা পরদার আড়ালে যায়, আর পরদার ভেতর থেকে ভূত বেরুতে আরম্ভ করে— বড় ছোট, হর-রঙের। আমি গোটাকতক দেখলাম বটে, কিন্তু ঠকবাজি বলেই বোধ হ'ল। আর গোটাকতক দেখে তবে ঠিক সিদ্ধান্ত করব। ভূতুড়েরা অনেকে আমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে।

দোসরা হচ্চেন ক্রিশ্চিয়ান সায়ান্স— এরাই হচ্চে আজকালকার বড় দল— সর্ব ঘটে। বড়ই ছড়াচ্ছে— গোঁড়া বেটাদের বুকে শেল বিঁধছে। এরা হচ্চে বেদান্তী অর্থাৎ গোটাকতক অদ্বৈতবাদের মত যোগাড় ক'রে তাকে বাইবেলের মধ্যে ঢুকিয়েছে আর 'সোঽহং সোঽহং' ব'লে রোগ ভাল ক'রে দেয়— মনের জোরে। এরা সকলেই আমাকে বড় খাতির করে।

আজকাল গোঁড়া বেটাদের ত্রাহি-ত্রাহি এদেশে ডেভিল ওয়ারশিপ আর

বড় একখানা চলছে না। আমাকে বেটারা যমের মতো দেখে। বলে, কোথা থেকে এ বেটা এল, রাজ্যির মেয়ে-মদ্দ ওর পিছু পিছু ফেরে— গোঁড়ামির জড় মারবার যোগাড়ে আছে। আগুন ধরে গেছে বাবা! গুরুর কৃপায় যে আগুন ধরে গেছে, তা নিববার নয়। কালে গোঁড়াদের দম নিকলে যাবে। কি বাঘ ঘরে ঢুকিয়েছেন, তা বাছাধনেরা টের পাচ্ছেন। থিওসফিস্টদের জোর বড় একটা নাই। তবে তারাও গোঁড়াদের খুব পিছু লেগে আছে।

এই ক্রিশ্চিয়ান সায়ান্স ঠিক আমাদের কর্তাভজা। বল্ 'রোগ নেই'— বস্, ভাল হয়ে গেল, আর বল্ 'সোঽহং', বস্—ছুট্টি, চরে খাওগে। দেশ ঘোর 'মেটিরিয়ালিস্ট' (জড়বাদী)। এই ক্রিশ্চিয়ান দেশের লোক— ব্যামো ভাল কর, আজগুবি কর ; পয়সার রাস্তা হয়, তবে ধর্ম মানে— অন্য কিছু বড় বোঝে না। তবে কেউ কেউ বেশ আছে— যত বেটা দুষ্টু বজ্জাত, ঠক-জোচ্চোর মিশনারিরা তাদের ঘাড় ভাঙে আর তাদের পাপ মোচন করে।... এরা আমাতে এক নূতন ঢৌলের মানুষ দেখেছে। গোঁড়া বেটাদের পর্যন্ত আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে, আর এখন সকলে বড়ই ভক্তি করছে— বাবা ব্রহ্মচর্যের চেয়ে কি আর বল আছে?

এরা ভাল মানুষ, দয়াবান্ সত্যবাদী। সব ভাল, কিন্তু ঐ যে 'ভোগ', ঐ ওদের ভগবান— টাকার নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যার ঢেউ, বিলাসের ছড়াছড়ি।

এইখান থেকেই শুরু ঐ ঢৌল সব। মহাশক্তির বিকাশ— এরা বামাচারী। তারই সিদ্ধি এখানে, আর কি! যাক— এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা! আমাকে যেন বাচ্ছাটির মতো ঘাটে-মাঠে দোকান-হাটে নিয়ে যায়। সব কাজ করে— আমি তার সিকির সিকিও করতে পারিনি।[৫৫]

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

...কলকাতা থেকে আমার বক্তৃতা ও কথাবার্তা সম্বন্ধে যে-সব বই ছাপা হয়েছে, তাতে একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি। তাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়লে বোধ হয় যেন আমি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছি। আমি কিন্তু রাজনীতিক নই, অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই। আমার লক্ষ্য কেবল ভেতরের আত্মতত্ত্বের দিকে ; সেইটি যদি ঠিক হয়ে যায়, তবে আর সবই ঠিক হয়ে যাবে— এই আমার মত।

...অতএব তুমি কলকাতার লোকদের অবশ্য অবশ্য সাবধান ক'রে দেবে, যেন আমার কোন লেখা বা কথার ভেতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মিথ্যা ক'রে

আরোপিত করা না হয়। কি আহাম্মকি!...শুনলাম, রেভারেন্ড কালীচরণ বাঁড়ুয্যে নাকি খ্রীষ্টান মিশনারীদের সমক্ষে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। যদি সর্বসাধারণের সমক্ষে এ কথা বলা হয়ে থাকে, তবে আমার তরফ থেকে তাঁকে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি কলকাতার যে-কোন সংবাদপত্রে লিখে হয় তা প্রমাণ করুন, নতুবা তাঁর ঐ বাজে আহাম্মকি কথাটা প্রত্যাহার করুন। এটা অন্য ধর্মাবলম্বীকে অপদস্থ করবার খ্রীষ্টান মিশনরীদের একটা অপকৌশলমাত্র। আমি সাধারণভাবে খ্রীষ্টান-পরিচালিত শাসনতন্ত্রকে লক্ষ্য ক'রে সরলভাবে সমালোচনার ছলে কয়েকটা কড়া কথা বলেছি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমার রাজনৈতিক বা ঐ রকম কিছু চর্চার দিকে কিছু ঝোঁক আছে, অথবা রাজনীতি বা তৎসদৃশ কিছুর সঙ্গে আমার কোনরূপ সম্পর্ক আছে। যাঁরা ভাবেন, ঐ সব বক্তৃতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে ছাপানো একটা খুব জমকালো ব্যাপার, আর যাঁরা প্রমাণ করতে চান যে আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক, তাঁদের আমি বলি, 'হে ঈশ্বর, আমার বন্ধুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।'

...আমার বন্ধুগণকে বলবে, যাঁরা আমার নিন্দাবাদ করছেন, তাঁদের জন্য আমার একমাত্র উত্তর— একদম চুপ থাকা। আমি তাঁদের ঢিলটি খেয়ে যদি তাঁদের পাটকেল মারতে যাই, তবে তো আমি তাঁদের সঙ্গে এক দরের হয়ে পড়লুম। তাদের বলবে— সত্য নিজের প্রতিষ্ঠা নিজেই করবে, আমার জন্যে তাদের কারও সঙ্গে বিরোধ করতে হবে না।

...সাধারণের সঙ্গে জড়িত এই বাজে জীবনে এবং খবরের কাগজের হুজুকে আমি একেবারে বিরক্ত হয়ে গিয়েছি। এখন প্রাণের ভেতর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে— হিমালয়ের সেই শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে যাই।[৫৬]

চিকাগো, সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

আমি এখন এদেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং সব কিছু দেখছি, এবং তার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটি মাত্র দেশ আছে, যেখানে মানুষ— ধর্ম কি বস্তু তা বোঝে— সে দেশ হল ভারতবর্ষ। হিন্দুদের সব দোষত্রুটি সত্ত্বেও তারা নৈতিক চরিত্রে ও আধ্যাত্মিকতায় অন্যান্য জাতি থেকে ঊর্ধ্বে ; আর তার নিঃস্বার্থ সন্তানগণের যথাযোগ্য যত্ন চেষ্টা ও উদ্যমের দ্বারা পাশ্চাত্যের কর্মৈষণা ও তেজস্বিতার কিছু উপাদান হিন্দুদের শান্ত গুণাবলীর সঙ্গে মিলিত করলে— এ যাবৎ পৃথিবীতে যত প্রকার মানুষ দেখা গিয়েছে, তার চাইতে অনেক উৎকৃষ্ট ধরনের

মানুষ আবির্ভূত হবে।

কবে ভারতবর্ষে ফিরতে পারব, বলতে পারব না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এদেশের যথেষ্ট আমি দেখেছি, সুতরাং শীঘ্রই ইউরোপ রওনা হচ্ছি— তারপর ভারতবর্ষ।[৫৭]

নিউ ইয়র্ক, ৯ই জুলাই (সেপ্টেম্বর?), ১৮৯৪
[৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ তে মন্তব্য]

জয় জগদম্বে! আমি আশারও অধিক পেয়েছি। মা আপন প্রচারককে মর্যাদায় অভিভূত করেছেন। তাঁর দয়া দেখে আমি শিশুর মতো কাঁদছি। ভগিনীগণ! তাঁর দাসকে তিনি কখনও ত্যাগ করেন না। আমি যে চিঠিখানি তোমাদের পাঠিয়েছি, তা দেখলে সবই বুঝতে পারবে। আমেরিকার লোকেরা শীঘ্রই ছাপা কাগজগুলি পাবে।

পত্রে যাঁদের নাম আছে, তাঁরা আমাদের দেশের সেরা লোক। সভাপতি ছিলেন কলকাতার এক অভিজাত শ্রেষ্ঠ, অপর ব্যক্তি মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজের শীর্ষস্থানীয়। তাঁর এই মর্যাদা গবর্নমেন্টেরও অনুমোদিত। ভগিনীগণ! আমি কি পাষণ্ড! তাঁর এত দয়া প্রত্যক্ষ করেও মাঝে আমার বিশ্বাস প্রায় হারিয়ে ফেলি। সর্বদা তিনি রক্ষা করছেন দেখেও মন কখন কখন বিষাদগ্রস্ত হয়। ভগিনীগণ! ভগবান একজন আছেন জানবে, তিনি পিতা, তিনি মাতা ; তাঁর সন্তানদের তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন না— না, না, না। নানারকম বিকৃত মতবাদ ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সরল শিশুর মতো তাঁর শরণাগত হও। আমি আর লিখতে পারছি না, মেয়েদের মতো কাঁদছি।

জয় প্রভু, জয় ভগবান![৫৮]

ওয়াশিংটন ডি সি, ২৩শে অক্টোবর, ১৮৯৪

এতদিনে আমি এদের নিজেদের ধর্মাচার্যগণের মধ্যে একজন হয়ে দাঁড়িয়েছি। এরা সবাই আমাকে এবং আমার উপদেশ পছন্দ করে। সম্ভবতঃ আমি আগামী শীতে ভারতে ফিরব। আপনি বোম্বাইয়ে মিঃ গান্ধীকে জানেন কি? তিনি এখনও চিকাগোতেই আছেন। ভারতে যেমন আমার অভ্যাস ছিল, এখানেও সেইরকম আমি সমস্ত দেশের ভিতর ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি। প্রভেদ এইটুকু যে, এখানে উপদেশ দিয়ে, প্রচার করে বেড়াচ্ছি। সহস্র সহস্র ব্যক্তি খুব আগ্রহ ও যত্নের সঙ্গে আমার কথা শুনেছে। এদেশে থাকা খুব ব্যয়সাধ্য, কিন্তু প্রভু সর্বত্রই আমার যোগাড় করে দিচ্ছেন।[৫৯]

ওয়াশিংটন, ১লা নভেম্বর (?), ১৮৯৪

আমি এখানে বেশ সদ্ব্যবহার পেয়েছি, কাজও চমৎকার হচ্ছে। ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। কেবল ভারত থেকে বোঝাবোঝা সংবাদপত্র আসায় বিরক্ত হয়েছিলাম। 'মাদার চার্চ' ও মিসেস গার্নসিকে সেগুলি গাড়ি বোঝাই ক'রে পাঠিয়ে দিয়ে ভারতে ওদের নিষেধ ক'রে দিলাম, আর যেন সংবাদপত্র না পাঠায়। ভারতে খুব হইচই পড়ে গিয়েছে। আলাসিঙ্গা লিখেছে, দেশ জুড়ে গ্রামে গ্রামে আমার নাম রটেছে। ফলে পূর্বেকার সে শান্তি আর রইল না ; এর পর আর কোথাও বিশ্রাম বা অবসর পাওয়া কঠিন হবে। ভারতের সংবাদপত্রগুলি আমাকে শেষ না ক'রে ছাড়বে না দেখছি। কবে কি খেয়েছি, কখন হেঁচেছি— সব কিছু ছাপাবে। অবশ্য বোকামি আমারই। প্রকৃতপক্ষে এখানে এসেছিলাম নিঃশব্দে কিছু অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ; কিন্তু ফাঁদে পড়ে গেছি, আর এখন চুপচাপ থাকতে পাব না।[৬০]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ১৮৯৪

গত শীতকালে আমি এ দেশে খুব বেড়িয়েছি— যদিও শীত অতিরিক্ত ছিল, আমার তত শীত বোধ হয়নি। মনে করেছিলাম— ভয়ানক শীত ভোগ করতে হবে, কিন্তু ভালয় ভালয় কেটে গেছে।[৬১]

নিউ ইয়র্ক, ১৯শে নভেম্বর, ১৮৯৪

আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন কেবল প্রেম সরলতা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ বিস্তার ; বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন— ওটাই জীবনের একমাত্র আইন। স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকতেও তা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ। দেহাবসানে কিছুই থাকে না এ কথা যে বলে, তাকেও স্বীকার করতে হবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু।

পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বই জন নরপশুই মৃত, তারা প্রেততুল্য ; কারণ হে যুবকবৃন্দ, যার হৃদয়ে প্রেম নেই, সে মৃত ছাড়া আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হোক, মস্তিষ্ক ঘুরতে থাকুক, তোমাদের পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হোক।

তখন গিয়ে ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও।

সকলেই তাঁর কাছ থেকে শক্তি ও সাহায্য পাবে— অদম্য উৎসাহ, অনন্ত শক্তি আসবে। গত দশ বছর ধরে আমার মূলমন্ত্র ছিল— এগিয়ে যাও ; এখনও বলছি এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না, তখনও বলেছি— এগিয়ে যাও। এখন একটু একটু আলো দেখা যাচ্ছে, এখনও বলছি— এগিয়ে যাও। বৎস, ভয় পেয়ো না। উপরে তারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয় দৃষ্টিতে চেয়ে মনে কোরো না, ওটা তোমাকে পিষে ফেলবে। অপেক্ষা কর, দেখবে— অল্পক্ষণের মধ্যে দেখবে, সবই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়— চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। আমি বরাবরই প্রভুর উপর নির্ভর করেছি, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল সত্যের উপর নির্ভর করেছি। আমার বিবেকের উপর এই কলঙ্ক নিয়ে যেন মরতে না হয় যে, আমি নামের জন্য, এমন কি পরের উপকার করবার জন্য লুকোচুরি খেলেছি।[৬২]

কেম্ব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪

আমার অর্থের একটা অংশ আমি ভারতে পাঠিয়েছি এবং চেষ্টা করছি প্রায় সবটাই শীঘ্রই পাঠাতে। শুধুমাত্র ফেরার টাকাটুকু রেখে দেব।[৬৩]

কেম্ব্রিজ, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪

প্রায়ই শুনে থাকি, কোন না কোন মিশনারি কাগজে আমাকে আক্রমণ ক'রে লেখা হচ্ছে। তার কোনটা আমার দেখবার ইচ্ছাও হয় না।[৬৪]

চিকাগো, ১৮৯৪

প্রভুর ইচ্ছায় এখনও নামযশের ইচ্ছা হৃদয়ে আসেনি ; বোধ হয় আসবেও না। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। এই যন্ত্র দিয়ে হাজারে হাজারে হৃদয়ে এই দূরদেশে তিনি ধর্মভাব উদ্দীপিত করছেন। সহস্র সহস্র নরনারী এদেশে আমাকে অতিশয় স্নেহ প্রীতি ও ভক্তি করে, আর শত শত পাদ্রী ও গোঁড়া ক্রিশ্চান আমাকে শয়তানের সহোদর মনে করে।

আমি তাঁর কৃপায় আশ্চর্য! যে শহরে যাই, তোলপাড় হয়। এরা আমার নাম দিয়েছে—'সাইক্লোনিক হিন্দু' মনে রেখো, এসব তাঁর ইচ্ছা— I am a voice without a form.[৬৫]

চিকাগো, ৩রা জানুয়ারী, ১৮৯৫

দেখছি, এই দেশেও আমার বিশেষ কাজ রয়েছে। জানি না— কবে ভারতে

যাব। তিনি যেমন চালাচ্ছেন, আমি সেইরকম চলছি ; আমি সম্পূর্ণ তাঁর হাতে।[৬৬]

চিকাগো, ৩রা জানুয়ারী, ১৮৯৫

গত রবিবার ব্রুকলিনে বক্তৃতা দিয়েছি। সন্ধ্যায় পৌছলে মিসেস হিগিন্স আমার সম্বর্ধনার আয়োজন করেন এবং ডক্টর জেন্‌স্‌ প্রভৃতি এথিক্যাল সোসাইটির কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কয়েকজন ভেবে ছিলেন যে, প্রাচ্যদেশীয় ধর্মপ্রসঙ্গ ব্রুকলিনের জনসাধারণের উপভোগ্য হবে না।

কিন্তু প্রভুর কৃপায় বক্তৃতা খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ব্রুকলিনের প্রায় আটশ গণ্যমান্য মানুষ যোগদান করেন ; যাঁরা মনে করেছিলেন বক্তৃতা সফল হবে না, তাঁরাই ব্রুকলিনে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করছেন।

এখানে একটি নতুন গাউন যোগাড় করবার চেষ্টাতেও আছি। পুরানো আলখাল্লাটা এখানে আছে। কিন্তু বারবার কাচার ফলে সেটা এত ছোট হয়ে গিয়েছে যে, সেটা প'রে লোকের সামনে যাওয়া যায় না। চিকাগোয় ঠিক তেমনি একটা গাউন পাব বলে মনে হয়।[৬৭]

চিকাগো, ১১ই জানুয়ারী, ১৮৯৫

এদেশের দুটি প্রধান কেন্দ্র— বস্টন ও নিউইয়র্কের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছি। এর মধ্যে বস্টনকে 'মস্তিষ্ক' ও নিউইয়র্ককে 'ম্যানি ব্যাগ' বলা যেতে পারে। উভয় শহরেই আমার কাজ আশাতীতভাবে সফল হয়েছে। খবরের কাগজে কি বেরুল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আশা কোরো না, এইসব রিপোর্ট তোমাদের কাছে পাঠাব। শুরুতে একটু হৈ চৈ দরকার ছিল। যা যথার্থ সত্য তা আমি শিক্ষা দিতে চাই ; তা এখানেই হোক আর অন্যত্রই হোক— আমি কাউকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। যতদিন না দেহত্যাগ হচ্ছে, ততদিন অবিশ্রান্তভাবে কাজ ক'রে যাব ; মৃত্যুর পরও জগতের কল্যাণের জন্য আমি কাজ করতে থাকব।

এখানে হাজার হাজার ভাল লোক আমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। খবরের কাগজে হুজুগ ক'রে আমাকে যতটা না বাড়াতে পেরেছে, তার চেয়ে এদেশে আমার প্রভাব লোকের ওপর ধীরে ধীরে অনেক বেশী বিস্তার লাভ করেছে। গোঁড়ারা এটা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে, তারা কিছুতেই এটা ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না ; তাই যাতে আমার প্রভাবটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করছে না। কিন্তু তারা তা পেরে উঠবে না— প্রভু এ কথা

থাকছেন।

প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীর হ'তে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন। আমি যাদের শিক্ষা দেব, তারা হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, আর খ্রীষ্টানই হোক, আমি তা গ্রাহ্য করি না। যারা প্রভুকে ভালবাসে, তাদের সেবা করতে আমি সর্বদা প্রস্তুত, জানবে।

আমাকে নীরবে ধীরভাবে কাজ করতে দাও— প্রভু আমার সঙ্গে সর্বদা রয়েছেন।[৬৮]

চিকাগো, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৯৫

এখন তোমরা চিরদিনের জন্য জেনে রাখো যে, আমি নাম-যশ বা ঐ ধরনের বাজে জিনিস একদম গ্রাহ্য করি না। জগতের কল্যাণের জন্য আমার ভাবগুলি আমি প্রচার করতে চাই। তোমরা খুব বড় কাজ করেছ বটে, কিন্তু কাজ যতদূর হয়েছে, তাতে শুধু আমার নাম-যশই হয়েছে। কেবল জগতের বাহবা নেবার জন্যই জীবন ব্যয় করা অপেক্ষা আমার কাছে আমার জীবনের আরও বেশী মূল্য আছে বলে মনে হয়। ঐসব আহাম্মকির জন্য আমার মোটেই সময় নেই, জানবে।[৬৯]

নিউ ইয়র্ক, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৫

আমার শেষ বক্তৃতাটা পুরুষদের সমাদর পায়নি কিন্তু মেয়েদের কাছে দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছে। তুমি জানো যে, ব্রুকলিন জায়গাটা নারী-অধিকার আন্দোলনের বিরোধিতার কেন্দ্র, তাই যখন আমি বললাম, মেয়েরা সর্ববিষয়ে অধিকার পাবার যোগ্য এবং তাদের তা পাওয়া উচিত, তখন বলাই বাহুল্য, পুরুষেরা সেটা পছন্দ ক'রল না। কোন চিন্তা নেই, মেয়েরা আনন্দে আত্মহারা।[৭০]

নিউ ইয়র্ক, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫

এইমাত্র তোমার সুন্দর পত্রখানি পেলাম। নিষ্কামভাবে কাজ করতে বাধ্য হওয়াও সময়ে সময়ে উত্তম সাধন— যদিও তাতে নিজকৃত কর্মের ফলভোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।...

তোমার সমালোচনাগুলি পড়ে আমি মোটেই দুঃখিত হইনি, বরং বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। সেদিন মিস থার্সবির বাড়ীতে এক প্রেসবিটেরিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক হয়েছিল। যেমন হয়ে থাকে, ভদ্রলোকটি অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে গালাগালি আরম্ভ করলেন। যাই হোক, মিসেস

যাব। তিনি যেমন চালাচ্ছেন, আমি সেইরকম চলছি ; আমি সম্পূর্ণ তাঁর হাতে।[৬৬]

চিকাগো, ৩রা জানুয়ারী, ১৮৯৫

গত রবিবার ব্রুকলিনে বক্তৃতা দিয়েছি। সন্ধ্যায় পৌঁছলে মিসেস হিগিন্স আমার সম্বর্ধনার আয়োজন করেন এবং ডক্টর জেন্স্ প্রভৃতি এথিক্যাল সোসাইটির কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কয়েকজন ভেবে ছিলেন যে, প্রাচ্যদেশীয় ধর্মপ্রসঙ্গ ব্রুকলিনের জনসাধারণের উপভোগ্য হবে না।

কিন্তু প্রভুর কৃপায় বক্তৃতা খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ব্রুকলিনের প্রায় আটশ গণ্যমান্য মানুষ যোগদান করেন। যাঁরা মনে করেছিলেন বক্তৃতা সফল হবে না, তাঁরাই ব্রুকলিনে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করছেন।

এখানে একটি নতুন গাউন যোগাড় করবার চেষ্টাতেও আছি। পুরানো আলখাল্লাটা এখানে আছে। কিন্তু বারবার কাচার ফলে সেটা এত ছোট হয়ে গিয়েছে যে, সেটা প'রে লোকের সামনে যাওয়া যায় না। চিকাগোয় ঠিক তেমনি একটা গাউন পাব বলে মনে হয়।[৬৭]

চিকাগো, ১১ই জানুয়ারী, ১৮৯৫

এদেশের দুটি প্রধান কেন্দ্র— বস্টন ও নিউইয়র্কের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছি। এর মধ্যে বস্টনকে 'মস্তিষ্ক' ও নিউইয়র্ককে 'ম্যানি ব্যাগ' বলা যেতে পারে। উভয় শহরেই আমার কাজ আশাতীতভাবে সফল হয়েছে। খবরের কাগজে কি বেরুল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আশা কোরো না, এইসব রিপোর্ট তোমাদের কাছে পাঠাব। শুরুতে একটু হৈ চৈ দরকার ছিল। যা যথার্থ সত্য তা আমি শিক্ষা দিতে চাই ; তা এখানেই হোক আর অন্যত্রই হোক— আমি কাউকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। যতদিন না দেহত্যাগ হচ্ছে, ততদিন অবিশ্রান্তভাবে কাজ ক'রে যাব ; মৃত্যুর পরও জগতের কল্যাণের জন্য আমি কাজ করতে থাকব।

এখানে হাজার হাজার ভাল লোক আমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। খবরের কাগজে হুজুগ ক'রে আমাকে যতটা না বাড়াতে পেরেছে, তার চেয়ে এদেশে আমার প্রভাব লোকের ওপর ধীরে ধীরে অনেক বেশী বিস্তার লাভ করেছে। গোঁড়ারা এটা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে, তারা কিছুতেই এটা ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না ; তাই যাতে আমার প্রভাবটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করছে না। কিন্তু তারা তা পেরে উঠবে না— প্রভু এ কথা

বলছেন।

প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীর হ'তে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন। আমি যাদের শিক্ষা দেব, তারা হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, আর খ্রীষ্টানই হোক, আমি তা গ্রাহ্য করি না। যারা প্রভুকে ভালবাসে, তাদের সেবা করতে আমি সর্বদা প্রস্তুত, জানবে।

আমাকে নীরবে ধীরভাবে কাজ করতে দাও— প্রভু আমার সঙ্গে সর্বদা রয়েছেন।[৬৮]

চিকাগো, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৯৫

এখন তোমরা চিরদিনের জন্য জেনে রাখো যে, আমি নাম-যশ বা ঐধরনের বাজে জিনিস একদম গ্রাহ্য করি না। জগতের কল্যাণের জন্য আমার ভাবগুলি আমি প্রচার করতে চাই। তোমরা খুব বড় কাজ করেছ বটে, কিন্তু কাজ যতদুর হয়েছে, তাতে শুধু আমার নাম-যশই হয়েছে। কেবল জগতের বাহবা নেবার জন্যই জীবন ব্যয় করা অপেক্ষা আমার কাছে আমার জীবনের আরও বেশী মূল্য আছে বলে মনে হয়। ঐসব আহাম্মকির জন্য আমার মোটেই সময় নেই, জানবে।[৬৯]

নিউ ইয়র্ক, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৫

আমার শেষ বক্তৃতাটা পুরুষদের সমাদর পায়নি কিন্তু মেয়েদের কাছে দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছে। তুমি জানো যে, ব্রুকলিন জায়গাটা নারী-অধিকার আন্দোলনের বিরোধিতার কেন্দ্র, তাই যখন আমি বললাম, মেয়েরা সর্ববিষয়ে অধিকার পাবার যোগ্য এবং তাদের তা পাওয়া উচিত, তখন বলাই বাহুল্য, পুরুষেরা সেটা পছন্দ ক'রল না। কোন চিন্তা নেই, মেয়েরা আনন্দে আত্মহারা।[৭০]

নিউ ইয়র্ক, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫

এইমাত্র তোমার সুন্দর পত্রখানি পেলাম। নিষ্কামভাবে কাজ করতে বাধ্য হওয়াও সময়ে সময়ে উত্তম সাধন— যদিও তাতে নিজকৃত কর্মের ফলভোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।...

তোমার সমালোচনাগুলি পড়ে আমি মোটেই দুঃখিত হইনি, বরং বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। সেদিন মিস থার্সবির বাড়ীতে এক প্রেসবিটেরিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক হয়েছিল। যেমন হয়ে থাকে, ভদ্রলোকটি অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে গালাগালি আরম্ভ করলেন। যাই হোক, মিসেস

বুল আমাকে এজন্য পরে খুব ভর্ৎসনা করেছেন, কারণ এসব আমার কাজের পক্ষে ক্ষতিকর। তোমারও মত ঐ রকম বলে বোধ হচ্ছে।

তুমি যে এ সম্বন্ধে ঠিক এই সময়েই লিখেছ, এটা আনন্দের বিষয়। কারণ আমিও ঐ বিষয়ে যথেষ্ট ভাবছি। প্রথমতঃ আমি এই সব ব্যাপারের জন্য আদৌ দুঃখিত নই ; হয়তো তুমি তাতে বিরক্ত হবে— হবার কথা বটে! সাংসারিক উন্নতির জন্য মধুরভাষী হওয়া যে কত ভাল, তা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি মিষ্টভাষী হতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু যখন তাতে আমার অন্তরস্থ সত্যের সঙ্গে একটা উৎকট রকমের আপস করতে হয়, তখনই আমি থেমে যাই। আমি বিনম্র দীনতায় বিশ্বাসী নই— সমদর্শিত্বের ভক্ত আমি!

সাধারণ মানবের কর্তব্য— তার 'ঈশ্বর' অর্থাৎ সমাজের সব আদেশ পালন করা ; কিন্তু জ্যোতির তনয়গণ কখনও সেরকম করেন না। এটা একটি চিরন্তন নিয়ম। একজন নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক মতামতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সর্বকল্যাণপ্রদ সমাজের কাছ থেকে সর্ববিধ সুখসম্পদ পায় ; অপর ব্যক্তি একাকী থেকে সমাজকে তাঁর দিকে টেনে নেন।

সমাজের সঙ্গে যে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলে, তার পথ কুসুমাস্তীর্ণ, আর যে তা করে না, তার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা পলকেই বিনাশপ্রাপ্ত হন ; আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী।

আমি সত্যকে একটা অনন্তশক্তিসম্পন্ন জারক (corrosive) পদার্থের সঙ্গে তুলনা করি। ওটা যেখানে পড়ে, সেখানেই ক্ষয় করতে করতে নিজের পথ করে নেয়—নরম জিনিসে শীঘ্র, শক্ত গ্র্যানাইট পাথরে বিলম্বে ; কিন্তু পথ করে নেবেই।

যল্লিখিতং তল্লিখিতম্। ভগিনি, আমি যে প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যার সঙ্গে মিষ্টবাক্যে আপস করতে পারি না, সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আমি তা পারি না। সারাজীবন এজন্য ভুগেছি, তবু তা করতে পারিনি। আমি বারবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। ঈশ্বর মহিমময়, তিনি আমাকে মিথ্যাচারী হতে দেবেন না। অবশেষে ওটা ছেড়ে দিয়েছি। এখন যা ভিতরে আছে, তাই ফুটে উঠুক।

আমি এমন কোন পথ পাইনি, যা সবাইকে খুশী করবে ; সুতরাং আমি স্বরূপতঃ যা, তাই আমাকে থাকতে হবে— আমায় নিজ অন্তরাত্মার কাছে খাঁটি থাকতে হবে। 'যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নামযশও নশ্বর, এমন কি পর্বতও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হয় ;

বন্ধুত্ব ও প্রেম ক্ষণস্থায়ী, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী।' হে সত্যরূপী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র পথ-প্রদর্শক হও।

আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এখন আর মিষ্ট মধু হওয়া চলে না। আমি যেমন আছি, যেন তেমনই থাকি। 'হে সন্ন্যাসি, তুমি নির্ভয়ে দোকানদারি ত্যাগ করে, শত্রু-মিত্র কাকেও গ্রাহ্য না করে সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকো।' এই মুহূর্ত হতে আমি ইহামূত্রফলভোগবিরাগী হলাম— 'ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় অসার ভোগনিচয়কে পরিত্যাগ কর।' হে সত্য, একমাত্র তুমিই আমার পথপ্রদর্শক হও।

আমার ধনের কামনা নেই, নামযশের কামনা নেই, ভোগের কামনা নেই। ভগিনি, এ সকল আমার নিকট অতি তুচ্ছ। আমি আমার ভাইদের সাহায্য করিতে চেয়েছিলাম। কিভাবে সহজে অর্থোপার্জন হয়, সে কৌশল আমার জানা নেই— ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমার হৃদয়স্থিত সত্যের বাণী না শুনে আমি কেন বাইরের লোকদের খেয়াল অনুসারে চলতে যাব? ভগিনি, আমার মন এখনও দুর্বল, বাহ্য জগতের সাহায্য এলে সময়ে সময়ে অভ্যাসবশতঃ তা আঁকড়ে ধরি। কিন্তু আমি ভীত নই। ভয়ই সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ— এটাই আমার ধর্মের শিক্ষা।

প্রেসবিটেরিয়ান যাজকমহাশয়ের সঙ্গে আমার যে শেষ বাগ্‌যুদ্ধ এবং তারপরে মিসেস বুলের সঙ্গে যে দীর্ঘ তর্ক হয়, তা থেকে আমি স্পষ্ট বুঝেছি, মনু কেন সন্ন্যাসিগণকে উপদেশ দিয়েছেন : একাকী থাকবে, একাকী বিচরণ করবে। বন্ধুত্ব বা ভালবাসামাত্রই সীমাবদ্ধতা। বন্ধুত্বে— বিশেষতঃ মেয়েদের বন্ধুত্বে চিরকালই 'দেহি দেহি' ভাব। হে মহাপুরুষগণ, তোমরাই ঠিক বলেছ, যাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করতে হয়, সে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সেবা করতে পারে না। হৃদয়, শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও, তা হলেই অনুভব করবে— প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

জীবন কিছুই নয়, মৃত্যুও ভ্রমমাত্র! এইসব কিছুই নয়, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। হৃদয়, ভয় পেও না, নিঃসঙ্গ হও। ভগিনি, পথ দীর্ঘ, সময় অল্প, সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে। আমাকে শীঘ্র ঘরে ফিরতে হবে। আদবকায়দার শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার সময় আমার নেই। আমি যে বার্তা বহন করে এনেছি, তাই বলে উঠতে পারছি না। তুমি সৎস্বভাবা, পরম দয়াবতী। আমি তোমার জন্য সব করব ; কিন্তু রাগ করো না, আমি তোমাদের সবাইকে শিশুর মতো দেখি।

আর স্বপ্ন দেখিও না। হৃদয়, আর স্বপ্ন দেখিও না। এক কথায় জগৎকে

আমার নূতন কিছু দেবার আছে। মানুষের মনযোগানোর সময় আমার নেই, তা করতে গেলেই আমি ভণ্ড হয়ে পড়ব। বরং হাজারবার মৃত্যু বরণ করব, তবুও [মেরুদণ্ডহীন] জেলি মাছের মতো জীবনযাপন করে নির্বোধ মানুষের চাহিদা মেটাতে পারব না— তা আমার স্বদেশেই হোক অথবা বিদেশেই হোক।

তুমিও যদি মিসেস বুলের মতো ভেবে থাকো, আমার কোন বিশেষ কাজ আছে, তা হলে ভুল বুঝেছ, সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছ। এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আমার কোনই কাজ নেই। আমার কিছু বলবার আছে, আমি তা নিজের ভাবে বলব, হিন্দুভাবেও নয়, খ্রীষ্টান ভাবেও নয়, বা অন্য কোন ভাবেও নয়। আমি ওসব নিজের ভাবে রূপ দেব— এইমাত্র।

মুক্তিই আমার একমাত্র ধর্ম, আর যা কিছু তাকে বাধা দিতে চায়, তা আমি পরিহার করে চলব— তার সঙ্গে সংগ্রাম করেই হোক বা তা থেকে পলায়ন করেই হোক।

কী! আমি যাজককুলের মনস্তুষ্টি করতে চেষ্টা করব!! ভগিনি, আমার এ কথা ভুল বুঝে তুমি ক্ষুণ্ণ হোয়ো না। তোমরা শিশুমাত্র, আর শিশুদের অপরের অধীনে থেকে শিক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা এখনও সেই উৎসের আস্বাদ পাওনি, যা 'যুক্তিকে অযুক্তিতে পরিণত করে, মর্ত্যকে অমর করে, এই জগৎকে শূন্যে পর্যবসিত করে এবং মানুষকে দেবতা করে তোলে।'

শক্তি থাকে তো লোকে যাকে 'এই জগৎ' নামে অভিহিত করে, সেই মূর্খতার জাল থেকে বার হয়ে এস— তখন আমি তোমায় প্রকৃত সাহসী ও মুক্ত বলব। যারা এই আভিজাত্যরূপ মিথ্যা ঈশ্বরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে তার চরম কপটতাকে পদদলিত করতে সাহস করে, তাদের যদি উৎসাহ দিতে না পারো, তবে চুপ করে থাকো। কিন্তু আপস ও মনস্তুষ্টিকরারূপ মিথ্যা মূর্খতা দিয়ে তাদের আবার পাঁকে টেনে আনবার চেষ্টা কোরো না।

আমি এই জগৎকে ঘৃণা করি— এই স্বপ্নকে, এই উৎকট দুঃস্বপ্নকে, তার গির্জা ও প্রবঞ্চনাসমূহকে, তার শাস্ত্র ও বদমাসিগুলোকে, তার সুন্দর মুখ ও কপট হৃদয়কে, তার ধর্মধ্বজিতার আস্ফালন ও অন্তঃসারশূন্যতাকে। সর্বোপরি ধর্মের নামে দোকানদারিকে আমি ঘৃণা করি।

কী! সংসারের ক্রীতদাসেরা কি বলছে, তা দ্বারা আমার হৃদয়ের বিচার করবে! ছিঃ! ভগিনি, তুমি সন্ন্যাসীকে চেনো না। বেদ বলেন, সন্ন্যাসী বেদশীর্ষ, কারণ তিনি গির্জা, ধর্মমত, ঋষি প্রফেট শাস্ত্র প্রভৃতি ব্যাপারের ধার ধারেন না। মিশনারিই হোক বা অপর কেউই হোক, তারা যথাসাধ্য চীৎকার ও

আক্রমণ করুক, আমি তাদের গ্রাহ্য করি না। ভর্তৃহরির ভাষায় : ইনি কি চণ্ডাল, অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা শূদ্র, অথবা তপস্বী, অথবা তত্ত্ববিচারে পণ্ডিত কোন যোগীশ্বর? এইভাবে নানা জনে নানা আলোচনা করতে থাকলেও যোগিগণ রুষ্টও হন না, তুষ্টও হন না ; তাঁরা আপন মনে চলে যান।

তুলসীদাসও বলেছেন :

হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভোঁকে হাজার
সাধুওঁকা দুর্ভাব নহী জব্ নিন্দে সংসার।

যখন হাতী বাজারের মধ্য দিয়ে চলে যায়, তখন হাজার কুকুর পিছুপিছু চীৎকার করতে আরম্ভ করে, কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না। সেরকম যখন সংসারী লোকেরা নিন্দা করতে থাকে, তখন সাধুগণ তাতে বিচলিত হন না।

আমি ল্যান্ডসবার্গের (Landsberg) বাড়ীতে অবস্থান করছি। ইনি সাহসী ও মহৎ ব্যক্তি। প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করুন। কখন কখন আমি গার্নসিদের (Guernseys) ওখানে শুতে যাই।[৭১]

নিউ ইয়র্ক, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫

মা-ঠাকুরানীর জন্য জমি কিনে দিলে আমি আপনাকে ঋণমুক্ত মনে করব। তারপর আমি আর কিছু বুঝিসুঝি না। তোমরা তো আমার নামটি টেনে নেবার বেলা খুব তৈয়ার—যে আমি তোমাদেরই একজন। কিন্তু আমি একটা কাজ করতে বললে অমনি পেছিয়ে পড়, 'মতলবকী গরজী জগ্ সারো'—এ জগৎ মতলবের গরজী।...

আমি বাঙলা দেশ জানি, ইণ্ডিয়া জানি—লম্বা কথা কইবার একজন, কাজের বেলা—০ (শূন্য)।...

আমি এখানে জমিদারিও কিনি নাই, বা ব্যাঙ্কে লাখ টাকাও জমা নাই। এই ঘোর শীতে পর্বত-পাহাড়ে বরফ ঠেলে—এই ঘোর শীতে রাত্তির দুটো-একটা পর্যন্ত রাস্তা ঠেলে লেকচার করে দু-চার হাজার টাকা করেছি—মা-ঠাকুরানীর অন্য জায়গা কিনলেই আমি নিশ্চিন্ত। গুঁতোগুঁতির আড্ডা করে দেবার শক্তি আমার নাই। অবতারের বাচ্চারা কোথায়—ছোট ছোট অবতারেরা—ওহে অবতারের পিলেগণ?[৭২]

নিউ ইয়র্ক, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫

মনুর মতে— সন্ন্যাসীর পক্ষে একটা সৎকার্যের জন্যও অর্থ সংগ্রহ করা ভাল নয়। আমি এখন বেশ প্রাণে প্রাণে বুঝেছি যে, প্রাচীন ঋষিরা যা বলে গেছেন, তা অতি ঠিক কথা : 'আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং

সুখম'— আশাই পরম দুঃখ এবং আশা ত্যাগ করাতেই পরম সুখ।

এই যে আমার 'এ ক'রব, ও ক'রব', এ রকম ছেলেমানুষি ভাব ছিল, এখন সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভ্রম বলে বোধ হচ্ছে। আমার এখন ঐ-সকল বাসনা ত্যাগ হয়ে আসছে। 'সব বাসনা ত্যাগ ক'রে সুখী হও। কেউ যেন তোমার শত্রু বা মিত্র না থাকে, তুমি একাকী বাস কর। এইভাবে ভগবানের নাম প্রচার করতে করতে শত্রুমিত্রে সমদৃষ্টি হয়ে, সুখদুঃখের অতীত হয়ে, বাসনা ঈর্ষা ত্যাগ ক'রে, কোন প্রাণীকে হিংসা না ক'রে, কোন প্রাণীর কোন প্রকার অনিষ্ট বা উদ্বেগের কারণ না হয়ে, আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ক'রে বেড়াব।'

'ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, কারও কাছ থেকে কিছু সাহায্য চেও না— কিছুরই আকাঙ্ক্ষা ক'রো না। এই যে সব দৃশ্য একের পর এক দৃষ্টির সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে, সেগুলিকে সাক্ষিরূপে দেখো— সেগুলি সব চলে যাক।'

হয়তো এই দেশে আমাকে টেনে নিয়ে আসবার জন্য ঐসব ভাবোন্মত্ত বাসনার প্রয়োজন ছিল। এই অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

এখন বেশ সুখে আছি। আমি আর মিঃ ল্যান্ডসবার্গ মিলে কিছু চাল ডাল বা যব রাঁধি— চুপচাপ খাই, তারপর হয়তো কিছু লিখলাম বা পড়লাম। উপদেশপ্রার্থী গরীব লোকদের কেউ দেখা করতে এলে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। আর এই ভাবে থেকে বোধ হচ্ছে, আমি যেন বেশ সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করছি—আমেরিকায় এসে অবধি এতদিন এ রকম অনুভব করিনি।

'ধন থাকলে দারিদ্র্যের ভয়, জ্ঞানে অজ্ঞানের ভয়, রূপে বার্ধক্যের ভয়, যশে নিন্দুকের ভয়, অভ্যুদয়ে ঈর্ষার ভয়, এমন কি দেহে মৃত্যুর ভয় আছে! এই জগতের সমুদয়ই ভয়যুক্ত। তিনিই কেবল নির্ভীক, যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন।'

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥—বৈরাগ্যশতকম্

আমি সেদিন মিস কর্বিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম— মিস ফার্মার ও মিস থার্সবিও সেখানে ছিলেন। আধঘণ্টা ধরে আমাদের বেশ আনন্দে কাটল। মিস কর্বিনের ইচ্ছা— আগামী রবিবার থেকে তাঁর বাড়ীতে কোন

রকম ক্লাস খুলি। আমি আর এখন এ-সবের জন্য ব্যস্ত নই। আপনা-আপনি যদি এসে পড়ে, তবে তাতে প্রভুরই জয়জয়কার। আর যদি না আসে, তা হলে প্রভুর আরও জয়জয়কার।[৭৩]

নিউ ইয়র্ক, ১৮ই মার্চ [ফেব্রুয়ারী] ১৮৯৫

ভালোই চলছে। শুধু বড় বড় ডিনার আমাকে বেশি রাত করাচ্ছে অনেকদিনই বাড়ি পৌঁছেছি রাত্রি ২টোর সময়। আজ রাতেও এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানে যাচ্ছি। তবে এটাই শেষ। এতো রাত পর্যন্ত জেগে থাকা আমার পক্ষে ভাল নয়। সকাল ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত প্রত্যহ আমার ঘরে ঘরে ক্লাশ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রোতারা ক্লান্ত না হয়ে যায়, ততক্ষণ আমাকে বকতে হয়। ব্রুকলীনের কোর্সটি গতকাল শেষ হয়েছে। আগামী সোমবার ওখানে আর একটি বক্তৃতা আছে।

বিনের স্যাপ এবং ভাত অথবা বার্লি হচ্ছে আমার বর্তমান আহার। টাকাপয়সার ব্যাপারে আমি খরচাপাতি চালিয়ে যাচ্ছি কারণ আমার ক্লাশের জন্য আমি কোনো পয়সা দিই না। আর পাব্লিকের কাছে বক্তৃতা ইত্যাদি বহু হাত ঘুরে ব্যবস্থা হয়।

নিউ ইয়র্কের জন্য আমার কিছু ভাল বক্তৃতার ব্যবস্থা হচ্ছে, সেগুলো আমি দফায় দফায় দিতে চাই।...

ডেলমণিকো আর ওয়াল্ডরফ্-এ খাওয়া-দাওয়াতে, আমার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছিল। সেজন্য নেমন্তন্ন এড়াতে খুব তাড়াতাড়ি আমি পূর্ণ নিরামিষাসী হয়ে গেছি।[৭৪]

পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভাল ভাল বৈজ্ঞানিক আমাকে বলেছেন, বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ। আমার সঙ্গে এঁদের একজনের বিশেষ পরিচয় আছে। তাঁর খাবার সময় নেই বা গবেষণাগার থেকে বাইরে যাবার অবকাশ নেই, অথচ ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি আমার বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতা শুনছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন—বেদান্তের উপদেশগুলি এতদূর বিজ্ঞানসম্মত, বর্তমান যুগের অভাব ও আকাঙ্ক্ষাগুলি বেদান্ত এত সুন্দরভাবে পূরণ করে থাকে, আর আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশঃ যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে, সেগুলির সঙ্গে বেদান্তের এত সামঞ্জস্য যে, আমি এর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারি না।[৭৫]

আমেরিকায় অবস্থানকালে আমার কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হয়েছিল। লোকের চোখের ভেতরে দেখে তার মনের ভেতরটা বুঝতে

পারতুম মুহূর্তের মধ্যে। কে কি ভাবছে না ভাবছে 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হয়ে যেত। কারুকে কারুকে বলে দিতুম। যাদের যাদের বলতুম, তাদের মধ্যে অনেকে আমার চেলা হয়ে যেত ; আর যারা কোনরূপ মতলব পাকিয়ে আমার সঙ্গে মিশতে আসত, তারা ঐ শক্তির পরিচয় পেয়ে আর আমার দিকেও মাড়াত না।

যখন চিকাগো প্রভৃতি শহরে বক্তৃতা শুরু করলুম, তখন সপ্তাহে ১২। ১৪টা, কখনও আরও বেশী লেকচার দিতে হ'ত। অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক শ্রমে মহা ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। যেন বক্তৃতার বিষয় সব ফুরিয়ে যেতে লাগলো। ভাবতুম—কি করি, কাল আবার কোথা থেকে কি নূতন কথা ব'লব? নূতন ভাব আর যেন জুটতো না।

একদিন বক্তৃতার পরে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, তাইতো এখন কি উপায় করা যায়? ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রার মত এল। সেই অবস্থায় শুনতে পেলুম, কে যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে। কত নূতন ভাব, নূতন কথা—সে-সব যেন ইহজন্মে শুনিনি, ভাবিওনি! ঘুম থেকে উঠে সেগুলি স্মরণ ক'রে রাখলুম, আর বক্তৃতায় তাই বললুম। এমন যে কতদিন ঘটেছে তার সংখ্যা নেই। শুয়ে শুয়ে এমন বক্তৃতা কতদিন শুনেছি! কখন বা এত জোরে জোরে তা হ'ত যে, অন্য ঘরের লোক আওয়াজ পেত ও পরদিন আমার ব'লত—'স্বামীজী, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে এত জোরে কথা কইছিলেন?' তাদের কথা আমি কোনরূপে কাটিয়ে দিতুম। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড! [৭৬]

লোকে যখন আমায় খাতির করতে লাগলো, তখন পাদ্রীরা আমার পেছনে খুব লাগলো। আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল। কত লোক আমায় তার প্রতিবাদ করতে ব'লত। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য করতুম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—চালাকি দ্বারা জগতে কোন মহৎ কার্য হয় না ; তাই ঐ-সকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না ক'রে ধীরে ধীরে আপনার কাজ ক'রে যেতুম। দেখতেও পেতুম, অনেক সময়ে যারা আমায় অযথা গালমন্দ ক'রত, তারাও অনুতপ্ত হয়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই কাগজে কন্ট্রাডিক্ট ক'রে ক্ষমা চাইত।

কখন কখন এমনও হয়েছে—আমাকে কোন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেউ আমার নামে ঐ-সকল মিথ্যা কুৎসা বাড়িওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে তিনি দোর বন্ধ ক'রে কোথায় চলে গিয়েছেন। আমি

নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি—সব ভোঁ ভাঁ, কেউ নেই। আবার কিছুদিন পরে তারাই সত্য কথা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আমার চেলা হ'তে এসেছে। কি জানিস সংসার সবই দুনিয়াদারি! ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এ-সব দুনিয়াদারিতে ভোলে রে বাপ! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্তব্য কার্য ক'রে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে, ও কি লিখছে, ও-সব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।

এই শ্লোকটা জানিস না?—

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব মরণমস্তু শতাব্দান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥—ভর্তৃহরি

—লোকে তোর স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হোক বা না হোক, আজ বা শতবর্ষ পরে তোর দেহপাত হোক, ন্যায় পথ থেকে যেন ভ্রষ্ট হ'সনি।[৭৭]

আমি সত্যানুসন্ধিৎসু। সত্য কখনও মিথ্যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে না। এমনকি সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও অবশেষে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।[৭৮]

মিশনারি-ফিশনারি এদেশে বড় চলবে না। এরা ঈশ্বরেচ্ছায় আমায় খুব ভালবাসে, কারুর কথায় ভোলবার নয়। এরা আমার 'আইডিয়াজ' (ভাব) বোঝে।[৭৯]

আমেরিকায় আমি অদ্বৈতবাদই অধিক প্রচার করছি, দ্বৈতবাদ প্রচার করছি না—একবার এইরকম অভিযোগ শুনেছিলাম। দ্বৈতবাদের প্রেম ভক্তি ও উপাসনায় যে কি অসীম আনন্দ লাভ হয়, তা আমি জানি ; ওর অপূর্ব মহিমা আমি সম্পূর্ণ অবগত। কিন্তু বন্ধুগণ, এখন আমাদের আনন্দে ক্রন্দন করবারও সময় নেই। আমরা যথেষ্ট কেঁদেছি। এখন আর আমাদের কোমলভাব অবলম্বন করবার সময় নেই। এইভাবে কোমলতার সাধন করতে করতে আমরা এখন জীবন্মৃত হ'য়ে পড়েছি—আমরা রাশীকৃত তুলোর মতো নরম হয়ে পড়েছি। আমাদের দেশের পক্ষে এখন প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও ইস্পাতের মতো স্নায়ু। এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি চাই, কেউই যেন তাকে প্রতিরোধ করতে

সমর্থ না হয়, ওটা যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়। যদি বা এই কার্যসাধনে সমুদ্রের অতল তলে যেতে হয়, যদি বা সর্বদা সর্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত থাকতে হয়! এইটিই এখন আমাদের আবশ্যক। আর আবশ্যক অদ্বৈতবাদের মহান্ আদর্শ ধারণা করে উপলব্ধি। অদ্বৈতবাদের মহান্ আদর্শ ধারণা করে উপলব্ধি করতে পারলেই ঐ ভাবের আবির্ভাব।...

বেদান্তের অদ্বৈত-ভাব প্রচার করা প্রয়োজন, যাতে লোকের হৃদয় জাগ্রত হয়, যাতে তারা নিজ আত্মার মহিমা জানতে পারে। এই জন্যই আমি অদ্বৈতবাদ প্রচার করে থাকি ; আর আমি সাম্প্রদায়িক ভাবে ওটা প্রচার করি না—সার্বভৌম ও সর্বজনগ্রাহ্য যুক্তি প্রদর্শন করে আমি ওটা প্রচার করে থাকি।[৮০]

যখন বালক ছিলাম, ভাবতাম উন্মত্ততা কাজের ক্ষেত্রে মস্ত বিষয়, কিন্তু এখন, যত বয়স বাড়ছে, দেখছি যে তা নয়...এই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা হ'চ্ছে, সর্বপ্রকার উন্মত্ততা পরিহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ।[৮১]

কোনো লোকের পক্ষে সব কিছুকে মেনে বিশ্বাস করা মানে তাকে পাগল বানানো! একবার আমার কাছে একটা বই এসেছিল, সেখানে বলেছে যে সেই বই-এর আমার বিশ্বাস করা উচিত। সেখানে বলছে যে আত্মা বলে কিছু নেই, কিন্তু স্বর্গে দেবতা এবং দেবীরা রয়েছেন এবং আমাদের প্রত্যেকের মাথা থেকে একটা আলোর সূত্র স্বর্গ অবধি যাচ্ছে! কি করে লেখক এইসব কথা জানতে পারলেন? ভদ্রমহিলা অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমাকেও তা বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন ; আর যেহেতু আমি রাজী নই. তিনি বলেছিলেন, 'তুমি খুব খারাপ লোক ; তোমার কোনো আশা নেই!' এটা হ'চ্ছে উন্মত্ততা।[৮২]

না, আমি কোন অলৌকিক বিদ্যায় অকাল্টিজম্ বিশ্বাস করি না। কোন জিনিস যদি মিথ্যা হয়, তবে তা নেই ; যা মিথ্যা, তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনাগুলোও প্রাকৃতিক ব্যাপারের অন্তর্গত। আমি এগুলিকে বিজ্ঞানের বিষয় বলে মনে করি। এগুলি আমার কাছে গুপ্তবিদ্যার বিষয় নয়। আমি কোন গুপ্তবিদ্যা-সম্বন্ধে আস্থা রাখি না। তারা ভাল কিছুই করে না, করতে পারে না।[৮৩]

নিউ ইয়র্ক, ২৭শে মার্চ, ১৮৯৫

প্রতারণার এ এক অদ্ভুত দেশ ; অন্যের ওপর সুবিধা নেওয়ার

কোন-না-কোন গুপ্ত অভিসন্ধি রয়েছে শতকরা নিরানব্বই জনের। যদি কেউ মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে, তাতেই তার সর্বনাশ! ভগিনী জোসেফাইন অগ্নিশর্মা। মিসেস পীক সাদাসিদে ভাল মহিলা। এখানকার লোকেরা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে যে, কিছু করবার আগে কয়েক ঘণ্টা আমাকে চারদিকে তাকাতে হয়। তার উপদেশে মিসেস বুল খুব উপকৃত হয়েছেন। আমিও কিছু উপদেশ গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু কোন কাজে লাগলো না। মিসেস এডাম্‌স্‌ যেমন চাইছেন, তাতে সামনের ক্রমবর্ধমান বোঝা নোয়ানো যায় না। হাঁটবার সময় যদি সামনে ঝুঁকবার চেষ্টা করি, তা হ'লে ভারকেন্দ্র পাকস্থলীর উপরিভাগে আসে ; কাজেই পুরোভাগে ডিগবাজি খেয়ে চলি।

আমার ক্লাসগুলি মহিলাতেই ভর্তি।... পুরানো পথেই জীবন চলেছে। ক্রমাগত বক্তৃতা ও বকতে বকতে অনেক সময় বিরক্তি আসে, দিনের পর দিন চুপ ক'রে থাকতে ইচ্ছা হয়।

নিউ ইয়র্ক, ১১ই এপ্রিল, ১৮৯৫

কাল মিঃ লেগেটের কাছে চলে যাচ্ছি কয়েকদিন গাঁয়ে বাস করবার জন্য। আশা করি, বিশুদ্ধ বায়ুসেবনে আমার ভাল হবে

এ বাড়ি এখনই ছেড়ে দেবার ইচ্ছা ত্যাগ করেছি, কারণ তাতে বেশী খরচা পড়বে। অধিকন্তু এখনই বাড়ী বদলানো যুক্তিযুক্ত নয় ; আমি ধীরে ধীরে সেটি করবার চেষ্টা করছি।...

মিস হ্যামলিন আমাকে 'ঠিক ঠিক লোকদের' সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চান—প্রভু যাঁদের পাঠান, তাঁরাই খাঁটি লোক ; আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় এই কথাই তো আমি বুঝেছি। তাঁরাই যথার্থ সাহায্য করতে পারেন, আর তাঁরাই আমাকে সাহায্য করবেন। আর অবশিষ্ট লোকদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই, প্রভু তাদের সকলেরই কল্যাণ করুন, আর তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

আমার বন্ধুরা সবাই ভেবেছিলেন, একলা একলা দরিদ্রপল্লীতে এভাবে থাকলে এবং প্রচার করলে কিছুই হবে না, আর কোন ভদ্রমহিলা কখনই সেখানে আসবেন না। বিশেষতঃ মিস হ্যামলিন মনে করেছিলেন, তিনি কিংবা তাঁর মতে যারা 'ঠিক ঠিক লোক', তারা যে দরিদ্রোচিত কুটিরে নির্জনবাসী একজন লোকের কাছে এসে তার উপদেশ শুনবে, তা হতেই পারে না। কিন্তু তিনি যাই মনে করুন, যথার্থ 'ঠিক ঠিক লোক' ঐ স্থানে দিনরাত আসতে লাগলো, তিনিও আসতে লাগলেন। হে প্রভো, মানুষের পক্ষে তোমার ও

তোমার দয়ার উপর বিশ্বাস-স্থাপন—কি কঠিন ব্যাপার!! শিব, শিব!

মা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক লোকই বা কোথায়, আর বে-ঠিক বা মন্দ লোকই বা কোথায়? সবই যে তিনি!! হিংস্র ব্যাঘ্রের মধ্যেও তিনি, মৃগশিশুর ভেতরও তিনি; পাপীর ভেতরও তিনি, পুণ্যাত্মার ভেতরও তিনি—সবই যে তিনি!! সর্বপ্রকারের আমি তাঁর শরণাগত, সারা জীবন তাঁর কোলে আশ্রয় দিয়ে এখন কি তিনি আমায় পরিত্যাগ করবেন? ভগবানের কৃপাদৃষ্টি যদি না থাকে, তবে সমুদ্রে এক ফোঁটা জলও থাকে না, গভীর জঙ্গলে একটা ছোট ডালও পাওয়া যায় না, আর কুবেরের ভাণ্ডারে একমুঠো অন্ন মেলে না। আর তাঁর ইচ্ছা হ'লে মরুভূমিতে ঝরনা বয়ে যায় এবং ভিক্ষুকেরও সকল অভাব ঘুচে যায়। একটা চড়ুই পাখী কোথায় উড়ে পড়ছে—তাও তিনি দেখতে পান। মা, এগুলি কি কেবল কথার কথা—না অক্ষরে অক্ষরে সত্য ঘটনা?

এই 'ঠিক ঠিক লোকদের' কথা এখন থাক। হে আমার শিব, তুমিই আমার ভাল, তুমিই আমার মন্দ। প্রভো, বাল্যকাল থেকেই আমি তোমার চরণে শরণ নিয়েছি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বা হিমানীমণ্ডিত মেরুপ্রদেশে, পর্বত-চূড়ায় বা মহাসমুদ্রের অতল তলে—যেখানেই যাই, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। তুমিই আমার গতি, আমার নিয়ন্তা, আমার শরণ, আমার সখা, আমার গুরু, আমার ঈশ্বর, তুমিই আমার স্বরূপ। তুমি কখনই আমায় ত্যাগ করবে না—কখনই না, এ আমি ঠিক জানি।

হে আমার ঈশ্বর, আমি কখন কখন একলা প্রবল বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন মানুষের সাহায্যের কথা ভাবি। চিরদিনের জন্য এসব দুর্বলতা থেকে আমাকে রক্ষা কর, যেন আমি তোমা ছাড়া আর কারও কাছে কখনও সাহায্য প্রার্থনা না করি। যদি কেউ কোন ভাল লোকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কখনও ত্যাগ করে না, বা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। প্রভু, তুমি সকল ভালোর সৃষ্টিকর্তা—তুমি কি আমার ত্যাগ করবে? তুমি তো জানো, সারা জীবন আমি তোমার—কেবল তোমারই দাস। তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে—যাতে অপরে আমায় ঠকিয়ে যাবে বা আমি মন্দের দিকে ঢলে প'ড়ব?

মা, তিনি কখনই আমায় ত্যাগ করবেন না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।[৮৫]

নিউ ইয়র্ক, জুন, ১৮৯৫

আমি এইমাত্র এখানে পৌঁছলাম। এই অল্প ভ্রমণে আমার উপকার হয়েছে।

সেখানকার পল্লী ও পাহাড়গুলো—বিশেষতঃ মিঃ লেগেটের নিউইয়র্ক স্টেটের গ্রামের বাড়িটি আমার খুব ভাল লেগেছে।

ল্যান্ডস্‌বার্গ বেচারী এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। সে তার ঠিকানা পর্যন্ত আমাকে জানিয়ে যায়নি। সে যেখানেই যাক, ভগবান তার মঙ্গল করুন। আমি জীবনে যে দু-চারজন অকপট লোক দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, সে তাদেরই মধ্যে একজন।

যা কিছু ঘটে, সবই ভালোর জন্য। সব মিলনের পরেই বিচ্ছেদ। আশা করি, আমি একাই সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবো। মানুষের কাছ থেকে যত কম সাহায্য নেওয়া যাবে, ভগবানের কাছ থেকে তত বেশী সাহায্য পাওয়া যায়। এইমাত্র আমি লণ্ডনের এক ইংরেজের চিঠি পেলাম। তিনি আমার দুই গুরু-ভাইয়ের সঙ্গে কিছুদিন হিমালয় পাহাড়ে বাস করেছিলেন। তিনি আমাকে লণ্ডনে যেতে বলছেন।[৮৬]

নিউ ইয়র্ক, ২২শে জুন, ১৮৯৫

আমার দিনগুলো আগের মতোই একভাবে চলেছে। সাধ্যমত হয় অনর্গল বকছি, না হয় একদম চুপচাপ। এবার গ্রীষ্মে গ্রীনএকার যাওয়া হয়ে উঠবে কি না জানি না। সেদিন মিস ফার্মারের সঙ্গে দেখা হল ; তখন তিনি কোথাও যাবার জন্য বেশ ব্যস্ত, সুতরাং বাক্যালাপ অতি অল্পই হয়। তিনি একজন মহীয়সী মহিলা।

ল্যান্ডস্‌বার্গ অন্যত্র চলে গেছে। আমি একাই আছি। আজকাল দুধ, ফল, বাদাম—এইসব আমার আহার। ভাল লাগে, স্বাস্থ্যকরও বটে। এই গ্রীষ্মে শরীরের ওজন তিরিশ-চল্লিশ পাউণ্ড কমিয়ে ফেলব' আমার আকার অনুযায়ী শরীরের ওজন তখন ঠিকই হবে। ঐ যাঃ। হাঁটার ব্যাপারে মিসেস এডাম্‌সের উপদেশের কথা একেবারে ভুলে গেছি। তাঁর নিউইয়র্কে এসে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আবার সেগুলি অভ্যাস করতে হবে।

বক্তৃতা না দিলেও এ বছর মাথা তোলবার সময় পাইনি। ভারত থেকে বেদান্তের উপর দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত—এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের ভাষ্য পাঠিয়েছে। আশা করি নির্বিঘ্নে এসে পৌছবে। চর্চা ক'রে খুব আনন্দ হবে। এই গ্রীষ্মে বেদান্তদর্শন-বিষয়ক বই লেখার সঙ্কল্প। এই পৃথিবীতে ভাল মন্দ, সুখ দুঃখের সংমিশ্রণ চিরকালই থাকবে। চক্র চিরকালই উঠবে ও নামবে ; ভাঙা গড়া বিধির অলঙ্ঘ্য বিধান। যাঁরা এ সবের পারে যাবার চেষ্টা করছেন, তাঁরাই ধন্য।[৮৭]

নিউ ইয়র্ক, ২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৫

যে রহস্যময় চিন্তারশ্মি সম্প্রতি পাশ্চাত্য জগতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েছে, তার মূলে যদিও কিছু সত্য আছে, তবু আমি জানি, এদের অধিকাংশই বাজে এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মতলবে পরিপূর্ণ। আর এইজন্যই ভারতে কিংবা অন্য কোথাও ধর্মের এই দিকটার সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধ রাখি নি। মিস্টিকরাও আমার প্রতি বিশেষ অনুকূল নন।

প্রাচ্যে কিংবা পাশ্চাত্যে—সর্বত্র একমাত্র অদ্বৈতদর্শনই মানুষকে 'ভূতপূজা' এবং ঐ জাতীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে পারে। অদ্বৈতই যে মানুষকে তার নিজের ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিমান্ করে তুলতে পারে, সে বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। পাশ্চাত্য দেশের মত ভারতেরও এই অদ্বৈতবাদের প্রয়োজন রয়েছে। কাজটি কিন্তু অত্যন্ত দুরূহ ; কারণ প্রথমতঃ সবার মনে রুচি সৃষ্টি করতে হবে, তারপর চাই শিক্ষা ; সবার শেষে সমগ্র সৌধটি তৈরি করবার জন্য এগোতে হবে।

চাই পূর্ণ সরলতা, পবিত্রতা, বিরাট বুদ্ধি এবং সর্বজয়ী ইচ্ছশক্তি। এইসব গুণসম্পন্ন মুষ্টিমেয় লোক যদি কাজে লাগে, তবে দুনিয়া ওলটপালট হয়ে যায়। গত বছর এদেশে (আমেরিকা) আমি অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলাম, বাহবাও অনেক পেয়েছিলাম ; কিন্তু পরে দেখলাম, সে-সব কাজ আমি যেন নিছক নিজের জন্যই করেছি। চরিত্রগঠনের জন্য ধীর ও অবিচলিত যত্ন এবং সত্যোপলব্ধির জন্য তীব্র প্রচেষ্টাই কেবল মানবজাতির ভবিষ্যৎ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাই এ বছর আমি সেই ভাবেই আমার কার্যপ্রণালী নিয়মিত করব, স্থির করেছি। কয়েকজন বাছা বাছা স্ত্রী-পুরুষকে অদ্বৈত বেদান্তের উপলব্ধি সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করব—কতদূর সফল হব, জানি না।

পত্রিকা বার করা বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু এ-সব করবার মতো ব্যবসাবুদ্ধি আমার একেবারে নেই। আমি শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচার করতে পারি, মধ্যে মধ্যে কিছু লিখতে পারি। সত্যের উপর আমার গভীর বিশ্বাস। প্রভুই আমাকে সাহায্য করবেন এবং তিনিই প্রয়োজনমত কর্মীও পাঠাবেন, আমি যেন কায়মনোবাক্যে পবিত্র, নিঃস্বার্থ এবং অকপট হতে পারি। [৮৮]

নিউ ইয়র্ক, ২৫শে এপ্রিল, ১৮৯৫

এখন গ্রীনএকারে যেতে পারছি না, সহস্রদ্বীপোদ্যানে (থাউজেন্ড আইল্যান্ড

পার্ক) যাবার বন্দোবস্ত করেছি—তা যেখানেই হোক। সেখানে আমার জনৈকা ছাত্রী মিস ডাচারের একটা কুটীর আছে। আমরা কয়েকজন সেখানে নির্জন বাস ক'রে বিশ্রাম ও শান্তিতে সময় কাটাবো, মনে করেছি। আমার ক্লাসে যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে 'যোগী' করতে চাই। গ্রীনএকারের মতো কর্মচঞ্চল খামার এ কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত। অপর জায়গাটি লোকালয় থেকে অনেক দূরে বলে যারা শুধু মজা চায়, তারা সেখানে যেতে সাহস করবে না।

জ্ঞানযোগের ক্লাসে যাঁরা আসতেন, তাঁদের ১৩০ জনের নাম ভাগ্যে মিস হ্যামলিন টুকে রেখেছিলেন—আরও ৫০ জন বুধবারে যোগ-ক্লাসে আসতেন—আর সোমবারের ক্লাসে আরও ৫০ জন। মিঃ ল্যান্ডসবার্গ সব নামগুলি লিখে রেখেছিলেন—আর নাম লেখা থাক বা নাই থাক, এঁরা সকলেই আসবেন। মিঃ ল্যান্ডসবার্গ আমার সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু নামগুলি সব এখানে আমার কাছে ফেলে গেছেন। এরা সকলেই আসবে—আর এখন যদি না আসে তো পরে আসবে। এইভাবেই চলবে—প্রভু, তোমারই মহিমা!!

নাম টুকে রাখা এবং বিজ্ঞাপন দেওয়া একটা মস্ত কাজ সন্দেহ নেই। আমার জন্য যাঁরা এই কাজ করেছেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে, অপরের উপর নির্ভর করা আমার নিজেরই আলস্য, সুতরাং ওটা অধর্ম। আলস্য থেকে সর্বদা অনিষ্টই হয়ে থাকে। সুতরাং এখন থেকে ঐ-সব কাজ আমিই করছি এবং পরেও নিজেই সব করব। ফলে ভবিষ্যতে কারও কোন উদ্বেগের কারণ থাকবে না।

যাই হোক, আমি মিস হ্যামলিনের 'ঠিক ঠিক লোকদের' মধ্যে যাকে হোক নিতে পারলে ভারি সুখী হবো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন একজনও তো এখনও এল না। আচার্যের চিরন্তন কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত 'বেঠিক' লোকদের ভিতর থেকে 'ঠিক ঠিক লোক' তৈরি ক'রে নেওয়া।

মোদ্দা কথাটা এই, মিস হ্যামলিন নামে কমবয়সী মহিলাটি আমাকে নিউইয়র্কের 'ঠিক ঠিক লোকগুলির' সঙ্গে প'রিচয় করিয়ে দেবার আশা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন সেইমতো তিনি আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, তার জন্যও আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ, তবু মনে করছি আমার যা অল্পস্বল্প কাজ আছে, তা আমার নিজের হাতে করাই ভাল। এখনও অন্যের সাহায্য নেবার সময় হয়নি—কাজ অতি অল্প।

মিস হ্যামলিন সম্বন্ধে আপনার যে অতি উচ্চ ধারণা, তাতে আমি খুব

খুশি। আপনি যে তাঁকে সাহায্য করবেন, এ জেনে আমি তো বিশেষ খুশি ; কারণ তাঁর সাহায্য প্রয়োজন।

কিন্তু মা, রামকৃষ্ণের কৃপায় কোন মানুষের মুখ দেখলেই স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবলে তার ভিতর কি আছে, তা প্রায় অভ্রান্তভাবে আমি জানতে পারি। এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, আপনি আমার সব ব্যাপার নিয়ে যা খুশি করতে পারেন, আমি তাতে এতটুকু অসন্তোষ প্রকাশ ক'রব না। মিস ফার্মারের পরামর্শও আমি খুব আনন্দের সঙ্গে নেব—তিনি যতই ভূত-প্রেতের কথা বলুন না কেন। এ-সব ভূত-প্রেতের অন্তরালে আমি একটি অগাধপ্রেমপূর্ণ হৃদয় দেখতে পাচ্ছি, কেবল এর ওপর একটা প্রশংসনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম আবরণ রয়েছে—তাও কয়েক বৎসরে নিশ্চয় অদৃশ্য হবে। এমন কি—ল্যান্ডস্‌বার্গও মাঝে মাঝে আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে কোন আপত্তি ক'রব না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

এঁরা ছাড়া অন্য কেউ আমাকে সাহায্য করতে এলে আমি বেজায় ভয় পাই—এই পর্যন্ত আমি বলতে পারি। আপনি আমাকে যে সাহায্য করেছেন, শুধু তার দরুন নয়—আমার স্বাভাবিক সংস্কারবশতই (অথবা যাকে আমি আমার গুরুমহারাজের প্রেরণা বলে থাকি) আপনাকে (সারা বুল) আমি আমার মায়ের মতো দেখে থাকি। সুতরাং আপনি আমাকে যে কোন উপদেশ দেবেন, তা আমি সর্বদাই মেনে চ'লব—কিন্তু ঐ পরামর্শ বা আদেশ সাক্ষাৎ আপনার কাছ থেকে আসা চাই। আপনি যদি আর কাকেও মাঝখানে খাড়া করেন, তা হ'লে আমি নিজে বেছে নেওয়ার দাবি প্রার্থনা করি। এই কথা আর কি। [৮৯]

নিউ ইয়র্ক, ৫ই মে, ১৮৯৫

যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে। যদিও অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর তাঁর হিন্দুধর্মবিষয়ক রচনাসমূহের শেষভাগে নিন্দাসূচক একটা মন্তব্য না দিয়ে ক্ষান্ত হন না, তবু আমার সর্বদাই মনে হ'ত, কোন সময়ে সমগ্র তত্ত্বই তিনি বুঝতে পারবেন। যত তাড়াতাড়ি পার, 'বেদান্তবাদ' নামে তাঁর শেষ বইখানা সংগ্রহ কর। বইখানিতে দেখবে তিনি সবই সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন—মায় জন্মান্তরবাদ।

অনেক বিষয়ে দেখবে চিকাগোয় আমি যা সব বলেছি, তারই আভাস।

বৃদ্ধ যে সত্যকে ধরতে পেরেছেন—এতে আমি আনন্দিত। কারণ আধুনিক গবেষণা ও বিজ্ঞানের বিরোধিতার মুখে ধর্মকে অনুভব করবার এই হ'ল একমাত্র পথ। [৯০]

নিউ ইয়র্ক, ৬ই মে, ১৮৯৫

আমি এখানে নাম-যশের জন্য আসিনি—আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসব এসে পড়েছে।

আমিই একা সাহস ক'রে নিজের দেশকে সমর্থন করছি ; হিন্দুদের কাছ থেকে এরা যা আশাই করেনি, তাই আমি এদের দিয়েছি...। এখন অনেকেই আমার বিরুদ্ধে, কিন্তু আমি কখনও কাপুরুষ হবো না।

মার্কিন জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ নিউ ইয়র্কে আমার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হয়েছে, এখানে আমার কাজ চলতে থাকবে। আমি আমার শিষ্যদের যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান শিক্ষার সমাপ্তির জন্য নির্জন এক গ্রীষ্মবাসে নিয়ে যাচ্ছি—যাতে তারা কাজ চালিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে।

এখানে একদল নূতন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে, যারা ঈশ্বরে অকপট বিশ্বাসী হবে এবং সংসারকে একেবারে গ্রাহ্য করবে না। [৯১]

নিউ ইয়র্ক, মে, ১৮৯৫

আমার ছাত্রেরা আবার এসেছে আমাকে সাহায্য করবার জন্য ; ক্লাসগুলি এখন সুন্দরভাবে চলবে, সন্দেহ নেই।

এতে আমি খুব খুশী হয়েছি, কারণ শেখানো ব্যাপারটা আমার জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আহার এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মত এও আমার জীবনে প্রয়োজন। [৯২]

নিউ ইয়র্ক, ১৬ই মে, ১৮৯৫

চিকাগো যেতে পারব কিনা আমি জানি না। আমি একটা ফ্রি পাশ যোগাড়ের চেষ্টা করছি ; যদি সেটা পাই তাহলে আসব, নতুবা নয়। টাকাপয়সার দিক থেকে এবারের শীতের কাজ মোটেই সফল হয়নি—কোনোরকমে জীবন ধারণ হয়েছে—কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক থেকে খুব ভাল আছি। [৯৩]

নিউ ইয়র্ক, ২৮শে মে, ১৮৯৫

অবশেষে এদেশে আমি কিছু ক'রে যেতে সমর্থ হলাম। [৯৪]

পার্সি, নিউ হ্যাম্পসায়ার, ৭ই জুন, ১৮৯৫

শেষ পর্যন্ত মিঃ লেগেটের কাছে এসে পৌঁছেছি। জীবনে যে-সকল সুন্দর জায়গা দেখেছি, এটি তাদের অন্যতম। কল্পনা করুন, চতুর্দিকে প্রকাণ্ড বনের দ্বারা আচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী ও তার মধ্যে একটি হ্রদ—আর সেখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। কি মনোরম, কি নিস্তব্ধ, কি শান্তিপূর্ণ! শহরের

কোলাহলের পর, আমি যে এখানে কি আনন্দ পাচ্ছি, তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন।

এখানে এসে আমি যেন নবজীবন লাভ করেছি। আমি একলা বনের মধ্যে যাই, আমার গীতাখানি পাঠ করি এবং বেশ সুখেই আছি। দিন দশেকের মধ্যে এই জায়গা ত্যাগ ক'রে সহস্রদ্বীপোদ্যানে (থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্ক) যাব। সেখানে ঘন্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ভগবানের ধ্যান ক'রব এবং একলা নির্জনে থাকব।[৯৫]

থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্ক, নিউ ইয়র্ক, ১৮ই জুন, ১৮৯৫

প্রাচীন হিন্দু প্রবচন 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'-ছাড়া এখানে বেশ সময় কাটছে। একই কথা, আমাকে খুব খাটতে হচ্ছে।[৯৬]

থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্ক, ২৬শে জুন, ১৮৯৫

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলরের 'আত্মার অমরত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধগুলো মাদার চার্চকে পাঠিয়েছি।... বেদান্তের কোন অংশই বৃদ্ধ উপেক্ষা করেননি। সাবাস তাঁর নির্ভীক কৃতিত্ব!

ভারতের চিঠিগুলোতে, আমাকে স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য বারংবার অনুরোধ করছে। ওরা অস্থির হয়ে পড়েছে। ইউরোপে যদি যাই তো নিউ ইয়র্ক অঞ্চলের মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটের অতিথি হয়ে যাব। তিনি ছয় সপ্তাহ ধরে জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের সর্বত্র ঘুরবেন। ওখান থেকে ভারতে ফিরবো। চাই কি এখানেও ফিরতে পারি। এদেশে যে বীজ বপন করলাম, তার পরিণতি কামনা করি। এইবারের শীতে চমৎকার কাজ হয়েছে নিউইয়র্কে। সহসা ভারতে চলে গেলে সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে। তাই যাওয়া এখনও মন স্থির করিনি।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে লক্ষ্য করার মতো তেমন কিছু ঘটেনি। দৃশ্য রমণীয় বটে। কয়েকজন বন্ধু রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে ইচ্ছামত প্রসঙ্গ হয়। ফল দুধ প্রভৃতি আহার করি, আর বেদান্তবিষয়ক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ি, এগুলি ওরা ভারত থেকে অনুগ্রহ ক'রে পাঠিয়েছে।...

মান্দ্রাজ-অভিনন্দনের উত্তর পড়ে তুমি খুবই বিচলিত হয়েছিলে। সেখানে কিন্তু তার খুব ফল হয়েছে। সেদিন মান্দ্রাজ 'খ্রীষ্টান কলেজে'র অধ্যক্ষ মিঃ মিলার তাঁর এক ভাষণে আমার চিন্তাগুলি অনেকাংশে সন্নিবিষ্ট ক'রে বলেছেন যে, ঈশ্বর ও মানুষ সম্বন্ধে ভারতের তত্ত্বগুলি প্রতীচ্যের খুব উপযোগী, আর

যুবকদের সেখানে গিয়ে প্রচারকার্যে ব্রতী হ'তে আহ্বান করেছেন। এতে ধর্মযাজক মহলে বেশ ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে।

...দেশভ্রমণ জীবনে খুবই আনন্দদায়ক। আমাকে এক জায়গায় বেশী দিন আটকে রাখলে সম্ভবতঃ মারা প'ড়ব। পরিব্রাজক-জীবনের তুলনা হয় না।

চতুর্দিকে অন্ধকার যতই ঘনিয়ে আসে, উদ্দেশ্য ততই নিকটবর্তী হয়, ততই জীবনের প্রকৃত অর্থ—জীবন যে স্বপ্ন, তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কেন যে মানুষ এটা বুঝতে পারে না, তাও বোঝা যায়। সে যে একান্ত অর্থহীনের মধ্যে অর্থসঙ্গতি খুঁজতে চেষ্টা করেছিল! স্বপ্নের মধ্যে বাস্তবের সন্ধান শিশুসুলভ উদ্যম বই আর কি! 'সবই ক্ষণিক, সবই পরিবর্তনশীল'—এইটুকু নিশ্চয় জেনে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখদুঃখ ত্যাগ ক'রে জগদ্বৈচিত্র্যের সাক্ষিমাত্ররূপে অবস্থান করেন, কোন কিছুতে আসক্ত হন না।[৯৭]

থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্ক, ২৬শে জুন, ১৮৯৫

...এ স্থানটি বড় ভাল লাগছে। আহার যৎসামান্য, অধ্যয়ন আলোচনা ধ্যানাদি কিন্তু খুব চলছে। অপূর্ব এক শান্তির আবেগে প্রাণ ভরে উঠছে। প্রতিদিনই মনে হচ্ছে—আমার করণীয় কিছু নেই। আমি সর্বদাই পরম শান্তিতে আছি। কাজ তিনিই করছেন। আমরা যন্ত্রমাত্র। তাঁর নাম ধন্য! কাম, কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠারূপ ত্রিবিধ বন্ধন যেন আমা থেকে সাময়িকভাবে খসে পড়েছে। ভারতে মধ্যে মধ্যে আমার যেমন উপলব্ধি হ'ত, এখানেও আবার তেমনি হচ্ছে—'আমার ভেদবুদ্ধি, ভালমন্দবোধ, ভ্রম ও অজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, আমি গুণাতীত রাজ্যে বিচরণ করছি। কোন্ বিধিবিশেষ মানবো? কোন্‌টাই বা লঙ্ঘন ক'রব?' সে উচ্চ ভাবভূমি থেকে মনে হয়, সারা বিশ্ব যেন একটা ডোবা। হরিঃ ওঁ তৎ সৎ। একমাত্র তিনিই আছেন আর কিছু নেই। আমি তোমাতে, তুমি আমাতে। হে প্রভো! তুমি আমার চির আশ্রয় হও। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।[৯৮]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ৯ই জুলাই, ১৮৯৫

মহারাজ তো ভালই জানেন, আমি হচ্ছি দৃঢ় অধ্যবসায়ের মানুষ। আমি এ দেশে একটি বীজ পুঁতেছি, সেটি ইতিমধ্যেই চারা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করি খুব শীঘ্রই এটা বৃক্ষে পরিণত হবে। আমি কয়েক শত অনুগামী শিষ্য পেয়েছি ; কতকগুলিকে সন্ন্যাসী ক'রব, তারপর তাদের হাতে কাজের ভার দিয়ে ভারতে চলে যাব।

খ্রীষ্টান পাদ্রীরা আমার বিরুদ্ধে যতই লাগছে, ততই তাদের দেশে একটা

স্থায়ী দাগ রেখে যাবার রোক আমার বেড়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে লণ্ডনে আমার কয়েকটি বন্ধু জুটেছে। আমি অগস্টের শেষে সেখানে যাব মনে করেছি। প্রত্যেক কাজকেই তিনটি অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়—উপহাস, বিরোধ ও পরিশেষে গ্রহণ। যে-লোক তার সময়ে প্রচলিত ভাবরাশি ছাড়িয়ে আরও উচ্চতর তত্ত্ব প্রকাশ করবে, তাকে নিশ্চয়ই লোকে ভুল বুঝবে। সুতরাং বাধা ও অত্যাচার আসুক, স্বাগতম্। কেবল আমাকে দৃঢ় ও পবিত্র হ'তে হবে এবং ভগবানে গভীর বিশ্বাস রাখতে হবে, তবেই এ-সব উড়ে যাবে। [৯৯]

থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্ক, ৩০শে আগস্ট [জুলাই], ১৮৯৫

ওগো মা। আমার বুকের মধ্যে, খুবই দুঃখ। চিঠিগুলো দেওয়ানজীর মৃত্যু সংবাদ বয়ে এনেছে। হরিদাস বিহারীদাস এই মরদেহ ত্যাগ করেছেন। আমার কাছে তিনি ছিলেন পিতৃসম। গত পাঁচ বছর ধরে বেচারি কর্মব্যস্ত জীবনের থেকে বিশ্রাম খুঁজছিলেন, শেষ পর্যন্ত সেটা পেলেনও। কিন্তু দীর্ঘদিন উপভোগ করতে পারলেন না। প্রার্থনা করি পৃথিবী নামক এই অপরিচ্ছন্ন গর্তে, তাঁকে আর ফিরে আসতে না হয়। স্বর্গেও যেন তার পুনর্জন্ম না হয়, ওঁকে যেন আবার শরীর ধারণ করতে না হয়—সেটা ভালই হোক, মন্দই হোক। এই পৃথিবীটা অতিমাত্রায় যে অলীক এবং বড়ই কথাসর্বস্ব, মাগো আমি অনবরত প্রার্থনা করি যে মানুষ প্রকৃত সত্যকে বুঝতে পারুক। অর্থাৎ ভগবান এবং এই দোকানদারি চিরদিনের মত বন্ধ হোক।

হৃদয় এতই ভারাক্রান্ত যে আর লিখতে পারছি না।[১০০]

থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্ক, আগস্ট ১৮৯৫

আমি স্বদেশবাসীর প্রতি কর্তব্য কতকটা করেছি। এখন জগতের জন্য—যার কাছ থেকে এই দেহ পেয়েছি, দেশের জন্য—যে দেশ আমাকে ভাব দিয়েছে, মনুষ্যজাতির জন্য—যাদের মধ্যে আমি নিজেকে একজন বলতে পারি, কিছু ক'রব। যতই বয়স বাড়ছে, ততই 'মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী' হিন্দুদের এই মতবাদের তাৎপর্য বুঝতে পাচ্ছি। [১০১]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আগস্ট, ১৮৯৫

এ বছর আমি অনেক কাজ করেছি, আসছে বছর আরও অনেক কিছু করবার আশা রাখি। মিশনারীদের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিও না। তারা চেঁচাবে, এ স্বাভাবিক। অন্ন মারা গেলে কে না চেঁচায়? গত দু বছর মিশনারি ফাণ্ডে মস্ত ফাঁক পড়েছে, আর সে-ফাঁকটা বেড়েই চলেছে। যাই হোক, আমি

মিশনারিদের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।...তুমি বেশ বলেছ, আমার ভাবগুলি ভারত অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশে বেশী পরিমাণে কার্যে পরিণত হ'তে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে, ভারত আমার জন্য যা করেছে, আমি ভারতের জন্য তার থেকে বেশি করেছি। একটু করে রুটি ও তার সঙ্গে ঝুড়ি খানেক গালাগাল—এই তো সেখানে পেয়েছি।

আমি সত্যে বিশ্বাসী ; আমি যেখানেই যাই না কেন, প্রভু আমার জন্য দলে দলে কর্মী প্রেরণ করেন।...

তারা গুরুর জন্য জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। সত্যই আমার ঈশ্বর—সমগ্র জগৎ আমার দেশ। আমি 'কর্তব্যে' বিশ্বাসী নই, কর্তব্য হচ্ছে সংসারীর পক্ষে অভিশাপ, সন্ন্যাসীর জন্য নয়। কর্তব্য একটা বাজে কথামাত্র। আমি মুক্ত, আমার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে—এই শরীর কোথায় যায় বা না যায়, আমি কি তা গ্রাহ্য করি?...

আমার কাছে একটা সত্য আছে—জগৎকে শেখাবার জন্য। আর যিনি আমাকে ঐ সত্য দিয়েছেন, তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে আমাকে সহকর্মী প্রেরণ করবেন। [১০২]

নিউ ইয়র্ক, ২রা আগষ্ট, ১৮৯৫

আমি জনৈক বন্ধুর সঙ্গে প্রথমে পারি-তে যাচ্ছি—১৭ই অগস্ট ইওরোপ যাত্রা করছি। পারি-তে আমার বন্ধুর বিবাহ হওয়া পর্যন্ত (মাত্র এক সপ্তাহ) থাকব, তারপর লণ্ডনে চলে যাব।

এখানে আমার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, তাঁদের অধিকাংশই দরিদ্র। সুতরাং কাজও মন্থরগতিতে চলতে বাধ্য। অধিকন্তু নিউ ইয়র্কে উল্লেখযোগ্য কিছু গড়ে তোলার আগে আরও কয়েক মাস খাটতে হবে। কাজেই শীতের গোড়ায় আমাকে নিউ ইয়র্কে ফিরে আসতে হবে। গ্রীষ্মে পুনরায় লণ্ডনে যাব। এখন যতদূর মনে হচ্ছে, তাতে এবারে সপ্তাহ-কয়েক মাত্র লণ্ডনে থাকতে পারব। কিন্তু ভগবানের কৃপায় হয়তো ঐ অল্প সময়েই গুরুতর বিষয়ের সূচনা হতে পারে। কবে লণ্ডনে পৌঁছুব, তা আপনাকে তার করে জানাব।

থিওজফিস্ট সম্প্রদায়ের জনকয়েক আমার নিউইয়র্কের ক্লাসে এসেছিলেন। মানুষ যখনই বেদান্তের মহিমা বুঝতে পারে, তখনই তাদের হিজি-বিজি ধারণাগুলি দূর হয়ে যায়।

আমার বরাবরের অভিজ্ঞতা, যখন মানুষ বেদান্তের মহান্ গৌরব উপলব্ধি

করতে পারে, তখন মন্ত্রতন্ত্রাদি আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। যে মুহূর্তে মানুষ উচ্চতর সত্যের আভাস পায়, সেই মুহূর্তে নিম্নতর সত্যটি নিজেই অন্তর্হিত হয়। সংখ্যাধিক্যে কিছুই যায় আসে না। বিশৃঙ্খল জনতা শত বৎসরেও যা করতে পারে না, মুষ্টিমেয় কয়েকটি সরল সঙ্ঘবদ্ধ এবং উৎসাহী যুবক এক বৎসরে তার চেয়ে বেশি কাজ করতে পারে। এক বস্তুর উত্তাপ নিকটবর্তী অন্যান্য বস্তুতে সঞ্চারিত হয়—এটাই প্রকৃতির নিয়ম। সুতরাং যে পর্যন্ত আমাদের মধ্যে সেই জ্বলন্ত অনুরাগ, সত্যনিষ্ঠা, প্রেম ও সরলতা সঞ্জীবিত থাকবে, ততক্ষণ আমাদের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।'—এই সনাতন সত্য আমার বৈচিত্র্যময় জীবনে বহুবার পরীক্ষিত হয়েছে।[১০৩]

নিউ ইয়র্ক, ৯ই আগস্ট, ১৮৯৫

যারা আমাদের অনিষ্ট সাধন করতে চায়, এমন অসংখ্য লোক মিলবে। কিন্তু এতেই কি প্রমাণিত হয় না যে, সত্য আমাদেরই পক্ষে? আমি জীবনে যত বাধা পেয়েছি, ততই আমার শক্তির স্ফুরণ হয়েছে। এক টুকরা রুটির জন্য আমি গৃহ থেকে গৃহান্তরে বিতাড়িত হয়েছি ; আবার রাজা-মহারাজারা আমার গাড়ি চালিয়েছেন, আমার পুজো করেছেন। বিষয়ী লোক এবং পুরোহিতকুল সমভাবে আমার উপর নিন্দাবর্ষণ করেছে। কিন্তু তাতে আমার কি আসে যায়? ভগবান তাদের কল্যাণ করুন, তারাও আমার আত্মার সঙ্গে অভিন্ন। এরা সবাই আমাকে স্প্রিং বোর্ডের মতো সাহায্য করেছে—এদের প্রতিঘাতে আমার শক্তি উচ্চ থেকে উচ্চতর বিকাশ লাভ করেছে।

বাক্সর্বস্ব ধর্মপ্রচারক দেখে যে আমার ভয় পাবার কিছু নেই, তা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছি। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ কখন কারও শত্রুতা ধরতে পারেন না। 'বচনবাগীশ'রা বক্তৃতা করতে থাকুক! তার চেয়ে ভাল কিছু তারা জানে না। নাম, যশ ও কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে তারা বিভোর ও মত্ত থাকুক। আর আমরা যেন ধর্মোপলব্ধির, ব্রহ্মলাভের ও ব্রহ্ম হওয়ার জন্য দৃঢ়ব্রত হই। আমরা যেন মৃত্যু পর্যন্ত এবং জীবনের পর জীবন ধরে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকি। অন্যের কথায় আমরা যেন কর্ণপাত না করি। সমগ্র জীবনের সাধনার ফলে আমাদের মধ্যে একজনও যদি জগতের কঠিন বন্ধনপাশ ছিন্ন করে মুক্ত হতে পারে, তবেই আমাদের ব্রত উদ্‌যাপিত হল। হরিঃ ওঁ।

আর একটি কথা। ভারতকে আমি সত্য-সত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন

আমার দৃষ্টি খুলে যাচ্ছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশতঃ লোকে যাদের 'মানুষ' বলে অভিহিত করে আমরা সেই 'নারায়ণের'ই সেবক।[১০৪]

পারি, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

যদি ভারতের লোকেরা চায় যে, আমি হিন্দুখাদ্য ছাড়া আর কিছু না খাই, তবে তাদের ব'লো, তারা যেন আমায় একজন রাঁধুনী ও তাকে রাখবার উপযুক্ত খরচ পাঠিয়ে দেয়। এক কানাকড়ি সাহায্য করবার মুরদ নেই, এদিকে গায়ে পড়ে উপদেশ—এতে আমার হাসিই পায়।

অপরদিকে যদি মিশনারিরা বলে, আমি সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ-রূপ প্রধান দুই ব্রত কখনও ভঙ্গ করেছি, তবে তাদের বলো যে তারা মস্ত মিথ্যাবাদী।[১০৫]

পারি, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

আলাসিঙ্গা, কারও সাহায্য চাই না। আমিই তো অপরকে সাহায্য করে আসছি। আমাকে সাহায্য করেছে এমন লোক তো আমি এখনও দেখতে পাইনি। বাঙালিরা—তাদের দেশে যত মানুষ জন্মেছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাজে সাহায্যের জন্যে কটা টাকা তুলতে পারে না, এদিকে ক্রমাগত বাজে বকছে ; আর যার জন্যে তারা কিছুই করেনি, বরং যে তাদের জন্যে যথাসাধ্য করেছে, তারই ওপর হুকুম চালাতে চায়। জগৎ এইরূপ অকৃতজ্ঞই বটে!![১০৫ক]

রিডিং, ইংলন্ড, ১৮৯৫

শশী, লোকে যা হয় বলুক গে। 'লোক না পোক'।...বাঙালিরাই আমাকে মানুষ করলে, টাকাকড়ি দিয়ে পাঠালে, এখনও আমাকে পরিপোষণ করছে— অহ হ!!! তাদের মন জুগিয়ে কথা বলতে হবে— না? বাঙালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? ওদের দেশে বারো বছরের মেয়ের ছেলে হয়! যাঁর জন্মে ওদের দেশ পবিত্র হয়ে গেল, তাঁর একটি সিকি পয়সার কিছু করতে পারলে না, আবার লম্বা কথা! বাংলা দেশে বুঝি যাব আর মনে করেছ? ওরা ভারতবর্ষের নাম খারাপ করেছে।...মঠ করতে হয় পশ্চিমে রাজপুতানায়, পাঞ্জাবে, 'ইভ্‌ন্' বোম্বায়ে। ...লন্ডনে কতকগুলো কাফ্রির মতো— আবার টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে ঘুরতে দেখতে পাই। কালো হাতখানা ছুঁলে ইংরেজরা খায় না— এই আদর! ঝি-চাকরের দলে ইয়ারকি দিয়ে দেশে গিয়ে বড়লোক হয়!! রাম! আহার গেঁড়িগুগলি,

পান প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুরজল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলাপাতা এবং ছেলের মলমূত্র-মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্নী-শাঁকচুন্নীর সঙ্গে, বেশ দিগম্বর কৌপীন ইত্যাদি, মুখে যত জোর! ওদের মতামতে কি আসে যায়রে ভাই? তোরা আপন কাজ করে যা।[১০৫খ]

হোটেল মিনার্ভা, ফ্লোরেন্স, ২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৬

রাখাল, পরস্পরের সহিত বিবাদ ও পরস্পরকে নিন্দা করা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। অলস, অকর্মণ্য, মন্দভাষী, ঈর্ষাপরায়ণ, ভীরু এবং কলহপ্রিয়— এই তো আমরা বাঙালি জাতি।... বেকুবদের কথা মোটেই ভেবো না ; কথায় বলে 'বুড়ো বেকুবের মতো আর বেকুব নেই।' ওরা একটু চেঁচাক না।[১০৫গ]

ইংলন্ডে

ইংরেজজাতের প্রতি আমার থেকে অধিকতর ঘৃণা পোষণ করে এমন কেউই কখনও ইংলন্ডে পদার্পণ করেনি। কিন্তু যত আমি তাঁদের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলাম এবং তাঁদের সঙ্গে মিশতে লাগলাম, যতই দেখতে লাগলাম ব্রিটিশজাতির জীবনযন্ত্র কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং যতই ঐ জাতের হৃৎস্পন্দন কোথায় হচ্ছে বুঝতে লাগলাম, ততই তাদের ভালবাসতে লাগলাম।[১০৬]

রিডিং, ইংলন্ড, সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

লণ্ডনে নির্বিঘ্নে পৌঁছেছি। বন্ধুর সন্ধান পেয়েছি, তাঁর বাড়ীতে বেশ আছি। চমৎকার পরিবার। স্ত্রীটি তাঁর বাস্তবিকই দেবীতুল্যা, আর তিনি নিজে যথার্থ ভারত-প্রেমিক। সাধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা ক'রে তাঁদেরই মতো খেয়ে-দেয়ে তিনি ভারতে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। কাজেই তাঁর এখানে আমি খুব আনন্দে আছি. এর মধ্যেই ভারত থেকে ফেরা অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন উচ্চপদস্থ সৈনিককে দেখলাম ; তাঁরা আমার সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করলেন।

রাস্তায় কেউ আমার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়েও থাকে না। ভারতের বাইরে আর কোথাও এরকম সুস্থির বোধ করিনি। ইংরেজরা আমাদের বোঝে, আমরাও তাদের বুঝি। এদেশের শিক্ষা ও সভ্যতা বেশ উচ্চস্তরের, সেজন্য

এবং বহুদিনের শিক্ষার ফলে এতটা পার্থক্য।

বন্ধুটি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। সুতরাং শঙ্কর প্রভৃতি আচার্যদের ভাষ্যপাঠে আমরা সর্বদা ব্যস্ত রয়েছি। এখানে এখন কেবল ধর্ম ও দর্শন চলেছে। [১০৭]

পাশ্চাত্য দেশে শেখানো হয় যে, 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এর সঙ্গে আঠারো-শ বছর আগে সমাজের জন্ম হয়েছিল ; তার পূর্বে সমাজ বলে কিছু ছিল না। পাশ্চাত্যজগতের বেলা এ-কথা সত্য হতে পারে, কিন্তু সমগ্র জগতের বেলা অবশ্যই নয়। লণ্ডনে যখন বক্তৃতা দিতাম, তখন একজন সুপণ্ডিত মেধাবী বন্ধু প্রায়ই আমার সঙ্গে তর্ক করতেন ; তাঁর তূণীরে যত শর ছিল, তার সবগুলি একদিন আমার উপর নিক্ষেপ করবার পর হঠাৎ তারস্বরে বলে উঠলেন, 'তা হলে আপনাদের ঋষিরা ইংলণ্ডে আমাদের শিক্ষা দিতে আসেননি কেন?' উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'কারণ তখন ইংলণ্ড বলে কিছু ছিলই না, যে সেখানে আসবেন। তাঁরা কি অরণ্যে গাছপালার কাছে প্রচার করবেন?' [১০৮]

রিডিং, ইংলন্ড, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

আমি নিজের থেকে লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই না, যদি প্রভু আমার সামনে লোকেদের এনে হাজির করেন, তবেই ভাল। অন্যের ওপর নিজেকে চাপিয়ে না দেওয়াই হলো আমার নীতি!...

এখন পরবর্তী ঢেউয়ের জন্য অপেক্ষা করছি। 'এড়িয়ে যেও না, খুঁজেও বেড়িও না ; ভাগবান যা পাঠান, তার জন্য অপেক্ষা কর'—এই আমার মূলমন্ত্র। [১০৯]

ক্যাভার্শাম্, ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫

আমি এক্ষণে ইংলণ্ডে। মিঃ স্টার্ডি আমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। লোকটি বড়ই উদ্যমী ও সজ্জন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে রক্ষে করছেন, দেখতে পাচ্ছি যে। ওরে পাগল, পরীর মতো মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা—এ সকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে? না, তিনি রক্ষা করছেন? [১১০]

ক্যাভার্শাম্, অক্টোবর, ১৮৯৫

ইংলণ্ড আমি খুব উপভোগ করছি। আমার বন্ধুর সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র আলোচনা ক'রে কাটাচ্ছি, খাবার ও ধূমপান করার জন্য অল্প একটু সময় রেখে। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ এবং সেই সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া আমাদের আর কিছু আলোচ্য নেই।

এখানে ইংরেজরা খুবই বন্ধুভাবাপন্ন। কয়েকজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাড়া কেউ কালা আদমীদের ঘৃণা করে না। এমন কি রাস্তায় আমাকে লক্ষ্য ক'রে কেউ ব্যঙ্গ করে না। মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি, তা হ'লে কি আমার মুখের রং সাদা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আরশিতে সত্য ধরা পড়ে যায়। এখানে সবাই খুব বন্ধুভাবাপন্ন।

আবার যেসব ইংরেজ পুরুষ এবং নারী ভারতবর্ষকে ভালবাসে, তারা হিন্দুদের চেয়েও বেশী 'হিন্দু'। শুনে বিস্মিত হবেন যে, এখানে আমি নিখুঁত ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রচুর তরিতরকারী পাচ্ছি। যখন একজন ইংরেজ একটা জিনিস ধরে, সে তখন গভীরতম দেশে প্রবেশ করে।[১১১]

ক্যাভার্শাম্, রিডিং, ইংলণ্ড, অক্টোবর, ১৮৯৫

মিঃ স্টাডি তারকদাদার পরিচিত। তিনিই আমাকে এখানে এনেছেন এবং আমরা উভয়ে একত্রে ইংলণ্ডে হাঙ্গামা করবার চেষ্টায় আছি। এবার নভেম্বর মাসে আমি আবার আমেরিকায় যাব।[১১২]

ক্যাভার্শাম্, অক্টোবর, ১৮৯৫

আমাকে দিনরাত খাটতে হয়—তার উপর লাটিমের মতো ঘুরে বেড়ানো।...

আমাদের দেশের মতো এখানে লেকচারে উলটে ঘর থেকে খরচ করতে হয়। তবে অনেকদিন করলে ও খাতির জমে গেলে খরচটা পুষিয়ে যায়। টাকাকড়ি সেই যা প্রথম বৎসর আমেরিকায় করি (তারপর থেকে হাতে এক পয়সাও নিই না), তা প্রায় ফুরিয়ে গেল ; আমেরিকায় পৌঁছবার মতো মাত্র আছে। এই ঘুরে ঘুরে লেকচার ক'রে আমার শরীর অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছে—প্রায়ই ঘুম হয় না, ইত্যাদি। তার উপর একলা।[১১৩]

ইংলন্ড, অক্টোবর, ১৮৯৫

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেই আমি বিশ্বাসী করি—এটাই আমার ব্রত। মানুষকে উন্নত করা ছাড়া আমার আর অন্য কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।...আমি আবার বলছি—আমি কোন সম্প্রদায় গড়িনি, কোন সঙ্ঘ বা সংস্থাও তৈরি করিনি। আমি অল্পই জানি এবং এই অল্প জ্ঞান দিয়েই আমি কিছু গোপন না রেখে প্রাণ ভরে শিক্ষা দিয়ে থাকি। যে বিষয়ে আমি জানি না, তা আমি অকপটে স্বীকার করি। যখনই আমি দেখি যে, কোন ব্যক্তি থিওসফিস্ট অথবা খ্রীষ্টান

অথবা মুসলমান অথবা দুনিয়ার যে কোন ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন তখনই আমি যারপরনাই খুশি হই। আমি একজন সেবকমাত্র--আমি এই পৃথিবীর কারও প্রভু নই। তারপরও যদি কোন মানুষ আমাকে ভালবাসে, তাহলে আমি তাকে স্বাগত আমন্ত্রণ জানাই, আর যদি কেউ আমাকে ঘৃণা করে, তাহলেও আমি তাকে সাদর অভ্যর্থনা করি।

প্রত্যেককেই আত্মরক্ষা করতে হবে, প্রত্যেককেই নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। আমি কারো সাহায্য প্রত্যাশা করি না, আমি কাকেও প্রত্যাহার করি না। এ জগতের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার অধিকার আমার নেই। অতীতে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন বা ভবিষ্যতে করবেন আমার প্রতি তাঁদের করুণা রয়েছে, এটা কখনও দাবি করা যায় না। তাই আমি সবার কাছে চির কৃতজ্ঞ।

তোমার পরিস্থিতি এত মন্দ দেখে আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু জানো যে—'আমার চেয়েও দুঃখী জগতে আছে।' আমি তোমার চেয়েও খারাপ পরিস্থিতিতে আছি। ইংলণ্ডে আমাকে নিজের পকেট থেকেই সব কিছুর জন্য খরচ করতে হয়, আয় বলতে কিছুই নেই। লণ্ডনে একখানা ঘরের ভাড়া হচ্ছে প্রতি সপ্তাহের জন্য ৩ পাউণ্ড। তার ওপরে নানা খরচপাতি আছে। আমার কষ্টের জন্য আমি কার কাছে অভিযোগ জানাব? এটা আমার নিজের কর্মফল, আমাকেই ভোগ করতে হবে। আর আমি যখন সন্ন্যাস নিয়েছি, তখন জেনেশুনেই নিয়েছি যে অনাহারেও এই শরীর পাত হতে পারে। তাতেই বা কী আসে যায়? সন্ন্যাসীর পক্ষে কখনও ক্ষোভ করা উচিত নয়। এই সংসারে সন্ন্যাসী একজন পরিব্রাজক পথিক মাত্র। যা-ই আসুক না কেন সবই মঙ্গল।

আমি একজন ভিখারি, আমার বন্ধুবান্ধবেরাও গরিব। আমি গরিবদেরই ভালবাসি। আমি দারিদ্র্যকেই স্বাগত জানাই। আমাকে মাঝে মাঝে যে উপবাসী থাকতে হয়, সেজন্য আমি খুশি। আমি কারো কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করি না। সাহায্য চেয়ে কি হবে? সত্য নিজেকে নিজেই প্রচার করবে, আমার সাহায্য না পেলে সত্য লুপ্ত হয়ে যাবে না! গীতা বলেছেন—'সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব...'। চিরন্তন প্রেম, সর্বাবস্থায় অবিচলিত প্রশান্তি এবং সর্বোপরি ঈর্ষা এবং বিদ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ব্যক্তির-ই জয় হয়—একমাত্র তারই জয় হয়, অন্য কিছু নয়।

সমগ্র ইংলণ্ডে আমার মাত্র একজন বন্ধুই আছেন, যিনি আমার প্রয়োজনের সময় খাদ্য এবং আশ্রয় দিয়ে থাকেন।[১১৪]

লণ্ডন, ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেট, ২৩শে অক্টোবর, ১৮৯৫

আমি যা শিক্ষা দিই, তা আমার গুরুর শিক্ষানুযায়ী। তাঁর উপদেশের অনুগামী হয়ে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ আমি নিজে যেরকম বুঝেছি, তাই ব্যাখ্যা করে থাকি। অলৌকিক উপায়ে লব্ধ কোনপ্রকার বিষয় শিক্ষা দেবার দাবি আমি করি না। আমার উপদেশের মধ্যে যতটুকু তীক্ষ্ণবিচার-বুদ্ধিসম্মত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গ্রাহ্য, ততটুকু লোকে গ্রহণ করলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হব।

সকল ধর্মেরই লক্ষ্য—কোন বিশেষ মানবজীবনকে আদর্শস্বরূপ ধরে স্থূলভাবে ভক্তি, জ্ঞান বা যোগ শিক্ষা দেওয়া। ওইসব আদর্শগুলিকে অবলম্বন করে ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ-বিষয়ক যে সাধারণ ভাব ও সাধনপ্রণালী রয়েছে, বেদান্ত তারই বিজ্ঞানস্বরূপ। আমি ঐ বিজ্ঞানই প্রচার করে থাকি। ঐ বিজ্ঞানসহায়ে নিজ নিজ সাধনার উপায়রূপে অবলম্বিত আদর্শগুলি প্রত্যেকে নিজেই বুঝে নিক —এই কথাই বলি। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজ নিজ অভিজ্ঞতাকেই প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করতে বলে থাকি। যেখানে কোন গ্রন্থের কথা প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করি, সেখানে বুঝতে হবে, চেষ্টা করলে সেগুলি সংগ্রহ করা যেতে পারে, এবং সকলেই ইচ্ছা করলে নিজে তা পড়ে নিতে পারে। সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত মহাপুরুষদের উপদেশ বলে কোন কিছু প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করি না, গোপনীয় গ্রন্থ বা হস্তলিপি থেকে কিছু শিখেছি বলে দাবি করি না। আমি কোন গুপ্ত সমিতির মুখপাত্র নই অথবা ঐ সমিতিসমূহের দ্বারা কোনরূপ কল্যাণ হতে পারে বলেও আমার বিশ্বাস নেই। সত্য আপনিই আপনার প্রমাণ, অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবার তার কোন প্রয়োজন নেই।

আমি প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ও সর্বসাধারণের সম্পত্তিস্বরূপ আত্মার তত্ত্ব উপদেশ দিয়ে থাকি। জনকয়েক দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি আত্মজ্ঞানলাভ করলে ও ঐ জ্ঞান-অবলম্বনে দৈনন্দিন জীবনের কাজ করে গেলে পূর্ব পূর্ব যুগের মত এ যুগেও জগৎটাকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করে দিতে পারেন। পূর্বকালেও এক এক জন দৃঢ়চিত্ত মহাপুরুষ ঐভাবে তাঁদের নিজ নিজ সময়ে যুগান্তর এনেছিলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোয় যে ধর্ম-মহাসভা হয়েছিল, আমি তাতে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি ছিলাম। সেই অবধি আমি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করে বক্তৃতা দিচ্ছি। মার্কিন জাতি পরম আগ্রহ সহকারে আমার বক্তৃতা শুনছে এবং আমার সঙ্গে পরমবন্ধুবৎ আচরণ করছে। সেদেশে আমার কাজ এমন সুপ্রতিষ্ঠিত

হয়েছে যে, আমাকে শীঘ্র সেখানে ফিরে যেতে হবে।

আমি এমন একটি দর্শন প্রচার করে থাকি, যা জগতে যত রকম ধর্ম থাকা সম্ভব, সে-সমুদয়েরই ভিত্তিস্বরূপ হতে পারে, আর আমার সব ধর্মের উপরই সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, আমার উপদেশ কোন ধর্মেরই বিরোধী নয়। আমি ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিসাধনেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখি, ব্যক্তিকেই তেজস্বী করবার চেষ্টা করি। প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বরাংশ বা ব্রহ্ম —এ কথাই শিক্ষা দিই, আর সর্বসাধারণকে তাদের অন্তর্নিহিত এই ব্রহ্মভাব সম্বন্ধে সচেতন হতেই আহ্বান করে থাকি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এটাই প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের আদর্শ।

আমার আশা এই যে, আমি কয়েকজনকে পূর্বোক্ত ভাবে শিক্ষা দেব, আর তাদের নিজ নিজ ভাবে অপরের কাছে তা ব্যক্ত করতে উৎসাহিত করব। আমার উপদেশ তারা যত ইচ্ছা রূপান্তরিত করুক, ক্ষতি নেই। আমি অবশ্য-বিশ্বাস্য মতবাদরূপে কিছু শিক্ষা দেব না, কারণ পরিণামে সত্যের জয় নিশ্চয়ই হয়ে থাকে।

আমি প্রকাশ্যে যে-সব কাজ করি, তার ভার আমার দু-একটি বন্ধুর হাতে আছে।

আমার উদ্দেশ্য সফল করবার যে-পথ দেখতে পাব, সেই পথ অনুসরণ করতে আমি প্রস্তুত ; লোকের বৈঠকখানায় বা অন্য স্থলে সভায় যোগ দেওয়া, পত্রের উত্তর দেওয়া বা সাক্ষাৎভাবে বিচার করা—সব কিছুই করতে আমি প্রস্তুত। এই অর্থ লালসা-প্রধান যুগে আমি এই কথাটি কিন্তু সকলকে বলতে চাই, আমার কোন কাজই অর্থলাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না।[১১৫]

লন্ডন, ২৪শে অক্টোবর, ১৮৯৫

আমার এই সর্বদা ভ্রাম্যমাণ জীবন বড় অদ্ভুত—কোনো বিশ্রাম নেই। বিশ্রামই আমার মৃত্যু—এটাই হচ্ছে অভ্যাসের শক্তি। এখানে ওখানে সামান্য সাফল্য এবং এবড়ো খেবড়ো পথে যথেষ্ট পরিমাণে ধাক্কা খাওয়া। প্যারিসে অনেক কিছু দেখা হল। নিউইয়র্কের বান্ধবী মিস্ জোসেফিন ম্যাকলিয়ড্ আমাকে একমাস ধরে সর্বত্র সব দেখিয়েছেন। সেখানেও, আমেরিকার দয়ালু নারী। ইংলন্ডে এরা আমাদের ভালভাবে জানে। যারা হিন্দুদের পছন্দ করে না ; ওরা তাদের ঘৃণা করে ; যারা পছন্দ করে, পুজো করে।

এখানে কাজের গতি মন্থর, কিন্তু নিশ্চিত। ভাসা ভাসা নয়, ওপর ওপর নয় আমেরিকান মহিলাদের মতন ইংলন্ডের মেয়েরা অত উচ্চ শিক্ষিতা নয়, অত

সুন্দরীও নয়।

যখন কোনো সাফল্য আসে—আমি হতাশা অনুভব করি ; আমার মনে হয় সবই যেন বৃথা—যেন এই জীবনের কোনো মানে নেই, যেন জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখা।

প্রেম, বন্ধুত্ব, ধর্ম্ম, পুণ্য, দয়া—প্রত্যেকটি হ'চ্ছে মনের তাৎক্ষণিক অবস্থা আমার মনে হয় আমাকে অনেক দুর যেতে হবে ; তা সত্ত্বেও আমি নিজেকে বলি, কতদূর—ওগো কতদূর। তবু দেহ এবং মনকে তার কর্ম করতে হবে আশা করি এটা মন্দ হবে না।... তবুও মনে হয় জীবনের গভীরতা যেমন বাড়ছে তেমন নিজের ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছে।...

একটি শান্ত, বিশ্রামপূর্ণ বিবাহিত জীবন অধিকাংশ মানুষের পক্ষে ভাল মিস্টার স্টার্ডি, যাঁর সঙ্গে এখন থাকছি, তিনি বহুবার ভারতে গিয়েছেন আমাদের দেশের সাধুসন্তদের সংগে তিনি মিশেছেন এবং নিজস্ব জীবনযাত্রার ব্যাপারে খুবই কঠোর। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি বিয়ে করে থিতু হ'য়েছেন। ওঁদের একটি সুন্দর শিশু সন্তান আছে। ওঁদের জীবন খুব সুন্দর। স্ত্রী অবশ্য মেটাফিজিক্স বা সংস্কৃত নিয়ে খুব মাথা ঘামান না, কিন্তু তাঁর সমস্ত জীবন স্বামীতে অর্পিত। স্বামীর মন সংস্কৃত মেটাফিজিক্সে ডুবে রয়েছে।[১১৬]

ইংলন্ড, অক্টোবর অথবা নভেম্বর, ১৮৯৫

বিদ্যের জোরে এদের অনুগত রাখতে হবে, নইলে ফু ক'রে উড়িয়ে দেবে। এরা না বোঝে সাধু, না বোঝে সন্ন্যাসী, না বোঝে ত্যাগ-বৈরাগ্য ; যা ওরা বোঝে তা হল জ্ঞানের ব্যপ্তি, বক্তৃতার সমারোহ এবং কর্ম্মচাঞ্চল্য।[১১৭]

লন্ডন, ১৮ই নভেম্বর, ১৮৯৫

ইংলন্ডে আমার কাজ সত্যিই ভাল হয়েছে ; আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। ইংরেজরা খবরের কাগজে বেশী বকে না, কিন্তু নীরবে কাজ করে। আমেরিকা অপেক্ষা ইংলন্ডে অনেক বেশী কাজ হবে বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। দলে দলে লোক আসছে, কিন্তু এত লোকের জন্য তো আমার জায়গা নেই। সুতরাং বড় বড় সম্ভ্রান্ত মহিলা ও অন্যান্য সকলেই মেঝের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। আমি তাদের কল্পনা করতে বলি যে, তারা যেন ভারতীয় আকাশের তলে শাখাপ্রশাখাসমন্বিত বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষের নীচে বসে আছে—তারা অবশ্য এ ভাবটা পছন্দই করে।

আমাকে আগামী সপ্তাহেই এখান থেকে চলে যেতে হবে, তাই এরা ভারি দুঃখিত। কেউ কেউ ভাবছে, যদি এত শীঘ্র চলে যাই, তা হ'লে এখানকার কাজের

ক্ষতি হবে। আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি কোন লোক বা জিনিসের উপর নির্ভর করি না—একমাত্র প্রভুই আমার ভরসা এবং তিনি আমার ভেতর দিয়ে কাজ করছেন। কিছু বিজ্ঞাপন যোগাড়ের চেষ্টা কর—বিজ্ঞাপনের জোরেই কাগজ চলে। আমি তোমার জন্যে 'ভক্তি' সম্বন্ধে বড় একটা কিছু লিখব। কিন্তু এটি মনে রেখো ; বাঙালীদের ভাষায়—'আমার মরবার পর্যন্ত সময় নেই'। দিবারাত্র কাজ, কাজ, কাজ। নিজের রুটির যোগাড় করতে হচ্ছে এবং আমার দেশকে সাহায্য করতে হচ্ছে—সব একলাই ; আর তার দরুন শত্রুমিত্র সকলেরই কাছে কেবল গাল খাচ্ছি!

...কলকাতা থেকে একজন সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠিয়েছি ; তাকে লন্ডনে কাজের জন্য রেখে যাব। আমেরিকার জন্য আর একজন আবশ্যক।... তার খরচাপত্র সব আমি দেব। ইংরিজি ও সংস্কৃত দুই-ই ভাল জানা চাই, আবার তার খুব শক্ত লোক হওয়া চাই—মেয়ে প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে যেন বিগড়ে না যায়।

বাস্তবিক আমি অবিরাম কাজ ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যে রকম কঠোর পরিশ্রম করেছি, আর কোন হিন্দুকে সে রকম করতে হ'লে সে এতদিনে রক্ত বমি ক'রে মরে যেত। আমি দীর্ঘ বিশ্রামের জন্য ভারতে যেতে চাই।[১১৮]

আর, এস্, ব্রিটানিক (জাহাজে), ২৯শে নভেম্বর, ১৮৯৫

এ পর্যন্ত ভ্রমণ খুবই মনোরম হয়েছে। জাহাজের খাজাঞ্চী আমার প্রতি খুব সদয় এবং একখানা কেবিন আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। একমাত্র অসুবিধে হ'ল খাদ্য—মাংস, মাংস, মাংস। আজ তারা আমাকে কিছু তরকারি দেবে বলেছে।

আমরা এখন নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছি। কুয়াসা এত ঘন যে, জাহাজ এগোতে পারছে না। তাই এই সুযোগে কয়েকটি চিঠি লিখছি।

এ এক অদ্ভুত কুয়াশা, প্রায় অভেদ্য, যদিও সূর্য উজ্জ্বলভাবে ও সহাস্যে কিরণ দিচ্ছে।... আমি এভিনিউ রোডে নাইট শার্টটা ফেলে এসেছি। অতএব ট্রাঙ্কটি না আনা পর্যন্ত আমাকে বিনা কামিজেই চালাতে হবে।[১১৯]

আমেরিকাতে প্রত্যাবর্তন

বুদ্ধের যেমন প্রাচ্যভূভাগে ঘোষণা করবার জন্য বিশেষ একটা বাণী ছিল, আমারও তেমনি পাশ্চাত্যদেশে ঘোষণা করবার একটা বাণী আছে।[১২০]

ইঙ্গারসোল আমায় একবার বলেন, 'এই জগৎ থেকে যতদূর লাভ করা যেতে

পারে, তার চেষ্টা সকলের করা উচিত—এই আমার বিশ্বাস। কমলালেবুকে নিংড়ে যতটা সম্ভব রস বার ক'রে নিতে হবে, যেন এক ফোঁটা রসও বাদ না যায় ; কারণ এই জগৎ ছাড়া অপর কোন জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত নই।'

আমি তাঁকে উত্তর দিয়েছিলাম : এই জগৎরূপ কমলালেবু নিংড়াবার যে প্রণালী আপনি জানেন, তার চেয়ে ভাল প্রণালী আমি জানি, আর আমি এইভাবে বেশী রস পেয়ে থাকি। আমি জানি আমার মৃত্যু নেই, সুতরাং আমার ঐ রস নিংড়ে নেবার তাড়া নেই। আমি জানি ভয়ের কোন কারণ নেই, সুতরাং বেশ ক'রে ধীরে ধীরে আনন্দ ক'রে নিংড়োচ্ছি। আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার স্ত্রীপুত্রাদি ও বিষয়সম্পত্তির কোন বন্ধন নেই, আমি সকল নরনারীকে ভালবাসতে পারি। সকলেই আমার পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ। মানুষকে ভগবান বলে ভালবাসলে কি আনন্দ—একবার ভেবে দেখুন দেখি! কমলালেবুকে এইভাবে নিংড়ান দেখি—অন্যভাবে নিংড়ে যা রস পান, তার চেয়ে দশহাজারগুণ রস পাবেন।[১২১]

ওদেশে অনেক সময়ে অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা ক'রত, 'আপনি আমার অন্তরের প্রশ্ন কেমন ক'রে জানতে পারলেন?' ওটা আমার তত হয় না। ঠাকুরের অহরহ হ'ত।[১২২]

নিউ ইয়র্ক, ৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫

দশ দিনের অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং বিক্ষুব্ধ সমুদ্রযাত্রার পর আমি নিরাপদে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছেছি। আমার বন্ধুরা ইতিমধ্যেই কয়েকটি ঘর ঠিক ক'রে রেখেছেন। সেখানেই আমি এখন বাস করছি এবং শীঘ্র ক্লাস নেবার ইচ্ছা আছে। ইতিমধ্যে থিওসফিস্টরা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠেছে এবং আমাকে আঘাত করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

মিসেস লেগেট ও অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তারা বরাবরের মতই সদয় ও অনুরক্ত।[১২৩]

এ-যাবৎ যত সমুদ্রযাত্রা করেছি, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দশদিন-ব্যাপী সমুদ্রযাত্রার পরে নিউইয়র্কে পৌঁছেছি। একাদিক্রমে দিনকয়েক বড়ই পীড়িত ছিলাম।

ইওরোপের ভকভকে ঝকঝকে শহরগুলির পরে নিউইয়র্কটাকে বড়ই নোংরা ও হতচ্ছাড়া মনে হয়। আগামী সোমবার কাজ আরম্ভ করব।[১২৪]

নিউ ইয়র্ক, ৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫

—তোদের মতো 'হাঘরের দল' জগতে আর কোথাও নেই। নীচ জাতগুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে উঠতে-বসতে জুতো-লাথি খেয়ে, একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে এখন প্রফেশনাল (পেশাদার) ভিখিরি হয়েছে ; তাদের উপরশ্রেণীর লোকেরা দু-এক পাতা ইংরেজী পড়ে আর্জি হাতে ক'রে সকল অফিসের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বিশ টাকার চাকরি খালি হ'লে পাঁচ-শ বি.এ, এম. এ. দরখাস্ত করে। পোড়া দরখাস্তও বা কেমন! 'ঘরে ভাত নেই, মাগ-ছেলে খেতে পাচ্ছে না ; সাহেব, দুটি খেতে দাও, নইলে গেলুম!' চাকরিতে ঢুকেও দাসত্বের চূড়ান্ত করতে হয়। তোদের উচ্চশিক্ষিত বড় বড় (?) লোকেরা দল বেঁধে 'হায় ভারত গেল! হে ইংরেজ, তোমরা আমাদের লোকদের চাকরি দাও, দুর্ভিক্ষ মোচন করো' ইত্যাদি দিনরাত কেবল 'দাও দাও' ক'রে মহা হল্লা করছে। সকল কথার ধুয়ো হচ্ছে—'ইংরেজ, আমাদের দাও।' বাপু, আর কত দেবে? রেল দিয়েছে, তারের খবর দিয়েছে, রাজ্যে শৃঙ্খলা দিয়েছে, ডাকাতের দল প্রায় তাড়িয়েছে, বিজ্ঞানশিক্ষা দিয়েছে। আবার কি দেবে? নিঃস্বার্থ ভাবে কে কি দেয়? বলি বাপু, ওরা তো এত দিয়েছে, তোরা কি দিয়েছিস?

প্রশ্ন : আমাদের দেবার কি আছে? রাজ্যের কর দিই।

—আ মরি! সে কি তোরা দিস, জুতো মেরে আদায় করে— রাজ্যরক্ষা করে বলে।[১২৫]

নিউ ইয়র্ক, ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫।

ইংলন্ডে আমার বেশ সাফল্য হ'য়েছে এবং ওখানে প্রথম বীজ বুনে এসেছি যা আগামী গ্রীষ্মে আমার ফিরে যাওয়া পর্যন্ত কাজ করবে। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে আমার কয়েকজন শক্তিশালী বন্ধু ইংলন্ডের চার্চের বড় বড় মাথা।...

মিসেস্ ফেল্পস্কে আমার ভালবাসা জানিও আর দয়া করে ওর সঙ্গে ক্লাশের (ডেট্রয়েটে) ব্যবস্থা কর। সবচাইতে ভাল হয় যদি কোনো জনসমাগমে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা যায় যেখানে আমি আমার কাজের সাধারণ পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে পারি। ইউনিটারিয়ান চার্চ পাওয়া যায়। যদি বিনা পয়সায় বক্তৃতা হয়, তাহলে ওখানে খুব ভীড় হবে। মনে হয় যা কালেকশন হবে তাতে সব খরচ পুষিয়ে যাবে। অতএব ওদের তাড়া দাও— মিসেস্ ফেল্পস, তুমি আর মিসেস্ ফাঙ্কি ওদের সঙ্গে কাজ করবে।

এই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ সম্ভব যদি মিসেস্ ফেল্পস্ এবং মিসেস্ ব্যাগলি ইচ্ছে করেন, তবে তাঁরা এটা ঝটপট করতে পারবেন।[১২৬]

নিউ ইয়র্ক, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫

এখানে আমার সপ্তাহে ছ-টি ক'রে ক্লাস হচ্ছে ; তা ছাড়া প্রশ্নোত্তর ক্লাসও একটি আছে। শ্রোতার সংখ্যা ৭০ থেকে ১২০ পর্যন্ত হয়। এ ছাড়া প্রতি রবিবারে আমি সর্বসাধারণের জন্য একটা বক্তৃতা দিই। গত মাসে যে সভাগৃহে আমার বক্তৃতাগুলি হয়েছিল, তাতে ৬০০ জন বসতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ ৯০০ জন আসবেই—৩০০ জন দাঁড়িয়ে থাকে, আর ৩০০ জন জায়গা না পেয়ে ফিরে যায়। এ সপ্তাহে আরও বড় একটা হল নিয়েছি, যাতে ১২০০ জন বসতে পারে।

এই বক্তৃতা শোনবার জন্য কোন পয়সা চাওয়া হয় না ; কিন্তু সভায় যা চাঁদা ওঠে, তাতে বাড়ী-ভাড়াটা পুষিয়ে যায়। এ সপ্তাহে খবরের কাগজগুলির দৃষ্টি আমার উপর পড়েছে— এ বছর আমি নিউইয়র্ককে বেশ মাতিয়ে তুলেছি। যদি এই গ্রীষ্মে এখানে থেকে গ্রীষ্মকালীন বাসস্থান করতে পারতাম, তবে এখানকার কাজটা সুদৃঢ় ভিত্তিতে চলতে পারত। কিন্তু মে মাসে ইংলণ্ডে যাবার সঙ্কল্প করেছি ব'লে এটা অসম্পূর্ণ রেখেই যেতে হবে।...

অধিকন্তু ভয় হচ্ছে, অবিরাম কাজের চাপে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে। কিছু বিশ্রাম আবশ্যক। এইসব পাশ্চাত্য রীতিতে আমরা অনভ্যস্ত—বিশেষতঃ ঘড়ি-ধরে-চলাতে। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকাখানি এখানে সুন্দর চলছে। আমি 'ভক্তি' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছি।

এখানে জনকয়েক বন্ধু আমার রবিবারের বক্তৃতাগুলি ছাপছেন।

আগামী মাসে ডেট্রয়েট যাব, তারপর বস্টনে ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। অতঃপর ইংলন্ডে যাব কিছুদিন বিশ্রাম ক'রে।[১২৭]

নিউ ইয়র্ক, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫

বাল্যবিবাহ আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। এজন্য ভয়ানক ভুগেছি, আর এই মহাপাপে আমাদের জাতকে ভুগতে হচ্ছে। অতএব এই পৈশাচিক প্রথাকে যদি আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করি, তবে নিজেই নিজের কাছে ঘৃণ্য হবো।

আমার মত আবেগপ্রবণ লোকেরা সবসময়ে আত্মীয় ও বন্ধুদের শিকার হয়। জগৎ বড়ই দয়াহীন। জগৎ তোমার বন্ধু যখন তুমি তার দাস। আমার পক্ষে এই জগৎ বেশ বিস্তৃত। সবসময় এর কোথাও একটা কোণ খুঁজে পাব। যদি ভারতে মানুষ আমাকে পছন্দ না করে অন্য কোথাও কেউ নিশ্চয় আমাকে পছন্দ করবে।

বাল্যবিবাহরূপ এই আসুরিক প্রথার উপর আমাকে যথাশক্তি পদাঘাত করতে হবে। আমি দুঃখিত—অতি দুঃখিত যে, ছোট ছোট মেয়েদের স্বামী যোগাড়ের ব্যাপারে আমি নিজেকে জড়াতে পারব না ; ভগবান আমার সহায় হোন! আমি এতে কোনদিন ছিলাম না এবং কোনদিন থাকবও না।

যে লোক শিশুর জন্য স্বামী যোগাড় করে তাকে আমি খুনও করতে পারি।

মোদ্দা কথা এই—আমার সাহায্যের জন্য এমন লোক চাই, যারা সাহসী, নির্ভীক ও বিপদে ভয় পায় না। না হলে আমি একাই কাজ ক'বব। আমাকে তো আমার ব্রত উদ্‌যাপন করতেই হবে। আমি একাই তা ক'রব। কে আসে বা কে যায়, তাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। গুরুমহারাজ আমার উপব যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তা সম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—এই ভেবে আমি আনন্দ পাচ্ছি। কাজ ভাল হোক মন্দ হোক, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ভেবেই আমি খুশী। কোন দেশের কোন মানুষের কাছে আমি সাহায্য প্রার্থী নই।[১২৮]

আমেরিকায় থাকার সময় থেকেই সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আমার দেশে ঐরকম প্রথা নেই বলেই যে আমি সর্বসাধারণকে যা জানাতে ইচ্ছা করি, তা জানাবার জন্য বিদেশে গিয়ে সেখানকার প্রচারের প্রচলিত প্রথাগুলি অবলম্বন করব না, এটা যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো শহরে যে বিশ্বধর্মমহাসভা বসেছিল, তাতে আমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি ছিলাম। মহীশূরের রাজা এবং অপর কয়েকটি বন্ধু আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। আমার বোধ হয়, আমি আমেরিকায় কিছুটা কৃতকার্য হয়েছি বলে দাবি করতে পারি। চিকাগো ছাড়াও আমেরিকার অন্যান্য বড় বড় শহরে আমি বহুবার নিমন্ত্রিত হয়েছি। আমি দীর্ঘকাল ধরে আমেরিকায় বাস করছি। গত বছর গ্রীষ্মকালে একবার ইংলণ্ডে এসেছিলাম, এ বছরও এসেছি ; প্রায় তিন বছর আমেরিকায় রয়েছি। আমার বিবেচনায় আমেরিকার সভ্যতা খুব উচ্চ স্তরের। দেখলাম, মার্কিনজাতির চিত্ত সহজেই নূতন নূতন ভাব ধারণা করতে পারে। কোন জিনিস নতুন বলেই তাঁরা পরিত্যাগ করেন না, তার বাস্তবিক কোন গুণাগুণ আছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখে—তারপর তা গ্রাহ্য কি ত্যাজ্য, বিচার করেন।

সব ধর্মের সারভাগ শিক্ষা দেওয়া বললে বরং আমার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা হতে পারে। ধর্মসমূহের গৌণ অঙ্গগুলি বাদ দিয়ে যেটি মুখ্য, যেটি মূলভিত্তি, সেইটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার কাজ।[১২৯]

নিউ ইয়র্ক, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫

এখানকার কাজ চমৎকার চলছে। এখানে আসার পর থেকেই দৈনিক দুটি ক্লাসের জন্য আমি অবিরাম খাটছি। আগামীকাল থেকে এক সপ্তাহের অবকাশ নিয়ে মিঃ লেগেটের সঙ্গে শহরের বাইরে যাচ্ছি। প্রসিদ্ধ গায়িকা মাদাম স্টার্লিংকে আপনি জানেন কি? তিনি আমার কাজে বিশেষ আগ্রহান্বিতা।

কাজের বৈষয়িক দিকটা সম্পূর্ণভাবে একটা কমিটির হাতে দিয়ে ঐসমস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হয়েছি। বৈষয়িক ব্যবস্থাদি করবার ক্ষমতা আমার নেই—ঐসব কাজ আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আমি এখন 'যোগসূত্র' ধরেছি এবং এক একটি সূত্র নিয়ে তার সঙ্গে সব ভাষ্যকারের মত আলোচনা করছি। এই সমস্তই লিখে রাখছি। এই লেখার কাজ শেষ হলে তা ইংরিজিতে পতঞ্জলির পূর্ণাঙ্গ সটীক অনুবাদ হবে।[৩০]

নিউ ইয়র্ক, ৬ই জানুয়ারী, ১৮৯৬

ইংলন্ডে দেখছিলাম—আমি যথার্থ শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইংরেজরা আমাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা করেছে। ইংরেজ জাত সম্বন্ধে আমার ধারণাও অনেকখানি বদলেছে। প্রথমেই দেখলাম লাণ্ড প্রভৃতি যারা আমাকে আক্রমণ করার জন্য ইংলন্ড থেকে এখানে এসেছিল, ওখানে তাদের কোন পাত্তাই নেই। ইংরেজরা ওদের অস্তিত্ব পর্যন্ত উপেক্ষা করে। যারা ইংলিশ চার্চের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের ভদ্র বলে মনে করা হয় না। ঐ চার্চের কয়েকজন যথার্থ সেরা লোক এবং প্রতিষ্ঠা ও পদমর্যাদায় অগ্রণীদের কয়েকজন আমার অকৃত্রিম বন্ধু হয়েছেন। আমার ইংলন্ডের অভিজ্ঞতা আমেরিকার তুলনায় একেবারে অন্য রকমের। তাই না?

প্রেসবিটেরিয়ন প্রভৃতি গোঁড়াদের সঙ্গে এখানকার হোটেলে আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনে ইংরেজরা তো হেসেই অস্থির। উভয় দেশের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা ও আচার-ব্যবহারে প্রভেদ লক্ষ্য করতে আমার দেরি হয় না। বুঝলাম কেন আমেরিকার মেয়েরা দলে দলে ইউরোপীয় বিবাহ করতে যায়। সকলের কাছে সদয় ব্যবহার পেয়েছি। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে অনেক উদারহৃদয় বন্ধু বসন্তকালে আমার ফিরে যাওয়ার প্রতীক্ষায় আছে।

সেখানকার কাজ সম্বন্ধে বলি, বেদান্তের ভাব ইংরেজ সমাজের উচ্চস্তরে প্রবেশ করেছে। বহু শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ মানুষ, যাঁদের মধ্যে ধর্মযাজকের সংখ্যাও কম নয়, আমাকে বলেন যে, এ যেন গ্রীস কর্তৃক রোম-বিজয়ের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে ইংলন্ডে।

সাধারণ বক্তৃতা ছাড়াও সপ্তাহে আটটি ক'রে ক্লাস নিতাম ; এত লোক হ'ত যে, অনেকে—এমন কি অভিজাত মহিলাগণও নিঃসঙ্কোচে মেজের উপর বসতেন। ইংলন্ডে দৃঢ়সঙ্কল্প নরনারী দেখতে পেলাম, তারা দায়িত্ব নিয়ে তাদের জাতি-সুলভ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ চালাতে থাকবে। নিউইয়র্কে আমার কাজ এ বছর চমৎকার চলেছে। মিষ্টার লেগেট নিউইয়র্কের একজন সেরা ধনী, তিনি আমার একান্ত অনুরাগী। নিউইয়র্কবাসীরা অধিকতর দৃঢ়চিত্ত তাই এখানেই আমার কেন্দ্রস্থাপনের সঙ্কল্প করেছি। এখানকার মেথডিস্ট ও প্রেসবিটেরিয়ন সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আমার উপদেশাদি আজব বলে মনে করেন। ইংলন্ডের ধার্মিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে কিন্তু এগুলি উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্বরূপে পরিগণিত।

তা ছাড়া মার্কিন নারীর স্বভাবসুলভ পরচর্চা ইংলন্ডে অজ্ঞাত। ইংরেজ মেয়েরা একটু শ্লথগতি, কিন্তু একবার মাথায় কিছু ঢুকলে তার সব কিছু আয়ত্ত ক'রে নেবেই। ওখানে ওরা সব কাজ যথারীতি চালাচ্ছে এবং প্রতি সপ্তাহে আমাকে তার বিবরণ পাঠাচ্ছে। বুঝে দেখ! আর এখানে সপ্তাহখানেকের জন্য যদি অনুপস্থিত থাকি তো কাজের দফা রফা।[১৩১]

নিউ ইয়র্ক, ১৬ই জানুয়ারী, ১৮৯৬

এখানে আমার ক্লাসগুলি ও রবিবারের বক্তৃতাগুলি আরম্ভ করেছি। দুটি কাজই খুব উৎসাহ জাগিয়েছে। এসবের জন্য আমি টাকা নিই না ; তবে হলের খরচ চালাবার জন্য কিছু সাহায্য ওঠাই। গত রবিবারের বক্তৃতাটি খুব প্রশংসা অর্জন করেছে সেটি ছাপা হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে আমি তোমাকে কয়েক কপি পাঠিয়ে দেবো। ওতে আমাদের কাজের একটা সাধারণ পরিকল্পনা ছিল।

আমার বন্ধুরা একজন সাঙ্কেতিক লেখক (জে জে গুড্উইন) নিযুক্ত করায় এই সমস্ত ক্লাসের পাঠগুলি ও বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

পল্লী অঞ্চলে একটা জমি পাবার সম্ভাবনা আছে ; তাতে কয়েকটি বাড়ি, বহু গাছ ও একটি নদী আছে। গ্রীষ্মকালে ওটিকে ধ্যানের স্থানরূপে ব্যবহার করা চলবে। অবশ্য আমার অনুপস্থিতিতে ওটার দেখাশোনার জন্য এবং টাকাকড়ি লেনদেন, ছাপা ও অন্যান্য কাজের জন্য একটা কমিটির প্রয়োজন হবে।

আমি নিজেকে টাকাকড়ির ব্যাপার থেকে একেবারে আলাদা ক'রে ফেলেছি, অথচ টাকাকড়ি না হ'লে কোন আন্দোলন চলতে পারে না। সুতরাং বাধ্য হয়ে কার্যপরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব কমিটির হাতে দিতে হয়েছে ; তারা আমার অনুপস্থিতিতে এই সব চালিয়ে যাবে।[১৩২]

নিউ ইয়র্ক, ২৫শে জানুয়ারী, ১৮৯৬

মনে হয়—এ বছর অতিরিক্ত পরিশ্রম হচ্ছে, কারণ অবসাদ অনুভব করছি। এক দফা বিশ্রামের বিশেষ দরকার।

আগামী কাল এ-মাসের শেষ রবিবাসরীয় বক্তৃতা। সামনের মাসের প্রথম রবিবারে বক্তৃতা হবে ব্রুকলিন শহরে, পরের তিনটি নিউইয়র্কে। এ বছরের মতো নিউইয়র্ক-বক্তৃতাবলী এখানেই শেষ ক'রব। অতএব আমি সকল বিষয়েই নিশ্চিন্ত। অধ্যাপনায় আমার ক্লান্তি এসে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে কয়েক মাস কাজ করার পর ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে বছর-কয়েকের জন্য কিংবা চিরতরে গা-ঢাকা দেব। আমার বিশ্বাস, ভগবান আমাকে প্রচারকার্যের বন্ধন থেকে অব্যাহতি দেবেন।

আত্মাই এক এবং অখণ্ড সত্তাস্বরূপ আর সব অসৎ—এই জ্ঞান হয়ে গেলে কি আর কোন মানুষ বা বাসনা মানসিক উদ্বেগের কারণ হ'তে পারে? মায়ার প্রভাবেই পরোপকার ইত্যাদি খেয়ালগুলো আমার মাথায় ঢুকেছিল, এখন আবার সরে যাচ্ছে। চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তকে জ্ঞানলাভের উপযোগী করা ছাড়া কর্মের যে আর কোন সার্থকতা নেই—এই বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছে।

দুনিয়া তার ভাল মন্দ নিয়ে নানা রূপে চলতে থাকবে। ভাল মন্দ শুধু নূতন নামে ও নূতন স্থানে দেখা দেবে। নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি ও বিশ্রামের জন্য আমার হৃদয় তৃষিত। 'একাকী বিচরণ কর! একাকী বিচরণ কর! যিনি একাকী অবস্থান করেন, কারও সহিত কদাচ তাঁর বিয়োগ হইতে পারে না। তিনি অপরের উদ্বেগের হেতু হন না, অপরেও তাঁর উদ্বেগের হেতু হন না।' সেই ছিন্ন বস্ত্র (কৌপীন), মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন ও ভিক্ষান্ন-ভোজন— হায়! এগুলিই এখন আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়! শত অপূর্ণতা সত্ত্বেও সেই ভারতভূমিই একমাত্র স্থান, যেখানে আত্মা তার মুক্তির সন্ধান পায়—ভগবানের সন্ধান পায়। পাশ্চাত্যের এ-সব আড়ম্বর অন্তঃসারশূন্য ও আত্মার বন্ধন। এর চেয়ে তীব্রভাবে জগতের অসারতা আর কখনও অনুভব করিনি। ভগবান সকলের বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিন—সকলেই মায়া-মুক্ত হোক, এইটাই বিবেকানন্দের চিরন্তন প্রার্থনা।[১৩৩]

নিউ ইয়র্ক, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬

আমার শরীর প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। নিউ ইয়র্কে আসার থেকে আমি এক রাত্তিরও ভালভাবে ঘুমাতে পারিনি ; এবছর লেখার এবং বক্তৃতার বিরামহীন কাজ। বহু বছরের জমা কাজ আর দুশ্চিন্তা এখন আমার ওপর চেপেছে। আর এক মহালড়াই ইংলণ্ডে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সমুদ্রের অতলে প্রবেশ করে আমি লম্বা ঘুম দিতে চাই।...

এ পর্যন্ত আমি অন্তর দিয়ে কাজ করবার চেষ্টা চালিয়েছি—ফলাফল সব প্রভুর। যদি সেগুলো ভাল হয়ে থাকে তবে আজ হোক কাল হোক সেগুলোর অঙ্কুরোদ্গম হবেই। যদি খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে যত তাড়াতাড়ি তারা শেষ হয়ে যায় তত মঙ্গল। জীবনের দায়দায়িত্ব নিয়ে আমি পরিতৃপ্ত। একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে যত কর্ম ব্যস্ত থাকা উচিৎ আমি তার চাইতেও বেশী করেছি। এবার আমি সমাজ থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হব। সংসারের স্পর্শ আমাকে অধঃপতিত করছে। এবার যে গুটিয়ে নেওয়া প্রয়োজন, তা আমি নিশ্চিত। হৃদয়কে পবিত্র করা ছাড়া কর্ম্মের আর কোনো মূল্য নেই। আমার হৃদয় যথেষ্ট পবিত্র ; তাহলে কেন আমি অপরের ভাল করবার জন্য মাথা ঘামাব? 'যদি জান যে আত্মাই একমাত্র স্থায়ী, আর কিছুই স্থায়ী নয়, তাহলে কিসের আশা করছ? কার ইচ্ছাপূরণের জন্য নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ?' এই পৃথিবী একটা স্বপ্ন, স্বপ্ন নিয়ে কেন অযথা মাথা ঘামাব? যোগীর পক্ষে পৃথিবীর এই আবহাওয়া বিষাক্ত। কিন্তু আমি জেগে উঠছি। আমার পুরোনো লৌহহৃদয় ফিরে আসছে—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শিষ্যদের প্রতি আকর্ষণ দ্রুত অদৃশ্য হচ্ছে। 'ধন দৌলতে বা বংশপরম্পরার মাধ্যমে নয়, এইসব ভুষোমাল পরিত্যাগ করাই সেই অমৃতত্ব প্রাপ্তির উপায়'—বেদ। কথা বলতেও আমি ক্লান্ত হয়ে যাই ; এবার মুখে তালা লাগিয়ে বছরের পর বছর নির্বাক বসে থাকতে চাই। কথার কোন মূল্য নেই।[১২৪]

নিউ ইয়র্ক, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬

আমি এতদিনে মার্কিন সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ নিউইয়র্ককে জাগাতে সমর্থ হয়েছি ; কিন্তু এর জন্য আমাকে ভয়ানক সংগ্রাম করতে হয়েছে গত দু বৎসর এক পয়সাও আসেনি।

হাতে যা-কিছু ছিল, তা প্রায় সবই এই নিউইয়র্ক ও ইংলন্ডের কাজে ব্যয় করেছি। এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, কাজ চলে যাবে।...

বড়ই কঠিন কাজ, বৎস, বড়ই কঠিন। যতদিন না অপরোক্ষানুভূতি ও পূর্ণ ত্যাগের ভাব ধারণা করবার উপযুক্ত একদল শিষ্য তৈরি হচ্ছে, ততদিন এই কামকাঞ্চনের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে নিজেকে স্থির রেখে নিজ আদর্শ ধরে থাকা সত্যিই কঠিন ব্যাপার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এরই মধ্যে অনেকটা কৃতকার্য হওয়া গেছে। আমাকে না বুঝবার জন্য আমি মিশনারীদের বা অন্যদের আর দোষ দিই না ; তারা এ ছাড়া আর কি করতে পারত? তারা তো আগে কখনও এমন লোক দেখে নি, যে কামিনী-কাঞ্চনের মোটেই ধার ধারে না। প্রথমে যখন তারা দেখলে, তারা বিশ্বাস করতে পারলে না ...এখন লোকেরা দলে দলে আমার

কাছে আসছে। এখন শত শত লোক বুঝেছে যে, এমন লোক আছে, যারা নিজেদের কামবৃত্তিকে সত্যই সংযত করতে পারে ; আর সাধুতা ও সংযমের প্রতি তাদের ভক্তিশ্রদ্ধাও বাড়ছে। যারা ধৈর্য ধরে থাকে, তাদের সব কিছুই জুটে যায়।[১৩৫]

নিউ ইয়র্ক, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬

একখানা বই—'কর্মযোগ' ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে ; তার চেয়ে অনেক বড় 'রাজযোগ' ছাপা চলছে ; 'জ্ঞানযোগ' পরে প্রকাশিত হ'তে পারে। কথা-বলার ভাষা হবার ফলে এই বইগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করবে।...

সাংকেতিক লেখক গুডউইন একজন ইংরেজ ; সে আমার কাজে এতটা আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছে যে, আমি তাকে ব্রহ্মচারী ক'রে নিয়েছি, সে আমার সঙ্গে ঘুরছে, আমরা একসঙ্গে ইংলণ্ডে যাব।[১৩৬]

বস্টন, ২৩শে মার্চ, ১৮৯৬

সম্প্রতি যাদের আমি সন্ন্যাস দিয়েছি, তাদের মধ্যে সত্যই একজন স্ত্রীলোক, ইনি মজুরদের নেত্রী ছিলেন, বাকি সব পুরুষ। ইংলণ্ডেও আমি আরও কয়েকজনকে সন্ন্যাস দেবো, তারপর তাদের আমার সঙ্গে ভারতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। আমার যে সাফল্য হচ্ছে, তার কারণ আমার সহজ ভাষা। আচার্যের মহত্ত্ব হচ্ছে— তাঁর ভাষার সরলতা।... আমার ভয় হয়—আমার খাটুনি অত্যধিক হয়ে পড়েছে ; এই দীর্ঘ একটানা পরিশ্রমে আমার স্নায়ুমণ্ডলী যেন ছিঁড়ে গেছে।

তোমাদের কাছ থেকে সহানুভূতি আমি কিছুমাত্র চাই না ; শুধু এইজন্য লিখছি যে, তোমরা আমার কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করো না। যতদূর ভালোভাবে সম্ভব কাজ করে যাও। আমার দ্বারা সম্প্রতি কোন বড় কাজ হবে, এমন আশা নেই বলেই মনে হয়। যা হোক, সাঙ্কেতিক প্রণালীতে আমার বক্তৃতাগুলো লিখে নেবার ফলে অনেকটা সাহিত্য গড়ে উঠেছে দেখে আমি খুশি। চারখানা বই তৈরি হয়ে গেছে!

যা হোক, লোককল্যাণের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—এই মনে করেই আমি সন্তুষ্ট। আর কাজ থেকে অবসর নিয়ে আমি যখন গিরিগুহায় ধ্যানে মগ্ন হবো, তখন এ বিষয়ে আমার বিবেক সাফ থাকবে।[১৩৭]

সরলতাই হচ্ছে চাবিকাঠি। আমার প্রভুর ভাষাই আমার আদর্শ, অত্যন্ত কথ্য অথচ সবচাইতে সহজবোধ্য। মনের চিন্তনকে এই ভাষার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে হবে।[১৩৮]

ইংলন্ডে দ্বিতীয়বার

রিডিং, ইংলন্ড, ২০শে এপ্রিল, ১৮৯৬

এবার সমুদ্রযাত্রা আনন্দদায়ক হয়েছে এবং কোন শারীরিক হাঙ্গামা হয়নি। সমুদ্রপীড়া এড়াবার জন্য আমি নিজেই কিছু চিকিৎসা করেছিলাম। আয়ার্লন্ডের মধ্য দিয়ে এবং ইংলন্ডের কয়েকটি পুরানো শহর দেখে এক দৌড়ে ঘুরে এলাম। এখন আবার রিডিং-এ 'ব্রহ্ম, মায়া, জীব, জীবাত্মা ও পরমাত্মা' প্রভৃতি নিয়ে আছি। অপর সন্ন্যাসীটি (স্বামী সারদানন্দ) এখানে রয়েছেন ; আমি যত লোক দেখেছি, তাদের মধ্যে তিনি একজন চমৎকার মানুষ, বেশ পণ্ডিতও। আমরা এখন বইগুলো সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি—নিতান্ত নীরস, একটানা এবং গদ্যময়, আমার জীবনের মতো। আমি যখন আমেরিকার বাইরে যাই, তখনই আমেরিকাকে বেশি ভালোবাসি। যাই হোক, এ পর্যন্ত যা দেখেছি, তা'র মধ্যে ওখানকার কয়েকটি বছরই সর্বোৎকৃষ্ট।[১৩৯]

রিডিং, মে (?), ১৮৯৬

পূর্বপত্রে যদি ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে এইপত্রে লিখি যে, কালী যে দিবস স্টার্ট করিবে সেদিন কিম্বা তাহার আগে যেন ই টি স্টার্ডিকে চিঠি লেখে, যাহাতে সে যাইয়া তাহাকে জাহাজ হইতে লইয়া আসে। এই লন্ডন শহর মানুষের জঙ্গল—দশ পনেরটা কলকাতা একত্রে—অতএব ঐ প্রকার না করিলে গোলমাল হয়ে যাবে।[১৪০]

লন্ডন, মে, ১৮৯৬

আবার লন্ডনে। এখন ইংলন্ডের আবহাওয়া বেশ চমৎকার ও ঠাণ্ডা ; ঘরে অগ্নিকুণ্ডে আগুন রাখতে হয়। তুমি জেনো, আমাদের ব্যবহারের জন্য এবার একটা গোটা বাড়ি পাওয়া গেছে। বাড়িটি ছোট হলেও বেশ সুবিধাজনক। লন্ডনে বাড়িভাড়া আমেরিকার মতো তত বেশী নয়।...এখানে জনকয়েক পুরানো বন্ধুও আছেন। মিস ম্যাকলাউড সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণ ক'রে লন্ডনে ফিরেছেন। তাঁর স্বভাবটি সোনার মতো খাঁটি এবং তাঁর স্নেহপ্রবণ হৃদয়টির কোন পরিবর্তন হয়নি।

আমরা এই বাড়িতে বেশ ছোটখাটো একটি পরিবার হয়েছি। আর আমাদের সঙ্গে আছেন ভারতবর্ষ থেকে আগত একজন সন্ন্যাসী (স্বামী সারদানন্দ)। ...এখনই আমার দুটি ক'রে ক্লাসের অধিবেশন হচ্ছে। চার-পাঁচ মাস ঐরূপ চলবে—তারপর ভারতে যাচ্ছি ; কিন্তু আমেরিকাতেই আমার হৃদয় পড়ে

আছে—আমি ইয়াঙ্কি দেশ ভালবাসি। আমি সব নূতন দেখতে চাই। পুরাতন ধ্বংসাবশেষের চারদিকে অলসভাবে ঘুরে বেড়িয়ে সারাজীবন প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে হা-হুতাশ ক'রে আর প্রাচীনকালের লোকদের কথা ভেবে ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে রাজী নই। আমার রক্তের যা জোর আছে, তাতে ঐরূপ করা চলে না।

সকল ভাব প্রকাশের উপযুক্ত স্থান, পাত্র ও সুযোগ কেবল আমেরিকাতেই আছে। আমি আমূল পরিবর্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরব, পরিবর্তনবিরোধী থসথসে জেলি মাছের মতো ঐ বিরাট পিণ্ডটার কিছু করতে পারি কি না দেখতে। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতন ক'রে আরম্ভ ক'রব—একেবারে সম্পূর্ণ নূতন, সরল অথচ সবল—সদ্যোজাত শিশুর মতো নবীন ও সতেজ।

যিনি সনাতন, অসীম, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ নন—তত্ত্বমাত্র। তুমি, আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপ মাত্র। এই অনন্ত তত্ত্বের যত বেশী কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে, তিনি তত মহৎ ; শেষে সকলকেই তার পূর্ণ প্রতিমূর্তি হ'তে হবে। এরূপে এখনও যদিও সকলেই স্বরূপতঃ এক, তথাপি তখনই প্রকৃতপক্ষে সব এক হয়ে যাবে। ধর্ম এ ছাড়া আর কিছুই নয় ; এই একত্ব অনুভব বা প্রেমই এর সাধন। সেকেলে নির্জীব অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণাগুলি প্রাচীন কুসংস্কারমাত্র। বর্তমানেও সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা কেন? পাশেই যখন জীবন ও সত্যের নদী বয়ে যাচ্ছে, তখন আর তৃষ্ণার্তদের নর্দমার জল খাওয়ানো কেন? এটা মানুষের স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুরাতন সংস্কারগুলোকে সমর্থন ক'রে ক'রে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি। ...জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে। যে স্থান ও পাত্রে ভাবরাশি সহজে কার্যে পরিণত হতে পারে, সেই স্থান ও পাত্রই প্রত্যেকের বেছে নেওয়া উচিত। হায়! যদি মাত্র বারো জন সাহসী, উদার, মহৎ, সরলহৃদয় লোক পেতাম!

আমি নিজে বেশ আছি এবং জীবনটাকে খুব উপভোগ করছি।[১৪১]

লন্ডন, ৩০শে মে, ১৮৯৬

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলরের সঙ্গে বেশ দেখাশুনা হয়ে গেল। তিনি ঋষিকল্প লোক—বেদান্তের ভাবে ভরপুর। তোমার কি মনে হয়? অনেক বছর যাবৎ তিনি আমার গুরুদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তিনি 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী'তে গুরুদেবের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

আপনি তাঁকে জগতের সমক্ষে প্রচার করবার কি কি করছেন? রামকৃষ্ণ তাঁকে অনেক বছর যাবৎ মুগ্ধ করছেন। এটা কি সুসংবাদ নয়?...

এখন এখানে ক্লাস খুলেছি। আগামী সপ্তাহ থেকে প্রতি রবিবার বক্তৃতা আরম্ভ ক'রব। ক্লাসগুলি খুব বড় হয় ; যে বাড়িটি সারা মরশুমের জন্য ভাড়া করেছি, সেই বাড়িতেই ক্লাস হয়। কাল রাত্রে আমি নিজেই রান্না করেছিলাম। জাফরান, লেভেণ্ডার, জয়ত্রী, জায়ফল, কাবাবচিনি, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, মাখন, লেবুর রস, পেঁয়াজ, কিসমিস, বাদাম, গোলমরিচ এবং চাল—এগুলি মিলিয়ে এমনই সুস্বাদু খিচুড়ি বানিয়েছিলাম যে, নিজেই গলাধঃকরণ করতে পারিনি। ঘরে হিং ছিল না, নতুবা তার খানিকটা মিশালে গিলবার পক্ষে সুবিধা হ'ত।[১৪২]

লন্ডন, ৬ই জুন, ১৮৯৬

...অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আমি দিন-কয়েক আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত, আমি তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়েছিলাম। যে-কোন ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন—তিনি নারীই হোন, পুরুষই হোন, তিনি যে-কোন সম্প্রদায়-মত-বা জাতিভুক্ত হোন না কেন—তাঁকে দর্শন করতে যাওয়া আমি তীর্থযাত্রাতুল্য জ্ঞান করি। 'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ'—আমার ভক্তের যাহারা ভক্ত, তাহারা আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। এটা কি সত্য নয়?...

অধ্যাপক যেন সহৃদয়তার মূর্তিবিশেষ। তিনি স্টার্ডি সাহেব ও আমাকে তাঁর সঙ্গে জলযোগের নিমন্ত্রণ করলেন এবং অক্সফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও বোডলিয়ান পুস্তকাগার দেখালেন। রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিতে আসলেন। আর আমাদেরকে এত যত্ন কেন করছেন, জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্যের সঙ্গে তো আর প্রতিদিন সাক্ষাৎ হয় না।' বাস্তবিক আমি নূতন কথা শুনলাম।

সুন্দর-উদ্যানসমন্বিত সেই মনোরম ক্ষুদ্র গৃহ, সপ্ততিবর্ষবয়ঃক্রম সত্ত্বেও তাঁর স্থির প্রসন্ন আনন, বালসুলভ মসৃণ ললাট, রজতশুভ্র কেশ, ঋষি-হৃদয়ের কোন নিভৃত অন্তরালে গভীর আধ্যাত্মিকতার খনির অস্তিত্বসূচক সেই মুখের প্রত্যেক রেখা, তাঁর সমগ্র জীবনের সঙ্গিনী সেই উচ্চাশয়া সহধর্মিনী, তাঁর সেই উদ্যানের তরুরাজি, পুষ্পনিচয়, তথাকার নিস্তব্ধ ভাব ও নির্মল আকাশ। এই সমুদয় মিলে কল্পনায় আমাকে প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবের যুগে নিয়ে গেল—যখন ভারতে ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ, উচ্চাশয় বানপ্রস্থগণ, অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠগণ বাস

করতেন।...

আর ভারতের উপর তাঁর কি অনুরাগ! যদি আমার সে অনুরাগের শতাংশের একাংশও থাকত, তা হলে আমি ধন্য হতাম। এই অসাধারণ মনস্বী পঞ্চাশ বা ততোধিক বছর ধরে ভারতীয় চিন্তারাজ্যে বাস ও বিচরণ করেছেন, পরম আগ্রহ ও হৃদয়ের ভালবাসার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অনন্ত অরণ্যের আলো ও ছায়ার বিনিময় পর্যবেক্ষণ করেছেন। শেষে ঐ-সব তাঁর হৃদয়ে বসে গিয়েছে এবং তাঁর সর্বাঙ্গে তার রঙ ধরিয়ে দিয়েছে।[১৪৩]

মনে হ'ল কি জানিস—সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার করতে ম্যাক্সমূলর-রূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন থেকেই ঐ ধারণা। ম্যাক্সমূলরকে দেখে সে ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এমন অধ্যবসায়ী, এমন বেদবেদান্তসিদ্ধ পণ্ডিত এ দেশে দেখা যায় না! তার উপর আবার ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) প্রতি কি অগাধ ভক্তি! তাঁকে অবতার ব'লে বিশ্বাস করে রে! বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম—কি যত্নটাই করেছিল! বুড়ো-বুড়ীকে দেখে মনে হ'ত, যেন বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর মতো দুটিতে সংসার করছে!—আমায় বিদায় দেওয়ার কালে বুড়োর চোখে জল পড়েছিল।

যিনি বেদের ভাষ্যকার, জ্ঞানের জ্বলন্ত মূর্তি, তাঁর পক্ষে আবার বর্ণাশ্রম, জাতিবিভাগ কি?—তাঁর কাছে ও-সব একেবারে অর্থশূন্য। জীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই আছে, সেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাপাবার খরচই বা কোথায় পেতেন? শুনিসনি? ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই ঋগ্বেদ ছাপাতে নয়লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিল। তাতে কুলোয়নি। এদেশের (ভারতের) শত শত বৈদিক পণ্ডিতকে মাসোহারা দিয়ে এ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য এইরূপ বিপুল অর্থব্যয়, এইরূপ প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এ দেশে এ যুগে কেউ কি কখন দেখেছে? ম্যাক্সমূলর নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসর কাল কেবল পাণ্ডুলিপি লিখেছেন ; তারপর ছাপতে ২০ বৎসর লেগেছে! ৪৫ বৎসর একখানা বই নিয়ে এইরূপ লেগে পড়ে থাকা সামান্য মানুষের কাজ নয়। এতেই বোঝ্ ; সাধে কি আর বলি, তিনি সায়ন![১৪৪]

ইংলিশ চার্চের বড় বড় মাতব্বররা বলতেন, আমার চেষ্টায় বাইবেলের ভিতর বেদান্তের ভাব প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে।[১৪৫]

ইংলন্ডে কোন মিশনারি বা অন্য কোন লোক আমার বিরুদ্ধে কিছু

বলেনি—একজনও আমার নিন্দে করবার চেষ্টা করেনি। আমি দেখে আশ্চর্য হলুম, অধিকাংশ বন্ধুই 'চার্চ অব্ ইংলন্ডে'র অন্তর্ভুক্ত।[১৪৬]

'আমি ইওরোপের অনেক জায়গা ঘুরেছি—জার্মানি এবং ফ্রান্সেও গিয়েছি, তবে ইংলন্ড ও আমেরিকাতেই ছিল আমার প্রধান কার্যক্ষেত্র। প্রথমটা আমি একটু মুশকিলে পড়েছিলাম। তার কারণ, ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা সে-সব দেশে গিয়েছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ভারতের বিরুদ্ধে বলেছেন। আমার কিন্তু চিরকাল ধারণা, ভারতবাসীরাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নীতিপরায়ণ ও ধার্মিক জাত। সেজন্য হিন্দুর সঙ্গে অন্য কোন জাতেরই ঐ বিষয়ে তুলনা করাটা ভুল।

সাধারণের কাছে হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য প্রথম প্রথম অনেকে আমার নিন্দাবাদ আরম্ভ করেছিল এবং আমার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যাকথাও রটিয়েছিল। তারা বলত, আমি জুয়াচোর, আমার এক-আধটি নয়—অনেকগুলি স্ত্রী ও একপাল ছেলে আছে। কিন্তু ঐ-সব ধর্মপ্রচারক সম্বন্ধে যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করলাম, ততই তারা ধর্মের নামে যে কতদূর অধর্ম করতে পারে, সে-বিষয়ে আমার চোখ খুলে গেল।

ইংলন্ডে ঐরকম মিশনারির উৎপাত কিছুমাত্র ছিল না। ওদের কেউই সেখানে আমার সঙ্গে লড়াই করতে আসে নি। আমেরিকায় কেউ কেউ আমার নামে গোপনে নিন্দা করতে গিয়েছিল, কিন্তু লোকে তাদের কথা শুনতে চায়নি ; কারণ আমি তখন লোকের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠেছি। যখন আবার ইংলন্ডে আসলাম, তখন ভেবেছিলাম, জনৈক মিশনারি সেখানেও আমার বিরুদ্ধে লাগবে, কিন্তু 'ট্রুথ' পত্রিকা তাকে চুপ করিয়ে দিল।

ইংলন্ডের সমাজবন্ধন ভারতের জাতিবিভাগ থেকেও কঠোর। ইংলিশ চার্চের সদস্যেরা সকলেই ভদ্রবংশ জাত—মিশনারিদের অধিকাংশই কিন্তু তা নয়। চার্চের সদস্যেরা আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। আমার বোধ হয়, প্রায় ত্রিশ জন ইংলিশ চার্চের প্রচারক ধর্মবিষয়ক নানা বিষয়ে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু দেখেছি, ইংলন্ডের প্রচারক বা পুরোহিতেরা ঐ-সব বিষয়ে আমার সঙ্গে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও কখন গোপনে আমার নিন্দাবাদ করেননি। এতে আমার আনন্দ ও বিস্ময় উভয়ই হয়েছিল। এটাই জাতিবিভাগ ও বংশপরম্পরাগত শিক্ষার গুণ।

'আমেরিকার অনেক লোকে—ইংলন্ড অপেক্ষা অনেক বেশী লোকে—আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। নিম্নজাতীয় মিশনারিগণের নিন্দা সেখানে আমার কাজের সহায়তাই করেছিল। আমেরিকা পৌঁছুবার সময় আমার

কাছে টাকাকড়ি বিশেষ ছিল না। ভারতের লোকে যাবার ভাড়াটা মাত্র দিয়েছিল। অতি অল্প দিনে তা খরচ হয়ে যায়, সেজন্য এখানে যেমন সেখানেও তেমন সাধারণের উপর নির্ভর করেই আমাকে থাকতে হয়েছিল। মার্কিনেরা বড়ই অতিথিবৎসল।

আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ লোক খ্রীষ্টান। অবশিষ্টের কোন ধর্ম নেই, অর্থাৎ তারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নয় ; কিন্তু তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ধার্মিক লোক দেখতে পাওয়া যায়। তবে বোধ হয়, ইংলণ্ডে আমার যেটুকু কাজ হয়েছে, তা পাকা হয়েছে। যদি আমি কাল মরে যাই এবং কাজ চালাবার জন্য সেখানে কোন সন্ন্যাসী পাঠাতে না পারি, তা হলেও ইংলণ্ডের কাজ চলবে।

ইংরেজ খুব ভাল লোক। ছোটবেলা থেকেই তাকে ভাব চেপে রাখতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরেজের মস্তিষ্ক একটু মোটা, ফরাসী বা মার্কিনের মতো চট করে সে কোন জিনিস ধরতে পারে না, কিন্তু ভারী দৃঢ়কর্মী। মার্কিন জাতের বয়স এখনও এমন হয়নি যে তারা ত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝবে। ইংলণ্ড শত শত যুগ ধরে বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য ভোগ করেছে—সেজন্য সেখানে অনেকেই এখন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত।

প্রথমবার ইংলণ্ডে গিয়ে যখন আমি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করি, তখন আমার ক্লাসে বিশ-ত্রিশ জন মাত্র ছাত্র আসত। সেখান থেকে আমার আমেরিকা চলে যাওয়ার পরেও ক্লাস চলতে থাকে। পরে আবার যখন আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে ফিরে গেলাম, তখন আমি ইচ্ছা করলেই এক হাজার শ্রোতা পেতাম। আমেরিকায় তার থেকে বেশি শ্রোতা পেতাম, কারণ আমি আমেরিকায় তিন বৎসর ও ইংলণ্ডে মাত্র এক বৎসর কাটিয়েছিলাম। ইংলণ্ডে একজন ও আমেরিকায় একজন সন্ন্যাসী রেখে এসেছি। অন্যান্য দেশেও প্রচারকার্যের জন্য সন্ন্যাসী পাঠাবার ইচ্ছা আছে।[১৪৭]

লণ্ডন, ৭ই জুন, ১৮৯৬

আমার আদর্শকে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এই : মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সবকাজে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ ক'রে দিতে হবে।

কুসংস্কারের শৃঙ্খলে এই সংসার আবদ্ধ। যে উৎপীড়িত—সে নর বা নারীই হোক—তাকে আমি করুণা করি ; আর যে উৎপীড়নকারী, সে আমার আরও বেশী করুণার পাত্র।

একটা ধারণা আমার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সকল

দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা। জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য ; যুগ যুগ ধ'রে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও বরেণ্য, তাঁদের চিরদিন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।

জগতের ধর্মগুলো এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত হয়েছে। এখন একান্ত যা প্রয়োজন তা হল চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মতো শক্তিশালী ক'রে তুলবে।

আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি আছে? এর চেয়ে মহত্তর কোন্ কাজ আছে? এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গেই আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি সব এসে পড়বে। আমি আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না। কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে নিজের কার্য সাধন করে। আমি শুধু বলি —ওঠ, জাগো।[১৪৮]

লন্ডন, ৭ই জুলাই, ১৮৯৬

এখানকার কাজ আশ্চর্যভাবে এগিয়ে চলেছে। ভারত থেকে একজন সন্ন্যাসী এখানে এসেছিলেন। তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়েছি এবং ভারত থেকে আর একজনকে পাঠাতে বলেছি। এখানকার মরসুম শেষ হয়েছে ; সুতরাং ক্লাস ও রবিবারের বক্তৃতাগুলি আগামী ১৬ই থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। আর সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ে শান্তি ও বিশ্রামের জন্য ১৯শে আমি যাচ্ছি— মাসখানেকের জন্য। আবার শরৎকালে লন্ডনে ফিরে কাজ আরম্ভ করা যাবে। এখানে কাজ খুবই আশাজনক হয়েছে। এখানে আগ্রহ জাগিয়ে—আমি ভারতে থেকে যা করতে পারতাম, তার চেয়ে বেশি ভারতের জন্যই করছি।

আমি তিনজন ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ে যাচ্ছি। পরে শীতের শেষে কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুকে নিয়ে ভারতে যাবার আশা করি। তাঁরাও আমাদের মঠে থাকতে যাচ্ছেন, মঠ হবার পরিকল্পনা চলছে মাত্র। হিমালয়ের কোথাও সেটা বাস্তবে রূপ নেবার চেষ্টা করছে।[১৪৯]

লন্ডন, ৬ই জুলাই, ১৮৯৬

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যতই ত্রুটি থাকুক, এটি যে চারদিকে ভাব ছড়াবার

সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র, তাতে আর সন্দেহ নেই। আমার সংকল্প—এই যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে আমার ভাবরাশি প্রচার ক'রব—তা হলেই সেগুলো সমগ্র জগতে ছড়িয়ে যাবে। অবশ্য সব বড় বড় কাজই খুব আস্তে আস্তে হয়ে থাকে। বিশেষ করে আমাদের হিন্দুদের—বিজিত জাতি ব'লে কাজের বাধাবিঘ্নও অনেক। কিন্তু এও বলি, যেহেতু আমরা বিজিত, সেইহেতু আমাদের ভাব চারদিকে ছড়াতে বাধ্য। দেখা যায়, আধ্যাত্মিক আদর্শ চিরকালই বিজিত পদদলিত জাতির মধ্য থেকে উঠে এসেছে। দেখ না, ইহুদীরা তাদের আদর্শে রোম সাম্রাজ্যকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল।

জেনে সুখী হবে যে, আমিও দিন দিন সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি। মনে হয়, প্রবল-প্রতাপশালী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও যে ভগবান রয়েছেন, আমি তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি। আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে শয়তান ব'লে যদি কেউ থাকে, তাকে পর্যন্ত ভালবাসতে পারব।

বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গোঁড়া বা একঘেয়ে ছিলাম যে, কারও প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারতাম না—আমার ভাবের বিরুদ্ধ হ'লে কারও সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারতাম না। কলকাতার যে ফুটপাথে থিয়েটার, সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে চলতাম না পর্যন্ত। এখন এই তেত্রিশ বৎসর বয়সে বেশ্যাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়িতে বাস করতে পারি—তাদের তিরস্কার করবার কথা একবার মনেও উঠবে না!

আমি কি ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছি? না, আমার হৃদয় ক্রমে উদার হয়ে অনন্ত প্রেম অথবা সাক্ষাৎ ভগবানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে? লোকে বলে শুনতে পাই, যে ব্যক্তি চারদিকে মন্দ ও অমঙ্গল দেখতে পায় না, সে ভাল কাজ করতে পারে না —এক রকম অদৃষ্টবাদী হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়! আমি তো তা দেখছি না ; বরং আমার কর্মশক্তি প্রবলভাবে বেড়ে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে কাজের সফলতাও খুব হচ্ছে। কখন কখন আমার এক ধরনের ভাবাবেশ হয়—মনে হয়, জগতের সবাইকে—সব জিনিসকে আশীর্বাদ করি, সব জিনিসকে ভালবাসি, আলিঙ্গন করি। তখন দেখি—যাকে মন্দ বলে, সেটা একটা ভ্রান্তিমাত্র! প্রিয় ফ্রান্সিস্, এখন আমি সেই রকম ভাবের ঘোরে রয়েছি, আর তুমি ও মিসেস লেগেট আমায় কত ভালবাস ও আমার প্রতি তোমাদের কত দয়া, তাই ভেবে সত্যসত্যই আনন্দাশ্রু বিসর্জন করছি। আমি যেদিন জন্মগ্রহণ করেছি, সেই দিনটিকে ধন্যবাদ! আমি এখানে এসে কত দয়া, কত ভালবাসা

পেয়েছি! আর যে অনন্ত প্রেমস্বরূপ থেকে আমার আবির্ভাব, তিনি আমার ভাল মন্দ ('মন্দ' কথাটিতে ভয় পেও না) প্রত্যেক কাজটি লক্ষ্য ক'রে আসছেন। কারণ আমি তাঁর হাতের একটা যন্ত্র বই আর কি—কোন্ কালেই বা তা ছাড়া আর কি ছিলাম? তাঁর সেবার জন্য আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করেছি, আমার প্রিয়জনদের ত্যাগ করেছি, সব সুখের আশা ছেড়েছি, জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছি। তিনি আমার সদালীলাময় আদরের ধন, আমি তাঁর খেলার সাথী। এই জগতের কাণ্ডকারখানার কোনখানে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—সব তাঁর খেলা, সব তাঁর খেয়াল। কোন্ কারণে তিনি আবার যুক্তির দ্বারা চালিত হবেন? লীলাময় তিনি—এই জগৎ-নাট্যের সব অংশেই তিনি এই সব হাসিকান্নার অভিনয় করেছেন। জো যেমন বলে— ভারি মজা, ভারি মজা!

এ তো বড় মজার জগৎ! আর সকলের চেয়ে মজার লোক তিনি—সেই অনন্ত প্রেমাস্পদ প্রভু! সব জগৎটা খুব মজা নয় কি? আমাদের পরস্পরে ভ্রাতৃভাবই বলো আর খেলার সাথীর ভাবই বলো, এ যেন জগতের ক্রীড়াক্ষেত্রে একদল স্কুলের ছেলেকে খেলতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সকলে চেঁচামেচি ক'রে খেলা করছে! তাই নয় কি? কাকে সুখ্যাতি ক'রব, কাকে নিন্দা ক'রব? এ যে সবই তাঁর খেলা।

লোকে জগতের ব্যাখ্যা চায়, কিন্তু তাঁকে ব্যাখ্যা করবে কেমন ক'রে? তাঁর তো মাথা-মুণ্ডু কিছু নেই—বিচারের কোন ধার ধারেন না। ছোটখাটো মাথা ও বুদ্ধি দিয়ে তিনি আমাদের বোকা সাজিয়েছেন ; কিন্তু এবার আর আমায় ঠকাতে পারছেন না, আমি এবার খুব হুঁশিয়ার ও সজাগ আছি।

আমি এতদিনে দু-একটা বিষয় শিখেছি। শিখেছি—ভাব, প্রেম, প্রেমাস্পদ সব যুক্তিবিচার বিদ্যা-বুদ্ধি ও বাক্যাড়ম্বরের বাইরে, ও-সব থেকে অনেক দূরে। 'সাকি', পেয়ালা পূর্ণ কর—আমরা প্রেমমদিরা পান ক'রে পাগল হয়ে যাই।[১৫০]

স্যাস্ গ্রান্ড, সুইজারল্যান্ড, ২৫শে জুলাই, ১৮৯৬

আমি জগৎটাকে একেবারে ভুলে যেতে চাই, অন্ততঃ আসছে দু-মাসের জন্য ; একটু কঠোর সাধনা করতে চাই। ওই আমার বিশ্রাম। ...পাহাড় এবং বরফ দেখলে আমার মনে এক অপূর্ব শান্তির ভাব আসে। এখানে আমার যেমন সুনিদ্রা হচ্ছে, এমন অনেক দিন হয়নি।[১৫১]

ভ্যালে, সুইজারল্যান্ড, ৫ই আগস্ট, ১৮৯৬

আমি অল্পস্বল্প পড়াশুনা করেছি উপোস করেছি অনেক এবং সাধনা

করেছি তার চেয়েও বেশী। বনে বনে বেড়িয়ে বেড়ানোটা অতি আরামপ্রদ। আমাদের বাসস্থানটি তিনটি বিরাট তুষার-প্রবাহের নীচে, প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

ভাল কথা, সুইজারল্যান্ডের হ্রদে আর্যদের আদি বাসভূমি সম্বন্ধে আমার মনে যাও একটু সন্দেহের ভাব ছিল, তা একেবারে চলে গেছে ; তাতারদের মাথা থেকে লম্বা টিকিটা সরিয়ে দিলে যা দাঁড়ায়, সুইজারল্যান্ডের অধিবাসীরা হচ্ছে তাই।[১৫২]

স্যাস ফি, আগস্ট, ১৮৯৬

গতকাল আমি 'মণ্টি রোজা'র তুষারপ্রবাহের ধারে গিয়েছিলাম এবং সেই চিরতুষারের প্রায় মাঝখান থেকে কয়েকটি শক্ত পাপড়িবিশিষ্ট ফুল তুলে এনেছিলাম।[১৫৩]

স্যাস ফি, ৫ই আগস্ট, ১৮৯৬

চিরতুষারের চূড়াগুলো দিয়ে চতুর্দিক ঘেরা। বসে আছি একটা বনভূমির ঘাসের ওপরে, আমার সমস্ত চিন্তা প্রিয়জনদের কাছে যেতে চাইছে—কাজেই আমি লিখছি।

আমি সুইজারল্যান্ডে আছি—ক্রমাগত ভ্রাম্যমাণ—বহু প্রয়োজনীয় বিশ্রাম পাচ্ছি। ছোটখাট হিমালয় এটি ; মন এখানে উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, পার্থিব সমস্ত চিন্তা আর সম্পর্করা মন থেকে দূরে সরে যায়। নিবিড়ভাবে এই অভিজ্ঞতা আমি উপভোগ করছি। অনুভব করছি বেশ উঁচু স্তরে উঠে যাচ্ছি। আমি লিখতে পারি না, কিন্তু আমি প্রার্থনা করি তোমরাও এই অনুভূতি চিরদিনের পাও—যখন তোমার পদদ্বয় এই বস্তুনির্ভর পৃথিবী ছুঁয়ে থাকতে চাইবে না—যখন আত্মা আধ্যাত্মিকতার মহাসমুদ্রে ভাসমান থাকবে।[১৫৪]

স্যাস ফি, ৮ই আগস্ট, ১৮৯৬

প্রিয় গুডউইন, আমি এখন বিশ্রাম ভোগ করছি। বিভিন্ন চিঠিতে কৃপানন্দের সম্বন্ধে অনেক কথা পড়েছি। আমি তার জন্য দুঃখিত...তার ভাবে তাকে চলতে দাও।

আমাকে ব্যথা দেওয়ার কথা বলছ?—তা দেবদানবের সাধ্যাতীত! সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকো।...

এখন আমি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঠিক সামনেই বিরাট তুষারপ্রবাহগুলি দেখি আর অনুভব করি, যেন হিমালয়ে

আছি। এখন আমি সম্পূর্ণ শান্ত। আমার স্নায়ুগুলিতে স্বাভাবিক শক্তি ফিরে এসেছে, এবং তুমি যে-জাতীয় বিরক্তিকর ব্যাপারের কথা লিখেছ, তা আমাকে একেবারেই স্পর্শ করে না। এই ছেলেখেলা আমাকে উদ্বিগ্ন করবে কি ক'রে? সারা দুনিয়াটা একটা নিছক ছেলেখেলা—প্রচার, শিক্ষাদান, সবই। 'যিনি দ্বেষও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, তাঁকেই সন্ন্যাসী বলে জেনো।'—গীতা। আর রোগ শোক ও মৃত্যুর চির লীলাভূমি এই সংসাররূপ পঙ্কিল ডোবাতে কি কাম্য বস্তু থাকতে পারে?—'যিনি সকল বাসনা ত্যাগ করেছেন, তিনিই সুখী।'

সেই শান্তি, সেই অনন্ত অনাবিল শান্তির কিছু আভাস আমি এখন এই মনোরম স্থানে পাচ্ছি। 'একবার যদি মানুষ জানে যে, আত্মাই আছেন—আর কিছু নেই, তা হ'লে কিসের কামনায় কার জন্য এই শরীরের দুঃখতাপে দগ্ধ হ'তে হবে?'—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

আমার মনে হয়, লোকে যাকে 'কাজ' বলে, তার থেকে যতটুকু অভিজ্ঞতা হবার, তা আমার হয়ে গেছে। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এখন আমি বেরিয়ে যাবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছি। 'সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে ক্বচিৎ কেউ সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে; যত্নপরায়ণ বহুর মধ্যেও ক্বচিৎ কেউ আমাকে যথার্থভাবে জানে।'—গীতা। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি বলবান, তারা সাধকের মনকে জোর ক'রে নাবিয়ে দেয়।[১৫৫]

স্যান ফি, ১২ই আগস্ট, ১৮৯৬

প্রিয় স্টার্ডি, আমি এখনো পর্যন্ত কিছু লিখিওনি, পড়িওনি। আমি নিছক বিশ্রাম নিচ্ছি। মঠ থেকে চিঠি পেয়ে জানলাম যে, অপর স্বামীটি (স্বামী অভেদানন্দ) রওনা হবার জন্য তৈরি। আমি নিশ্চিত যে তোমরা যে ধরনের লোক চাও, তিনি সেই ধরনের উপযুক্ত হবেন। আমাদের মধ্যে যে কয়জনের সংস্কৃতে বিশেষ অধিকার আছে, তিনি তাঁদের অন্যতম ...এবং শুনলাম তাঁর ইংরিজী বেশ দুরস্ত হয়েছে। আমেরিকা থেকে সারদানন্দ সম্বন্ধে অনেকগুলি খবরের কাগজের কাটিং পেয়েছি—তা থেকে জানলাম যে, তিনি সেখানে খুব সাফল্য অর্জন করেছেন। মানুষের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ফুটিয়ে তোলার পক্ষে আমেরিকা একটি সুন্দর শিক্ষাক্ষেত্র।[১৫৬]

লুসার্ণ, সুইজারল্যাণ্ড, ২৩শে আগস্ট, ১৮৯৬

সারদানন্দ ও গুডউইন আমেরিকায় প্রচারকার্য সুন্দররূপে করছে, শুনে খুশি হলাম। আমার নিজের কথা এই যে, আমি কোন কাজের প্রতিদানে

ঐ ৫০০ পাউন্ডের ওপর কোন দাবি রাখি না। আমার বোধ হয়, আমি যথেষ্ট খেটেছি। এখন আমি অবসর নেবো। আমি ভারত থেকে আর একজন লোক চেয়ে পাঠিয়েছি ; তিনি আগামী মাসে আমার সঙ্গে যোগ দেবেন। আমি কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছি, এখন অন্যে এটাকে চালাক।

দেখতেই তো পাচ্ছেন, কাজটা চালিয়ে দেবার জন্য কিছুদিন টাকাকড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস যে, আমার যতটুকু করবার তা শেষ হয়েছে ; এখন আমার আর বেদান্ত বা জগতের অন্য কোন দর্শন, এমন কি ঐ কাজটার ওপরও কোন টান নেই। আমি চলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি—পৃথিবীর এই নরককুণ্ডে আর ফিরে আসছি না। এমন কি, এই কাজের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তার দিকটার ওপরও আমার অরুচি হয়ে আসছে। মা শীঘ্রই আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিন!

এই সব কাজ করা, উপকার করা ইত্যাদি শুধু চিত্তশুদ্ধির সাধনমাত্র। তা আমার যথেষ্ট হয়ে গেছে। জগৎ চিরকাল—অনন্তকাল ধরে জগৎই থাকবে। আমরা যে যেমন, সে তেমন ভাবেই জগৎটা দেখি। কে কাজ করে, আর কার কাজ? জগৎ ব'লে কিছু নেই—এ সবই তো স্বয়ং ভগবান। ভুল করে আমরা একে জগৎ বলি। এখানে আমি নেই, তুমি নেই, আপনি নেই—আছেন শুধু তিনি, আছেন প্রভু—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

সুতরাং এখন থেকে টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমি আর কিছুই জানি না। আমি জগতের কোন সন্ন্যাসীর প্রভু বা চালক নই, যে কাজটা তাঁদের ভাল লাগে সেইটা তাঁরা করেন এবং আমি যদি তাঁদের কোন সাহায্য করতে পারি—বস্, এইমাত্র তাঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। আমি পারিবারিক বন্ধনরূপ লোহার শেকল ভেঙেছি—আর ধর্মসঙ্ঘের সোনার শেকল পরতে চাই না। আমি মুক্ত, সর্বদাই মুক্ত থাকব। আমার ইচ্ছা সকলেই মুক্ত হয়ে যাক—বাতাসের মতো মুক্ত। আর আমার কথা—আমি তো অবসর গ্রহণ করেছি বললেই চলে। জগৎ-রঙ্গমঞ্চে আমার যেটুকু অভিনয় করবার ছিল, তা আমি শেষ করেছি।[১৫৭]

স্কাফাসেন, সুইজারল্যান্ড ২৬শে আগস্ট, ১৮৯৬

এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আল্পস্ পর্বতে খুব চড়াই করছি আর তুষারপ্রবাহ পার হচ্ছি। এখন যাচ্ছি জার্মানিতে। অধ্যাপক ডয়সন কিয়েলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন।[১৫৮]

লেক লুসার্ন, সুইজারল্যান্ড ২৩শে অগস্ট, ১৮৯৬

রামকৃষ্ণানন্দ, অদ্য রামদুলালবাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন যে, দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে অনেক বেশ্যা যাইয়া থাকে এবং সেজন্য অনেক ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে। পুনশ্চ--তাঁহার মতে পুরুষদিগের একদিন এবং মেয়েদের আর একদিন হওয়া উচিত। তদ্বিষয়ে আমার বিচার এই :

১। বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় তো কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।

২। মেয়েপুরুষ-ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি নরক-দ্বাররূপ বহুভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে ঐরূপ ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থ আর নরকে ভেদ কি?

৩। আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার। বৎসরের মধ্যে একদিন অন্ততঃ সহস্র সহস্র নরনারী পাপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া হরিনাম করে ও শোনে, ইহাই পরম মঙ্গল।

৪। যদি তীর্থস্থলেও লোকের পাপবৃত্তি একদিনের জন্য সঙ্কুচিত না হয়, তাহা তোমাদের দোষ, তাহাদের নহে। এমন মহা ধর্মস্রোত তোল যে, যে জীব তাহার নিকট আসবে, সেই ভেসে যাক।

৫। যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ জাতি, ঐ গরিব, ঐ ছোটলোক ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বলো) সংখ্যা যতই কম হয়, ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর-ডাকাত সকলে আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার। 'It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kindgom of God.' এ সকল নিষ্ঠুর রাক্ষসীভাব মনেও স্থান দিবে না।

৬। তবে কতকটা সামাজিক সাবধানতা চাই—সেটা কি প্রকারে করিতে হইবে? জনকতক লোক (বৃদ্ধ হইলেই ভাল হয়) ছড়িদারের কার্য ঐ দিনের জন্য লইবেন। তাঁহারা মহোৎসবস্থলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবেন, কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে কদাচার বা কুকথা ইত্যাদিতে নিযুক্ত দেখিলে তাহাদিগকে উদ্যান হইতে

তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিবেন। কিন্তু যতক্ষণ তাহারা ভাল মানুষের মতো ব্যবহার করে ততক্ষণ তারা ভক্ত ও পূজ্য—মেয়েই হউক আর পুরুষ হউক, গৃহস্থ হউক বা অসতী হউক।[১৫৮ক]

কিয়েল, জার্মানি, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

...অবশেষে অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। ...অধ্যাপকের সঙ্গে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে ও বেদান্ত আলোচনা ক'রে কালকের দিনটা খুব চমৎকার কাটানো গেছে।

আমার মতে তিনি যেন একজন 'যুধ্যমান অদ্বৈতবাদী'। অপর কিছুর সঙ্গে তিনি আপস করতে নারাজ। 'ঈশ্বর' শব্দে তিনি আঁতকে ওঠেন। ক্ষমতায় কুলালে তিনি এ সব কিছুই রাখতেন না।[১৫৯]

আমি আমেরিকা ও ইওরোপে অনেক সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপক দেখেছি, তাঁদের অনেকেই বৈদান্তিক ভাবের প্রতি অতিশয় সহানুভূতিসম্পন্ন। আমি তাঁদের মনীষা ও নিঃস্বার্থ কাজে উৎসর্গীকৃত জীবন দেখে মুগ্ধ। কিন্তু পল ডয়সেন (অথবা ইনি নিজে যেমন সংস্কৃতে 'দেবসেনা' বলে অভিহিত হতে পছন্দ করেন) এবং বৃদ্ধ ম্যাক্সমুলারকে আমার ভারতের ও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর সর্বাপেক্ষা অকৃত্রিম বন্ধু বলে ধারণা হয়েছে।[১৬০]

ইংলন্ডে প্রত্যাবর্তন, উইম্বলডন লন্ডন, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

সুইজরল্যান্ডে দু-মাস পাহাড় চড়ে, পর্যটন ক'রে ও হিমবাহ দেখে আজ লন্ডনে এসে পৌঁছেছি। এতে আমার একটা উপকার হয়েছে—কয়েক পাউন্ড অপ্রয়োজনীয় মেদ বাষ্পীয় অবস্থায় ফিরে গিয়েছে। তাতেও কোন নিরাপত্তা নেই, কারণ এ জন্মের স্থূল দেহটির খেয়াল হয়েছে মনকে অতিক্রম ক'রে অনন্তে প্রসারিত হবে। এ ভাবে চলতে থাকলে আমাকে অচিরেই সমস্ত ব্যক্তিগত সত্তা হারাতে হবে—এই রক্তমাংসের দেহে থেকেও, অন্ততঃ বাইরের জগৎটার কাছে।

আমি এখানে বন্ধুদের মধ্যে এসে জুটেছি, কয়েক সপ্তাহ এখানে কাজ করব এবং তারপর শীতকালে ভারতবর্ষে ফিরে যাব।[১৬১]

লন্ডন, ৭ই অক্টোবর, ১৮৯৬

আবার সেই লন্ডনে! ক্লাসগুলিও যথারীতি শুরু হয়েছে। আমার ভাগ্যে আছে নিত্যবর্ধমান কর্মের তাণ্ডব!

কোন নির্জন পর্বতগুহায় গিয়ে চুপ ক'রে থাকাই হচ্ছে আমার স্বাভাবিক

প্রবণতা ; কিন্তু পিছন থেকে নিয়তি আমাকে সামনে ঠেলে দিচ্ছে, আর আমি এগিয়ে চলেছি! অদৃষ্টের গতি কে রোধ করবে?

বর্তমানে ফল বাদাম প্রভৃতিই আমার প্রধান আহার, এবং ওতেই যেন আমি ভাল আছি।

আমার চর্বি অনেকটা কমে গেছে ; তবে যেদিন বক্তৃতা থাকে ; সেদিন কিছু পেটভরা খাবার খেতে হয়।

এখন আমরা একটি 'হল্'—বেশ বড় 'হল্' পেয়েছি ; তাতে দু-শ বা তার চেয়েও বেশী লোকের স্থান হতে পারে। একটা বড় কোণ আছে, সেখানে লাইব্রেরি বসানো যাবে। সম্প্রতি আমাকে সাহায্য করবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে আর একজন এসেছেন (স্বামী অভেদানন্দ)।

আজ পথে মাদাম স্টারলিং—এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি আর আজকাল আমার বক্তৃতায় আসেন না। সেটা তাঁর পক্ষে ভালই ; অত্যধিক দার্শনিক চিন্তা ভাল নয়।

সেই মহিলাটি—যিনি আমার প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে এমন সময় এসে উপস্থিত হতেন, যখন কিছুই শুনতে পেতেন না, কিন্তু বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে আমাকে ধ'রে রাখতেন এবং বকাতেন যে, খিদের জ্বালায় আমার পাকস্থলীতে ওয়াটার্লুর মহাসমর উপস্থিত হ'ত? তিনি এসেছিলেন, অপর সকলেও আসছে এবং আরও আসবে। এ সবই আনন্দের বিষয়।[১৬২]

লন্ডন, ২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৬

নূতন স্বামী (স্বামী অভেদানন্দ) তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিলেন। বেশ হয়েছিল এবং আমার ভাল লেগেছিল। তাঁর ভেতর ভাল বক্তা হবার শক্তি রয়েছে—এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

গুডউইন সন্ন্যাসী হবে। সে অবশ্য আমার সঙ্গেই ভ্রমণ করবে। আমাদের সব বই-এর জন্য আমরা তার কাছে ঋণী। আমার বক্তৃতাগুলি সে সাঙ্কেতিক প্রণালীতে লিখে রেখেছিল, তাই থেকে বই হয়েছে।[১৬৩]

লন্ডন, ২০শে নভেম্বর, ১৮৯৬

আগামী ১৬ই ডিসেম্বর আমি ইংলন্ড থেকে যাত্রা করছি। ইটালিতে কয়েকটি জায়গা দেখে নেপল্সে জার্মান লয়েড লাইনের 'S. S. Prinz Regent Leopold' নামক জাহাজ ধ'রব। আগামী ১৪ই জানুয়ারি স্টীমার

কলম্বো গিয়ে লাগবার কথা। সিংহলে অল্পস্বল্প দেখবার ইচ্ছা আছে ; তারপর মান্দ্রাজ যাব।

আমার সঙ্গে যাচ্ছেন আমার ইংরেজ বন্ধু সেভিয়ার দম্পতি ও গুডউইন। মিঃ সেভিয়ার ও তাঁর সহধর্মিণী হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে আশ্রম স্থাপন করতে যাচ্ছেন। ঐ হবে আমার হিমালয়ের কেন্দ্র, আর পাশ্চাত্য শিষ্যেরা সেখানে এসে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিরূপে বাস করতে পারে। গুডউইন একজন অবিবাহিত যুবক, সে আমার সঙ্গে থাকবে ও ভ্রমণ করবে। সে ঠিক সন্ন্যাসীরই মতো।

কলকাতা আর মান্দ্রাজে দুটি কেন্দ্র খুলব—এই হচ্ছে আমার বর্তমান পরিকল্পনা ; সেখানে যুবক প্রচারক তৈরি করা হবে। কলকাতায় কেন্দ্র খোলবার মতো অর্থ আমার হাতে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানেই আজীবন কাজ ক'রে গেছেন, সুতরাং কলকাতার ওপরেই আমাকে প্রথম নজর দিতে হবে। মান্দ্রাজে কেন্দ্র খোলবার মত টাকাপয়সা, আশা করি, ভারতবর্ষ থেকে উঠবে।

এই তিনটি কেন্দ্র নিয়েই এখন আমরা কাজ আরম্ভ ক'রব ; পরে বোম্বাই ও এলাহাবাদে যাব। প্রভুর ইচ্ছা হ'লে এ-সকল কেন্দ্র হ'তে আমরা যে শুধু ভারতকেই আক্রমণ ক'রব তা নয়, আমরা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দলে দলে প্রচারক পাঠাব। এ কথা ভুলে যেও না যে, সব দেশের লোকের প্রতিই আমার টান রয়েছে, শুধু ভারতের প্রতি নয়।[১৬৪]

লন্ডন, ২৮শে নভেম্বর, ১৮৯৬

লন্ডনের প্রচারকার্যে খুব সাফল্য হয়েছে। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এবং মিঃ গুডউইন কাজ করবার জন্য আমার সঙ্গে ভারতে যাচ্ছেন এবং এই কাজে তাঁরা নিজেদেরই অর্থ ব্যয় করবেন।

সম্প্রতি আমি কলকাতায় একটি এবং হিমালয়ে আর একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছি। প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চতার একটা গোটা পাহাড়ের উপর এই কেন্দ্র স্থাপিত হবে। পাহাড়টি গ্রীষ্মকালে বেশ শীতল থাকবে, আবার শীতকালে খুব ঠাণ্ডা হবে। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার ঐখানে থাকবেন।[১৬৫]

লন্ডন, ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৯৬

এই মুহূর্তে ব্যাপার খুব জমজমাট ; ৩৯নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে বড় হলঘরটি লোকে পরিপূর্ণ এবং এখন আরও লোক আসছে।

হ্যাঁ, আমার সেই পুরাতন প্রিয় দেশটি এবার আমায় ডাকছে ; যেতেই হবে আমাকে। সুতরাং এই এপ্রিলে রাশিয়ায় যাবার সমস্ত পরিকল্পনা বিদায়।

ভারতে কাজকর্ম কিছুটা গোছগাছ ক'রে দিয়েই আমি চিরসুন্দর আমেরিকা ইংলন্ড প্রভৃতি স্থানে আবার ফিরে আসছি।

গুডউইনের আসাটা একটা সৌভাগ্য, কারণ তার ফলে এখানকার বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে।

আগামী সপ্তাহে তিনটি বক্তৃতা, বস্, তারপর এই মরসুমের মতো আমার লন্ডনের কাজ শেষ। অবশ্য এখানকার সকলেই ভাবছেন, এই সাফল্যের মুখে কাজটা ছেড়ে যাওয়া বোকামি, কিন্তু আমার প্রিয় প্রভু বলছেন, 'প্রাচীন ভারতের অভিমুখে যাত্রা কর'। আমি তাঁর আদেশ পালন ক'রব।[১৬৬]

ড্যাম্পিয়ার, "প্রিন্স-রিজেন্ট লিওপোল্ড" [জাহাজে] ৩রা জানুয়ারি, ১৮৯৭

নেপল্‌স্ থেকে চারদিন ভয়াবহ সমুদ্রযাত্রার পর পোর্ট সৈয়দের কাছে এসে পড়েছি। জাহাজ খুব দুলছে—অতএব এই অবস্থায় লেখা আমার এই হিজিবিজি তুমি ক্ষমা করো।

সুয়েজ থেকে এশিয়া। আবার এশিয়ায়! আমি কি এশিয়াবাসী, ইওরোপীয় না আমেরিকান? আমার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ অনুভব করছি।

কয়েকদিন পরেই কলম্বোতে নামছি, এবং সিংহলে কিছু একটা ক'রব ভাবছি। প্রায় ৮০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বাংলা থেকে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এখানেই ছিল প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র আর অনুরাধাপুর ছিল সেকালের লণ্ডন।

পাশ্চাত্যের সব কিছুর মধ্যে আমি রোমকেই সবচেয়ে বেশী উপভোগ করেছি, পম্পিয়াই দেখার পর তথাকথিত 'আধুনিক সভ্যতা'র ওপর আমি একেবারে শ্রদ্ধা হারিয়েছি। বাষ্প আর বিদ্যুৎ বাদ দিলে ওদের আর সব কিছু ছিল—এবং আধুনিকদের চেয়ে ওদের চারুকলার ধারণা এবং রূপায়ণের শক্তিও অনন্তগুণে বেশী ছিল।[১৬৭]

ইংলণ্ড থেকে আসবার সময় পথে বড় এক মজার স্বপ্ন দেখেছিলুম। ভূমধ্যসাগরে আসতে আসতে জাহাজে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে দেখি—বুড়ো থুড়থুড়ো ঋষিভাবাপন্ন একজন লোক আমাকে বলছে, 'তোমরা এস, আমাদের পুনরুদ্ধার কর, আমরা হচ্ছি সেই পুরাতন থেরাপুত্ত সম্প্রদায়—ভারতের ঋষিদের ভাব নিয়েই যা গঠিত হয়েছে। খ্রীষ্টানেরা আমাদের প্রচারিত ভাব ও সত্যসমূহই যীশুর দ্বারা প্রচারিত ব'লে প্রকাশ করেছে। নতুবা যীশু নামে

বাস্তবিক কোন ব্যক্তি ছিল না। এ-বিষয়ক নানা প্রমাণাদি এই স্থান খনন করলে পাওয়া যাবে।'

আমি বললাম, 'কোথায় খনন করলে ঐ-সকল প্রমাণ-চিহ্নাদি পাওয়া যেত পারে?' বৃদ্ধ বলল, 'এই দেখ না এখানে।' একথা ব'লে টার্কির নিকটবর্তী একটি স্থান দেখিয়ে দিল। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙবামাত্র তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন জাহাজ কোন্ জায়গায় উপস্থিত হয়েছে?' ক্যাপ্টেন ব'লল, 'ওই সামনে টার্কি এবং ক্রীটদ্বীপ দেখা যাচ্ছে।' [১৬৮]

আলমোড়া, ৯ই জুলাই ১৮৯৭

আমেরিকান খবরের কাগজে এক অদ্ভুত খবর পেলাম যে আমাকে এখানে জাতিচ্যুত করা হয়েছে! আমার আবার জাত হারাবার ভয়—আমি যে সন্ন্যাসী!

আমায় কিন্তু ক্রমাগত খাটতে হয়েছে, যাতে মার্কিনরা অপেক্ষাকৃত উদার ও ধর্মপ্রাণ হয়—তার জন্য আমেরিকায় আমার সমস্ত শক্তি ক্ষয় ক'রে এখন আমি মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত।

ইংলণ্ডে আমি কেবল ছ-মাস কাজ করেছি, একবার ছাড়া কখনও কোন নিন্দারও রব ওঠেনি—সে নিন্দা-রটনাও একজন মার্কিন মহিলার কাজ, এই কথা জানতে পেরে তা আমার ইংরেজ বন্ধুরা বিশেষ আশ্বস্ত হলেন। আক্রমণ তো কোন রকম হয়ইনি বরং অনেক ভাল ভাল ইংলিশ চার্চের পাদরী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন—আর না চেয়েই আমি আমার কাজের জন্য যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।

...প্রিয় মেরী, আমার জন্যে কিছু ভয় করোনা। মার্কিনরা বড়—কেবল ইউরোপের হোটেলওয়ালা ও কোটিপতিদের চোখে এবং নিজেদের কাছে। পৃথিবীতে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে—ইয়াঙ্কিরা চটলেও আমার জায়গার অভাব হবে না।[১৬৯]

গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমিই ভালই দেখেছিলুম (আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা)। আমেরিকানরা সকলেই বড় অতিথিবৎসল সৎস্বভাব ও সহৃদয় ব্যক্তি।[১৭০]

সব সমাজ-সংস্কারকরা, অন্ততঃ তাঁদের নেতারা, এখন তাঁদের সাম্যবাদ প্রভৃতির একটা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি বার করবার চেষ্টা করছে—আর সেই ভিত্তি কেবল বেদান্তেই পাওয়া যায়। অনেক নেতা, যাঁরা আমার বক্তৃতা

শুনতে আসতেন, আমাকে বলেছেন, 'নূতন ভাবে সমাজ গঠন করতে হ'লে বেদান্তকে ভিত্তিস্বরূপ নেওয়া দরকার।' আমেরিকা ও ইংলণ্ডে অনেক সময় আমার পোশাকের দরুন জনসাধারণ খেপে অনেকবার আমাকে মারবার যোগাড়ই করেছিল। কিন্তু ভারতে কারও অসাধারণ পোশাকের দরুন জনসাধারণ খেপে গিয়ে মারতে উঠেছে, এ-রকম কথা তো কখন শুনিনি। [১৭১]

যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিলে মার্কিন-ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোকবামাত্রই বললে, 'ও চেহারা এখানে চলবে না'! মনে করলুম বুঝি পাগড়ি-মাথায় গেরুয়া রঙের বিচিত্র ধোকড়া-মস্ত গায়, অপরূপ দেখে নাপিতের পছন্দ হ'ল না ; ত একটা ইংরেজি কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি—ভাগ্যিস্ একটি ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা ; সে বুঝিয়ে দিলে যে বরং ধোকড়া আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বলবে না, কিন্তু ইউরোপী পোশাক পরলেই মুশকিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও দু-একটা নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধরলুম।

খিদেয় পেট জ্বলে যায়, খাবার দোকানে গেলুম, 'অমুক জিনিসটা দাও', বললে, 'নেই'। 'ঐ যে রয়েছে'। 'ওহে বাপু সাদা ভাষা হচ্ছে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই।' 'কেন হে বাপু?' 'তোমার সঙ্গে যে খাবে, তার জাত যাবে।' তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মত ভাল লাগতে লাগলো। [১৭২]

[স্বামীজি বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে...]

প্রশ্ন: স্বামীজী, আমেরিকায় কতগুলি শিষ্য করেছ?

—অনেক।

প্রশ্ন: ২।৪ হাজার?

—ঢের বেশী।

প্রশ্ন: কি সব মন্ত্রশিষ্য?

—হাঁ।

প্রশ্ন: কি মন্ত্র দিলে, স্বামীজী? সব প্রণবযুক্ত মন্ত্র দিয়েছ?

—সকলকে প্রণবযুক্ত দিয়েছি।

প্রশ্ন: লোকে বলে শূদ্রের প্রণবে অধিকার নেই, তায় তারা ম্লেচ্ছ ; তাদের প্রণব কেমন ক'রে দিলে? প্রণব তো ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কারও উচ্চারণে অধিকার নেই?

—যাদের মন্ত্র দিয়েছি তারা যে ব্রাহ্মণ নয়, তা তুই কেমন ক'রে জানলি?

প্রশ্ন: ভারত ছাড়া সব তো যবন ও ম্লেচ্ছের দেশ ; তাদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ কোথায়?

—আমি যাকে যাকে মন্ত্র দিয়েছি, তারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ও-কথা ঠিক, ব্রাহ্মণ নইলে প্রণবের অধিকারী হয় না। ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তার মানে নেই, হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে। বাগবাজারে—চক্রবর্তীর ভাইপো যে মেথর হয়েছে, মাথায় ক'রে গুয়ের হাঁড়ি নে যায়! সেও তো বামুনের ছেলে।

প্রশ্ন: ভাই, তুমি আমেরিকা-ইংলণ্ডে ব্রাহ্মণ কোথায় পেলে?

—ব্রাহ্মণজাতি আর ব্রাহ্মণের গুণ—দুটো আলাদা জিনিস। এখানে সব—জাতিতে ব্রাহ্মণ, সেখানে গুণে। যেমন সত্ত্ব রজঃ তমঃ—তিনটে গুণ আছে জানিস, তেমনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ব'লে গণ্য হবার গুণও আছে। এই তোদের দেশে ক্ষত্রিয়-গুণটা যেমন প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, তেমনি ব্রাহ্মণত্ব-গুণটাও প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। ওদেশে এখন সব ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্ব পাচ্ছে।

প্রশ্ন: তার মানে সেখানকার সাত্ত্বিকভাবের লোকদের তুমি ব্রাহ্মণ ব'লছ?

—তাই বটে ; সত্ত্ব রজঃ তমঃ যেমন সকলের মধ্যেই আছে—কোনটা কাহার মধ্যে কম, কোনটা কাহারও মধ্যে বেশী ; তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হবার কয়টা গুণও সকলের মধ্যে আছে। তবে এই কয়টা গুণ সময়ে সময়ে কম বেশী হয়। আর সময়ে সময়ে এক একটা প্রকাশ হয়। একটা লোক যখন চাকরি করে, তখন সে শূদ্রত্ব পায়। যখন দু-পয়সা রোজগারের ফিকিরে থাকে, তখন বৈশ্য ; আর যখন মারামারি ইত্যাদি করে, তখন তার ভিতর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পায়। আর যখন সে ভগবানের চিন্তায় বা ভগবৎ-প্রসঙ্গে থাকে, তখন সে ব্রাহ্মণ।[১৭৩]

অন্তরে আমি একজন অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী, এইসব যুক্তি-তর্ক-বিচার আমার কাছে বাহ্যব্যাপার মাত্র। আমি সব সময়ই বাইরের চিহ্ন এবং বস্তুর সন্ধানেই ঘুরছি। তাই আমার দীক্ষাদানের পরিণতি কি হবে, তা আমি ভাবি না। যদি কেউ একান্তভাবেই আমার কাছে সন্ন্যাস নিতে চায়, তাহলে আমি মনে করি এরপর তার কি হবে, তা ভাবার দায়িত্ব আমার নয়। কখন-কখন আমার ভুলের জন্য বহু খেসারত দিতে হয়েছে। কিন্তু এর একটা সুবিধা এবং ভাল দিকও আছে। এই সব ঘটনা প্রবাহের মধ্যে এই ভাবটিই আমাকে সন্ন্যাসী করে রেখেছে।[১৭৪]

আমি আমার কর্মীদের কাজে আদৌ নাক গলাই না ; কারণ যার কাজ করার সামর্থ্য আছে, তার নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্বও আছে। চাপ দিলে সে বেঁকে বসে। এই কারণেই আমি কর্মীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চাই।[১৭৫]

হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন, মালটা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেল বারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি। বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান করতাম। পান করলেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত! সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত। আর শুনতাম—সেই 'হর্ হর্ হর্' দেখতাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন—'হর্ হর্ হর্!!'[১৭৬]

আমার জীবনের দিকে [তাকালে] আমার আপসোস হয় না। দেশে দেশে কিছু না কিছু লোকশিক্ষা দিয়ে বেড়িয়েছি, তার বদলে রুটির টুকরা খেয়েছি। যদি দেখতুম যে, কোনও কাজ করিনি, কেবল লোক ঠকিয়ে খেয়েছি, তা হলে আজ গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।[১৭৭]

ওদেশের লোকেরা ভাবে, যে যত ধর্মপরায়ণ হবে, সে বাইরের চালচলনে তত গম্ভীর হবে, মুখে অন্য কথাটি থাকবে না। একদিকে আমার মুখে উদার ধর্মকথা শুনে ওদেশের ধর্মযাজকেরা যেমন অবাক হয়ে যেত, বক্তৃতার শেষে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করতে দেখে আবার তেমনি অবাক হয়ে যেত। মুখের উপর কখন কখন বলেও ফেলত, 'স্বামীজী, আপনি একজন ধর্মযাজক ; সাধারণ লোকের মতো এরকম হাসি-তামাসা করা আপনার উচিত নয়। ও-রকম চপলতা আপনার শোভা পায় না।' তার উত্তরে আমি বলতাম, আমরা আনন্দের সন্তান, বিরস মুখে থাকব কেন? ঐ কথা শুনে তারা মর্ম গ্রহণ করতে পারত কি না সন্দেহ।[১৭৮]

বহুবার আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে : 'তুমি এত হাসো কেন, ও এত ঠাট্টা বিদ্রূপ কর কেন?' মাঝে মধ্যে আমি খুব গম্ভীর হই—যখন আমার খুব

পেট-বেদনা হয়! ভগবান্ আনন্দময়। তিনি সকল অস্তিত্বের পিছনে। তিনিই সকল বস্তুর মঙ্গলময় সত্তাস্বরূপ। তোমরা তাঁর অবতার। এটাই তো গৌরবময়। যত তুমি তাঁর কাছাকাছি হবে, তোমার শোক বা দুঃখজনক অবস্থা তত কম আসবে। তাঁর কাছ থেকে যতদূরে যাবে ততই দুঃখে তোমার মুখ শুকনো হবে। তাঁকে আমরা যত বেশি জানতে পারি, ক্লেশ তত অন্তর্হিত হয়। যদি ঈশ্বরময় হয়েও কেউ শোকগ্রস্ত হয়, তবে সেরকম পরিস্থিতির প্রয়োজন কি? এইরকম ঈশ্বরেরই বা প্রয়োজন কি? তাঁকে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছুঁড়ে ফেলে দাও! আমরা তাঁকে চাই না।[১৭৯]

ভারতে ফিরে এলাম

আমার বিশ্বাস, নেতা গড়ে ওঠেন না। তাঁরা জন্মান। নেতার প্রকৃত লক্ষণ হ'ল, তিনি ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিদের সাধারণ সহানুভূতিসূত্রে একত্র করতে পারেন। এ কাজ স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে আপনা আপনি সম্পন্ন হয়, চেষ্টা করে করা যায় না।[১]

পাশ্চাত্যদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছু পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'স্বামীজী, চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবের মুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণের পর মাতৃভূমি আপনার কেমন লাগবে?' আমি বললাম, পাশ্চাত্যভূমিতে আসবার আগে ভারতকে আমি ভালবাসতাম, এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র, ভারতের বায়ু আমার কাছে পবিত্রতামাখা, আমার কাছে এখন তীর্থস্বরূপ। এ ছাড়া আর কোন উত্তর আমার মনে আসল না।[২]

সমাজকে, জগৎকে ইলেকট্রিফাই করতে হবে। ক্যারাকটার গঠিত হয়ে থাক, তারপর আমি আসছি, বুঝলে?

মহা আধ্যাত্মিক বন্যা আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, তাঁর কৃপায় মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

ওঠ, ওঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, অনওয়ার্ড, অনওয়ার্ড। মেয়েমদ্দে আচণ্ডাল

সব পবিত্র তাঁর কাছে—এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, নামের সময় নেই, যশের সময় নেই, মুক্তির সময় নেই, ভক্তির সময় নেই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান চরিত্রে, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এইটাই কাজ আর কিছু নেই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখছ না? এ কি ছেলেখেলা, এবি জ্যাঠামি, এ কি চ্যাংড়ামি—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—হরে হরে। তিনি পিছনে আছেন।

আমি আর লিখতে পারছি না—অনওয়ার্ড, এই কথাটা খালি বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার 'স্পিরিট' (শক্তি) আসবে, বিশ্বাস কর। অনওয়ার্ড, হরে হরে। চিঠি ছাপার ক'রো না। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। অনওয়ার্ড, হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁশিয়ার—তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য তাঁর সেবা নয়—তাঁর সন্তানদের গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরি হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।[৩]

আকাশের তারা চর্বণ করব, ত্রিভুবন বলপূর্বক উৎপাটন করব, আমাদের কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণদাস।[৪]

নানা বাধাবিপদের মধ্যে আমার ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, সংসার ত্যাগ করবে ; তবেই তো ভিত্তি শক্ত হবে।

আমরণ কাজ ক'রে যান—আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি। আমার শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি আপনাদের সঙ্গে কাজ করবে। জীবন তো আসে যায়—ধন, মান, ইন্দ্রিয়ভোগ সবই দুদিনের জন্য। ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মতো মরার চেয়ে কর্মক্ষেত্রে সত্য প্রচার ক'রে মরা ভাল—ঢের ভাল। চলুন—এগিয়ে চলুন। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।[৫]

তুমি শুনেছ যে যীশু বলেছিলেন, "আমার বাণীই আমার আত্মা, তারাই আমার জীবন।" সেইরকম আমার বাণীই হ'চ্ছে আমার আত্মা আর জীবন। তার জ্বলতে জ্বলতে তোমার মস্তিষ্কে পথ করে নেবে, তুমি কিছুতেই দূরে থাকতে পারবে না।[৬]

পাম্বান, ২৬শে জানুয়ারি, ১৮৯৭

রামনাদের রাজা আমার প্রতি যে-ভালবাসা দেখিয়েছেন, সেজন্য আমি যে তাঁর কাছে কত কৃতজ্ঞ, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমাকে দিয়ে যদি কিছু সৎকার্য হয়ে থাকে, তবে তার প্রত্যেকটির জন্য ভারত এই মহানুভব রাজার কাছে ঋণী ; কারণ আমাকে চিকাগোয় পাঠাবার কল্পনা তাঁর মনেই প্রথম উদিত হয়। তিনিই আমার মাথায় ঐ ভাব প্রবেশ করিয়ে দেন এবং তা কাজে পরিণত করবার জন্য আমাকে বার বার উৎসাহিত করেন।[৭]

রামনাদ, ৩০শে জানুয়ারি, ১৮৯৭

চারদিকের পরিস্থিতি অতি আশ্চর্যরূপে আমার অনুকূল হয়ে আসছে। সিংহলে—কলম্বোয় আমি জাহাজ থেকে নেমেছি এবং এখন ভারতবর্ষের প্রায় শেষ দক্ষিণপ্রান্তে রামনাদে রাজার অতিথিরূপে রয়েছি। কলম্বো থেকে রামনাদ পর্যন্ত আমার পরিক্রমা যেন একটা বিরাট শোভাযাত্রা—হাজার হাজার লোকের ভিড়, আলোকসজ্জা, অভিনন্দন ইত্যাদি!

ভারত-ভূমির যেখানে আমি প্রথম পদার্পণ করি, সেখানে ৪০ ফুট উঁচু স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হচ্ছে। রামনাদের রাজা সুন্দর কারুকার্যখচিত খাঁটি সোনায় তৈরি বৃহৎ পেটিকায় তাঁর অভিনন্দনপত্র আমাকে দিয়েছেন ; তাতে আমাকে হিজ মোস্ট হোলিনেস ('মহাপবিত্রস্বরূপ') ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে। মান্দ্রাজ ও কলকাতা আমার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে, যেন সমগ্র দেশটা আমাকে অভিনন্দিত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সুতরাং তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমি আমার সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে উঠেছি। তবু আমার মন চিকাগোর সেই নিস্তব্ধ, প্রশান্ত দিনগুলির দিকেই ছুটছে—কি বিশ্রাম-শান্তি-ও প্রেমপূর্ণ দিনগুলো![৮]

অনুরাধাপুরে প্রচার করছি একবার, হিঁদুদের মধ্যে—বৌদ্ধদের [মধ্যে] নয়—তাও খোলা মাঠে, কারুর জমিতে নয়। ইতিমধ্যে দুনিয়ার বৌদ্ধ 'ভিক্ষু' গৃহস্থ, মেয়ে-মদ্দ, ঢাক ঢোল কাঁসি নিয়ে এসে সে যে বিটকেল আওয়াজ আরম্ভ করলে, তা আর কি ব'লব। লেকচার তো 'অলমিতি' হ'ল ; রক্তারক্তি হয় আর কি! অনেক ক'রে হিঁদুদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে, আমরা নয়, একটু অহিংসা করি এস—তখন শান্ত হয়।[৯]

মাদ্রাজ, ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭

আমার মনে হয়, অনেক দোষ-ত্রুটিসত্ত্বেও কিছুটা সাহস আমার আছে। ...আজকের বিষয় আরম্ভ করবার আগে আমি সাহস করে তোমাদের সকলের কাছে গোটাকতক কথা বলতে চাই। কিছুদিন যাবৎ কতকগুলো ব্যাপার এমন দাঁড়াচ্ছে যে, ঐ-গুলোর জন্য আমার কাজে বিশেষ বিঘ্ন ঘটছে। এমন কি, সম্ভব হলে আমাকে একেবারে পিষে ফেলে আমার অস্তিত্ব উড়িয়ে দেবার চেষ্টাও চলছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই-সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে—আর এইরকম চেষ্টা চিরদিনই বিফল হয়ে থাকে।

গত তিন বৎসর যাবৎ দেখছি, জনকয়েক ব্যক্তির আমার ও আমার কাজ সম্বন্ধে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে। যতদিন বিদেশে ছিলাম ততদিন চুপ করেছিলাম, এমন কি একটা কথাও বলি নি। কিন্তু এখন মাতৃভূমিতে দাঁড়িয়ে এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বুঝিয়ে বলা আবশ্যক বোধ হচ্ছে। এ কথাগুলির কি ফল হবে, তা আমি গ্রাহ্য করি না; এ কথাগুলি বলার দরুন তোমাদের হৃদয়ে কি ভাবের উদ্রেক হবে, তাও গ্রাহ্য করি না। লোকের মতামত আমি কমই গ্রাহ্য করে থাকি। চার বছর আগে দণ্ড-কমণ্ডলু-হাতে সন্ন্যাসিবেশে তোমাদের শহরে প্রবেশ করেছিলাম—আমি সেই সন্ন্যাসীই আছি। সারা দুনিয়া আমার সামনে এখনও পড়ে আছে।...

...এবার আমি মাদ্রাজের সংস্কার-সভাগুলির কথা বলব।...

আমার আশঙ্কা হয়, কতকগুলি সংস্কার-সমিতি আমাকে ভয় দেখিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁদের পক্ষে এরকম চেষ্টা বড় আশ্চর্যের বিষয় বলতে হবে। যে মানুষ চোদ্দ বছর ধরে অনাহারে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, যে-লোকের এতদিন ধরে কাল কি খাবে, কোথায় শোবে তাহার কিছু ঠিক ছিল না, তাকে এত সহজে ভয় দেখানো যায় না। যে-লোক [বিদেশে] একরকম বিনা পরিচ্ছদে হিমাঙ্কের ৩০ ডিগ্রি নীচে বাস করতে সাহসী হয়েছিল, যার সেখানেও কাল কি খাবে কিছুই ঠিক ছিল না, তাকে ভারতে এত সহজে ভয় দেখানো যেতে পারে না। আমি তাঁদের প্রথমেই বলতে চাই যে, তাঁরা জেনে রাখুন—আমার নিজের একটু দৃঢ়তা আছে, একটু অভিজ্ঞতাও আছে, আর জগতের কাছে আমার কিছু বার্তা বহন করবার আছে ; আমি নির্ভয়ে ও ভবিষ্যতের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না করে সেই বার্তা বহন করব।

সংস্কারকগণকে আমি বলতে চাই, আমি তাঁদের চেয়ে বড় একজন

সংস্কারক। তাঁরা একটু আধটু সংস্কার করতে চান—আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কারের প্রণালীতে। তাঁদের প্রণালী—ভেঙে-চুরে ফেলা, আমার পদ্ধতি—সংগঠন। আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ঈশ্বরের জায়গায় বসিয়ে সমাজকে 'তোমায় এদিকে চলতে হবে, ওদিকে নয়' বলে আদেশ করতে সাহস পাই না। আমি কেবল সেই কাঠবিড়ালের মতো হতে চাই, যে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় যথাসাধ্য এক অঞ্জলি বালুকা বহন করেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিল—এই আমার ভাব।...

এই কারণে আমি মদ্রাজের সংস্কারকগণকে এইটুকু বলতে চাই যে, তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে। তাঁদের বিশাল হৃদয়, তাঁদের স্বদেশপ্রীতি, দরিদ্র ও অত্যাচরিত জনগণের প্রতি তাঁদের ভালবাসার জন্য আমি তাঁদের ভালবাসি। কিন্তু ভাই যেমন ভাইকে ভালবাসে অথচ তার দোষ দেখিয়ে দেয়, এইভাবে আমি তাঁদের বলছি—তাঁদের কার্যপ্রণালী ঠিক নয়। শত শত বৎসর যাবৎ এই প্রণালীতে কাজ করবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। এখন আমাদের অন্য কোন উপায়ে কাজ করবার চেষ্টা চালাতে হবে।...

বৈদেশিক সংস্থাগুলি জোর করে আমাদের যে প্রণালীতে চালিত করবার চেষ্টা করছে, সেই মতো কাজ করার চেষ্টা বৃথা ; ওটা অসম্ভব। ভেঙে-চুরে আমাদের যে অপর জাতির মতো গড়তে পারা অসম্ভব, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি অন্যান্য জাতির সামাজিক প্রথার নিন্দা করছি না। তাঁদের পক্ষে ওটা ভাল হ'লেও আমাদের পক্ষে নয়। তাঁদের পক্ষে যা অমৃত, আমাদের পক্ষে তা বিষবৎ হ'তে পারে। প্রথমে এটিই শিখতে হবে। অন্য ধরনের বিজ্ঞান ঐতিহ্য ও পদ্ধতি অনুযায়ী গঠিত হওয়াতে তাঁদের আধুনিক সমাজবিধি প্রথা একরকম দাঁড়িয়েছে। আমাদের পেছনে আবার অন্য ধরনের ঐতিহ্য এবং হাজার বছরের ধারাবাহিকতা রয়েছে, সুতরাং আমরা স্বভাবতই আমাদের সংস্কার অনুযায়ী বলতে পারি এবং আমাদের সেরকমই করতে হবে।...

তবে আমি কি প্রণালীতে কাজ করব? আমি প্রাচীন মহান আচার্যদের উপদেশ অনুসরণ করতে চাই।...আপনারা অনেকেই জানেন আমেরিকায় ধর্মমহাসভা হয়েছিল বলে আমি সেখানে যাই নি। দেশের জনসাধারণের দুর্দশা দূর করবার জন্য আমার ঘাড়ে একটা ভূত চেপেছিল। আমি অনেক বছর ধরে সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরেছি, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কাজ করবার

কোন সুযোগ পাই নি। সেই জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম। তখন আপনাদের মধ্যে যাঁরা আমাকে জানতেন, তাঁরা অবশ্য এ-কথা জানেন। ধর্মমহাসভা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংস-স্বরূপ জনগণ দিন দিন ডুবছে, তাদের খবর কে নেয়? এই ছিল আমার প্রথম সিঁড়ি।[১০]

মাদ্রাজ, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭

আগামী রবিবার 'মোম্বাসা' জাহাজে আমার রওনা হবার কথা। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় পুনার এবং আরও অনেক জায়গায় নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও গরমে আমার শরীর বেশ খারাপ হয়েছে।[১১]

আলমবাজারের মঠ, কলকাতা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭

লোকে যেমন বলে, 'আমার মরবারও সময় নেই', সমগ্র দেশময় শোভাযাত্রা, বাদ্যভাণ্ড ও সংবর্ধনার রকমারি আয়োজনে আমি এখন মৃতপ্রায়। উৎসব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি পাহাড়ে পালিয়ে যাব।

আমি ক্লান্ত—এতই ক্লান্ত যে, যদি বিশ্রাম না পাই, তবে আর ছ-মাসও বাঁচব কি না সন্দেহ!

বর্তমানে আমাকে দুটি কেন্দ্র খুলতে হবে—একটি কলকাতায়, আর একটি মাদ্রাজে। এদেশে হিংসুক ও নির্দয় প্রকৃতির লোকের সংখ্যা বড় বেশী—তারা আমার সব কাজকে লণ্ডভণ্ড ক'রে নষ্ট করতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

তবে আপনি তো বেশ জানেন, বাধা যত বাড়ে, আমার ভেতরের দৈত্যটাও তত বেশী জেগে ওঠে। এই দুই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আমার মৃত্যু হ'লে আমার জীবনব্রত অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।[১২]

(কলকাতায় জন-অভ্যর্থনার বিষয়ে)

আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, আমায় নিয়ে একটা খুব হৈচৈ হয়। কি জানিস, একটা হৈচৈ না হলে তাঁর (ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের) নামে লোক চেতবে কি করে? এত সম্বর্ধনা কি আমার জন্য করা হলো, না, তাঁর নামেরই জয়জয়কার হলো? তাঁর বিষয় জানবার জন্য লোকের মনে কতটা ইচ্ছা হলো। এইবার একটু একটু করে তাঁকে জানবে তবে না দেশের মঙ্গল হবে। যিনি দেশের মঙ্গলের জন্য এসেছেন, তাঁকে না জানলে লোকের মঙ্গল কি করে হবে? তাঁকে ঠিক ঠিক জানলে তবে মানুষ তৈরি হবে, আর মানুষ তৈরি হলে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাড়ানো কতক্ষণের কথা! আমাকে নিয়ে এই রকম বিরাট

সভা করে হৈচৈ করে তাঁকে প্রথমে মানুক—আমার এই ইচ্ছাই হয়েছিল ; নতুবা আমার নিজের জন্য এত হাঙ্গামার কি দরকার ছিল?[১৩]

দার্জিলিং ২৬শে মার্চ, ১৮৯৭

আমাকে নিয়ে জাতীয় উল্লাস-উদ্দীপনা প্রদর্শন শেষ হয়েছে ; আমাকে সে সব সংক্ষেপে সারতে হয়েছে, যেহেতু স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। পশ্চিমে একটানা খাটুনি ও ভারতে এক মাস প্রচণ্ড পরিশ্রমের পরিণাম বাঙালীর ধাতে—বহুমূত্র রোগ। এ একটি বংশগত শত্রু এবং বড় জোর কয়েক বছরের মধ্যে এই রোগে আমার দেহাবসান পূর্বনির্দিষ্ট। শুধু মাংস খাওয়া, জল একেবারে না খাওয়া এবং সর্বোপরি, মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বিশ্রামই বোধ হয়, জীবনের মেয়াদ বাড়াবার একমাত্র উপায়। মগজটাকে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম আমি দিচ্ছি দার্জিলিংয়ে।[১৪]

দার্জিলিং, ৬ই এপ্রিল,১৮৯৭

আমাকে অভ্যর্থনা করবার ব্যয়নির্বাহের জন্য কলিকাতাবাসীরা টিকিট বিক্রয় করে লেকচার দেওয়ালেন।[১৫]

দার্জিলিং, ২০শে এপ্রিল, ১৮৯৭

আমার রোগ অনেকটা এক্ষণে শান্ত হইয়াছে—একেবারে সারিয়া গেলেও যাইতে পারে—প্রভুর ইচ্ছা।[১৬]

দার্জিলিং, ২৮শে এপ্রিল, ১৮৯৭

এখানে সমস্ত দেশবাসী আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য যেন একপ্রাণ হয়ে সমবেত হয়েছিল। শত সহস্র লোক—যেখানে যাই সেখানেই উৎসাহসূচক আনন্দধ্বনি করছিল, রাজা-রাজড়ারা আমার গাড়ি টানছিলেন, বড় বড় শহরের সদর রাস্তার উপর তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তাতে নানা রকম মঙ্গলবাক্য জ্বল জ্বল করছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই শীঘ্র বইয়ের আকারে বেরুবে এবং তুমিও একখানা পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ইতিপূর্বেই ইংলণ্ডে কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়েছি, আবার এখানে দাক্ষিণাত্যের ভীষণ গরমে অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছি। কাজেই আমাকে ভারতের অন্যান্য জায়গা পরিদর্শন করবার পরিকল্পনা ছেড়ে নিকটতম শৈলনিবাস দার্জিলিং-এ চোঁচা দৌড় দিতে হ'ল। সম্প্রতি আমি অনেকটা ভাল আছি এবং আবার মাসখানেক আলমোড়ায় থাকলেই সম্পূর্ণ সেরে যাব।

সম্প্রতি আমার ইউরোপে যাবার একটা সুবিধা চলে গেল। রাজা অজিত সিং এবং আরও কয়েকজন রাজা আগামী শনিবার ইংলণ্ড যাত্রা করছেন। তাঁরা অবশ্য আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারেরা রাজী ন'ন। তাঁরা চান না আমি এখন কোন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করি, সুতরাং অত্যন্ত ক্ষুণ্ণহৃদয়ে আমাকে এই সুযোগ ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তবে যত শীঘ্র পারি যাবার চেষ্টা ক'রব।

এই দার্জিলিং অতি সুন্দর জায়গা। এখান থেকে মাঝে মাঝে যখন মেঘ সরে যায়, তখন ২৮১৪৬ ফুট উচ্চ মহিমামণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এবং কাছের একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে মাঝে মাঝে ২৯০০২ ফুট উঁচু গৌরীশঙ্করের চকিত দর্শন পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা তিব্বতীরা, নেপালীরা এবং সর্বোপরি সুন্দরী লেপচা মেয়েরা—যেন ছবির মতো।

তুমি চিকাগোর কলস্টন টার্নবুল নামে কাউকে চেনো কি? আমি ভারতবর্ষে পৌছবার আগে কয়েক সপ্তাহ তিনি এখানে ছিলেন। তিনি দেখছি, আমাকে খুব পছন্দ করতেন, আর এর ফলে হিন্দুরা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত পছন্দ ক'রত।

আমার চুল গোছা গোছা পাকতে আরম্ভ করেছে এবং মুখের চামড়া অনেক কুঁচকে গেছে—দেহের এই মাংস কমে যাওয়াতে আমার বয়স যেন আরও কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। এখন আমি দিন দিন ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে যাচ্ছি। তার কারণ আমাকে শুধু মাংস খেয়ে থাকতে হচ্ছে—রুটি নেই, ভাত নেই, আলু নেই, এমন-কি আমার কফিতে একটু চিনিও নেই!!

আমি এখানে বেশ ভাল আছি। কারণ—সমতল-ভূমিতে বাস করা আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে ; সেখানে আমার রাস্তায় পা-টি বাড়াবার জো নেই—অমনি একদল লোক আমায় দেখবে ব'লে ভিড় করবে!! নামযশটা সব সময়েই বড় সুখের নয়। আমি এখন মস্ত দাড়ি রাখছি ; আর তা পেকে সাদা হ'তে আরম্ভ হয়েছে—এতে বেশ গণ্যমান্য দেখায় এবং আমেরিকান কুৎসা-রটনাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে! হে সাদা দাড়ি, তুমি কত জিনিসই না ঢেকে রাখতে পারো! তোমারই জয়জয়কার।[১৭]

বাগবাজার, কলকাতা, ১লা মে, ১৮৯৭

নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হ'তে পারে না।

আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ ক'রে

সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বছরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সংঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা এ কাজে সহায় হোন।...

তুই কি ক'রে জানলি এ-সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ ক'রে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা-পাঠ প্রবর্তনা করতে কখনও উপদেশ দেননি। তিনি সাধনভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব সম্বন্ধে যে-সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি ক'রে জীবকে শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরি ক'রে যেতে আমার জন্ম হয়নি প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাব দিতেই আমাদের জন্ম।[১৮]

কলকাতা, ১লা মে, ১৮৯৭

মনে আজকাল কেবল উঠছে—এটা করি, সেটা করি, তাঁর কথা জগতে ছড়িয়ে দিই, ইত্যাদি। আবার ভাবি—এতে না ভারতে আর একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে পড়ে। তাই অনেক সামলে চলতে হয়। কখনও ভাবি—সম্প্রদায় হোক। আবার ভাবি—না, তিনি কারও ভাব কদাচ নষ্ট করেননি ; সমদর্শিতাই তাঁর ভাব। এই ভেবে মনের ভাব অনেক সময় চেপে চলি।

আমরা নিজের খেয়ালে কাজ ক'রে যাচ্ছি। তবে বিপদে, আপদে, অভাবে, দারিদ্র্যে তিনি দেখা দিয়ে ঠিক পথে চালান, গাইড করেন—ঐটি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু প্রভুর শক্তির কিছুমাত্র ইয়ত্তা করে উঠতে পারলুম না।[১৯]

কলকাতা, মে, ১৮৯৭

মানুষের প্রাণ যখন ভক্তিতে ভরে ওঠে, তখন তার হৃদয় ও স্নায়ুগুলো এত নরম হয় যে, ফুলের ঘা পর্যন্ত সহ্য হয় না। তোমরা কি জান যে আজকাল আমি উপন্যাসের প্রেমকাহিনী পর্যন্ত পড়তে পারি না? ঠাকুরের কথা খানিকক্ষণ বলতে বা ভাবতে গেলেই ভাবোদ্বেল না হয়ে থাকতে পারি না! সেইজন্য কেবলই এই ভক্তিস্রোতটা চেপে যাবার চেষ্টা করি। জ্ঞানের শিকল দিয়ে নিজেকে বাঁধতে চাই, কারণ এখনও মাতৃভূমির প্রতি আমার কর্তব্য শেষ হয়নি। যেই দেখি, উদ্দাম ভক্তিপ্রবাহে প্রাণটা ভেসে যাবার উপক্রম

হয়েছে, অমনি তার মাথায় কঠিন জ্ঞানের অঙ্কুশ দিয়ে আঘাত করতে থাকি। ওঃ, এখনও আমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে! আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাসানুদাস ; তিনি আমার ঘাড়ে যে কাজ চাপিয়ে গেছেন, যতদিন না সে কাজ শেষ হয়, ততদিন আমার বিশ্রাম নেই।[২০]

আলমবাজার মঠ, কলকাতা, ৫ই মে, ১৮৯৭

ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্য একমাস দার্জিলিং-এ ছিলাম। আমি এখন বেশ ভাল হয়ে গেছি। ব্যারাম-ফ্যারাম দার্জিলিং-এ একেবারেই পালিয়েছে। কাল আলমোড়া নামক আর একটি শৈলাবাসে যাচ্ছি, স্বাস্থ্যোন্নতি সম্পূর্ণ করবার জন্য।

আমি আগেই তোমাকে লিখেছি যে, এখানকার অবস্থা বেশ আশাজনক ব'লে বোধ হচ্ছে না – যদিও সমস্ত জাতটা একযোগে আমাকে সম্মান করেছে এবং আমাকে নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে যাবার মতো হয়েছিল! কোন বিষয়ে কার্যকারিতার দিকটা ভারতবর্ষে আদৌ দেখতে পাবে না। কলকাতার কাছাকাছি জমির দাম আবার খুব বেড়ে গেছে। আমার বর্তমান অভিপ্রায় হচ্ছে তিনটি রাজধানীতে তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা। ঐগুলি আমার শিক্ষকদের শিক্ষণকেন্দ্রস্বরূপ হবে—সেখান থেকেই আমি ভাতববর্ষ আক্রমণ করতে চাই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেটাকে নানাবিধ কুরুচিপূর্ণ আধুনিক হিন্দুধর্ম বলা হয়, তা হচ্ছে অচল অবস্থায় পতিত বৌদ্ধধর্ম মাত্র। এটা স্পষ্ট বুঝলে হিন্দুদের পক্ষে তা বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করা সহজ হবে। বৌদ্ধধর্মের যেটি প্রাচীনভাব—যা শ্রীবুদ্ধ নিজে প্রচার ক'রে গেছেন, তার প্রতি এবং শ্রীবুদ্ধের প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা। আর তুমি ভালভাবেই জানো যে, আমরা হিন্দুরা তাঁকে অবতার ব'লে পূজা করি। সিংহলের বৌদ্ধধর্মও তত সুবিধার নয়। সিংহলে ভ্রমণকালে আমার ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে।

আমি এক সময়ে ভাবতাম, আদর্শ বৌদ্ধধর্ম বর্তমানকালেও অনেক উপকার করবে। কিন্তু আমি আমার ঐ মত একেবারে ত্যাগ করেছি এবং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কি কারণে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল...

আমি আমেরিকায় এক মানুষ ছিলাম, এখানে আর এক মানুষ হয়ে গেছি। এখানে সমস্ত (হিন্দু) জাতটা আমাকে যেন তাদের একজন 'অথরিটি' ব'লে মনে করছে ; আর সেখানে ছিলাম একজন অতিনিন্দিত প্রচারক মাত্র। এখানে

রাজারা আমার গাড়ি টানে—আর সেখানে আমাকে একটা ভাল হোটেলে পর্যন্ত ঢুকতে দিত না। সেইজন্যে এখানে যা কিছু ব'লব, তাতে সমস্ত জাতটার—আমার সমস্ত স্বদেশবাসীর—মঙ্গল হওয়া আবশ্যক, তা সেগুলো দুচারজনের যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। কপটতাকে কখনই নয়, যা কিছু খাঁটি ও সৎ, সেগুলিকে গ্রহণ করতে হবে, ভালবাসতে হবে, সেগুলির প্রতি উদারভাব পোষণ করতে হবে। ভারতবর্ষ ইতিপূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে এবং বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের জন্য এখানকার কাজ একটু সংগঠিত ক'রে নিয়েছি। [২১]

আলমবাজার মঠ, কলকাতা, ৫ই মে, ১৮৯৭

জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন মন একেবারে নৈরাশ্যে ডুবে যায়—বিশেষতঃ কোন আদর্শকে রূপ দেবার জন্য জীবনব্যাপী উদ্যমের পর যখন সাফল্যের ক্ষীণ আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হয়, ঠিক সেই সময়ে যদি আসে প্রচণ্ড সর্বনাশা আঘাত। দৈহিক অসুস্থতা আমি গ্রাহ্য করি না ; দুঃখ হয় এইজন্য যে, আমার আদর্শগুলি কাজে পরিণত হবার কিছুমাত্র সুযোগ পেল না। আর তুমি তো জানই, অন্তরায় হচ্ছে অর্থাভাব।

হিন্দুরা শোভাযাত্রা এবং আরও কত কিছু করছে ; কিন্তু তারা টাকা দিতে পারে না। দুনিয়াতে আর্থিক সাহায্য বলতে আমি পেয়েছি শুধু ইংলণ্ডে মিস ম্যুলার এবং মিস্টার সেভিয়ারের কাছে।...ওখানে থাকতে আমার ধারণা ছিল যে, এক হাজার পাউণ্ড পেলেই অন্ততঃ কলকাতার প্রধান কেন্দ্রটি স্থাপন করা যাবে ; কিন্তু আমি এই অনুমান করেছিলাম দশ বারো বছর আগেকার কলকাতার অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু ইতিমধ্যে জিনিসের দাম তিন চার গুণ বেড়ে গেছে।

যাই হোক, কাজ আরম্ভ করা গেছে। একটি পুরানো জরাজীর্ণ বাড়ী ছ-সাত শিলিং ভাড়ায় নেওয়া হয়েছে এবং তাতেই প্রায় ২৪ জন যুবক শিক্ষালাভ করছে। স্বাস্থ্যলাভের জন্য আমাকে এক মাস দার্জিলিং-এ থাকতে হয়েছিল। তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমি আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি। আর তুমি বিশ্বাস করবে কি যে, কোন ঔষধ ব্যবহার না করেও শুধু ইচ্ছাশক্তি দিয়েই এরকম ফল পেয়েছি!! আগামী কাল আবার আর একটি শৈলনিবাসে যাচ্ছি, কারণ নীচে এখন বেজায় গরম।...

শুনতে পেলাম, লণ্ডনের কাজ মোটেই ভাল চলছে না। প্রধানতঃ এই কারণেই আমি এখন লণ্ডনে যেতে চাই না, যদিও জুবিলী (মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের সুবর্ণ-জয়ন্তী—পঞ্চাশ বর্ষ-পূর্তি) উৎসব উপলক্ষে

ইংলণ্ডযাত্রী আমাদের কয়েকজন রাজা আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ওখানে গেলেই বেদান্ত বিষয়ে লোকের আগ্রহ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বেজায় খাটতে হ'ত, তার ফলে শারীরিক কষ্ট আরও বেশী হ'ত।

যাই হোক অদূর ভবিষ্যতে মাসখানেকের জন্য (ওদেশে) যাচ্ছি। শুধু যদি এখানকার কাজের গোড়াপত্তন দৃঢ় হয়ে যেত, তবে আমি কত আনন্দে ও স্বাধীনভাবেই না ঘুরে বেড়াতে পারতাম!...

মিঃ ও মিসেস হ্যামন্ড দুখানি অতি সুন্দর ও প্রীতিপূর্ণ চিঠি লিখেছেন। অধিকন্তু মিস্টার হ্যামণ্ড 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় একটি চমৎকার কবিতা পাঠিয়েছেন--যদিও আমি মোটেই ঐ প্রশস্তির যোগ্য নই।[২২]

আলমোড়া, ২০শে মে, ১৮৯৭

টাকাকড়ি এখনও যেন জলে ভাসছে...যোগাড় নিশ্চিত হবে। হল, বিল্ডিং, জমি ও ফণ্ড—সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু না আঁচালে তো বিশ্বাস নেই—এবং দু-তিন মাস আমি তো আর গরম দেশে যাচ্ছি না। তারপর একবার 'ট্যুর' ক'রে টাকা যোগাড় ক'রব নিশ্চিত।

যোগেনও আছে ভাল। আমি—আলমোড়ায় অত্যন্ত গরম হওয়ায় ২০ মাইল দূরে এক সুন্দর বাগানে আছি; অপেক্ষকৃত ঠাণ্ডা, তবুও গরম। কলকাতার গরম থেকে এখানকার গরম কম নয়।...

জ্বরভাবটা চলে গেছে। আরও ঠাণ্ডা জায়গায় যাবার চেষ্টা করছি। গরমি বা পথশ্রম হলেই দেখছি লিভারে গোল দাঁড়ায়। এখানে হাওয়া এত শুকনো যে, দিনরাত নাক জ্বালা করে, জিব যেন কাঠের চোকলা।[২৩]

আলমোড়া, ২৯শে মে, ১৮৯৭

প্রিয় শশী ডাক্তার, আমি সকাল-বিকালে ঘোড়ায় চড়ে যথেষ্ট ব্যায়াম শুরু করেছি এবং তার ফলে অনেক ভাল বোধ করছি।

ব্যায়াম শুরু করে প্রথম সপ্তাহে শরীর এতই ভাল বোধ করেছিলাম যে, ছেলেবেলা যখন কুস্তি করতাম, তারপর তেমনটি কখনও বোধ করিনি। আমার তখন সত্যই বোধ হ'ত যে, শরীর থাকা একটা আনন্দের বিষয়। তখন শরীরের প্রতিটি ক্রিয়াতে আমি শক্তির পরিচয় পেতাম এবং প্রত্যেক পেশীর নড়াচড়াই আনন্দ দিত। ...এখানে আমার মনে হয় যেন আমার কোন ব্যাধিই নেই। কেবল একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। জীবনে কখনও শোবার সঙ্গে সঙ্গে

আমি ঘুমুতে পারিনি ; অন্তত দু'ঘণ্টা এপাশ-ওপাশ করতে হয়। কেবলমাত্র মান্দ্রাজ থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত (দার্জিলিঙের প্রথম মাস পর্যন্ত) বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসত। সেই সুলভ নিদ্রার ভাব এখন একেবারে চলে গেছে।...

ডাক্তার, আমি যখন আজকাল তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের সম্মুখে ধ্যানে বসে উপনিষদ্ থেকে আবৃত্তি করি—'ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ, প্রাপ্তস্য হি যোগাগ্নিময়ং শরীরম্।'—যে যোগাগ্নিময় দেহ লাভ করেছে, তার রোগ জরা মৃত্যু কিছুই নেই। সেই সময় যদি তুমি আমায় একবার দেখতে! [২৪]

আলমোড়া, ২রা জুন, ১৮৯৭

আমার শরীর খুবই খারাপ ; আজকাল কিছুটা উন্নতি বোধ করছি—আশা করি খুব শীঘ্রই সেরে উঠব।

লণ্ডনের কাজকর্ম কি রকম চলছে? আমার ভয় হচ্ছে, বুঝি বা সেটা একেবারে ভেঙেচুরে যায়।

আলমোড়ার কোন ব্যবসায়ীর একটি চমৎকার বাগানে আছি—এর চারদিকে বহু ক্রোশ পর্যন্ত পর্বত ও অরণ্য। পরশু রাত্রে একটি চিতাবাঘ এই বাগানে এসে পাল থেকে একটি ছাগল নিয়ে গেছে। চাকরদের প্রাণপণ চেঁচামেচি ও পাহারাদার তিব্বতী কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ শব্দ মিলে ভয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা হবার মতো অবস্থা ঘটেছিল। আমি এখানে আসা অবধি রোজ রাত্রে এই কুকুরগুলোকে বেশ কিছুটা দূরে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হচ্ছে, যাতে তাদের চেঁচামেচিতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। চিতাবাঘটি তাই সুযোগ বুঝে একটি বেশ ভাল আহার্য জুটিয়ে নিল, সম্ভবত অনেক সপ্তাহ এ-রকম জোটেনি। এতে তার প্রভূত কল্যাণ হোক!

আমার সামনে সারি সারি দিগন্তবিস্তৃত বরফের চূড়াগুলোর উপর অপরাহ্ণের রক্তিমাভা উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। সেগুলো এখান থেকে সোজাসুজি কুড়ি মাইল,—আর আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথে চল্লিশ মাইল।

নিদ্রা আহার ব্যায়াম এবং ব্যায়াম আহার নিদ্রা—আরও কয়েক মাস শুধু এই ক'রে আমি কাটাতে যাচ্ছি। মিঃ গুডউইন আমার সঙ্গে আছেন। ভারতীয় পোশাকে তুমি যদি তাকে দেখতে! খুব শীঘ্রই মস্তক মুণ্ডন করিয়ে তাকে একটি পূর্ণ-বিকশিত সন্ন্যাসীতে পরিণত করতে যাচ্ছি। [২৫]

আলমোড়া, ২০শে জুন, ১৮৯৭

অনেক কাল লণ্ডনে কাজের কোন খবর পাইনি। তুমি আমায় কিছু জানাতে পারো কি? ভারতে আমাকে নিয়ে যতই মাতামাতি করুক না কেন, আমি এখানে কোন সাহায্যের আশা রাখি না। এরা এত দরিদ্র!

তবে আমি নিজেও যেভাবে শিক্ষালাভ করেছিলাম, ঠিক সেইভাবেই গাছের তলা আশ্রয় ক'রে এবং কোন রকমে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা ক'রে কাজ শুরু ক'রে দিয়েছি। কাজের ধারাও অনেকটা বদলেছে। আমার কয়েকটি ছেলেকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে পাঠিয়েছি। এতে যাদুমন্ত্রের মতো কাজ হয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আর আমার চিরকালের ধারণাও ছিল তাই যে, হৃদয়—শুধু হৃদয়েরই ভেতর দিয়ে সকলের মর্মস্থল স্পর্শ করতে পারা যায়।

জনকয়েক ছেলে ইতিমধ্যেই শিক্ষা পাচ্ছে ; কিন্তু কাজের জন্য যে জীর্ণ আশ্রয়টি (আলমবাজার মঠ) আমরা পেয়েছিলাম, তা গত ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে ; তবে বাঁচোয়া এইটুকু যে, এটা ভাড়া-বাড়ি ছিল। যাক, ভাববার কিছু নেই ; বিপত্তি ও নিরাশ্রয়তার মধ্যেও কাজ চালিয়ে যেতে হবে।...এ পর্যন্ত আমাদের সম্বল শুধু মুণ্ডিত মস্তক, ছেঁড়া কাপড় ও অনিশ্চিত আহার। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আবশ্যক এবং পরিবর্তন হবেও নিশ্চয় ; কারণ আমরা মনে-প্রাণে এই কাজে লেগেছি।...

এক হিসাবে এটা সত্য যে, এদেশের লোকের ত্যাগ করবার কিছু নেই বললেই চলে, তবু ত্যাগ আমাদের মজ্জাগত। যে-সব ছেলেরা শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের একজন একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিল। ভারতে এটি একটি উচ্চ পদ। সে খড়কুটোর মতো ঐ পদ ত্যাগ করেছে।[২৬]

আলমোড়া, ২০শে জুন, ১৮৯৭

আমি সেরেসুরে গেছি। শরীরে জোরও খুব ; তৃষ্ণা নেই, আর রাত্রে উঠিয়া প্রস্রাব বন্ধ।...কোমরে বেদনা-ফেদনা নাই, লিভারও ভাল। শশীর ঔষধে কি ফল হল বুঝতে পারলাম না—কাজেই বন্ধ। আম খুব খাওয়া যাচ্ছে। ঘোড়াচড়াটা বেজায় রপ্ত হচ্ছে—কুড়ি-ত্রিশ মাইল এক নাগাড়ে দৌড়ে গিয়েও কিছু মাত্র বেদনা বা exhaustion (অবসাদ) হয় না। দুধ একদম বন্ধ করেছি—পেট মোটার ভয়ে। কাল আলমোড়ায় এসেছি। আর বাগানে যাব না।

এখন থেকে মিস্ মুলারের অতিথি হিসেবে সারাদিনে তিনবার খাব

ইংরেজদের মত।[২৭]

আলমোড়া, ৪ঠা জুলাই, ১৮৯৭

আমি যদিও এখনো হিমালয়ে আছি এবং আরও অন্ততঃ এক মাস থাকব, আমি আসার আগেই কলকাতায় কাজ শুরু ক'রে দিয়ে এসেছি এবং প্রতি সপ্তাহে কাজের বিবরণ পাচ্ছি।

এখন আমি দুর্ভিক্ষের কাজে ব্যস্ত আছি এবং জনকয়েক যুবককে ভাবী কাজের জন্য গড়ে তোলা ছাড়া শিক্ষাকার্যে অধিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারিনি। অন্নসংস্থানের ব্যাপারেই আমার সমস্ত শক্তি ও সম্বল নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। যদিও এ পর্যন্ত অতি সামান্য ভাবেই কাজ করতে পেরেছি, তবু অপ্রত্যাশিত ফল দেখা যাচ্ছে। বুদ্ধের পরে এই আবার প্রথম দেখা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণসন্তানেরা অন্ত্যজ বিসূচিকা-রোগীর শয্যাপার্শ্বে সেবায় নিরত।

ভারতে বক্তৃতা ও অধ্যাপনায় বেশী কাজ হবে না। প্রয়োজন সক্রিয় ধর্মের। আর মুসলমানদের কথায় বলতে গেলে 'খোদার মর্জি হ'লে'—আমি তাই দেখাতে বদ্ধপরিকর।[২৮]

আলমোড়া, ৯ই জুলাই, ১৮৯৭

আমি রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবার বন্দোবস্ত করেছিলাম, কিন্তু ডাক্তাররা অনুমতি দিলে না, কাজেই যাওয়া ঘটল না।

আমি অনেকগুলি আমেরিকান কাগজের কাটিং পেয়েছি ; তাতে দেখলাম মার্কিন মেয়েদের সম্বন্ধে আমার উক্তিসমূহের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে—তাতে আরও এক অদ্ভুত খবর পেলাম যে, আমাকে এখানে জাতিচ্যুত করা হয়েছে! আমার আবার জাত হারাবার ভয়—আমি যে সন্ন্যাসী!

জাত তো কোনরকম যায়ইনি, বরং সমুদ্রযাত্রার উপর সমাজের যে একটা বিরুদ্ধ ভাব ছিল, আমার পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার দরুন তা বহুল পরিমাণে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

আমাকে সম্মানপ্রদর্শনের জন্য এক রাজা সামাজিক ভোজের আয়োজন করেছিলেন ; তাতে ঐ জাতের অধিকাংশ বড় বড় লোক যোগ দিয়েছিলেন। শত শত রাজার বংশধরেরা এই পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়েছে, পুজো করেছে—আর সমস্ত দেশে যেরূপ আদর অভ্যর্থনা অভিনন্দনের ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে আর এ রকমটি কারও হয়নি।

রাস্তায় বেরুতে গেলেই এত লোকের ভিড় হ'ত যে, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের দরকার হ'ত—জাতিচ্যুত করাই বটে!

আমি কখনও কোন জিনিস মতলব ক'রে করিনি। আপনা-আপনি যেমন যেমন সুযোগ এসেছে, আমি তারই সহায়তা নিয়েছি। কেবল একটা ভাব আমার মাথার ভিতর ঘুরছিল—জনসাধারণের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত ক'রে চালিয়ে দেওয়া। আমি সে বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যদি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভেতর কেমন কাজ করছে, কলেরা-আক্রান্ত 'পারিয়া'র মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের সেবাশুশ্রূষা করছে এবং অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে—প্রভু আমাকে সাহায্য করছেন, তাদেরও সাহায্য পাঠাচ্ছেন! মানুষের কথা আমি কি গ্রাহ্য করি?

সেই প্রেমাস্পদ প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংলণ্ডে, যেমন ভারতের রাস্তায় রাস্তায় যখন ঘুরে বেড়াতাম—কেউ আমায় চিনত না—তখন যেমন সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা কি বলে না বলে, তাতে আমার কি এসে যায়—ওরা তো ছেলেমানুষ! এর চেয়ে বেশী ওরা বুঝবে কি ক'রে? আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার, তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি—সামান্য বালকদের কথায় আমার নির্দিষ্ট পথ থেকে আমি চ্যুত হবো?—আমাকে দেখে কি তেমনি মনে হয়?

আমাকে আমার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হ'ল—কারণ তোমাদের কাছে না বললে আমার কর্তব্য শেষ হ'ত না। আমি বুঝতে পারছি--আমার কাজ শেষ হয়েছে। জোর তিন চার বছর জীবন অবশিষ্ট আছে। আমার নিজের মুক্তির ইচ্ছা সম্পূর্ণ চলে গেছে। আমি সাংসারিক সুখের প্রার্থনা কখনও করিনি। আমি দেখাতে চাই যে, আমার যন্ত্রটা বেশ প্রবলভাবে চালু হয়েছে আর এটা যখন নিশ্চয় বুঝব যে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে অন্ততঃ ভারতে এমন একটা যন্ত্র সচল করলাম যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমবো। নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান এবং একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পুজোর জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি। আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ! এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।

আমার সময় অল্প। এখন আমার যা কিছু বলবার আছে, কিছু না চেপে ব'লে যেতে হবে। ওতে কারও হৃদয়ে আঘাত লাগবে বা কেউ বিরক্ত হবে—এ বিষয়ে লক্ষ্য করলে চলবে না। অতএব প্রিয় মেরী, আমার মুখ

থেকে যাই বের হোক না কেন, কিছুতেই ভয় পেও না। কারণ যে শক্তি আমার পিছনে থেকে কাজ করছে, তা বিবেকানন্দ নয়—তিনি স্বয়ং প্রভু। কিসে ভাল হয়, তিনিই বেশী বোঝেন। যদি আমাকে—জগৎকে সন্তুষ্ট করতে হয়, তা হ'লে তাতে জগতের অনিষ্টই হবে।

যে-কোন নূতন ভাব প্রচারিত হবে, তারই বিরুদ্ধে লোকে লাগবে। যাঁরা সভ্য শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন না ক'রে উপহাসের হাসি হাসবেন ; আর যারা সভ্য নয়, তারা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ চীৎকার করবে ও কুৎসিত নিন্দা রটাবে। [২৯]

আলমোড়া, ১০ই জুলাই, ১৮৯৭

আমাদের কর্মীরা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বিভিন্ন জেলায় যে কাজে নেমেছে, এখান থেকে তার পরিচালনায় আমি খুবই ব্যস্ত।...

বক্তৃতা ও বাগ্মিতা ক'রে ক'রে হয়রান হয়ে পড়ায় আমি হিমালয়ে আশ্রয় নিয়েছি। ডাক্তাররা আমায় খেতড়ির রাজার সঙ্গে ইংলণ্ডে যেতে না দেওয়ায় আমি বড়ই দুঃখিত ; আর স্টার্ডি এতে খেপে গেছে!

এ বছর তিব্বতে যাবার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এরা যেতে দিল না ; কারণ ঐপথে চলা ভয়ানক শ্রমসাপেক্ষ। যা হোক আমি খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পাহাড়ী ঘোড়া ছুটিয়েই সন্তুষ্ট আছি। তোমার বাইসাইকেলের চেয়ে এটা আরও বেশী উন্মাদনাপূর্ণ ; অবশ্য উইম্বলডনে আমার সে অভিজ্ঞতাও হয়ে গেছে। মাইলের পর মাইল চড়াই ও মাইলের পর মাইল উতরাই—রাস্তাটা কয়েক ফুট মাত্র চওড়া, খাড়া পাহাড়ের গায়ে যেন ঝুলে আছে, আর বহু সহস্র ফুট নীচে খদ।

মান্দ্রাজে শীঘ্রই একটা পত্রিকা আরম্ভ করা হবে ; গুডউইন তারই কাজে সেখানে গেছে। [৩০]

আলমোড়া, ১৩ই জুলাই, ১৮৯৭

আমার শরীর এই ঘোড়ার পিঠে রৌদ্রে ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের দরুন একটু আজ খারাপ আছে। শশীবাবুর ঔষধ প্রায় দুই সপ্তাহ খাইলাম—বিশেষ কিছুই দেখি না।—লিভারের বেদনাটা গিয়াছে ও খুব কসরত করার দরুন হাত-পা বিশেষ মাসকুলার (পেশীবহুল) হইয়াছে, কিন্তু পেটটা বিষম ফুলিতেছে ; উঠতে বসতে হাঁপ ধরে। বোধ হয় দুধ খাওয়াই তার কারণ। শশীকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, দুগ্ধ ছাড়িয়া দেওয়া যায় কি না। পূর্বে আমার দুইবার sun-stroke (সর্দি-গরমি) হয়। সেই অবধি রৌদ্র লাগাইলেই চোখ লাল হয়, দুই-তিন দিন শরীর খারাপ যায়। [৩১]

দেউলধার, আলমোড়া, ১৩ই জুলাই, ১৮৯৭

মঠের নাম কি হইবে একটা স্থির তোমরাই কর। ...টাকা সাত সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছিবে ; জমির তো কোন খবর নাই। এ বিষয়ে কাশীপুরের কেষ্টগোপালের বাগানটা নিলে ভাল হয় না? পরে বড় কার্য ক্রমে হবে। যদি মত হয়, এ বিষয় কাহাকেও—মঠস্থ বা বাহিরের—না বলিয়া চুপি চুপি অনুসন্ধান করিও। দুই-কান হইলেই কাজ খারাপ হয়। যদি ১৫।১৬ হাজারের ভিতর হয় তো তৎক্ষণাৎ কিনিবে (যদি ভাল বোঝ)। যদি কিছু বেশি হয় তো বায়না করিয়া ঐ সাত সপ্তাহ অপেক্ষা করিও। আমার মতে আপাততঃ ওটা লওয়াই ভাল। বাকি ধীরে ধীরে হবে। ও বাগানের সহিত আমাদের সমস্ত association (স্মৃতি জড়িত)। বাস্তবিক এটাই আমাদের প্রথম মঠ। অতি গোপনে—'ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব।

কাশীপুরের বাগানের অবশ্য জমির দাম বেড়ে গেছে ; কিন্তু কড়ি তেমনি কমে গেছে। যা হয় একটা করো ও শীঘ্র করো। গয়ং গচ্ছ করতে করতে যত কাজ মাটি হয়। ওটাও তো নিতেই হবে, আজ না হয় কাল— আর যত বড়ই গঙ্গাতীরে মঠ হউক না। অন্য লোক দিয়ে কথা পাড়লে আরও ভাল হয়। আমাদের কেনা টের পেলে লম্বা দর হাঁকবে। চেপে কাজ করে চালাও। অভীঃ, ঠাকুর সহায়। ভয় কী?[৩১৪]

আলমোড়া, ২৫শে জুলাই, ১৮৯৭

স্নেহের মেরী, আজকাল বেশ খানিকটা ব্যায়াম করছি ও ঘোড়ায় চড়ছি, কিন্তু চিকিৎসকের ব্যবস্থা মতো আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে সর-তোলা দুধ খেতে হয়েছিল আর তারই ফলে আমি পিছনের চেয়ে সামনের দিকে বেশি এগিয়ে গিয়েছি। যদিও আমি সবসময়ই আগুয়ান—কিন্তু এখনই এতটা অগ্রগতি চাই না, তাই দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।...

কথায় কথায় ব'লে রাখি, আমার চুল পাকতে শুরু করেছে—এত তাড়াতাড়ি যে বুড়ো হ'তে চলেছি, তাতে আনন্দই হচ্ছে। সোনালীর মধ্যে অর্থাৎ কালোর মধ্যে—রূপালী কেশ অতি দ্রুত এসে যাচ্ছে।

ধর্মপ্রচারকের অল্পবয়সী হওয়া ভাল নয়, তোমার তাই মনে হয় না কি? আমি কিন্তু তাই মনে করি, সারা জীবন ধরেই মনে করেছি। একজন বৃদ্ধের প্রতি মানুষ অনেক বেশী আস্থা রাখে এবং তাঁকে দেখে অনেক বেশী শ্রদ্ধা জাগে। তথাপি এ জগতে বুড়ো বদমাসগুলিই সবচেয়ে মারাত্মক। তাই নয় কি? এই দুনিয়ার বিচারের একটা নিজস্ব নিয়ম আছে, এবং হায়, সত্য থেকে

তা কতই না স্বতন্ত্র!

বেদান্ত ও যোগের সাহায্যে তুমি উপকৃত হয়েছ, এ কথা জেনে আমি খুবই খুশী। দুর্ভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে আমার নিজেকে সার্কাস-দলের ক্লাউনের মতো মনে হয়, সে কেবল অন্যকে হাসায়, কিন্তু তার নিজের দশা সকরুণ।

...আমাদের জীবনের ত্রুটি হ'ল এই যে, আমরা বর্তমানের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হই—ভবিষ্যতের দ্বারা নয়। যা এই মুহূর্তে আমাদের ক্ষণিক আনন্দ দেয়, আমরা তারই পিছনে ছুটি ; ফলে দেখা যায়, বর্তমানের ক্ষণিক আনন্দের বিনিময়ে আমরা ভবিষ্যতের বিপুল দুঃখ সঞ্চয় ক'রে বসি।

যদি ভালবাসার মতো কেউ আমার না থাকত! যদি আমি শৈশবেই মাতৃপিতৃহীন হতাম! আমার আপনার লোকেরাই আমার পক্ষে সবচেয়ে বেশী দুঃখের কারণ হয়েছে—আমার ভ্রাতা, ভগ্নী, জননী ও অন্য সব আপনজন। আত্মীয়স্বজনরাই মানুষের উন্নতির পথে কঠিন বাধাস্বরূপ। আর এটা খুব আশ্চর্য নয় কি যে, মানুষ তৎসত্ত্বেও বিবাহ করবে ও নূতন মানুষের জন্ম দিতে থাকবে!!!

যে মানুষ একাকী, সেই সুখী। সকলের কল্যাণ কর, সকলকে তোমার ভাল লাগুক, কিন্তু কাউকে ভালবাসতে যেও না। এটা একটা বন্ধন, আর বন্ধন শুধুই দুঃখ ডেকে আনে। তোমার অন্তরে তুমি একাকী বাস কর—তাতে সুখী হবে। যার দেখাশুনো করবার কেউ নেই এবং কারও তত্ত্বাবধান নিয়ে যে মাথা ঘামায় না, সেই মুক্তির পথে এগিয়ে যায়।

...আমার প্রকৃতিতে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের গুণ বেশি। আমি সবসময়ই অন্যের দুঃখবেদনা শুধু-শুধুই নিজের মধ্যে টেনে নিচ্ছি, অথচ কারও কোন কল্যাণ করতেও পারছি না—ঠিক যেমন মেয়েদের সন্তান না হ'লে একটা বেড়াল পুষে তার প্রতি সকল ভালবাসা ঢেলে দেয়।

তোমার কি মনে হয়, তার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিকতা আছে? একদম না, এগুলি হল জড় স্নায়বিক বন্ধন—হ্যাঁ, ঠিক তাই। হায়, পঞ্চভূতে গড়া এই দেহের দাসত্ব ঘোচানো, সে কি সহজ কথা!

তোমার বন্ধু মিসেস মার্টিন প্রতি মাসে অনুগ্রহ ক'রে তাঁর পত্রিকাটি আমাকে পাঠাচ্ছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে স্টার্ডির থার্মোমিটার এখন শূন্য ডিগ্রীর নীচে। এই গ্রীষ্মে আমার ইংল্যাণ্ডে যাওয়া হ'ল না ব'লে তিনি খুবই নিরাশ হয়ে পড়েছেন। আমার কিই বা করার ছিল?

আমরা এখানে দুটি মঠের পত্তন করেছি—একটি কলকাতায়, অপরটি

মান্দ্রাজে। কলকাতায় মঠটি (একটি জীর্ণ ভাড়াটে বাড়ি) সম্প্রতিক ভূমিকম্পে ভয়ানক আন্দোলিত হয়েছে।

কয়েকদিন বাদেই আমি সমতলে যাচ্ছি এবং সেখান থেকে যাব—এই পর্বতের পশ্চিমখণ্ডে। সমভূমিতে যখন একটু ঠাণ্ডা পড়বে, তখন দেশময় একবার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াব—দেখব কি পরিমাণ কাজ করা যায়।[৩২]

আলমোড়া, ২৯শে জুলাই, ১৮৯৭

আমি পরশুদিন এখান হ'তে যাচ্ছি—মসূরী পাহাড় বা অন্য কোথাও যাই পরে ঠিক ক'রব। কাল এখানে ইংরেজ-মহলে এক লেকচার হয়েছিল, তাতে সকলে বড়ই খুশী। কিন্তু তার আগের দিন হিন্দীতে এক বক্তৃতা করি, তাতে আমি বড়ই খুশী—হিন্দীতে যে oratory (বাগ্মিতা) করতে পারবো তা তো আগে জানতাম না।[৩৩]

আলমোড়া, ৩০শে জুলাই, ১৮৯৭

গঙ্গাধর, আমি আগামী সোমবার এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি।...এখানে একটি—সাহেবমহলে—ইংরেজী বক্তৃতা হইয়াছিল ও একটি—দেশী লোকদিগকে হিন্দিতে। হিন্দিতে আমার এই প্রথম, কিন্তু সকলের তো খুব ভাল লাগলো।

...আগামী শনিবার আর একটি বক্তৃতা ইংরিজীতে দেশীয় লোকের জন্য।

সোমবার বেরেলি-যাত্রা, তারপর সাহারানপুর, তারপর আম্বালা, সেখান হইতে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের সঙ্গে বোধ হয় মসূরী, আর একটু ঠাণ্ডা পড়লেই দেশে পুনরাগমন ও রাজপুতানায় গমন ইত্যাদি।

তুমি খব চুটি এ কাজ ক'রে যাও, ভয় কি? আমিও 'ফের লেগে যা' আরম্ভ কা ছি। শরীর তো যাবেই, কুড়েমিতে কেন যয়? It is better to wear out than rust out.' (মরচে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল)। মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেলবে, তার ভাবনা কি? দশ বৎসরের ভেতর ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেলতে হবে—এর কমে হবেই না। তাল ঠুকে লেগে যাও—'ওয়া গুরু কী ফতে'। টাকা-ফাকা সব আপনা-আপনি আসবে। মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কি করতে পারে?[৩৪]

আম্বালা, ১৯শে আগস্ট, ১৮৯৭

শশী, আমি এক্ষণে ধর্মশালার পাহাড়ে যাইতেছি!

আমি কিছুদিন আরও পাঞ্জাবী পাহাড়ে বিশ্রাম করিয় পাঞ্জাবে কার্য আরম্ভ

করিব। পাঞ্জাব ও রাজপুতানাই কার্যের ক্ষেত্র। কার্য আরম্ভ করিয়াই তোমাদের পত্র লিখিব।...

আমার শরীর মধ্যে বড় খারাপ হইয়াছিল। এক্ষণে ধীরে ধীরে শুধরাইতেছে। পাহাড়ে দিনকতক থাকিলেই ঠিক হইয়া যাইবে।[৩৫]

অমৃতসর, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

আমি সদলে অদ্য কাশ্মীর চলিলাম দুইটার গাড়িতে। মধ্যে ধর্মশালা পাহাড়ে যাইয়া শরীর অনেক সুস্থ হইয়াছে এবং টনসিল, জ্বর প্রভৃতি একেবারে আরাম হইয়া গিয়াছে।...[৩৬]

শ্রীনগর, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

এক্ষণে কাশ্মীর। এদেশ সম্বন্ধে যে প্রশংসা শুনিয়াছি, তাহা সত্য। এমন সুন্দর দেশ আর নাই, আর লোকগুলিও সুন্দর, তবে ভাল চক্ষু হয় না। কিন্তু এমন নরককুণ্ডের মতো ময়লা গ্রাম ও শহর আর কোথাও নাই। শ্রীনগরে ঋষিবর বাবুর বাড়িতে ওঠা গেছে। তিনি বিশেষ যত্নও করছেন। আমার চিঠিপত্র তাঁর ঠিকানায় পাঠাইবে। আমি দু-এক দিনের মধ্যে অন্যত্র বেড়াইতে যাইব ; কিন্তু আসিবার সময় পুনরায় শ্রীনগর হইয়া আসিব।

আমার শরীর ধর্মশালা যাওয়া অবধি এখনও বেশ আছে। ঠাণ্ডাটিই বেশ লাগে এবং শরীর ভাল থাকে। কাশ্মীরের দু-একটা জায়গা দেখিয়া একটা উত্তম স্থানে চুপ করিয়া বসিব—এই প্রকার ইচ্ছা, অথবা জলে জলে ঘুরিব। যাহা ডাক্তার বাবু বলেন তাহাই করিব। আমি এখান হইতে অক্টোবর মাসে নামিয়া পাঞ্জাবে দু-চারটি লেকচার দিব। তাহার পর সিন্ধু হইয়া কচ্ছ, ভুজ ও কাথিয়াওয়াড়—সুবিধা হইলে পুনা পর্যন্ত, নহিলে বরোদা হইয়া রাজপুতানা। রাজপুতানা হইয়া N. W. P. (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) ও নেপাল, তারপর কলকাতা—এই তো প্রোগাম এখন, পরে প্রভু জানেন।[৩৭]

শ্রীনগর, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

অবশেষে আমরা কাশ্মীরে এসে পড়েছি। এ জায়গায় সব সৌন্দর্যের কথা তোমায় লিখে আর কি হবে? আমার মতে এই হচ্ছে একমাত্র দেশ, যা যোগীদের অনুকূল। কিন্তু এদেশের যারা বর্তমান অধিবাসী, তাদের অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্য থাকলেও তারা অত্যন্ত অপরিষ্কার! এদেশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখবার জন্য এবং শারীরিক শক্তিলাভের জন্য আমি এক মাস জলে জলে ঘুরে বেড়াব। কিন্তু নগরটিতে এখন ভয়ানক ম্যালেরিয়া এবং সদানন্দ ও

কৃষ্ণলালের জ্বর হয়েছে। সদানন্দ আজ ভাল আছে, কিন্তু কৃষ্ণলালের এখনও জ্বর আছে। ডাক্তার আজ এসে তার জোলাপের ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। আমরা আশা করি, সে কালকের মধ্যে সেরে উঠবে এবং আমরা যাত্রাও ক'রব কাল।

কাশ্মীর গভর্নমেন্ট আমাকে তাদের একখানি বজরা ব্যবহার করতে দিয়েছেন, বজরাটি বেশ সুন্দর, আরামপ্রদ। তাঁরা জেলার তহশিলদারদের উপরও আদেশ জারি করেছেন। এদেশের লোকেরা আমাদের দেখবার জন্য দল বেঁধে আসছে, আমাদের সুখে রাখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই করছে। [৩৮]

শ্রীনগর, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

এক্ষণে কাশ্মীর দেখিয়া ফিরিতেছি। দু-এক দিনের মধ্যে পঞ্জাব যাত্রা করিব। এবার শরীর অনেক সুস্থ হওয়ায় পূর্বের (পূর্বের) ভাবে পুনরায় ভ্রমণ করিব, মনস্থ করিতেছি। লেকচার-ফেকচার বড় বেশি নয়—যদি একটা-আদটা পঞ্জাবে হয়ত হইবে, নইলে নয়। এদেশের লোক ত এখনও এক পয়সা গাড়িভাড়া পর্যন্ত দিলে না—

কেবল ঐ ইংরেজ শিষ্যদের নিকট হাতপাতাও লজ্জার কথা। অতএব (পূর্বের) ভাবে 'কম্বলবন্ত' হইয়া চলিলাম। [৩৯]

কাশ্মীর, সেপ্টেম্বর (?), ১৮৯৭

এ কাশ্মীর বাস্তবিকই ভূস্বর্গ—এমন দেশ পৃথিবীতে আর নাই। যেমন পাহাড়, তেমনি জল, তেমনি গাছপালা, তেমনি স্ত্রীপুরুষ, তেমনি পশুপক্ষী। [৪০]

শ্রীনগর, ১লা অক্টোবর, ১৮৯৭

তোমার কাছে কাশ্মীরের বর্ণনা দেবার চেষ্টাও ক'রব না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই ভূস্বর্গ ছাড়া অন্য কোন দেশ ছেড়ে আসতে আমার কখনও মন খারাপ হয়নি। সম্ভব হ'লে, রাজাকে রাজী করিয়ে এখানে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এখানে অনেক কিছু করবার আছে—আর উপকরণও এত আশাপ্রদ! [৪১]

মরী, ১১ই অক্টোবর, ১৮৯৭

কাশ্মীর হ'তে আজ দশ দিন পর্যন্ত সমস্ত কাজ যেন একটা ঝোঁকে করেছি ব'লে মনে হচ্ছে। সেটা শরীরের রোগ হোক বা মনেরই হোক। এক্ষণে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি আর কাজের যোগ্য নই।... তোমাদের উপর অত্যন্ত কটু ব্যবহার করেছি, বুঝতে পারছি। তবে তুমি (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমার সব

সহ্য করবে আমি জানি, ও মঠে আর কেউ নেই যে সব সহ্য করবে।

মায়ের কাজ আমার দ্বারা যতটুকু হবার ছিল ততটুকু করিয়ে শেষ শরীর-মন চুর ক'রে ছেড়ে দিলেন 'মা'। মায়ের ইচ্ছা!

এক্ষণে আমি এ-সমস্ত কাজ হ'তে অবসর নিলাম। দু-এক দিনের মধ্যে আমি সব...ছেড়ে দিয়ে একলা, একলা চলে যাব ; কোথাও চুপ ক'রে বাকি জীবন কাটাব।

আমি চিরকাল বীরের মতো চলে এসেছি—আমার কাজ বিদ্যুতের মত শীঘ্র, আর বজ্রের মত অটল চাই। আমি ঐ রকমই ম'রব। আমি লড়ায়ে কখনও পেছপাও হইনি ; এখন কি...হবো? হার-জিত সকল কাজেই আছে ; তবে আমার বিশ্বাস যে, কাপুরুষ মরে নিশ্চিত কৃমিকীট হয়ে জন্মায়। যুগ যুগ তপস্যা করলেও কাপুরুষের উদ্ধার নেই—আমায় কি শেষে কৃমি হয়ে জন্মাতে হবে?...আমার চোখে এ সংসার খেলামাত্র—চিরকাল তাই থাকবে। এর মান-অপমান দু-টাকা লাভ-লোকসান নিয়ে কি ছমাস ভাবতে হবে?...আমি কাজের মানুষ! খালি পরামর্শ হচ্ছে—ইনি পরামর্শ দিচ্ছেন, উনি দিচ্ছেন ; ইনি ভয় দেখাচ্ছেন, তো উনি ডর! আমার চোখে এ জীবনটা এমন কিছু মিষ্টি নয় যে, অত ভয়ডর ক'রে হুঁশিয়ার হয়ে বাঁচতে হবে। টাকা, জীবন, বন্ধু-বান্ধব, মানুষের ভালবাসা, আমি—সব অত সিদ্ধি নিশ্চিত ক'রে যে কাজ করতে চায়, অত ভয় যদি করতে হয়তো গুরুদেব যা বলতেন যে, 'কাক বড় স্যায়না—' তার তাই হয়।

লড়াই করলুম কোমর বেঁধে—এ আমি খুব বুঝি ; আর যে বলে, 'কুছ পরোয়া নেই, ওরা বাহাদুর, আমি সঙ্গেই আছি'...তাকে বুঝি, সে বীরকে বুঝি, সে দেবতাকে বুঝি। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোটি কোটি নমস্কার ; তারাই জগৎপাবন, তারাই সংসারের উদ্ধারকর্তা! আর যেগুলো খালি 'বাপ রে এগিও না, ওই ভয়, ওই ভয়'—ডিস্‌পেপ্‌টিকগুলো—প্রায়ই ভয়তরাসে। তবে আমার মায়ের কৃপায় মনের এত জোর যে, ঘোর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কখনো আমায় কাপুরুষ করতে পারবে না।

...আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মিন্‌মিনে, ভিন্‌ভিনে, ছেঁড়া ন্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক। মা জগদম্বে, হে গুরুদেব! তুমি চিরকাল বলতে, 'এ বীর!'—আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়। এই আমার প্রার্থনা, হে ভাই!...'উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা'—এই ঠাকুরের দাসানুদাসের মধ্যে কেউ না কেউ উঠবে আমার মতো, যে আমায় বুঝবে।

'জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন ; শিয়রে শমন,...তাহা না ডরাক তোমা'—যা কখন করিনি, রণে পৃষ্ঠ দিইনি, আজ কি...তাই হবে?...হারবার ভয়ে লড়াই থেকে হঠে আসব? হার তো অঙ্গের আভরণ ; কিন্তু না লড়েই হারব?

তারা! মা!...

মা আবার মানুষ দেন—যাদের ছাতিতে সাহস, হাতে বল, চোখে আগুন জ্বলে, যারা জগদম্বার ছেলে—এমন একজনও যদি দেন, তবে কাজ ক'রব, তবে আবার আসব ; নইলে জানলুম মায়ের ইচ্ছা এই পর্যন্ত। আমার এখন 'ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে', আমি চাই তড়িঘড়ি কাজ, নির্ভীক হৃদয়।...[৪২]

লাহোর, ১১ই নভেম্বর, ১৮৯৭

লাহোরের লেকচার এক রকম হইয়া গেল। দু-এক দিনের মধ্যেই ডেরাদুন যাত্রা করিব।.. সিন্ধুযাত্রা এখন স্থগিত রহিল।

এক্ষণে আমি প্রতিদিন আমেরিকা হইতে টাকার অপেক্ষা করিতেছি। ...হরি ও শরতের নামে যে উইল করিবার জন্য বলিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় হইয়া গিয়াছে।

শরীর রেগুলার একসাইজ (নিয়মিত ব্যায়াম) না করিলে কখনও ভাল থাকে না, বকে-বকেই যত ব্যারাম ধরে, ইহা নিশ্চিত জানিও।[৪৩]

লাহোর, ১৫ই নভেম্বর ১৮৯৭

মা, বড় দুঃখের বিষয় যে, একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও এ যাত্রায় সিন্ধুদেশে (করাচি) আসিয়া তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ঘটিল না।

দ্বিতীয়তঃ আমার অসুখ হওয়ার জন্য জীবনের উপর ভরসা নাই। এক্ষণেও আমার উদ্দেশ্য যে, কলিকাতায় একটি মঠ হয়—তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না। অপিচ দেশের লোক বরং পূর্বে আমাদের মঠে যে সাহায্য করিত, তাহাও বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা যে, আমি ইংলণ্ড হইতে অনেক অর্থ আনিয়াছি!! তাহার উপর এবার মহোৎসব হওয়া পর্যন্ত অসম্ভব ; কারণ রাসমণির (বাগানের) মালিক বিলাতফেরত বলিয়া আমাকে উদ্যানে যাইতে দেবেন না!! অতএব আমার প্রথম কর্তব্য এই যে, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে যে দুই-চারিটি বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতায় একটি স্থান করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা। এই সকল কারণের জন্য আপাততঃ অত্যন্ত দুঃখের সহিত সিন্ধুদেশ (করাচি) যাত্রা স্থগিত রাখিলাম।[৪৪]

লাহোর, ১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৭

আমার শরীর বেশ আছে। তবে রাত্রে দু-একবার উঠিতে হয়। নিদ্রা উত্তম হইতেছে। খুব লেকচার করিলেও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না, আর exercise (ব্যায়াম) রোজ আছে। [৪৫]

দেরাদুন, ২৪শে নভেম্বর, ১৮৯৭

এবার টিহিরীর শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ঘাড়ে একটা বেদনার জন্য অত্যন্ত ভুগিতেছেন ; আমিও নিজে ঘাড়ের একটা বেদনায় অনেকদিন যাবৎ ভুগিতেছি। যদি তোমাদের সন্ধানে 'পুরাতন ঘৃত' থাকে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ ডেরাদুনে উক্ত বাবুকে এবং খেতড়ির ঠিকানায় কিঞ্চিৎ আমাকে পাঠাইবে। [৪৬]

দিল্লি, ৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৭

মিস মুলার তোমার (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও আমার নামে গ্রিন্ডলে কোম্পানির ওখানে টাকা রাখবেন। তাতে তোমার পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি থাকার দরুন তুমি একাই সমস্ত ড্র করতে পারবে। এটি যেমন রাখা, অমনি তুমি নিজে ও হরি পাটনায় গিয়ে সেই লোকটিকে ধর গিয়ে—যেমন করে পারো রাজী করাও ; আর জমিটে যদি ন্যায্য দাম হয় তো কিনে লও। নইলে অন্য জায়গার চেষ্টা দেখ। [৪৬ক]

বেলুড় মঠ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮

কিছুকাল যাবৎ আমার শরীর ভাল যাইতেছিল না, সম্প্রতি অনেক ভাল। এখন কলিকাতায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা একটু বেশী শীত পড়িয়াছে এবং আমেরিকা হইতে যে-সব বন্ধুরা আসিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে খুব আনন্দেই আছেন। যে জমি কেনা হইয়াছে, আজ আমরা উহার দখল লইব এবং যদিও এখনই ঐ জমিতে মহোৎসব করা সম্ভবপর নহে, তথাপি রবিবারে উহার উপর আমি কিছু না কিছু করাইব। অন্ততঃ শ্রীজীর ভস্মাবশেষ ঐ দিনের জন্য আমাদের নিজস্ব জমিতে লইয়া গিয়া পূজা করিতেই হইবে।

আমার হাতে টাকা নাই—আমার যাহা ছিল, তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত রাজার (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) হাতে দিয়াছি। কারণ সবাই বলে যে আমি অপব্যয়ী আর সেজন্যে আমার কাছে টাকা রাখিতে ভয় পায়।

ভাল কথা, আমরা এখানে আবার আমাদের নাচের ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছি ; হরি, সারদা ও স্বয়ং আমাকে ওয়াল্‌ট্‌জ (waltz) নৃত্য করিতে

দেখিলে তুমি আনন্দে ভরপুর হইতে। আমি নিজেই অবাক হইয়া যাই যে, আমরা কিরূপে টাল সামলাইয়া রাখি।

শরৎ আসিয়াছে এবং তাহার অভ্যাস-মতো কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। এখন আমাদের কিছু ভাল আসবাব হইয়াছে—সেই পুরানো মঠের চাটাই ছাড়িয়া সুন্দর টেবিল, চেয়ার ও তিনখানি খাট পাওয়া কত বড় উন্নতি! আমি মাসকয়েক পরেই মিসেস বুলের সঙ্গে আবার আমেরিকায় যাইতেছি।

এখানে মঠ তো স্থাপিত হইল। আমি আরও সাহায্যের জন্য বিদেশে যাইতেছি। উদ্যমের সঙ্গে কাজ কর। ভিতরে ও বাইরে ভারত এখন পচা শব। শ্রী-মহারাজের আশীর্বাদে তাকে আমরা বাঁচিয়ে তুলবো।[৪৭]

বেলুড় মঠ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮

একজন বিশেষ বন্ধুর কাছে আমি অনেকটা ঋণী ; তিনি সম্ভবতঃ আমাকে দার্জিলিং-এ নিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেছেন। জনকয়েক আমেরিকান বন্ধুও এসেছেন এবং যা কিছু সময় পাই, তার সবটাই মঠ ও তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যে নিয়োজিত হচ্ছে। তা ছাড়া আমার আশা এই যে, আগামী মাসে আমেরিকা যাত্রা করব।[৪৮]

বেলুড় মঠ, মার্চ, ১৮৯৮

তুলসীর উচিত গুডউইনের নিকট হইতে সাঙ্কেতিক লিখন শিখিয়া লওয়া। ভারতের বাহিরে থাকাকালে আমাকে প্রায় প্রতি ডাকে মান্দ্রাজে একখানি করিয়া চিঠি লিখিতে হইত।... আমাকে ঐসব চিঠি পাঠাইয়া দিও। আমি আমার ভ্রমণকাহিনী লিখিতে চাই। ইহাতে অন্যথা করিও না।[৪৮ক]

বেলুড় মঠ, ২রা মার্চ, ১৮৯৮

লণ্ডন থেকে ফিরে এসে যখন আমি দক্ষিণ ভারতে এবং যখন লোকেরা আমাকে উৎসবে ভোজে আপ্যায়িত করছে ও আমার কাছ থেকে ষোল আনা কাজ আদায় ক'রে নিচ্ছে, এমন সময় একটি বংশগত পুরানো রোগ এসে দেখা দিল। রোগের প্রবণতা (সম্ভাবনা) সব সময়ই ছিল, এখন অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তা আত্মপ্রকাশ ক'রল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে এল সম্পূর্ণ ভাঙন ও চূড়ান্ত অবসাদ। আমাকে তৎক্ষণাৎ মান্দ্রাজ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা উত্তরাঞ্চলে আসতে হ'ল ; এক দিন দেরি করা মানে অন্য জাহাজ ধরবার জন্য সেই প্রচণ্ড গরমে আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করা।

কথায় কথায় বলছি—আমি পরে জানতে পেরেছি যে, মিঃ ব্যারোজ পরদিন মাদ্রাজ এসে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁর প্রত্যাশা-মত আমাকে সেখানে না পেয়ে খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন—যদিও আমি তাঁর থাকবার জায়গার ও সংবর্ধনার ব্যবস্থা ক'রে এসেছিলাম। বেচারী জানে না, আমি তখন মরণাপন্ন।

গত গ্রীষ্মকালটা হিমালয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি ; দেখলাম ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে আসতে না আসতেই সুস্থ বোধ করি, কিন্তু সমতলের গরমে যেতে না যেতে আবার শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি। আজ থেকে কলকাতায় বেজায় গরম পড়েছে, তাই আবার আমাকে পালিয়ে যেতে হবে। এবার সুশীতল আমেরিকায়, কারণ মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড এখন এখানে। কলকাতার কাছে গঙ্গাতীরে আমি সঙ্ঘের জন্য একখণ্ড জমি কিনেছি। এখানে একটি ছোট বাড়িতে তাঁরা এখন বাস করছেন ; খুব কাছেই, যেখানে এখন মঠ স্থাপিত হয়েছে, সে বাড়িতে আমরা রয়েছি।

প্রত্যহ তাঁদের সঙ্গে দেখা করি, এতে তাঁরাও খুব আনন্দিত। এক মাস পরে তাঁদের একবার কাশ্মীর ভ্রমণে বেরোবার ইচ্ছা ; যদি তাঁরা চান, আমি তাঁদের সঙ্গে যাব পরামর্শদাতা, বন্ধু ও সম্ভবতঃ দার্শনিকরূপে। তারপর আমরা সবাই সমুদ্রপথে স্বাধীনতা ও কুৎসার দেশের উদ্দেশে রওনা হবো।

তুমি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না, কারণ রোগটা আর দুই-তিন বছর আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। বড় জোর নির্দোষ সঙ্গীর মতো থেকে যেতে পারে। আমার কোন খেদ নেই। কেবল কাজটাকে গুছিয়ে নেবার জন্য সর্বক্ষণ কঠোর পরিশ্রম ক'রে যাচ্ছি—শুধু এইজন্য যে, আমি যখন রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যাব, তখনও যেন যন্ত্রটি সামনের দিকে এগিয়ে চলে। বহুদিন আগে যেদিন জীবনকে বিসর্জন দিয়েছি, সেদিনই আমি মৃত্যুকে জয় করেছি। আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা হ'ল 'কাজ', এমনকি তাও প্রভুকে সমর্পণ ক'রে দিচ্ছি, তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। [৪৯]

দার্জিলিং, ২৩শে এপ্রিল, ১৮৯৮

সন্দুকফু (১১,৯২৪ ফুট) প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া অবধি শরীর অতি উত্তম ছিল, কিন্তু পুনর্বার দার্জিলিং আসিয়া অবধি প্রথম জ্বর, তাহা সারিয়া সর্দি-কাশিতে ভুগিতেছি। রোজ পালাইবার চেষ্টা করি ; ইহারা আজ কাল করিয়া দেরী করিয়া দিল। যাহা হউক, কাল রবিবার এ স্থান হইতে যাত্রাপথে খর্সানেতে এক দিন থাকিয়া সোমবার কলিকাতায় যাত্রা। রামকৃষ্ণ মিশনের একটি বাৎসরিক মিটিং করা উচিত এবং মঠেরও একটি হওয়া উচিত। তাহাতে

দুই জায়গায়ই ফেমিন রিলিফ-এর হিসাব 'সাবমিট' করিতে হইবে।... ঐ সমস্ত তৈয়ার রাখিবে।[৫০]

দার্জিলিং, ২৯শে এপ্রিল, ১৮৯৮

আমার অনেক বার জ্বর হয়ে গেল—সর্বশেষে হয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা। এখন তা সেরে গেছে বটে, কিন্তু ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছি। হাঁটবার উপযুক্ত শক্তি লাভ করলেই আমি কলকাতায় নেমে আসছি।...

অন্ধকার রাত্রে যখন অগ্নিদেবতা, সূর্যদেবতা, চন্দ্রদেবতা ও তারকাদেবীরা ঘুমিয়ে পড়েন, তখন কে তোমার অন্তর আলোকিত করে? আমি তো এইটুকু আবিষ্কার করেছি যে, ক্ষুধাই আমার চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখে। আহা, 'আলোকের ঐক্য'-রূপ (correspondence of light) মহান্ মতবাদটি কি অপূর্ব! ভাবো দেখি, এই মতবাদের অভাবে জগৎ বহু যুগ ধ'রে কী অন্ধকারেই না ছিল! এ সব জ্ঞান, ভালবাসা ও কর্ম এবং যত বুদ্ধ, কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট—সবই বৃথা। তাঁদের জীবন ও কার্য একেবারে ব্যর্থ হয়েছে; কারণ রাত্রে যখন সূর্য ও চন্দ্র তিমিরলোকে ডুবে যায়, তখন কে যে অন্তরে আলো জ্বালিয়ে রাখে, এ তত্ত্ব তো তাঁরা আবিষ্কার করতে পারেননি!! বড়ই মুখরোচক—কি বলো?

আমি যে শহরে জন্মেছি, তাতে যদি প্লেগ এসে পড়ে, তবে আমি তার প্রতিকার-কল্পে আত্মোৎসর্গ ক'রব বলেই স্থির করেছি; আর জগতে যত জ্যোতিষ্ক আজ পর্যন্ত আলো দিয়েছে, তাদের উদ্দেশে আহুতি দেওয়ার চেয়ে আমার এ উপায়টা নির্বাণলাভের প্রকৃষ্টতর উপায়![৫১]

আলমোড়া, ২০শে মে, ১৮৯৮

আমি নৈনিতালে পৌঁছিলে এখন হইতে বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) ঘোড়া চড়িয়া নৈনিতালে যায় কাহারও কথা না শুনিয়া এবং আসিবার দিনও ঘোড়া চড়িয়া আমাদের সঙ্গে আসে। আমি ডাণ্ডি চড়িয়া অনেক পিছে পড়িয়াছিলাম। রাত্রে যখন ডাকবাংলায় পৌঁছি, শুনিলাম বাবুরাম আবার পড়িয়া গিয়াছে ও হাতে চোট লাগিয়াছে—ভাঙে-চুরে নাই, এবং ধমকানি খাইবার ভয়ে দেশী ডাকবাংলায় আছে; কারণ পড়িবার দরুন মিস ম্যাকলাউড তাহাকে ডাণ্ডি দিয়া নিজে তাহার ঘোড়ায় আসিয়াছে।

সে-রাত্রে আর আমার সহিত দেখা হয় নাই। পরদিন ডাণ্ডির যোগাড় করিতেছি—ইতিমধ্যে শুনিলাম সে পায়ে হাঁটিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই অবধি তাহার আর কোনও খবর নাই। দু-এক জায়গায় তার করিয়াছি; কিন্তু খবর নাই। বোধ হয় কোন গ্রামে...বসিয়া আছে। ভাল কথা। কাহারও উদ্বিগ্নতা

বাড়াইতে এনারা পারদর্শী।

আমার শরীর অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল, কিন্তু ডিস্পেপসিয়া (অজীর্ণতা) যায় নাই এবং পুনর্বার অনিদ্রা আসিয়াছে। তুমি যদি কবিরাজী একটা ভাল ডিস্পেপসিয়ার ঔষধ শীঘ্র পাঠাও তো ভাল হয়।...

এবারে আলমোড়ায় জলহাওয়া অতি উত্তম। তাহাতে সেভিয়ার যে বাংলা লইয়াছে, তাহা আলমোড়ার মধ্যে উৎকৃষ্ট। ওপারে এনি বেস্যান্ট একটি ছোট বাংলায় চক্রবর্তীর সহিত আছে। আমি একদিন দেখা করতে গিয়াছিলাম। এনি বেস্যান্ট আমায় অনুনয় ক'রে বললে যে, আপনাব সম্প্রদায়ের সহিত যেন আমার সম্প্রদায়ের পৃথিবীময় প্রীতি থাকে ইত্যাদি। আজ বেস্যান্ট চা খাইতে এখানে আসিবে। আমাদের মেয়েরা নিকটে একটি ছোট বাংলায় আছে এবং বেশ আছে। কেবল আজ মিস ম্যাকলাউড একটু অসুস্থ। হ্যারি সেভিয়ার দিন দিন সাধু বনে যাচ্ছে।[৫২]

আলমোড়া, জুন, ১৮৯৮

গভীর দুঃখের সঙ্গে মিঃ গুডউইনের এই জীবন থেকে চিরবিদায়ের কথা জানতে পারলাম, ব্যাপারটা এমন ঘটে গিয়েছে যে হঠাৎ তার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত থাকতে পারলাম না। তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনই পূরণ করা সম্ভব হবে না। আর যারা মনে করে যে আমার চিন্তাধারা তাদের কোনো কাজে লেগেছে তাদের জানা উচিত যে প্রায় তার প্রত্যেকটি শব্দই মিঃ গুডউইনের অক্লান্ত এবং সব নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের ফলেই প্রকাশিত হ'য়েছে। ইস্পাতের মত একজন বন্ধুকে হারিয়েছি, হারিয়েছি একজন শিষ্যকে এক চিরঅনুগত ভক্তকে, হারিয়েছি একজন কর্মীকে যে জানতো না ক্লান্তি কাকে বলে। অপরের জন্য বেঁচে থাকার জন্যে জন্ম নিয়েছিল এমন একজন মানুষকে হারিয়ে পৃথিবী বড় দরিদ্র হয়ে গেল।[৫৩]

শ্রীনগর, ১৭ই জুলাই, ১৮৯৮

আমার শরীর বেশ আছে। রাত্রে প্রায় আর উঠিতে হয় না, অথচ দু-বেলা ভাত আলু চিনি—যা পাই তাই খাই। ওষুধটা কিছু কাজের নয়—ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীরে ঔষধ ধরে না।[৫৪]

অমরনাথ, ২রা অগস্ট, ১৮৯৮

আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি। ...আমি ভেবেছিলাম বরফের লিঙ্গটিই স্বয়ং শিব। সেখানে চৌর্যমনোবৃত্তির কোনো ব্রাহ্মণ ছিল না, কোনো লেনদেন ছিল

না, ছিল না কোনো অন্যায়। শুধুই পূজো ছিল। কোনো ধর্মস্থানে কখনও এতো আনন্দ পাইনি।[৫৫]

শ্রীনগর, ১০ই আগস্ট, ১৮৯৮

শ্রী অমরনাথজীকে দেখতে গিয়েছিলাম। খুবই উপভোগ্য তীর্থশালা দেবদর্শন অবিস্মরণীয়।

আরো একমাস এখানে থাকব, তারপরে আমি নীচে নেমে আসব।[৫৬]

কাশ্মীর, ২৫শে আগস্ট, ১৮৯৮

কল্যাণীয়া মার্গট, গত দু-মাস যাবৎ আমি অলসের মতো দিন কাটাচ্ছি। ভগবানের দুনিয়ার জমকালো সৌন্দর্যের যা পরাকাষ্ঠা হ'তে পারে, তারই মধ্য দিয়ে প্রকৃতির এই নৈসর্গিক উদ্যানে মনোরম ঝিলামের বুকে নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছি, এখানে পৃথিবী বায়ু ভূমি তৃণ গুল্মরাজি পাদপশ্রেণী পর্বতমালা তুষার-রাশি ও মানবদেহ—সবকিছুর অন্ততঃ বাহিরের দিকটায় ভগবানেরই সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নৌকাটিই আমার ঘরবাড়ি ; আর আমি প্রায় সম্পূর্ণ রিক্ত—এমনকি দোয়াত-কলমও নেই বলা চলে ; যখন যেমন জুটছে, খেয়ে নিচ্ছি—ঠিক যেন রিপ ভ্যান উইঙ্কল্-এর ছাঁচে ঢালা তন্দ্রাচ্ছন্ন জীবন!...

কাজের চাপে নিজেকে শেষ করে ফেলো না যেন। ওতে কোন লাভ নেই ; সর্বদা মনে রাখবে, 'কর্তব্য হচ্ছে মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো—তার তীব্র রশ্মি মানুষের জীবনী-শক্তি ক্ষয় করে।' সাধনার দিক দিয়ে ওর সাময়িক মূল্য আছে বটে, তার বেশি করতে গেলে ওটা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। আমরা জগতের কাজে অংশ গ্রহণ করি আর নাই করি, জগৎ নিজের ভাবে চলে যাবেই। মোহের ঘোরে আমরা নিজেদের ধ্বংস ক'রে ফেলি মাত্র। এক-জাতীয় ভ্রান্ত ধারণা আছে, যা চরম নিঃস্বার্থতার মুখোস প'রে দেখা দেয় ; কিন্তু সব রকম অন্যায়ের কাছে যে মাথা নোয়ায়, সে শেষ পর্যন্ত অপরের অনিষ্টই করে। নিজেদের নিঃস্বার্থপরতা দিয়ে অপরকে স্বার্থপর ক'রে তোলার কোন অধিকার আমাদের নেই। আছে কি?[৫৭]

শ্রীনগর, ২৮শে আগস্ট, ১৮৯৮

কয়েকদিনের জন্য আমি দূরে চলে গিয়েছিলাম। এখন আমি মহিলাদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি। তারপর যাত্রিদলটি যাচ্ছে কোন পাহাড়ের পিছনে এক বনের মধ্যে সুন্দর শান্ত পরিবেশে, সেখানে কুলকুল ক'রে ছোট নদী বয়ে চলেছে। সেখানে তারা দেবদারু গাছের নীচে বুদ্ধের মতো আসন ক'রে

গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ধ্যানে নিমগ্ন থাকবে।[৫৮]

কাশ্মীর, ৬ই অক্টোবর, ১৮৯৮

আর 'হরিঃ ওঁ' নয়, এবার 'মা', 'মা'! আমার সব স্বদেশপ্রেম ভেসে গেছে। আমার সব গেছে। এখন কেবল 'মা, মা'!

আমার খুব অন্যায় হয়েছে। মা আমাকে বললেন, 'যদিই বা ম্লেচ্ছরা আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, আমার প্রতিমা অপবিত্র করে, তাতে তোর কী? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি?' সুতরাং আমার আর স্বদেশপ্রেম বলে কিছুই নেই। আমি তো ক্ষুদ্র শিশু মাত্র![৫৯]

কাশ্মীর, ১২ই অক্টোবর ১৮৯৮

দেখেছি, সব বর্ণে-বর্ণে সত্য!—

"সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"

মা সত্যসত্যই তার কাছে আসেন। আমি নিজ জীবনে এই প্রত্যক্ষ করেছি। কারণ, আমি মৃত্যুকে সাক্ষাৎভাবে আলিঙ্গন করেছি।[৬০]

লাহোর, অক্টোবর ১৮৯৮

আর তিন বছর বাঁচব। এখন একমাত্র ভাবনা—এই সময়ের মধ্যে আমার যেসব পরিকল্পনা আছে সেগুলো বাস্তবায়িত করতে পারব কি না।[৬১]

বেলুড় মঠ, ২০ শে অক্টোবর, ১৮৯৮

অমরনাথ-দর্শনের পর থেকে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা যেন শিব বসে আছেন, কিছুতেই নাবছেন না।

৺অমরনাথ ও পরে ৺ক্ষীরভবানীর মন্দিরে খুব তপস্যা করেছিলাম।

অমরনাথ যাবার কালে পাহাড়ের একটা খাড়া চড়াই ভেঙে উঠেছিলুম। সে রাস্তায় যাত্রীরা কেউ যায় না, পাহাড়ী লোকেরাই যাওয়া-আসা করে। আমার কেমন রোক হ'ল, ঐ পথেই যাব। যাব তো যাবই। সেই পরিশ্রমে শরীর একটু দমে গেছে। ওখানে এমন কনকনে শীত যে, গায়ে যেন ছুঁচ ফোটে।

আমিও কৌপীনমাত্র পরে ভস্ম মেখে গুহায় প্রবেশ করেছিলাম ; তখন শীত-গ্রীষ্ম কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডায় যেন জড় হয়ে গিয়েছিলাম।

তিন চারটে সাদা পায়রা দেখেছিলুম। তারা গুহায় থাকে কি নিকটবর্তী

পাহাড়ে থাকে, তা বুঝতে পারলুম না।

শুনেছি পায়রা দেখলে যা কামনা করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়।

ঐ দৈববাণী শোনা অবধি আমি আর কোন সঙ্কল্প রাখি না। মঠ-ফঠ করবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি ; মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে। তা ভেতরেরই হোক আর আর বাইরেরই হোক, তুই যদি নিজের কানে আমার মতো ঐরকম অশরীরী কথা শুনিস, তা হ'লে কি মিথ্যা বলতে পারিস? দৈববাণী সত্যসত্যই শোনা যায় ; ঠিক যেমন, এই আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে—তেমনি।[৬২]

বেলুড় মঠ, ২৫শে অক্টোবর, ১৮৯৮

আমার শরীর আবার খারাপ হয়েছে। তাই কাশ্মীর থেকে আমাকে দ্রুত কলকাতায় ফিরতে হ'য়েছে। ডাক্তারেরা বলেছেন যে আমার পক্ষে পুনরায় শীতে পরিব্রাজক হওয়া ঠিক হবে না। এর থেকে হতাশাজনক কি হতে পারে? যাই হোক, এই গ্রীষ্মে আমি আমেরিকাতে আসছি। মিসেস্ বুল্ এবং মিসেস্ ম্যাকলিয়ড এই বছরের কাশ্মীর ভ্রমণ খুব উপভোগ করেছেন।...

ক্রমশই আমার শরীরের উন্নতি হচ্ছে তার কয়েক মাস পরেই তো আমেরিকায় যাত্রা। "মা" জানেন আমাদের পক্ষে কোনটা সবচাইতে ভা'ল। তিনিই পথ দেখাবেন। আমি বর্তমানে ভক্তিতে বাঁধা। যত বয়স হ'চ্ছে, তত জ্ঞানের জায়গাটা ভক্তি দখল করছে।[৬৩]

বেলুড় মঠ, নভেম্বর, ১৮৯৮

এই যে সেদিন বৈদ্যনাথ দেওঘরে প্রিয় মুখুয্যের বাড়ি গিয়েছিলুম, সেখানে এমন হাঁপানি ধ'রল যে প্রাণ যায়। ভেতর থেকে কিন্তু শ্বাসে শ্বাসে গভীর ধ্বনি উঠতে লাগলো—'সোঽহং সোঽহং' ; বালিশে ভর ক'রে প্রাণবায়ু বেরোবার অপেক্ষা করছিলুম আর দেখছিলুম—ভেতর থেকে কেবল শব্দ হচ্ছে 'সোঽহং সোঽহং'—কেবল শুনতে লাগলুম 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন!'[৬৪]

কলকাতা, ১২ই নভেম্বর, ১৮৯৮

শ্রীমা (সারদা দেবী) আজ সকালে নূতন মঠ দেখতে যাচ্ছেন। আমিও সেখানে যাচ্ছি।[৬৫]

বেলুড় মঠ, ২২শে নভেম্বর, ১৮৯৮

মাননীয় মহারাজা, আজ মহারাজার কাছে আমার একটি অত্যন্ত দরকারি বিষয় পেশ করব। আপনাকে আমার জীবনের একমাত্র বন্ধু বলে জানি এবং

আপনার কাছে মনের কথা খুলে বলায় তিলমাত্র লজ্জা আমার নেই। যদি আপনার কাছে আমার এই বক্তব্যের কোন আবেদন থাকে ভালোই, নইলে বন্ধুসুলভ ক্ষমা দ্বারা আমার মূর্খতাকে ভুলে যাবেন।

আপনি অবগত আছেন, বিদেশ থেকে ফেরার পর থেকেই আমি ক্রমাগত ভুগছি। কলকাতায় থাকাকালীন মহারাজা আমায় তাঁর মহানুভব বন্ধুত্বের এবং ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, আমি যেন অসুস্থতার কারণে উদ্বিগ্ন না হই। কিন্তু এই অসুস্থতা সারবার নয় ; অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনার জন্য এই অসুস্থতা এসেছে এবং হাজার বায়ু পরিবর্তনই করি না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না উত্তেজনা, দুশ্চিন্তাদি দূর হচ্ছে ততক্ষণ কোন সুফল হবে না।

এই দুই বছর বিভিন্ন জলহাওয়া পরীক্ষা করে কাটল, কিন্তু স্বাস্থ্য প্রতিদিনই অবনতির দিকে চলেছে। আমি এখন প্রায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। আজ আমি মহারাজার আশ্বাস, মহানুভবতা ও বন্ধুত্বের কাছে একটি আবেদন করছি।

সর্বক্ষণ একটি পাপের কথা আমার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছে। আমি পার্থিব জগতে কিছু সেবা করে চলে যেতে চাই। আমার মায়ের প্রতি আমি বড় অবিচার করেছি। আমার মেজ ভাই চলে যাওয়ায় (এই সময় মহেন্দ্রনাথ বিদেশে গিয়েছিলেন) তিনি বড় বেশী কাতর হয়েছেন। এখন আমার শেষ ইচ্ছা, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য মায়ের সেবা করে পাপস্খালন করি। এখন আমি মায়ের কাছে থাকতে চাই, আমাদের বংশটি যাতে লোপ না পায় সেজন্য ছোট ভাইটির বিয়েও দিতে চাই। এতে আমার ও আমার গর্ভধারিণীর শেষ কয়টি দিন যে শান্তিপূর্ণভাবে কাটবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মা এখন এক ভাঙাচোরা বাসের অযোগ্য বাড়িতে বাস করছেন। আমি তাঁর জন্য একটা ছোট্ট সুন্দর বাড়ি তৈরি করাতে ইচ্ছুক। ছোট ভাইটির উপার্জন ক্ষমতা সম্পর্কে আমার আশা কম, তার জন্যও কিছু করে যাওয়া দরকার।

আপনি রাজা রামচন্দ্রের বংশধর ; যাকে ভালবাসেন, যাকে বন্ধু মনে করেন তার জন্য এই সাহায্য করা কি আপনার পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে? আমি জানি না আর কার কাছে আমি আমার এই আবেদন পেশ করব। ইউরোপ থেকে যা কিছু পেয়েছিলাম তার প্রতিটি কপর্দক আমি আমার আরব্ধ 'কর্মে' নিয়োজিত করেছি। আমি আমার জন্য অন্য কারও কাছে হাত পাততে পারি না। আমার পারিবারিক খুঁটিনাটি সব কথা আমি আপনার কাছে খুলে বলেছি এবং জগতের দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি সে কথা জানবে না। আমি ক্লান্ত,

বিষণ্ণ, মৃতকল্প—আমার প্রার্থনা, আপনার মহত্ত্বসুলভ এই শেষবারের দাক্ষিণ্য আমার প্রতি প্রদর্শন করুন। আমার প্রতি আপনি বহুবার যে বহুতর দয়া দেখিয়েছেন, এই শেষ দয়া সেগুলির অলংকাররূপে শোভা পাবে এবং আমার জীবনের শেষ দিনগুলো সহজ ও সুন্দরভাবে অতিবাহিত হবে। যে ঈশ্বরের সেবায় আমি জীবন উৎসর্গ করবার চেষ্টা করেছি সেই মহান ঈশ্বর যেন চিরদিন আপনার ও আপনার আত্মীয়বর্গের মাথায় তাঁর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বর্ষণ করেন।

পুনশ্চ ঃ এই চিঠি নিতান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয়।[৬৬]

বেলুড় মঠ, ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮

কাশীপুরে ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে ক'রে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলায় কি, আর কুটীরই কি।' সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে ক'রে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহু কাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।

প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন বুদ্ধির রঙে রঙিয়ে এক এক জনে এক এক রকম দেখে ও বোঝে। তিনি যেন মহাসূর্য, আর আমরা যেন প্রত্যেকে এক এক রকম রঙিন কাচ চোখে দিয়ে সেই একই সূর্যকে নানা রঙ-বিশিষ্ট ব'লে দেখছি।

এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থান হবে ; এখান থেকে যে মহাসমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।

ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামলো। আমার মনে এখন কি হচ্ছে, জানিস? এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। তোদের মতো ধার্মিক গৃহস্থেরা এর চারদিককার জমিতে ঘরবাড়ি ক'রে থাকবে, আর মাঝখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাকবে। আর মঠের ঐ দক্ষিণের জমিটায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাকবার ঘর-দোর হবে।

সময়ে সব হবে। আমি তো পত্তন-মাত্র ক'রে দিচ্ছি-এর পর আরও কত কি হবে! আমি কতক ক'রে যাব।[৬৭]

বেলুড় মঠ, ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৯৮

...'মা'ই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। আর যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে, সে-সকল তাঁরই বিধানে।...[৬৮]

বেলুড় মঠ, ২৬ শে জানুয়ারী ১৮৯৯

আমি আর একবার মৃত্যুর উপত্যকায় চলে গিয়েছিলাম। পুরোনো বহুমূত্র রোগ এখন অদৃশ্য হ'য়েছে। তার জায়গাতে যা এসেছে তাকে, ডাক্তাররা হাঁপানি বলছেন অন্যরা বলছেন অজীর্ণতা, যেটা স্নায়ুর অবসাদের জন্য। যাই হোক, খুবই বিরক্তিকর রোগ, যে কোনো লোককে দমবন্ধ হবার অনুভূতি দেয়—কখনও জের থাকে বেশ কয়েক দিনের জন্য। কোলকাতায় আমি সবচাইতে ভাল থাকি ; সুতরাং আমি এখানে বিশ্রামের জন্য আছি এবং শান্ত এবং স্বল্পাহারে। যদি মার্চে আমি ভাল হয়ে যাই, তাহলে আমি ইউরোপের পথে যাত্রা করব। মিসেস্ বুল আর অন্যান্যরা চলে গিয়েছেন, দুঃখ এই যে অসুস্থতার জন্য তাঁদের সঙ্গে যেতে পারলাম না।...

আমার জন্য মোটেও বিন্দুমাত্রও বিচলিত হ'য়ো না। "মা" যেমন চান সব জিনিস তেমনই হবে। আমাদের একমাত্র কাজ তাঁকে মান্য করা এবং অনুসরণ করা। [৬৯]

বেলুড় মঠ, এপ্রিল, ১৮৯৯

(স্বামী যোগানন্দের মৃত্যুর পরে)

"আমার প্রাণের ভাইটিকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন বলে ঠাকুরের ওপর আমার খুব রাগ হয়েছিল, তাই এই কদিন মন্দিরে আসিনি। ওদের [গুরুভাইদের] এত ভালবাসি কেন জানিস? ওদের সঙ্গে যতদিন আর যত অন্তরঙ্গভাবে কাটিয়েছি তত আমার নিজের সহোদর ভাইদের সঙ্গেও না।...কিন্তু ঠাকুরের ওপরেই বা আমি রাগ করবো কেন? আমি কেন আশা করবো, আমার ইচ্ছা মতো সব কিছু ঘটবে? আর দুঃখে আদৌ ভেঙে পড়বোই বা কেন? আমি না বীর? ঠাকুর আমার কাঁধে হাত রেখে বলতেন : " 'নরেন, তুই একটা বীর, তোকে দেখলেই আমি বুকে বল পাই।' হ্যাঁ, সত্যিই আমি বীর। তবে কেন আমি কাপুরুষের মতো দুঃখের কাছে মাথা নোয়াবো?" [৭০]

বেলুড় মঠ, ১১ই এপ্রিল, ১৮৯৯

দু-বছরের শারীরিক কষ্ট আমার বিশ বছরের আয়ু হরণ করেছে। ভাল কথা, কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। হয় কি? সেই-আপনভোলা আত্মা একই ভাবে বিভোর হয়ে তীব্র একাগ্রতা ও আকুলতা নিয়ে ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। [৭১]

বেলুড় মঠ, ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৯

যদি আমার বা আমার গুরুভ্রাতাদিগের কোনও একটি বিশেষ আহারের বস্তু ত্যাগ করিলে অনেক শুদ্ধসত্ত্ব এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের কার্যে সহায় হন, তাহা হইলে সে ত্যাগে আমাদের মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হবে না বা এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়বে না। তবে, এতদিন তেমন কাহাকেও তো দেখি নাই। দু-এক জন আমাদের hobby-র জায়গায় তাঁহাদের 'হবি' বসাইতে চাহিয়াছেন, এই পর্যন্ত। যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোনও উৎকট পাপ করিয়া নরক-ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি, জানিবেন। তবে মানুষ দেখতে দেখতে বৃদ্ধ হতে চলিলাম।

যে-সব দেশহিতৈষী গুরুপূজাটি ছাড়লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার একটুকু খুঁত আছে। বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড়-ছেঁড়, প্রাণ যায়-যায়, কণ্ঠে ঘড়-ঘড় ইত্যাদি—আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ ক'রে দিলে?

তবে ঠাকুরের আঁটিটি গলায় আটকে যদি সব মারা যায় তো না হয় আঁটিটি ছাড়িয়া দেওয়া যায়।[৭২]

বেলুড় মঠ, ১০ই মে, ১৮৯৯

আবার ভাল হয়ে যাচ্ছি। আমার মনে হয় আমার সমস্ত অসুবিধার মূলে ঠিকমত হজম না হওয়া এবং স্নায়বিক ক্লান্তি। হজমের ব্যাপারে আমি যত্ন নিচ্ছি, দ্বিতীয় সাফল্যর সবটাই দূর হবে যখন তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। তুমি জান যে পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ একটা মহা উল্লাসের ব্যাপার! অতএব উল্লসিত হও! বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই। আমি এখন যে সব নিরাশার লাইন লিখছি তা একেবারেই বিশ্বাস করো না ; কারণ কখনও কখনও আমি নিজের মধ্যে থাকি না। আমি এত নার্ভাস হয়ে পড়ি।

যেমন করেই হোক এই গ্রীষ্মে ইউরোপে যাব।[৭৩]

কলকাতা, মে (?), ১৮৯৯

বাপ্, কতই না খেটেছি! আমেরিকানরা ভালবেসে এই দেখ্ খাট বিছানা গদি দিয়েছে! দুটো খেতেও পাচ্ছি। কিন্তু ভাই, ভোগ আমার অদৃষ্টে নেই। গদিতে শুলেই রোগ বাড়ে, হাঁপিয়ে মরি। আবার মেজেয় শুয়ে পড়ি, তবে বাঁচি।[৭৪]

কলকাতা, মে (?), ১৮৯৯

'আজ বড় মজা হয়েছে। একজনের বাড়ি গেছলুম—সে একটা ছবি

আঁকিয়েছে—কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রথের উপর, ঘোড়ার লাগাম হাতে অর্জুনকে গীতা বলছেন। ছবিটা দেখিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়েছে? আমি বললুম, মন্দ কি! সে জিদ ক'রে বললে, সব দোষগুণ বিচার ক'রে বল—কেমন হয়েছে। কাজেই বলতে হ'ল—কিছুই হয়নি। প্রথমতঃ 'রথটা' আজকালের প্যাগোডা রথ নয়, তারপর কৃষ্ণের ভাব কিছুই হয়নি।

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর ছবিতে যে-সব রথ আঁকা আছে, দেখেছিস? দু-চাকার, পিছন দিয়ে ওঠা-নাবা যায়—সেই রথ আমাদের ছিল। একটা ছবি আঁকলেই কি হ'ল?

শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস?—সমস্ত গীতাটা personified (মূর্তিমান্)! যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলছেন, তখন তাঁর সেন্ট্রাল আইডিয়া শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।

এমনি ক'রে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা-দুটো প্রায় হাঁটুগাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে—ঘোড়াগুলো হাঁ ক'রে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় action খেলছে। তাঁর সখা ত্রিভুবনবিখ্যাত বীর ; দু-পক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মত রথের ওপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই-রকম ঘোড়ারাশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই স্বর্গীয় প্রেমকরুণামাখা বালক সুলভ মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন।

অ্যাই!—সমস্ত শরীরে intense action আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর ও প্রশান্ত। এই হ'ল গীতার সেন্ট্রাল আইডিয়া দেহ জীবন প্রাণ মন সবই তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির ও গম্ভীর। [৭৫]

এদেশে আমি কি করতে চাই

প্রতীচ্যের জনগণের উদ্দেশে আমার বাণী তেজোদীপ্ত। হে প্রিয় স্বদেশবাসিগণ! তোমাদের প্রতি আমার বাণী বলিষ্ঠতর। প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণী আমার সাধ্যানুযায়ী আমি প্রতীচ্য জাতিসমূহের কাছে প্রচার করবার চেষ্টা করেছি। ওটা ভাল হয়েছে, কি মন্দ হয়েছে, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে।

কিন্তু সেই ভবিষ্যতের বলদৃপ্ত কণ্ঠের মৃদু অথচ নিশ্চিত বাণী স্পন্দিত হচ্ছে, দিনে দিনে সেই ধ্বনি স্পষ্টতর হচ্ছে—ওটা বর্তমান ভারতের কাছে ভবিষ্যৎ ভারতের বাণী।

নানা জাতির মধ্যে অনেক আশ্চর্য প্রথা ও বিধি, অনেক অদ্ভুত শক্তি ও ক্ষমতার বিকাশ লক্ষ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, আচার-ব্যবহারের—সংস্কৃতি ও শক্তির আপাত বৈচিত্র্যের অন্তরালে একই মনুষ্যহৃদয় একই ধরনের আনন্দ-বেদনা, সবলতা ও দুর্বলতা নিয়ে স্পন্দিত হচ্ছে।

ভাল মন্দ সর্বত্রই আছে। তাদের সামঞ্জস্যও আশ্চর্যভাবে বিদ্যমান। কিন্তু সকলের ঊর্ধ্বে সর্বত্র সেই গৌরবদীপ্ত মানবাত্মা—তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে জানলে সে কখনও কাকেও ভুল বোঝে না। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এমন নরনারী আছেন, যাঁদের জীবন মানবজাতির পক্ষে আশীর্বাদ-স্বরূপ। তাঁরা সম্রাট অশোকের সেই বাণীর প্রমাণস্বরূপ—'প্রত্যেক দেশেই ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা বাস করেন।'

যে পবিত্র ভালবাসার সঙ্গে প্রতীচ্যের অধিবাসিগণ আমাকে গ্রহণ করেছিলেন, তা নিঃস্বার্থ হৃদয়েই সম্ভব, সে-দেশের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই মাতৃভূমির প্রতিই আমার সারা জীবনের আনুগত্য ; এবং আমাকে যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, তবে সেই সহস্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার স্বদেশবাসীর, হে আমার বন্ধুবর্গ—তোমাদেরই সেবায় ব্যয়িত হবে।

আমার দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক যা কিছু সম্বল—সে-সবই তো আমি এই দেশের কাছে পেয়েছি, এবং যদি আমি কোন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে থাকি, সে গৌরব আমার নয়, তোমাদের। আবার দুর্বলতা ও ব্যর্থতা—সবই আমার ব্যক্তিগত, সে-সবই এ দেশবাসীকে যে মহতী ভাবধারা আজন্ম ধারণ করে রাখে, তা দ্বারা সমৃদ্ধ হবার শক্তির অভাববশতঃ।...

আমরা সবাই ভারতের অধঃপতন সম্বন্ধে শুনে থাকি। এককালে আমিও এটা বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়িয়ে, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে, সর্বোপরি দেশের সংস্পর্শে এসে তাদের অতিরঞ্জিত চিত্রসমূহের বাস্তব রূপ দেখে সবিনয়ে স্বীকার করছি, আমার ভুল হয়েছিল।

হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো কখনও অবনতি হয় নি। কত রাজদণ্ড চূর্ণ হয়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, কত শক্তির দণ্ড এক হাত থেকে অন্য হাতে গিয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা ও রাজসভা অতি অল্প লোককেই প্রভাবিত

করেছে। উচ্চতম থেকে নিম্নতম শ্রেণী অবধি বিশাল জনসমষ্টি আপন অনিবার্য গতিপথে ছুটে চলেছে ; জাতীয় জীবনস্রোতে কখন মৃদু অর্ধচেতনভাবে, কখন প্রবল জাগ্রতভাবে প্রবাহিত হয়েছে। শত শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার সামনে আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে দণ্ডায়মান, সে শোভাযাত্রার কোন কোন অংশে আলোকরেখা-স্তিমিত প্রায়, পরক্ষণে দ্বিগুণতেজে ভাস্বর, আর তার মাঝখানে আমার দেশমাতৃকা রানীর মতো পদবিক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন ; স্বর্গ বা মর্ত্যের কোন শক্তির সাধ্য নেই—এ জয়যাত্রার গতিরোধ করে। [১]

ঐ সদা আশীর্বাদপুষ্ট ভূমি যা আমাকে এই শরীর প্রদান করেছে, আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সেদিকে ফিরে তাকাই এবং যাঁরা যে দয়াময় পৃথিবীর এই পবিত্রতম জায়গায়, আমাকে জন্মগ্রহণে অনুমতি দিয়েছেন, আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের স্মরণ করি। সমগ্র পৃথিবী যখন ধনবান ও শক্তিবানদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষদের খোঁজার চেষ্টা করছে, তখন একমাত্র হিন্দুরা সন্তদের থেকে তাদের আদিপুরুষদের সন্ধান করে গর্ববোধ করছে।

সেই অদ্ভুত তরণী যা যুগ যুগ ধরে জীবনসমুদ্রে নর এবং নারীদের বহন ক'রে চলেছে, হতে পারে হয়তো কখনো কখনো ফুটোফাটা বেরিয়েছে।

যদি কোনোরকম ফুটো সেখানে থাকেও, সামান্য একজন সন্তান হিসেবে আমার কর্তব্য সেই ডুবে যাওয়া জাহাজকে জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করা। যদি আমি দেখতে পাই যে আমার সেই সংগ্রাম বিফলে গেল, তবুও যেহেতু প্রভু আমার সাক্ষী, আমি তাদের আশীর্বাদ করে বলব যে : "হে আমার ভ্রাতৃগণ ; তোমরা ভালই করেছ—অন্ততঃ যে কোনো জাতি এই জাতীয় পরিস্থিতিতে যতটা করতে পারত তার চেয়ে। আমার যা কিছু আছে তা তোমাদেরই দান। শেষ সময় পর্যন্ত তোমাদের পাশে থাকবার সুযোগ আমাকে দাও, এসো আমরা একসঙ্গে ডুবে যাই। [২]

আমার দৃঢ় ধারণা—কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক রেখে বাঁচতে পারে না। আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা বা নীতি সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এইরকম চেষ্টা করা হয়েছে, যেখানেই কোন জাতি আপনাকে পৃথক রেখেছে, সেখানেই তার পক্ষে ফল অতিশয় শোচনীয় হয়েছে।

আমার মনে হয়, ভারতে অধঃপতন ও অবনতির প্রধান কারণ—জাতির চারিদিকে এইরকম আচারের বেড়া দেওয়া। প্রাচীনকালে এই আচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুরা যেন চতুষ্পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধদের সংস্পর্শে না আসে। এর ভিত্তি—অপরের প্রতি ঘৃণা।[৩]

যে-সব নীতি অবলম্বন করে আমার জীবন পরিচালিত হচ্ছে, তার মধ্যে একটি এই যে, আমি কখন আমার পূর্বপুরুষগণকে স্মরণ করে লজ্জিত হই নি। জগতে যত গর্বিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছে, আমি তাদের অন্যতম ; কিন্তু আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি, আমার নিজের কোন গুণ বা শক্তি নিয়ে আমি অহঙ্কার করি না, আমি আমার প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করে থাকি। যতই আমি অতীতের আলোচনা করি, যতই আমি পিছনের দিকে চেয়ে দেখি, ততই গৌরব বোধ করি। এতেই আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সাহস এসেছে, আমাকে পৃথিবীর ধূলি হতে তুলে মহান্ পূর্বপুরুষগণের মহান্ অভিপ্রায় কাজে পরিণত করতে নিযুক্ত করেছে।[৪]

এই আমি একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি ; তথাপি আমার জাতির—আমার পূর্বপুরুষগণের গৌরবে আমি গৌরব অনুভব করে থাকি। আমি যে তোমাদের একজন অযোগ্য দাস, এতে আমি গর্ব অনুভব করে থাকি। তোমরা ঋষির বংশধর, সেই অতিশয় মহিমময় পূর্বপুরুষগণের বংশধর—আমি যে তোমাদের স্বদেশীয়, এতে আমি গর্ব অনুভব করে থাকি। অতএব তোমরা আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হও, পূর্বপুরুষগণের নামে লজ্জিত না হয়ে তাঁদের নামে গৌরব অনুভব কর।[৫]

আমিও স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাস করি। আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎ কাজ করতে গেলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা—আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি কতটুকু সাহায্য করতে পারে আমাদের? ওরা কেবল কয়েক পদ এগিয়ে দেয় মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়ে মহাশক্তির প্রেরণা এসে থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের কাছে উন্মুক্ত।

হে ভাবী সংস্কারকগণ, ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধররা পশুপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব

করছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরে অর্ধাশনে কাটাচ্ছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝছ—অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করেছে? তোমরা কি এই-সব ভেবে অস্থির হয়েছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছে? তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে কি এই ভাবনা মিশে গিয়েছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করে তুলেছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হয়েছে? ঐ চিন্তায় বিভোর হয়ে তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলেছ? তোমাদের এরকম হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে, তবে বুঝবে তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করেছ।[৬]

বহু প্রাচীনকাল থেকে অন্যে বলেছে—তোরা হীন, তোদের কোন শক্তি নেই। তোরাও তাই শুনে আজ হাজার বছর হ'তে চ'লল ভাবছিস—আমরা হীন, সব বিষয়ে অকর্মণ্য। ভেবে ভেবে তাই হয়ে পড়েছিস। (নিজের শরীর দেখিয়ে) এ দেহও তো তোদের দেশের মাটি থেকেই জন্মেছে। আমি কিন্তু কখনও ওরকম ভাবিনি। নিজের ওপর আমার প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল। তাই দেখ্ না, তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছায়, যারা আমাদের চিরকাল হীন মনে করে, তারাই আমাকে দেবতার মতো খাতির করেছে ও করছে। তোরাও যদি ঐরকম ভাবতে পারিস—'আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে' এবং অনন্তের ঐ শক্তি জাগাতে পারিস তো তোরাও আমার মতো হ'তে পারিস।

তোরা বলবি, "ঐরূপ ভাববার শক্তি কোথায়? ঐ কথা শোনাবে ও বুঝিয়ে দেবে, এমন শিক্ষক বা উপদেষ্টাই বা কোথায়?"

তাই তো আমি এসেছি অনুরূপ শেখাতে ও দেখাতে। তোরা আমার কাছ থেকে ঐ তত্ত্ব শেখ, বোঝ, অনুভব কর্—তারপর নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ঐ ভাব ছড়িয়ে দে। সকলকে গিয়ে বল্—'ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও না ; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, এ কথা বিশ্বাস করো, তা হলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে।'[৭]

আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, তোদের ভেতর অনন্ত শক্তি রয়েছে! সেই শক্তি জাগা ; ওঠ্, ওঠ্, লেগে পড়ে, কোমর বাঁধ্। কি হবে দু-দিনের ধন-মান নিয়ে? আমার ভাব কি জানিস? আমি মুক্তি-ফুক্তি চাই না। আমার কাজ

চাচ্ছে—তোদের ভেতর এই ভাবগুলি জাগিয়ে দেওয়া ; একটা মানুষ তৈরি করতে লক্ষ জন্ম যদি নিতে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত।[৮]

আমার কথা বলতে গেলে, আমি স্বদেশবাসীর উন্নতিকল্পে যে কাজে হস্তক্ষেপ করেছি, তা সম্পন্ন করবার জন্য প্রয়োজন হলে দু'শ বার জন্মগ্রহণ করব।[৯]

এবার আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে যাব। আমি সবেমাত্র আমার কাজ আরম্ভ করেছি। আমি আমেরিকাতে একটি বা দুটি তরঙ্গ তুলেছি মাত্র ; সেখানে একটা মহাপ্লাবন তুলতে হবে। সমাজকে একেবারে ওলটপালট করে দিতে হবে। সমগ্র জগতে একটা নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে হবে। তখন সমগ্র বিশ্ব বুঝতে পারবে মহাশক্তি কী এবং আমি কি জন্য এসেছি। আগেরবার আমি যে শক্তি প্রদর্শন করেছি, সে তুলনায় এবারকার শক্তি হবে আরও বিপুল ও প্রবল।[১০]

তোমার আমার ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, সে-জন্য প্রভুর কাজ আটকে থাকে না। তিনি সামান্য ধূলি হতেও তাঁর কাজের জন্য শত সহস্র কর্মী সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর অধীনে থেকে কাজ করা তো আমাদের পক্ষে সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।[১১]

ঠাকুরের কাজের জন্য একটু হাঙ্গামের দরকার ছিল, তা হয়ে গেছে, বেশ কথা।[১২]

ভারত দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণা সয়েছে, সনাতন ধর্মের ওপর বহুকাল ধরে অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু প্রভু দয়াময়, তিনি আবার তাঁর সন্তানগণের পরিত্রাণের জন্য এসেছেন। পতিত ভারতকে আবার জাগরিত হবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ চারদিকে প্রচার করতে হবে, যেন হিন্দুসমাজের সর্বাংশে—প্রতি অণুতে পরমাণুতে এই উপদেশ ওতপ্রোতভাবে ছড়িয়ে যায়।[১৩]

আমার গুরুদেব বলতেন, হিন্দু খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম—মানুষ মানুষে পরস্পর ভ্রাতৃভাবের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আগে ঐসব ঐগুলি ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করতে হবে। পরের মঙ্গল করবার শক্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি, এখন কেবল অশুভ প্রভাবের বিস্তার। এদের কুৎসিত কুহকে পড়ে

আমাদের মধ্যে যাঁরা সেরা তাঁরাও অসুরবৎ ব্যবহার ক'রে থাকেন। ঐগুলি ভাঙবার জন্য কঠোর চেষ্টা করতে হবে এবং আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হব।

তাই তো একটা কেন্দ্র স্থাপন করবার জন্য আমার এত আগ্রহ। সংঘের অনেক দোষ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ছাড়া কিছু হবারও জো নেই।

ভিতর থেকে যেরকম প্রেরণা আসে, সেভাবে কাজ করা উচিত। যদি কাজটা ঠিক ঠিক এবং ভাল হয়, তবে হয়তো মরে যাবার শত শত শতাব্দী পরে সমাজকে তাঁর দিকে ঘুরে আসতেই হবে। দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে সর্বান্তঃকরণে আমাদের কাজে লেগে যেতে হবে। একটা ভাবের জন্য যতদিন পর্যন্ত না আমরা আর কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছি, ততদিন কোন কালে আলো দেখতে পাব না।

যাঁরা মানবজাতিকে কোনপ্রকার সাহায্য করতে চান, তাঁদের এইসব সুখ দুঃখ, নাম যশ, এবং যত প্রকার স্বার্থ আছে সেসব পোঁটলা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে এবং ভগবানের কাছে আসতে হবে। সকল আচার্যই এই কথা ব'লে গেছেন এবং ক'রে গেছেন।

আমার ভাব ও জীবন—সবই উৎসর্গ করেছি, ভগবান আমার সহায়, আর সাহায্য চাই না। এইটাই সিদ্ধির একমাত্র রহস্য।[১৪]

দূরে—অতি দূরে, লিপিবদ্ধ ইতিহাস, এমন কি ঐতিহ্যের ক্ষীণ রশ্মিজাল পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করতে অসমর্থ—অনন্তকাল সেই আলোক স্থিরভাবে জ্বলছে। বহিঃপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে কখন কিছুটা ক্ষীণ, কখন অতি উজ্জ্বল, কিন্তু চিরকাল অনির্বাণ ও স্থির থেকে শুধু সমগ্র ভারতে নয়, সমগ্র ভাবরাজ্যে তার নীরব অননুভূত, শান্ত অথচ সর্বশক্তিমান্ পবিত্র রশ্মি বিকিরণ করছে। উষাকালীন শিশিরসম্পাতের মত অশ্রুত ও অলক্ষ্যভাবে অতি সুন্দর গোলাপ-কলিকে প্রস্ফুটিত করছে—এটাই উপনিষদের ভাবরাশি, এটাই বেদান্তদর্শন।

আমি নিঃসঙ্কোচে বলছি, মানুষ আধ্যাত্মিক রাজ্যের যা কিছু পেয়েছে বা পাবে, তাই তার প্রথম ও তাই শেষ। ভারতেও প্রাচীন বা আধুনিক কালে বিরোধী সম্প্রদায় বর্তমান থাকলেও এদের সবগুলিই উপনিষদ্ বা বেদান্তরূপ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সব সম্প্রদায়েরই উপনিষদের প্রামাণ্য মেনে চলা উচিত, কিন্তু এই-সব সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা আপাততঃ অনেক বিরোধ দেখতে পাই। উপনিষদ্-সমূহের মধ্যে যে অপূর্ব সমন্বয় রয়েছে, অনেক সময় প্রাচীন বড় বড় ঋষিগণ পর্যন্ত তা ধরতে পারেন নি।

উপনিষদের মন্ত্রগুলির মধ্যে গূঢ়রূপে যে সমন্বয়ভাব রয়েছে, এখন তার ব্যাখ্যা ও প্রচার আবশ্যক। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে-সমন্বয় রয়েছে, তা জগতের কাছে স্পষ্টভাবে দেখাতে হবে।

ঈশ্বর-কৃপায় আমার এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়েছিল, যাঁর সমগ্র জীবনই উপনিষদের এই মহাসমন্বয়ের ব্যাখ্যা-স্বরূপ—যাঁর জীবন উপনিষদ্‌মন্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ। তাঁকে দেখলে মনে হত, উপনিষদের ভাবগুলি বাস্তবিকই যেন মানবমূর্তি ধরে প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবতঃ সেই সমন্বয়ের ভাব আমার ভিতরেও কিছু এসেছে। আমি জানি না, জগতের কাছে তা প্রকাশ করতে পারব কি না, কিন্তু বৈদান্তিক সম্প্রদায়গুলি যে পরস্পরবিরোধী নয়, পরস্পর-সাপেক্ষ, একটি যেন অন্যটির পরিণতি-স্বরূপ, একটি যেন অন্যটির সোপান-স্বরূপ এবং সর্বশেষ চরম লক্ষ্য অদ্বৈতে 'তত্ত্বমসি'তে পর্যবসিত, এটা দেখানোই আমার জীবনব্রত।[১৫]

প্রশ্নঃ এটা সত্য হ'লে, পূর্ববর্তী আচার্যগণের কেউ এ বিষয় কখনও উল্লেখ করেন নি কেন?

—ঐ-জন্যই, আমার জন্ম ঐ কাজ আমারই জন্য নির্দিষ্ট ছিল।[১৬]

আত্মজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। আর সবই মায়া—ভেলকিবাজি![১৭]

আমার মনে পড়ছে, কাশ্মীরের কোন পল্লীগ্রামে জনৈক বৃদ্ধা মুসলমান মহিলার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কোন্ ধর্মাবলম্বী? তিনি তাঁর নিজ ভাষায় সতেজে উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ; তাঁর দয়ায় আমি মুসলমানী।' তারপর একজন হিন্দুকেও সেই প্রশ্ন করাতে সে সাদাসিধা ভাষায় বলেছিল—'আমি হিন্দু।'

কঠোপনিষদের সেই মহাবাক্যটি মনে পড়ছে—'শ্রদ্ধা' বা অপূর্ব বিশ্বাস। এই 'শ্রদ্ধা' বা যথার্থ বিশ্বাস প্রচার করাই আমার জীবনব্রত। তোমরা যে-দার্শনিকমতই অবলম্বন কর না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। আমি শুধু এখানে প্রমাণ করতে চাই যে, সমগ্র ভারতে 'মানবজাতির পূর্ণতায় অনন্ত বিশ্বাস-রূপ প্রেমসূত্র' ওতপ্রোতভাবে বর্তমান, আমি স্বয়ং এটা বিশ্বাস করে থাকি ; ঐ বিশ্বাস সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হোক।[১৮]

ভারতের জন্য যে পরিকল্পনা আমার মনে রূপ পেয়েছে, তা এই : ভারতের সন্ন্যাসীদের কথা আমি আপনাদের বলেছি। কেমন করে আমরা কোনরকম মূল্য গ্রহণ না করে অথবা একখণ্ড রুটির বিনিময়ে দ্বারে দ্বারে ধর্মপ্রচারে করে থাকি, তাও বলেছি। সেইজন্য ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ব্যক্তিও ধর্মের মহত্তম ভাবরাশি ধারণ করে। এ সবই এই সন্ন্যাসীদের কাজ। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায়—'ইংরেজ কারা?' সে উত্তর দিতে পারবে না।...

'তোমাদের শাসনকর্তা কে?' 'জানি না।' 'শাসনতন্ত্র কি?'—তা জানে না। কিন্তু দর্শনের মূলতত্ত্ব তারা জানে। যে ইহজগতে তারা দুঃখকষ্ট ভোগ করে, সেই জগৎ সম্বন্ধে তাদের ব্যবহারিক জ্ঞানেরই অভাব। এই-সব লক্ষ লক্ষ মানুষ পরলোকের জন্য প্রস্তুত—এই কি যথেষ্ট? কখনই নয়। একটুকরা ভাল রুটি এবং একখণ্ড ভাল কম্বল তাদের প্রয়োজন। বড় প্রশ্ন এই, এ-সব লক্ষ লক্ষ পতিত জনগণের জন্য সেই ভালো রুটি আর ভালো কম্বল কোথা থেকে মিলবে?

প্রথমেই বলব, তাদের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ পৃথিবীতে তারা সবচেয়ে শান্ত জাতি। তারা যে ভীরু, তা নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা অসুর-পরাক্রমে যুদ্ধ করে। ইংরেজের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায় থেকে সংগৃহীত। মৃত্যুকে তারা গ্রাহ্য করে না। তাদের মনোভাব এই : 'এ জন্মের পূর্বে অন্ততঃ বিশ বার মরেছি, হয়তো তারপর আরও অসংখ্যবার মরব। তাতে কী আসে যায়?' তারা কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না। বিশেষ ভাবপ্রবণ না হলেও যোদ্ধা হিসাবে তারা ভালো।

তাদের জন্মগত প্রবৃত্তি অবশ্য কৃষিকর্মে। আপনি তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিন, তাদের হত্যা করুন, করভারে জর্জরিত করুন, যা ইচ্ছা করুন—যতক্ষণ তাদের স্বাধীনভাবে ধর্ম আচরণ করতে দিচ্ছেন, তারা শান্ত ও নম্র থাকবে। তারা কখনও অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করে না। 'আমাদের ভাবানুযায়ী ঈশ্বরের আরাধনা করবার অধিকার আমাদের দাও আর সব কেড়ে নাও'—এই তাদের মনোভাব। ইংরেজরা যখনই ঐ জায়গায় হস্তক্ষেপ করে, অমনি গণ্ডগোল শুরু হয়। ওটাই ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহি বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ—ধর্ম নিয়ে নির্যাতন ভারতবাসী সহ্য করবে না। ভারতবাসীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে গিয়েই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য এক কথায় শূন্যে মিলিয়ে গেল।...

এই পবিত্র ও সরল কৃষককুল কেন দুঃখভোগ করবে? এ পর্যন্ত কোন

জাতিগত সভ্যতাই সম্পূর্ণ সার্থক হয় নি। ঐ সভ্যতাকে কিছুটা এগিয়ে দাও, তবেই তা স্বীয় লক্ষ্যে পৌছুবে। ঐ সভ্যতাকে আমূল পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করবেন না। একটা জাতির প্রচলিত প্রথা, নিয়মকানুন, রীতিনীতি বাদ দিলে তার আর কী অবশিষ্ট থাকে? ঐগুলিই জাতিকে সংহত করে রাখে।

কিন্তু অতি পণ্ডিত এক বিদেশী এসে বললেন, 'দেখ তোমাদের সহস্র বৎসরের রীতিনীতি নিয়ম-কানুন ছেড়ে দিয়ে আমাদের এই খালি পাত্রটি গ্রহণ কর।'—এটা নিতান্ত মূর্খতা।

পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে, কিন্তু এ-বিষয়ে আমাদের আর একটু অগ্রসর হতে হবে। সাহায্য করতে গিয়ে নিঃস্বার্থ হওয়া প্রয়োজন। 'আমি তোমাকে যেরকম করতে বলি, ঠিক সেরকম করলে তবে তোমায় সাহায্য করব, নতুবা নয়।'—এর নাম কি সাহায্য?...

অবশ্যই বলব সন্ন্যাস-ব্যবস্থায় আমি খুব বেশী বিশ্বাসী নই। ঐ ব্যবস্থার অনেক গুণ আছে অনেক দোষও আছে। সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা উচিত।

...পরিকল্পনাটি এতক্ষণে কাগজে কলমে সুন্দরভাবে লিখিত হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলি, আমি আদর্শবাদের স্তর থেকেই এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম। এ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি শিথিল ও আদর্শবাদীই ছিল। যত দিন যেতে লাগল, ততই তা সংহত ও নিখুঁত হতে লাগল ; প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে নেমে আমি তার ত্রুটি প্রভৃতি লক্ষ্য করলাম।

বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করতে গিয়ে আমি কী আবিষ্কার করলাম? প্রথমতঃ এই সন্ন্যাসীদের শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তুলবার কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। যেমন ধরুন, কাউকে আমি ক্যামেরা দিয়ে পাঠালাম ; তাকে ঐ-সব বিষয়ে সর্বপ্রথম শিক্ষিত হতে হবে। ভারতবর্ষে প্রায় সব লোকই অশিক্ষিত, সুতরাং শিক্ষার জন্য প্রচণ্ড শক্তিশালী বহু কেন্দ্র প্রয়োজন। এর অর্থ কি দাঁড়ায়?—টাকা। আদর্শবাদের জগৎ থেকে আপনি প্রতিদিনের কর্মক্ষেত্রে নেমে এলেন।

আমি আপনাদের দেশে চার বৎসর ও ইংলণ্ডে দু বছর কঠোর পরিশ্রম করেছি।...

আমেরিকান ও ইংরেজ বন্ধুরা আমার সঙ্গে ভারতে গিয়েছেন এবং অতি-সাধারণভাবে কাজের সূচনা হয়েছে। কয়েকজন ইংরেজ সঙ্গে যোগদান করেছেন। একজন হতভাগ্য দরিদ্র কর্মী অতিরিক্ত পরিশ্রম করে মৃত্যুবরণ

করেছেন। এক ইংরেজ দম্পতি অবসর গ্রহণ করে, নিজেদের সামান্য যা কিছু সংস্থান আছে, তার দ্বারা হিমালয়ে একটি কেন্দ্রস্থাপন করে শিক্ষা দিচ্ছেন। আমি তাঁদের আমার দ্বারা স্থাপিত একটি পত্রিকা—'প্রবুদ্ধ ভারত' দিয়েছি। তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাদান ও অন্যান্য কাজ করছেন। আমার আর একটি কেন্দ্র আছে কলকাতায়।...

এ-কথা বলতে আমি আনন্দ বোধ করছি, যে অতি সাধারণভাবে আমি কাজ আরম্ভ করেছি। কিন্তু ঠিক ঐরকম কাজ আমি সমান্তরালভাবে মেয়েদের জন্যও করতে চাই।[১৯]

আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতে বা ভারতের বাইরে মনুষ্যজাতি যে মহৎ চিন্তারাশি উদ্‌ভাবন করেছে, তা অতি হীন, অতি দরিদ্রের কাছে পর্যন্ত প্রচার করা। তারপর তারা নিজেরা ভাবুক। জাতিভেদ থাকা উচিত কি না, স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। 'চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতার উপরেই নির্ভর করে জীবন, উন্নতি এবং কল্যাণ'। এর অভাবে মানুষ, বর্ণ ও জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।...

আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটি যন্ত্র চালিয়ে যাব—যা প্রত্যেক মানুষের কাছে উচ্চ ভাবরাশি বহন করে নিয়ে যাবে। তারপর পুরুষই হোক আর নারীই হোক—নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করবে।[২০]

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য চরণস্পর্শে যে মুষ্টিমেয় যুবকদলের অভ্যুদয় হয়েছে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তারা আসাম থেকে সিন্ধু, হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত তাঁর উপদেশামৃত প্রচার করছে। তারা পদব্রজে ২০,০০০ ফুট ঊর্ধ্বে হিমালয়ের তুষাররাশি অতিক্রম করে তিব্বতের রহস্য ভেদ করেছে। তারা চীরধারী হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছে। কত অত্যাচার তাদের উপর দিয়ে গিয়েছে—এমন কি তারা পুলিসের দ্বারা অনুসৃত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, অবশেষে যখন গভর্নমেন্ট বিশেষ প্রমাণ পেয়েছে তারা নির্দোষ তখন তারা মুক্তিলাভ করেছে।[২১]

পাঁচ-সাতটা ছোঁড়াতে মিলে, যাদের এক পয়সাও নেই, একটা কাজ আরম্ভ করলে—যা এখন এমন accelerated (ক্রমবর্ধমান) গতিতে বাড়তে চ'লল—এ হুজুক, কি প্রভুর ইচ্ছা?[২২]

'জগতে পাপ নেই'—আমি নাকি এই ঘোর পৈশাচিক তত্ত্ব প্রচার করে

থাকি ; জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লোকে আমাকে এজন্য গালি দিয়েছে। ভাল কথা, কিন্তু এখন যারা আমায় গালি দিচ্ছে, তাদেরই বংশধরগণ—আমি অধর্ম প্রচার করি নি, ধর্মই প্রচার করেছি বলে আমাকে আশীর্বাদ করবে। অজ্ঞানান্ধকার বিস্তার না করে জ্ঞানালোক বিস্তার করবার চেষ্টা করছি বলে আমি গৌরব অনুভব করে থাকি।[২৩]

ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করে তাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখে আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়ে অশ্রুজল বিসর্জন করতাম। কেন এ পার্থক্য হল? শিক্ষা—জবাব পেলাম।[২৪]

আমেরিকায় যে বিছানাগুলোয় ওরা শোয় তা যেমন নরম তেমনি আরামদায়ক। ও রকম বিছানা তোরা এদেশে চোখেই দেখিসনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে দীনদুঃখীদের কথা ভেবে ভেবে রাতে আমার ঘুম আসতো না। রাতের পর রাত দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি। মেঝেতে শুয়ে ছট্‌ফট্ করেছি।[২৫]

ঠিক ঠিক জিজ্ঞাসুর কাছে দু-রাত্রি বকলেও আমার শ্রান্তি বোধ হয় না, আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রে আমি অনবরত বকতে পারি। ইচ্ছা করলে তো আমি হিমালয়ের গুহায় সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারি। তবে কেন ঐরকম করি না? কেনই বা এদেশে রয়েছি? কেবল দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আর স্থির থাকতে পারিনে। সমাধি-ফমাধি তুচ্ছ বোধ হয়, 'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং' হয়ে যায়। তোদের মঙ্গল-কামনা হচ্ছে আমার জীবনব্রত। যে দিন ঐ ব্রত শেষ হবে, সে দিন দেহ ফেলে চোঁচা দৌড় মারব।[২৬]

আমি দুনিয়া ঘুরে দেখলুম, এ দেশের মতো এত অধিক তামস-প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাইরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভেতরে একেবারে ইট-পাটকেলের মতো জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে? এমন অকর্মা, অলস, শিশ্নোদরপরায়ণ জাত দুনিয়ায় কতদিন আর বেঁচে থাকতে পারবে?

আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে দৈহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই! কি হবে রে, জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা? আমি নেড়ে চেড়ে এদের ভেতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত

জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম।[২৭]

আমি নির্দ্বিধায় বলব যে আমার সারা জীবনের কাজের অভিজ্ঞতায়, আমি সবসময়েই লক্ষ্য করেছি যে অকাল্টিজিম্ মানবজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুর্বল করে। আমরা চাই শক্তি। অন্য জাত অপেক্ষা আমরা ভারতীয়রা, শক্তিময় এবং উৎসাহব্যঞ্জক চিন্তা চাই। সব বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট অতিসূক্ষ্মতা র'য়েছে। শত শত বছর ধরে আমরা রহস্যময়তায় পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছি ; ফলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত বিষয় এবং আধ্যাত্মিকতা পরিপাক করা দুর্বল হ'য়ে গেছে, সমস্ত জাতটা নৈরাশ্যজনকভাবে পুরুষত্বহীনতার গভীরে নেমে এসেছে—প্রত্যেক বীর্যবান জাতির গঠনের জন্য একটা তাজা এবং উৎসাহজনক চিন্তাধারা থাকা উচিত।

সমস্ত পৃথিবীকে আরও যথোপযুক্ত শক্তিশালী করার জন্য উপনিষদ র'য়েছে। অদ্বৈতবাদ হ'চ্ছে শক্তির শাশ্বত আকর। কিন্তু এর জন্যে খাটতে হবে, পাণ্ডিত্যের কঠিন আবরণ থেকে একে মুক্ত করতে হবে, তারপরে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সরলতা, সৌন্দর্য্য আর সম্ভ্রম উৎপাদক শিক্ষা দিতে হবে। "এটা খুব বড় বিষয়," আগামী দিনে এটা সুসম্পন্ন হবে। এই কাজই আমাদের করতে হবে। একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে—যদি কেউ তার প্রকৃত প্রেম আর নিঃস্বার্থতা দিয়ে কাউকে সাহায্য করতে চায় তবে সেটা চমৎকারভাবে ঘটবে![২৮]

আমি কখনও প্রতিহিংসার কথা বলি না। আমি সব সময়ে শক্তির কথাই বলেছি। সমুদ্রের জলকণিকার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিহিংসা-বৃত্তি জাগে কি? তবে হাঁ, একটা মশার কাছে ওটা খুবই বড় ব্যাপার।[২৯]

আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—মহাবীর নিজের শক্তিমত্তার সব বিশ্বাস হারিয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই, শব্দ নেই। সনাতন ধর্মভাবে একে কোনরূপে জাগাতে পারলে বুঝব, ঠাকুরের ও আমাদের আসা সার্থক হ'ল। ঐ ইচ্ছাটা কেবল আছে—মুক্তি ফুক্তি তুচ্ছ বোধ হচ্ছে।[৩০]

যত দিন যাচ্ছে, তত আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে পৌরুষই সার বস্তু। এই আমার নূতন বার্তা।[৩১]

যারা তাদের কুসংস্কারগুলো আমাদের দেশবাসীর ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে, তাদের সঙ্গে অমি একমত নই। মিশর-তত্ত্ববিদ্‌গণের মিশরের প্রতি

কৌতূহল পোষণ করার মতো ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও লোকের কৌতূহল পোষণ করা সহজ, কিন্তু তা স্বার্থ-প্রণোদিত।

কেউ কেউ হয়তো প্রাচীন গ্রন্থে, গবেষণাগারে বা স্বপ্নে ভারতবর্ষকে যেমন দেখেছেন, তাকে আবার সেইভাবে দেখতে ইচ্ছা করেন। আমি সেই ভারতকেই আবার দেখতে চাই, যে-ভারতে প্রাচীন যুগে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব ছিল তার সঙ্গে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি স্বাভাবিকভাবে মিলিত হয়েছে। এই নূতন অবস্থার সৃষ্টি ভিতর থেকেই হবে, বাইরে থেকে নয়।

সেজন্য আমি কেবল উপনিষদ্‌ই প্রচার করি। আমি কখনও উপনিষদ্ ছাড়া অন্য কিছু আবৃত্তি করি না। আবার উপনিষদের যে-সব বাক্যে শক্তির কথা আছে, সেগুলিই বলি। শক্তি—এই একটি শব্দের মধ্যেই বেদ-বেদান্তের মর্মার্থ রয়েছে।

বুদ্ধের বাণী ছিল অপ্রতিরোধ বা অহিংসা ; কিন্তু আমার মতে সেই অহিংসা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শক্তির ভাব একটা উন্নততর উপায়। অহিংসার পিছনে আছে ভয়ঙ্কর এক দুর্বলতা ; দুর্বলতা থেকেই প্রতিরোধের ভাবটি আসে। আমি সমুদ্রের একটা জল-কণিকার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার বা তাকে এড়াবার কথা কখনও চিন্তা করি না। আমার কাছে এটা কিছুই নয়, কিন্তু একটা মশার কাছে এটা বিপজ্জনক। সব রকম হিংসার ব্যাপারেই এই একই কথা—শক্তি এবং নির্ভীকতা। আমার আদর্শ সেই মহাপুরুষ, যাঁকে লোকে সিপাহী বিদ্রোহের সময় হত্যা করেছিল এবং যিনি বুকে ছুরিকাহত হলে মৌন ভঙ্গ করে বলেছিলেন, 'তুমিও তিনিই।'

জিজ্ঞাসা করতে পারো—এই চিন্তাধারায় রামকৃষ্ণের স্থান কোথায়? তাঁর ছিল এক অদ্ভুত জীবন, এক অত্যাশ্চর্য সাধনা, যা অজ্ঞাতসারে গড়ে উঠেছিল। তিনি নিজেও তা জানতেন না। তিনি ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডবাসীদের সম্বন্ধে—তারা সমুদ্রপারের এক অদ্ভুত জাতি—এইটুকু ছাড়া আর কিছুই জানতেন না। কিন্তু তিনি এক মহৎ জীবন দেখিয়ে গিয়েছেন এবং আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

কোনদিন কারও একটি নিন্দাবাদ তিনি করেন নি। একবার আমি আমাদের দেশের এক ব্যভিচারী সম্প্রদায়ের সমালোচনা করছিলাম। তিন ঘণ্টা ধরে আমি বকে গেলাম, তিনি শান্তভাবে সব শুনলেন। আমার বলা শেষ হলে বললেন, 'তাই না হয় হ'ল, প্রত্যেক বাড়িরই তো একটা খিড়কির দরজা থাকতে পারে ; তা কে জানে?' [৩২]

প্রশ্ন : ভারতের ব্যাপারে আপনার ধর্মান্দোলনের অবদান কি?

—হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কার করা এবং জাতীয় চেতনা জাগ্রত করে দেওয়া। বর্তমানকালে 'হিন্দু' বলতে ভারতের তিনিটি সম্প্রদায় বুঝায়—প্রথম গোঁড়া বা গতানুগতিক সম্প্রদায় ; দ্বিতীয় মুসলমান আমলের সংস্কার-সম্প্রদায়সমূহ এবং তৃতীয় আধুনিক সংস্কার-সম্প্রদায়সমূহ। আজকাল দেখি, উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সকল হিন্দু কেবল একটি বিষয়ে একমত—গোমাংস-ভোজনে সকল হিন্দুরই আপত্তি।

প্রশ্ন : বেদবিশ্বাসে কি সকলেই একমত নয়?

—মোটেই না। ঠিক এইটিই আমরা পুনরায় জাগাতে চাই।

প্রশ্ন : আপনি পূর্বে যে তিন সম্প্রদায়ের নাম করলেন, তন্মধ্যে আপনি নিজেকে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন?'

- আমি সকল সম্প্রদায়ের। আমরাই সনাতন হিন্দু।

কিন্তু ছুঁৎমার্গের সঙ্গে আমাদের সংস্রব নেই। ওটা হিন্দুধর্ম নয়, ওটা আমাদের কোন শাস্ত্রে নেই। ওটা প্রাচীন আচারের অনুমোদিত একটা কুসংস্কার—আর চিরদিনই তা জাতীয় অভ্যুদয়ে বাধা সৃষ্টি করেছে।

প্রশ্ন : এই প্রবুদ্ধ হিন্দুধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়?

—এ বিষয়ের মীমাংসার ভার আমার নয়। আমি কখন কোন ব্যক্তিবিশেষকে প্রচার করিনি। আমার নিজের জীবন এই মহাত্মার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাভক্তিবশে পরিচালিত, কিন্তু অপরে আমার এই ভাব কতদূর গ্রহণ করবে, তা তারা নিজেরাই স্থির করবে। যতই বড় হোক, কেবল একটি নির্দিষ্ট জীবনখাত দিয়েই চিরকাল পৃথিবীতে ঐশীশক্তিস্রোত প্রবাহিত হয় না। প্রত্যেক যুগকে নূতন করে আবার ঐ শক্তি লাভ করতে হয়। আমরা কি সকলেই ব্রহ্মস্বরূপ নই?

আমাদের কার্যপ্রণালী অতি সহজেই বর্ণিত হতে পারে। ঐ প্রণালী আর কিছুই নয়। কেবল জাতীয় জীবনাদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করলেন, ভারত শুনল, ছয় শতাব্দী যেতে না যেতে সে তার সর্বোচ্চ গৌরবশিখরে আরোহণ করল। এটাই রহস্য। 'ত্যাগ ও সেবাই' ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুটি বিষয়ে তাকে উন্নত করুন, তা হলে অবশিষ্ট যা কিছু আপনা থেকেই উন্নত হবে। এদেশে ধর্মের পতাকা যতই উঁচুতে তুলে ধরা হোক, কিছুতেই পর্যাপ্ত নয়। কেবল এর উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করছে। [৩৩]

আমেরিকায় এসে একটা মস্ত প্রলোভনে পড়ে গেছি, ঠিক এত বড় প্রলোভনের মুখোমুখি আর কখনো হইনি।

না, না, কোনও মেয়ে নয় ; আমি ভাবছি একটি সঙ্ঘ গড়ার কথা। [৩৪]

ঈশ্বর করেন তো মঠকে মহাসমন্বয়ক্ষেত্র ক'রে তুলতে হবে। ঠাকুর আমাদের সর্বভাবের সাক্ষাৎ সমন্বয়মূর্তি। ঐ সমন্বয়ের ভাবটি এখানে জাগিয়ে রাখলে ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সর্বমতের সর্বপথের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ—সকলে যাতে এখানে এসে আপন আপন আদর্শ দেখতে পায়, তা করতে হবে।

সেদিন যখন মঠের জমিতে ঠাকুরকে স্থাপন করলুম, তখন মনে হ'ল যেন এখান থেকে তাঁর ভাবের বিকাশ হয়ে বিশ্ব চরাচর ছেয়ে ফেলেছে! আমি তো যথাসাধ্য করছি ও ক'রব—তোরাও ঠাকুরের উদার ভাব লোকদের বুঝিয়ে দে। বেদান্ত কেবল প'ড়ে কি হবে? প্র্যাকটিকাল লাইফে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সত্যতা প্রমাণিত করতে হবে। শঙ্কর এ অদ্বৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন ; আমি এবার সেটাকে সেখান থেকে সংসারে ও সমাজের সর্বত্র রেখে যাব ব'লে এসেছি। ঘরে ঘরে, মাঠে ঘাটে, পর্বতে প্রান্তরে এই অদ্বৈতবাদের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে। [৩৫]

কি হয়েছে, তার কিছু কিছু মাত্র তোরা দেখতে পাবি। কালে পৃথিবীকে ঠাকুরের উদার ভাব নিতে হবে, তার সূচনা হয়েছে। এই প্রবল বন্যামুখে সকলকে ভেসে যেতে হবে। [৩৬]

ঐরকম কর্মতৎপরতা ও আত্মনির্ভরতা কালে দেশে আসবেই আসবে—বেশ দেখতে পাচ্ছি ; There is no escape (গত্যন্তর নেই)। [৩৭]

অন্ধ—যে অতি অন্ধ, যে সময়ের সঙ্কেত দেখছে না, বুঝছে না। দেখছে না, সুদূরগ্রামজাত দরিদ্র, ব্রাহ্মণ পিতামাতার এই সন্তান (শ্রীরামকৃষ্ণ) এখন সেই-সব দেশে সত্য সত্যই পূজিত হচ্ছেন, যে-সব দেশের লোকেরা শত শতাব্দী যাবৎ পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করে আসছে। এ কার শক্তি? এটা কি তোমাদের শক্তি না আমার? না, এটা আর কারও শক্তি নয় ; যে-শক্তি এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, এ সেই শক্তি।... এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভমাত্র দেখছি। আর বর্তমান যুগের অবসান হবার পূর্বেই তোমরা এর আশ্চর্য—অতি আশ্চর্য খেলা প্রত্যক্ষ করবে। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হয়েছে। [৩৮]

...আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই মূল ভাবটিকে সরিয়ে ঐ স্থানে অন্য ভাব স্থাপন করতে যাচ্ছিলাম, যে-মেরুদণ্ডের বলে আমরা দণ্ডায়মান,

আমরা যেন তার পরিবর্তে অপর একটি মেরুদণ্ড স্থাপন করতে যাচ্ছিলাম, আমাদের জাতীয় জীবনের ধর্মরূপ মেরুদণ্ডের স্থানে আমরা রাজনীতিরূপ মেরুদণ্ড স্থাপন করতে যাচ্ছিলাম। যদি আমরা এতে কৃতকার্য হতাম, তবে আমাদের সমূলে বিনাশ হত। কিন্তু তা তো হবার নয়। তাই এই মহাশক্তির প্রকাশ হয়েছিল। এই মহাপুরুষকে যেভাবেই নাও, তা আমি গ্রাহ্য করি না! তাঁকে কতটা ভক্তিশ্রদ্ধা কর, তাতেও কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমি জোর করে বলছি, কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতে এরূপ অদ্ভুত মহাশক্তির বিকাশ আর কখন হয়নি। আর তোমরা এই শক্তির দ্বারা শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও মঙ্গল কিভাবে সাধিত হচ্ছে তা জানবার জন্য এই শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করে একে বুঝবার চেষ্টা করা তোমাদের কর্তব্য।[৩৯]

...আমরা চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ ... ধর্মবীর না হলে আমরা তাঁকে আদর্শ করতে পারি না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে আমরা এমন এক ধর্মবীর—এমন একটি আদর্শ পেয়েছি। যদি এই জাত উঠতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করে বলছি—এই নামে সকলকে মাততে হবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আমি বা অপর যে-কেউ প্রচার করুক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমি তোমাদের কাছে এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে স্থাপন করলাম। এখন বিচারের ভার তোমাদের উপর। এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে নিয়ে কি করবে, আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য তোমাদের এখনই তা স্থির করা উচিত। একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক—তোমরা যত মহাপুরুষকে দেখেছ, অথবা স্পষ্ট করেই বলছি, যত মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠ করেছ, তার মধ্যে এঁর জীবন পবিত্রতম। আর এটা তো স্পষ্টই দেখছ যে, এমন অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের কথা তোমরা তো কখন পাঠও করনি, দেখবার আশা তো দূরের কথা। তাঁর তিরোভাবের পর দশ বৎসর যেতে না যেতে এই শক্তি জগৎ পরিব্যাপ্ত করেছে।

আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্মের উন্নতির জন্য কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে আমি এই মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের সামনে স্থাপন করছি। আমাকে দেখে তাঁর বিচার করো না। আমি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রমাত্র, আমাকে দেখে তাঁর চরিত্রের বিচার করো না। তাঁর চরিত্র এত উন্নত ছিল যে, আমি অথবা তাঁর অপর কোন শিষ্য যদি শত শত জীবনব্যাপী চেষ্টা করি, তথাপি তিনি যথার্থ যা ছিলেন, তা কোটি ভাগের এক ভাগেরও তুল্য হতে পারব না।

...হয় আমাদের সমগ্র জগৎ জয় করতে হবে, নতুবা মরতে হবে। এছাড়া আর কোন পথ নেই। ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে যেতে হলে আমাদের হৃদয়ের প্রসার করতে

হবে ; আমাদের যে জীবন আছে তা দেখতে হবে।...দুয়ের মধ্যে একটা কর—হয় বাঁচো, না হয় মর।[৪০]

প্রিয় কিডি, জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু এতে আশঙ্কা এই—পাছে তা শুষ্ক পাণ্ডিত্যে পর্যবসিত হয়। প্রেম ভক্তি খুব বড় ও ভাল জিনিস, কিন্তু নিরর্থক ভাবপ্রবণতায় আসল জিনিসই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এগুলির সামঞ্জস্যই দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এমনই সমন্বয়পূর্ণ ছিল। কিন্তু এমন মহাপুরুষ কালেভদ্রে জগতে এসে থাকেন। তবে তাঁর জীবন ও উপদেশ আদর্শ-স্বরূপ সামনে রেখে আমরা এগোতে পারি।...

ভগবান যদিও সর্বত্র আছেন বটে, কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নি ; সুতরাং তাঁকেই কেন্দ্র ক'রে আমাদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হবে ; অথচ প্রত্যেকের তাঁকে নিজের ভাবে গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে—কেউ আচার্য বলুক, কেউ পরিত্রাতা, কেউ ঈশ্বর, কেউ আদর্শ পুরুষ, কেউ বা মহাপুরুষ—যার যা খুশি।[৪১]

চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান্, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা—আমার আইডিয়াগুলি যারা কাজে পরিণত ক'রে নিজেদের ও দেশের কল্যাণসাধনে জীবনপাত করতে পারবে।

নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাবান্ দশ-বারটি ছেলে পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা ক'রে দিতে পারি।[৪২]

ইচ্ছা হয়—মঠ-ফঠ সব বিক্রি ক'রে দিই, এইসব গরীবদুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, ওদেশে যখন গিয়েছিলুম, মাকে কত বললুম, 'মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব্য-চুষ্য খাচ্ছে, কী না ভোগ করছে! আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। মা! তাদের কোন উপায় হবে না?' ওদেশে ধর্মপ্রচার করতে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, এদেশের লোকের জন্য যদি অন্নসংস্থান করতে পারি।

দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখবাজানো ঘণ্টানাড়া ; ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা ; সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে, চরিত্র ও সাধনা বলে বড়লোকদের বুঝিয়ে, কড়িপাতি যোগাড় ক'রে নিয়ে আসি এবং দরিদ্র নারায়ণদের সেবা ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

ইচ্ছা হয়, তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত-কাঙাল দীন-দরিদ্র আছিস্' ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হ'ল? হায়! এরা দুনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে—সকলে মিলে এদের চোখ খুলে। আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র।

আমি এত তপস্যা ক'রে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন ; তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'[৪৩]

মা-ঠাকরুন (শ্রী সারদা দেবী) কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। শক্তির কৃপা না হ'লে কি ঘোড়ার ডিম হবে!

আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি।

মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়। ...ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া। মার হুকুম হলেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত সব করতে পারে।

বিশ্বাস বড় ধন ; দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম।

মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?' দাদা, ও ঐ যে বলছি, ওইখানটায় আমার গোঁড়ামি।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।[৪৪]

ভবিষ্যৎ কি হবে, তা দেখতে পাচ্ছি না, দেখবার জন্য আমার আগ্রহও নেই। কিন্তু আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখছি যে, আমাদের সেই প্রাচীনা জননী আবার জেগে উঠে পুনর্বার নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিতা হয়ে তাঁর সিংহাসনে বসেছেন।[৪৫]

একটা নতুন পথ নির্মাণ করে আমি তা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি।[৪৬]

শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভেতরে আমার ভাবগুলির কিছু-কিছুও যদি ঢুকোতে পেরে থাকি, তাহলেই জানবো এই দেহটা ধরা সার্থক

হয়েছে।[৪৭]

আমি সাধনাবস্থায় যখন ভারতের নানা জায়গায় ভ্রমণ করতুম, তখন কত গুহায় নির্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হলো না বলে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছি, কত ধ্যান—কত সাধন-ভজন করেছি ; কিন্তু এখন আর মুক্তিলাভের জন্য সে বিজাতীয় আগ্রহ নেই। এখন কেবল মনে হয়, যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর একটা লোকও অমুক্ত থাকছে, ততদিন আমার নিজের মুক্তির প্রয়োজন নেই।[৪৮]

দেখ, এই যে কত বছর ভারতের নানাদেশ ঘুরেছি—কত হৃদয়বান মানুষ দেখেছি। কত মহাপুরুষ দেখেছি, তাঁদের কাছে বসলে হৃদয়ে এক অদ্ভুত শক্তি আসত, তারই জোরে তোদের দুই এক কথা বলছি মাত্র, আমাকে তোরা একটা মস্ত কিছু ভাবিস না।[৪৯]

সদা সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু। যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে নরকে গিয়েও জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র--ইতরে কৃপণাঃ (অন্যেরা কৃপার পাত্র)। যে এই মহা সন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর খবর বিতরণ করবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে, বাকি যারা তা না পারো—তফাত হয়ে যাও এই বেলা ভালয় ভালয়।

এই চিঠি তোমরা পড়বে—যোগেন-মা, গোলাপ-মা সকলকে শোনাবে। এই 'টেস্ট' (পরীক্ষা), যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, 'প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচির্কীর্ষবঃ' (প্রাণদিয়েও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তারা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাত হয়ে যাক, এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম দিকে দিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন ; এই সাধন, এই সিদ্ধি।[৫০]

পাশ্চাত্যে দ্বিতীয়বার

গঙ্গা থেকে বেরুতে আমাদের দুদিন লাগলো।

চব্বিশে জুন রাত্রে আমাদের জাহাজ মান্দ্রাজে পৌঁছল। প্রাতঃকালে উঠে দেখি, সমুদ্রের মধ্যে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে-নেওয়া মান্দ্রাজের বন্দরে রয়েছি। ভেতরে স্থির জল ; আর বাইরে উত্তাল তরঙ্গ গজরাচ্ছে, আর এক এক বার বন্দরের দ্যালে লেগে দশ বার হাত লাফিয়ে উঠছে, আর ফেনময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়লে। তখন একটা রোল উঠল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, হাজারখানেক মান্দ্রাজী স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা বন্দরের বাঁধের উপর বসেছিল—জাহাজ ছাড়তেই, তাদের এই বিদায়-সূচক রব! মান্দ্রাজীরা আনন্দ হ'লে বঙ্গদেশের মত হুলু দেয়।

মান্দ্রাজ হ'তে কলম্বো চার দিন। যে তরঙ্গভঙ্গ গঙ্গাসাগর থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তা ক্রমে বাড়তে লাগলো। মান্দ্রাজের পর আরও বেড়ে গেল। জাহাজ বেজায় দুলতে লাগলো। যাত্রীরা মাথা ধরে ন্যাকার ক'রে অস্থির।

পঁচিশে জুন প্রাতঃকাল জাহাজ কলম্বো ছাড়লো। এবার ভরা মন্‌সুনের মধ্য দিয়ে গমন। জাহাজ যত এগিয়ে যাচ্ছে, ঝড় ততই বাড়ছে, বাতাস ততই বিকট নিনাদ করছে—উভশ্রান্ত বৃষ্টি, অন্ধকার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ গর্জ্জে গর্জ্জে জাহাজের উপর এসে পড়ছে ; ডেকের ওপর তিষ্ঠুনো দায়। জাহাজ ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ ক'রে উঠছে, যেন বা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কাপ্তেন বলছেন, 'তাইতো এবারকার মনসুনটা তো ভারি বিটকেল!'

ছয় দিনের পথ চৌদ্দ দিন ক'রে দিনরাত বিষম ঝড়-বাদলের মধ্য দিয়েও শেষটা এডেনে পৌঁছে গেলুম। কলম্বো থেকে যত এগুনো যায়, ততই ঝড় বাড়ে, ততই আকাশ পুকুর, ততই বৃষ্টি ততই বাতাসের জোর, ততই ঢেউ ; সে বাতাস, সে ঢেউ ঠেলে কি জাহাজ চলে? জাহাজের গতি আদ্দেক হয়ে গেল—সকোত্রা দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে বেজায় বাড়লো। কাপ্তেন বললেন, 'এইখানটা মনসুনের কেন্দ্র ; এইটা পেরুতে পারলেই ক্রমে ঠাণ্ডা সমুদ্র।' তাই হ'ল। এ দুঃস্বপ্নও কাটলো।

১৪ই জুলাই রেড-সী পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পৌঁছুল।

এটি বড় সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর, প্রায় তিন দিকে বালির ঢিপি আর পাহাড় -জলও খুব গভীর। জলে অসংখ্য মাছ আর হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

সকাল বেলা খাবার-দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। জল-জ্যান্ত হাঙ্গর পূর্বে আর কখন দেখা যায়নি—

হাঙ্গরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত।

বারান্দা ধ'রে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে ঝুঁকে হাঙ্গর দেখছে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙ্গর-মিঞারা একটু সরে গেছেন ; মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হ'ল।

আধ ঘণ্টা, তিন কোয়ার্টার—ক্রমে তিতিবিরক্ত হয়ে আসছি, এমন সময়ে একজন বললে—ঐ ঐ! দশ বার জনে ব'লে উঠল—ঐ আসছে, ঐ আসছে!! চেয়ে দেখি, দূরে একটা প্রকাণ্ড কালো বস্তু ভেসে আসছে, পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নীচে। ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আসতে লাগলো। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দিলে ; সেই গদাইলস্করি চাল, বিভীষণ মাছ।

সেকেন্ড কেলাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি লোক—তার তো উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একটা ভীষণ বঁড়শির যোগাড় করলে, তাতে সেরখানেক মাংস আচ্ছা দড়ি দিয়ে জোর ক'রে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হ'ল। হাত চার বাদ দিয়ে, একখানা মস্ত কাঠ ফাতনার জন্য লাগানো হ'ল। তারপর ফাতনা সুদ্ধ বঁড়শি, ঝুপ ক'রে জলে ফেলে দেওয়া হ'ল।

আমরা উদ্গ্রীব হয়ে, পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে বারান্দায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙ্গরের জন্য ঐ। বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরছে ; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে! দেখুক। চুপ্ চুপ্—এইবার চিৎ হ'ল—ঐ যে আড়ে গিলছে ; চুপ্—গিলতে দাও। তখন 'থ্যাব্ড়া' অবসরক্রমে, আড় হয়ে, টোপ উদরস্থ ক'রে যেমন চলে যাবে, অমনি প'ড়ল টান! বিস্মিত 'থ্যাবড়া' মুখ ঝেড়ে, চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উলটো উৎপত্তি!! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে বুড়ো, জোয়ান, দে টান—কাছি ধ'রে দে টান। ঐ হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠল—টান্ ভাই টান্।

টান্ ভাই টান্। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান্—এই এল। এইবার জাহাজের ওপর ফেলো ; ভাই হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার—আর ঐ ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড়—ধুপ্! বাবা, কি হাঙ্গর! কি ধপাৎ করেই জাহাজের উপর প'ড়ল!

সাবধানের মার নেই—ঐ কড়িকাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মারো। ওহে ফৌজি-ম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ। 'বটে তো'। রক্ত-মাখা গায়ে-কাপড়ে ফৌজি যাত্রী কড়িকাঠ উঠিয়ে দুম্‌দুম্ দিতে লাগলো হাঙ্গরের মাথায়, আর মেয়েরা 'আহা কি নিষ্ঠুর! মেরো না' ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগলো—অথচ দেখতেও ছাড়বে না। তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এইখানেই বিরাম হোক। কেমন ক'রে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হ'ল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগলো, কেমন সে হাঙ্গর ছিন্ন-অন্ত্র ভিন্ন-দেহ ছিন্নহৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগলো, নড়াতে লাগলো ; কেমন ক'রে তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম, মাংস, কাঠ-কুটরো এক রাশ বেরুলো—সে সব কথা থাক। এই পর্যন্ত যে, সেদিন আমার খাওয়া-দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল। সব জিনিসেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হ'তে লাগলো।

এবার ভূমধ্যসাগর। ভারতবর্ষের বাহিরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নেই—এশিয়া, আফ্রিকা—প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। একজাতীয় রীতিনীতি খাওয়া দাওয়া শেষ হ'ল, আর এক প্রকার আকৃতি-প্রকৃতি, আহার-বিহার, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার আরম্ভ হ'ল—ইউরোপ এল।

জাহাজ নেপল্‌সে লাগল—আমরা ইতালীতে পৌঁছুলাম।

নেপল্‌স ত্যাগ ক'রে জাহাজ মার্সাইতে লেগেছিল, তারপর একেবারে লন্ডন।[১]

সুয়েজ, ১৪ই জুলাই, ১৮৯৯

এবার আমি সত্যিই বেরিয়ে পড়েছি, আশা করছি সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যে লন্ডন পৌঁছাব। এই বছরে নিশ্চিত আমেরিকাতে যাব, আশা করি তোমার সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ ঘটবে। জান! আমি এখনও এতই বস্তুতান্ত্রিক যে বন্ধুদের শারীরিকভাবে সাক্ষাৎ করতে চাই।...

ভারতে আমার শরীর, খুবই খারাপ ছিল। হার্টের গোলমাল হচ্ছিল—পাহাড়ে চড়া, হিমবাহের জলে স্নান করা এবং স্নায়বিক অবসাদ ইত্যাদি কারণে। হাঁপানির প্রকোপে প্রচণ্ড কাবু হতাম—সেবার আক্রমণটা সাত দিন সাত রাত স্থায়ী হয়েছিল। সর্বদা আমার শ্বাসরোধ হচ্ছিল এবং আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'তো।

এবারের ভ্রমণ আমাকে নতুন এক মানুষে রূপান্তরিত করেছে। আমি এখন অপেক্ষাকৃত ভাল অনুভব করছি, আর এটা যদি চলতে থাকে, তাহলে আশা করি আমেরিকা পৌঁছুবার আগে যথেষ্ট তাজা হ'য়ে উঠতে পারব।[২]

ইংলন্ড

উইম্বল্ডন, ইংলন্ড, ৩রা আগস্ট, ১৮৯৯

স্নেহের জো, অবশেষে হাজির। তুরীয়ানন্দের ও আমার সুন্দর বাসস্থান মিলেছে।

সমুদ্রযাত্রায় বেশ কিছু স্বাস্থ্যোন্নতি হয়েছে। তা ঘটেছে ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম ও মৌসুমী ঝড়ে ঢেউয়ের উপর স্টীমারের ওলটপালট থেকে। অদ্ভুত, নয় কি? আশা করি এটা বজায় থাকবে।...

এখানে এখন সুন্দর উষ্ণ আবহাওয়া ; সকলে বলছে, একটু বেশী মাত্রায় উষ্ণ। কিছুদিনের জন্য আমি শূন্যবাদী হয়ে গেছি, কোন কিছুতেই বিশ্বাস করি না। কোন কিছুর পরিকল্পনা, কোন অনুশোচনা, প্রচেষ্টা—কিছুই নেই ; কাজকর্মের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করেছি। ...এক কাট্টা হয়ে লেগে যাও, কর্ম থেকে কারও নিস্তার নেই। দেখো, এবারের সমুদ্রযাত্রার ফলে আমার বয়স যেন কয়েক বছর কমে গেছে। শুধু যখন বুক ধড়ফড় ক'রে ওঠে, তখন টের পাই বয়স হয়েছে। এটা কি অস্থিচিকিৎসার কোন ব্যাপার? আমার রোগ সারাতে দু-একটা পাঁজর কেটে বাদ দেবে নাকি? উহুঁ, তা হচ্ছে না। আমার পাঁজরা দিয়ে...তৈরি করা-টরা চলবে না। ওটা যা-ই হোক, তার পক্ষে আমার হাড় পাওয়া কঠিন হবে। আমার হাড় গঙ্গায় প্রবাল সৃষ্টি করবে, আমার বরাতে এই লেখা আছে। এখন আমার ফরাসী শেখার ইচ্ছা— কিন্তু ও-সব ব্যাকরণের বালাই একদম নয়। আমি শুধু পড়ে যাব, আর তুমি ইংরিজিতে ব্যাখ্যা করে যাবে।[৩]

উইম্বল্ডন, ৬ই আগস্ট ১৮৯৯

মা, স্টার্ডির ঠিকানায় পাঠানো আপনার (মিসেস বুল) পত্র পেয়েছি। আপনার সহৃদয় কথাগুলোর জন্য কৃতজ্ঞ। এর পর আমাকে কি করতে হবে অথবা আদৌ কিছু করতে হবে কি না, তা আমি জানি না। জাহাজে ওঠার পর আমি ভাল ছিলাম কিন্তু নেমে অবধি আবার বেশ খারাপ বোধ করছি। মানসিক উদ্বেগের কথা বলতে গেলে—ইদানীং তা যথেষ্টই হয়েছে।

কাকিমা, যাঁকে আপনি দেখেছেন, আমাকে ঠকানোর এক গভীর ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং তিনি ও তাঁর লোকজন আমাকে ৬০০০ টাকায় অর্থাৎ ৪০০ পাউন্ডে একটি বাড়ি বিক্রি করার ছল করেছিলেন এবং আমি সরল বিশ্বাসে তা আমার মায়ের জন্য কিনি। পরে, তারা আমায় দখল দেয়নি ; ভেবেছিল, আমি

সন্ন্যাসী, লোকলজ্জার ভয়ে জোর করে দখল করার জন্য কোর্টে যাব না।

আপনি ও অন্যান্য ব্যক্তিরা যে টাকা আমাকে কাজের জন্য দিয়েছিলেন, তা থেকে একটি টাকাও খরচ করেছি বলে আমার মনে হয় না। আমার মাকে সাহায্যের সুস্পষ্ট ইচ্ছা জানিয়ে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার আমাকে ৮০০০ টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকাও মনে হয় জলেই গেছে। এর বাইরে আমার পরিজনের জন্য অথবা এমন কি আমার ব্যক্তিগত খরচের জন্যও আর কিছুই খরচ করা হয়নি। আমার খাওয়া প্রভৃতির খরচ খেতড়ি-রাজ দিতেন আর তা থেকে অর্ধেকের বেশি প্রতিমাসে মঠে যেত। একমাত্র যদি ব্রহ্মানন্দ (কাকিমার বিরুদ্ধে) ঐ মামলা বাবদ কিছু খরচ করে থাকে, কারণ এভাবে আমি নিশ্চয়ই লুণ্ঠিত হতে পারি না—যদি সে তা করে থাকে তবে, যে কোন উপায়েই হোক আমি তা পূরণ করে দেব, যদি তা করতে বেঁচে থাকি।

ইউরোপ এবং আমেরিকায় কেবল বক্তৃতা করে যে টাকা পেয়েছি, তা আমি আমার ইচ্ছামত খরচ করেছি, কিন্তু কাজের জন্য যা পেয়েছি, তার প্রতিটি পাই-এর হিসাব রাখা হয়েছে, তা মঠে আছে।...

এখনো পর্যন্ত আমার কোন পরিকল্পনা নেই বা পরিকল্পনা করার কোন প্রবৃত্তিও নেই। কাজ করতে চাইও না। মা অন্য কর্মীদের খুঁজে নিন। এমনিতেই আমার বোঝা যথেষ্ট রয়েছে।[৪]

উইম্বলডন, আগষ্ট, ১৮৯৯

কয়েক সপ্তাহ পরেই নিউইয়র্কে পৌঁছুব, আশা করি ; তারপরের কথা জানি না। আগামী বসন্তে হয়তো আবার ইংলন্ডে ফিরে আসব।

আমি একান্তভাবে চাই যে কাউকেই যেন কখনও দুঃখ পেতে না হয়, কিন্তু (একথাও সত্যি যে) একমাত্র দুঃখই জীবনের গভীরে প্রবেশ করবার অন্তর্দৃষ্টি এনে দেয়। তাই নয় কি?

আমাদের বেদনার মুহূর্তে চিরদিনের মতো বন্ধ দুয়ার আবার খুলে যায় এবং আলোর বন্যা অন্তরে প্রবেশ করে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে। কিন্তু হায়! এ জগতে লব্ধ জ্ঞানকে আমরা কাজে লাগাতে পারি না। যে মুহূর্তে মনে হয় কিছু শিখেছি, তখনই রঙ্গমঞ্চ থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হয়। এরই নাম মায়া![৫]

আমেরিকা

রিজলি ম্যানর, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

ছয় মাস ধরে খারাপ অবস্থার ভয়াবহ পালা চলেছে। যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই দুর্ভাগ্য যেন আমাকে অনুসরণ করছে। ইংলন্ডে স্টার্ডি মনে হয় কাজে বিরক্ত হয়েছে ; সে আমাদের মধ্যে কোনো ভারতীয় তপস্বীসুলভ কৃচ্ছ্রসাধন দেখতে পাচ্ছে না।[৬]

রিজলি ম্যানর, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় স্টার্ডি, মিসেস জন্‌সনের মতে ধার্মিক ব্যক্তির রোগ হওয়া উচিত নয়। এখন আবার তাঁর মনে হচ্ছে, আমার ধূমপানাদিও পাপ। মিস মূলারও আমায় ছেড়ে গেছেন—ঐ রোগের জন্য। হয়তো তাঁরাই ঠিক। তুমিও জানো, আমিও জানি, আমি যা, আমি তাই। ভারতে অনেকে এই দোষের জন্য এবং ইওরোপীয়দের সঙ্গে আহার করার জন্য আপত্তি জানিয়েছেন, ইওরোপীয়দের সঙ্গে খাই ব'লে আমাকে একটি পারিবারিক দেবালয় থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছিল। আমার তো ইচ্ছা হয়, আমি এমন নমনীয় হই যে, প্রত্যেকের ইচ্ছানুরূপ আকারে গঠিত হ'তে পারি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন লোক তা আজও দেখলাম না, যে সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারে। বিশেষতঃ যাকে বহু জায়গায় যেতে হয়, তার পক্ষে সকলকে তুষ্ট করা সম্ভব নয়।

আমি যখন প্রথম আমেরিকায় আসি, তখন প্যান্টালুন না থাকলে লোকে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার ক'রত ; তারপর আমাকে শক্ত আস্তিন ও কলার পরতে বাধ্য করা হ'ল—তা না হ'লে তারা আমায় ছোঁবেই না। তারা আমাকে যা খেতে দিত, তা না খেলে আমায় অদ্ভুত মনে ক'রত। এমনি সব!

ভারতে আমি পদার্পণ করামাত্র তারা আমাকে মস্তক মুণ্ডন করিয়ে কৌপিন পরায় ; এবং পরিণামে আমার ডায়াবেটিস ইত্যাদি হয়।

অবশ্য সবই আমার কর্মফল, আর এতে আমি খুশীই আছি। কারণ এতে যদিও সেই সময়ের মতো যন্ত্রণা হয়, তবু এতে জীবনের আর এক অভিজ্ঞতা হয় এবং তা এ-জীবনেই হোক বা পরজীবনেই হোক, কাজে লাগবে।...

আমি নিজে কিন্তু জোয়ার-ভাঁটার মধ্য দিয়েই চলেছি। আমি সর্বদা জানি এবং প্রচার ক'রে এসেছি যে, প্রত্যেক আনন্দের পিছন পিছন আসে দুঃখ—চক্রবৃদ্ধি সুদ সমেত না হলেও আসলটা তো আসবেই। আমি জগতের কাছে প্রচুর ভালবাসা পেয়েছি, সুতরাং যথেষ্ট ঘৃণার জন্যও আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আর এতে আমি খুশীই আছি—কারণ আমাকে অবলম্বন ক'রে আমার এই

মতবাদই প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক উত্থানের সঙ্গে থাকে তার অনুরূপ পতন

আমার দিক থেকে আমি আমার স্বভাব ও নীতিকে সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকি—একবার যাকে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করেছি, সে সর্বদাই আমার বন্ধু। তা ছাড়া ভারতীয় রীতি অনুসারে আমি বাইরের ঘটনাবলীর কারণ আবিষ্কারের জন্য অন্তরেই দৃষ্টিপাত করি ; আমি জানি যে, আমার উপর যত বিদ্বেষ ও ঘৃণার তরঙ্গ এসে পড়ে, তার জন্য দায়ী আমি এবং শুধু আমিই। এমনটি না হয়ে অন্য রকম হওয়া সম্ভব নয়।[৭]

রিজলি ম্যানর, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

আমি লেগেটদের বাড়িতে শুধু বিশ্রামই উপভোগ করছি, আর কিছুই করছি না! অভেদানন্দ এখানে আছে, খুব খাটছে।[৮]

রিজলি ম্যানর, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

আমি অনেক ভাল আছি। তোমাকে ধন্যবাদ। তিনদিন ছাড়া, এখানে বলবার মত ভিজে আবহাওয়া ছিল না। মিস (মার্গারেট) নোবল গতকাল এসেছিল এবং বেশ মজায় আমাদের কাটছে সময়। বলতে খুবই দুঃখিত হচ্ছি যে পুনরায় মোটা হ'য়ে যাচ্ছি। এটা খুব খারাপ। অল্প খেয়ে আমি আবার রোগা হ'য়ে যাব।[৯]

রিজলি ম্যানর, অক্টোবর, ১৮৯৯

আমি যা নই, তার ভান কখনও করেছি ব'লে মনে পড়ে না। আর তা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমার ধূমপান, খারাপ মেজাজ ইত্যাদি ব্যাপার—আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটালে যে-কেউ সহজে জানতে পারে। 'মিলন-মাত্রেরই বিচ্ছেদ আছে'—এই হ'ল প্রকৃতির নিয়ম। তার জন্য কোন নৈরাশ্যের ভাব আমার মধ্যে জাগে না। আশা করি, তোমার মনে কোন তিক্ততা থাকবে না। কর্মই আমাদের মিলিয়ে দেয়, আবার কর্মই বিচ্ছিন্ন করে।

আমার নীতি হ'ল, টাকার জন্য হাত না পেতে স্বেচ্ছায় দানের জন্য অপেক্ষা করা।

আমার সমস্ত কাজে এই একই নীতি মেনে চলি, কারণ আমার স্বভাব যে অনেকের কাছেই নিতান্ত অপ্রীতিকর, সে সম্বন্ধে আমি খুবই সচেতন এবং যতক্ষণ না কেউ আমাকে চায়, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা ক'রে থাকি। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যও প্রস্তুত থাকি। আর এই বিচ্ছেদের ব্যাপারে আমার কখনও মন খারাপ হয় না কিংবা সে-সম্বন্ধে বেশি কিছু চিন্তাও করি না, কারণ আমার নিত্য ভ্রাম্যমাণ জীবনে এ জিনিস আমাকে সব সময়ই করতে হচ্ছে। তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এর দ্বারা অন্যকে যে কষ্ট দিই, সেই আমার দুঃখ।[১০]

রিজলি ম্যানর, ১৮ (?) অক্টোবর, ১৮৯৯

একটা বিষয় আছে যার নাম প্রেম ; আর একটা বিষয় আছে যাকে বলে মিলন। এবং প্রেমের চাইতে মিলন বড়।

আমি ধর্ম ভালবাসি না। আমি নিজেই তো ধর্ম হয়ে গিয়েছি। ধর্মই আমার জীবন। মানুষ যার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছে তাকে ভালবাসে না। যা আমরা ভালবাসি সেটা এখনও আমি নই। ... ভক্তি এবং জ্ঞানের মধ্যে এইটাই তফাৎ, এই জন্যই ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বড়।"[১১]

রিজলি ম্যানর, ২৩শে অক্টোবর, ১৮৯৯

আমার আগের চিঠিটা আমার শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী রঞ্জিত ছিল। তবু মা (মিসেস হেল) জীবনে সুখের চাইতে যন্ত্রণা বেশী। যদি তা না হ'তো, তাহলে কেন তোমাকে আর তোমার সন্তানদের আমি প্রতিদিনের জীবনে স্মরণ করি। সুখ এতই প্রিয় কারণ সেটা দুষ্প্রাপ্য। আমাদের জীবনের অধিক কৃচ্ছ্র হ'চ্ছে নিশ্চেষ্টতা, অবসাদ ; বাকী অংশের চল্লিশ ভাগই যন্ত্রণা, কেবল দশ শতাংশ সুখ—এটাও হ'চ্ছে অত্যন্ত ভাগ্যবানদের জন্য। আমরা অধিকাংশ সময়েই এই অবসাদের অবস্থার সঙ্গে আনন্দকে মিশিয়ে ফেলি।[১২]

রিজলি, ১লা নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মার্গো, মনে হচ্ছে তোমার মনে যেন কি একটা বিষাদ রয়েছে। তুমি ঘাবড়িও না, কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। যাই কর না কেন, জীবন কিছু অনন্ত নয়! আমি তার জন্য খুবই কৃতজ্ঞ। জগতের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সাহসী, যাতনাই তাদের বিধিলিপি ; যদিও বা এর প্রতিকার সম্ভব হয়, তবু তা না হওয়া অবধি, ভাবী বহু যুগ পর্যন্ত এ জগতে এ ব্যাপারটা অন্ততঃ একটা স্বপ্নভঙ্গের শিক্ষারূপেও গ্রহণীয়। আমার স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তো নিজের দুঃখ-যন্ত্রণাকে সানন্দেই বরণ করি। কাউকে না কাউকে এ জগতে দুঃখভোগ করতেই হবে ; আমি খুশি যে, প্রকৃতির কাছে যারা বলিপ্রদত্ত হয়েছে, আমিও তাদের একজন।[১৩]

নিউ ইয়র্ক, ১০ই নভেম্বর, ১৮৯৯

আমি এখন নিউ-ইয়র্কে রয়েছি। ডাঃ (এগবার্ট) গার্নেসী গতকাল আমার প্রস্রাব পরীক্ষা করেছেন, তাতে কোনো সুগার বা এ্যালবুমিন পান নি। অতএব আমার মূত্রাশয়দ্বয় ঠিকঠাক আছে। হৃদযন্ত্রটি কেবল নার্ভাস তার শান্ত হওয়া দরকার।—প্রয়োজন কিছু আমুদে সঙ্গ এবং কয়েকজন ভাল বন্ধুবান্ধব এবং সামান্য নির্জনতা। একমাত্র অসুবিধা ডিসপেপসিয়া, ওইটাই তো শত্রু। যেমন ধরো সকালের দিকে আমি বেশ ভাল থাকি এবং মাইলের পর মাইল হাঁটতে

পারি, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে খাওয়া দাওয়ার পরে হাঁটা প্রায় অসম্ভব—বায়ু, যার পুরোটাই খাবারের ওপর নির্ভর করে। আমার ব্যাটল ক্রিক হেলথ ফুড্ চেষ্টা করা উচিত। আমি যদি ডেট্রয়েট আসি, সেখানে শান্তি, সেই সঙ্গে পাব ব্যাটল ক্রিক ফুড্।

যদি তুমি কেমব্রিজে আস, তাহলে সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে, অথবা ব্যাপারটা তোমার আমার মধ্যে গোপন থাকুক, আমরা দু'জনেই রেঁধে নেবো। 'ব্যাটল ক্রিক' ফুড তৈরি করাতে হবে। রান্নাবান্নায় আমার যথেষ্ট ভাল হাত। তুমি তো রান্নার কিচ্ছু জান না। খুব ভাল হয় যদি তুমি প্লেট ইত্যাদি পরিষ্কারে সাহায্য কর। যখন খুব প্রয়োজন হয় তখন ঠিক আমি টাকা পেয়ে যাই, "মা" সর্বদাই এটা দেখেন। সুতরাং এই ব্যাপারে তেমন কোনো বিপদ নেই। আমার জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা নেই, ডাক্তাররা এটা মেনে নিয়েছেন—শুধুমাত্র এই ডিসপেপসিয়াটা যদি চলে যায় আর যার ওপর সেটা নির্ভর করছে সেটি হল "খাদ্য", "খাদ্য", "খাদ্য" এবং কোনোরকম উদ্বিগ্নতা নয়। ওঃ আমার উদ্বেগ কত না ছিল।[১৪]

নিউ ইয়র্ক, ২১শে নভেম্বর, ১৮৯৯

আমার রূঢ়তার জন্য মন খারাপ করো না। মুখে যাই থাকুক—তুমি তো আমার হৃদয় জানো। তোমাদের সর্বপ্রকার শুভ হোক। বিগত প্রায় এক বছর আমি যেন একটা ঝোঁকে চলেছি। এর কারণ কিছু জানি না। ভাগ্যে এই নরকযন্ত্রণা ভোগ ছিল—আর তা হয়ে গেছে। আমি সত্যিই এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল। প্রভু তোমাদের সহায় হোন! আমি চিরবিশ্রামের জন্য শীঘ্রই হিমালয়ে যাচ্ছি। আমার কাজ শেষ হয়েছে।[১৫]

লস এঞ্জেলেস, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় নিবেদিতা, কারও কারও প্রকৃতিই এমন যে, তারা দুঃখ পেতেই ভালবাসে। যাদের মধ্যে আমি জন্মেছি, যদি তাদের জন্য আমার হৃদয় উৎসর্গ না করতাম তো অন্যের জন্য করতেই হ'ত—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই হচ্ছে কারও কারও ধাত—আমি তা ক্রমে বুঝতে পারছি।

আমরা সকলেই সুখের পেছনে ছুটছি সত্য, কিন্তু কেউ কেউ যে দুঃখেরই মধ্যে আনন্দ পায়—এটা খুব আশ্চর্য নয় কি? এতে ক্ষতি কিছু নেই ; শুধু ভাববার বিষয় এই যে, সুখ-দুঃখ উভয়ই সংক্রামক।

ইঙ্গারসোল একবার বলেছিলেন যে, তিনি যদি ভগবান হতেন তবে ব্যাধিকে সংক্রামক না ক'রে স্বাস্থ্যকেই সংক্রামক করতেন। কিন্তু স্বাস্থ্য যে ব্যাধি অপেক্ষা

অধিক না হলেও অনুরূপভাবে সংক্রামক, তা তিনি একটুও ভাবেননি।

বিপদ তো ঐখানেই। আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখে জগতের কিছুই যায়-আসে না—শুধু অপরে যাতে সংক্রামিত না হয়, তা দেখতে হবে। কর্মকৌশল তো ঐখানেই। যখনই কোন মহাপুরুষ মানুষের দুঃখে ব্যথিত হন, তখন তিনি নিজের মুখ ভার করেন, বুক চাপড়ান এবং সকলকে ডেকে বলেন, 'তোমরা তেঁতুল-জল খাও, কয়লা চিবাও, গায়ে ছাই মেখে গোবরের গাদায় বসে থাকো, আর শুধু চোখের জলে করুণ সুরে বিলাপ কর।'

আমি দেখছি, তাঁদের সবারই ত্রুটি ছিল—সত্যি সত্যি ছিল। যদি সত্যই জগতের বোঝা কাঁধে নিতে তুমি প্রস্তুত হয়ে থাকো, তবে সর্বতোভাবে তা গ্রহণ কর ; কিন্তু তোমার বিলাপ ও অভিশাপ যেন আমাদের শুনতে না হয়। তোমার নিজের জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে আমাদের এমন শঙ্কিত ক'রে তুলো না যে, শেষে আমাদের মনে করতে হয়, তোমার কাছে না এসে আমাদের নিজের দুঃখের বোঝা নিয়ে থাকাই বরং ছিল ভাল। যে লোক সত্যসত্যই জগতের দায় ঘাড়ে নেয়, সে জগৎকে আশীর্বাদ করতে করতে আপন পথে চলতে থাকে। তার মুখে একটাও নিন্দার কথা, একটাও সমালোচনার কথা থাকে না। তার কারণ এ নয় যে, জগতে পাপ নেই ; তার কারণ এই যে, সে স্বেচ্ছায় স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে সেই পাপ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। যিনি পরিত্রাতা, তাঁকেই সানন্দে আপন পথে চলতে হবে ; যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে, এ কাজ তাদের নয়।

আজ সকালে শুধু এই তত্ত্বের আলোই আমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। যদি এ ভাবটি আমার মধ্যে স্থায়িভাবে এসে থাকে এবং আমার সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে, তবেই যথেষ্ট।

দুঃখভার-জর্জরিত যে যেখানে আছ, সব এস, তোমাদের সব বোঝা আমার উপর ফেলে দিয়ে আপন মনে চলতে থাকো, আর তোমরা সুখী হও এবং ভুলে যাও যে, আমি একজন কোনকালে ছিলাম।[১৬]

লস এঞ্জেলেস, ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯

অবশেষে ক্যালিফোর্নিয়াতে আসা, যা আমার পক্ষে ভাল, যাদের আমি ভালবাসি তাদের পক্ষেও ভাল। আমাদের কোনো এক কবি বলেছেন যে : "হায় তুলসী! কোথায় বারাণসী, কোথায় বা কাশ্মীর, কোথায় খোরাসান, কোথায় বা গুজরাট—তেমনি মানুষের পূর্ব কর্মই তাকে সামনে টেনে নিয়ে যায়।" অতএব আমি এখানে। এইটাই তো সবচাইতে ভাল, তাই না?...

গত রাতে এখানে একটা বক্তৃতা ছিল। হল তেমন ভিড়ে বোঝাই ছিল

না—কারণ বিজ্ঞাপন দেওয়াই হয়নি। যদি আমি ভাল বোধ করি, তবে এই শহরে শীঘ্রই ক্লাশের ব্যবস্থা করব। এবার আমি ব্যবসার পথে রয়েছি। ঝটিতি কিছু ডলার দরকার, দেখা যাক যদি সফল হই।[১৭]

লস এঞ্জেলেস, ১২ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯

আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি নিষ্ঠুর, বড়ই নিষ্ঠুর। আর আমার মধ্যে কোমলতা প্রভৃতি যা কিছু আছে, তা আমার ত্রুটি। এই দুর্বলতা যদি আমার মধ্যে আরও কম—অনেক কম থাকত! হায়! কোমলভাবই হ'ল আমার দুর্বলতা এবং এইটিই আমার সব দুঃখের কারণ।

ভাল কথা, (বালি) মিউনিসিপালিটি অত্যধিক কর বসিয়ে আমাদের উচ্ছেদ করতে চায়? সেটা আমারই দোষ, কারণ আমিই ট্রাস্ট করে মঠটি সাধারণের হাতে তুলে দিই নি। আমি যে মাঝে মাঝে আমার ছেলেদের প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করি, সেজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত ; কিন্তু তারাও জানে যে, সংসারে সবার চাইতে আমি তাদের বেশী ভালবাসি।

দৈবের সহায়তা সত্যই হয়তো আমি পেয়েছি। কিন্তু উঃ! এতটুকু দৈব কৃপার জন্য আমাকে কী পরিমাণেই না রক্তমোক্ষণ করতে হয়েছে। ঐটি না পেলে হয়তো আমি আরও বেশী সুখী হতাম এবং মানুষ হিসাবে আরও ভাল হতাম। বর্তমান অবস্থা অবশ্য খুবই তমসাচ্ছন্ন ব'লে মনে হয় ; তবে আমি নিজে যোদ্ধা, যুদ্ধ করতে করতেই আমার প্রাণ দিতে হবে—হাল ছেড়ে দেওয়া চলবে না ; এই জন্যই তো ছেলেদের উপর আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। আমি তো তাদের যুদ্ধ করতে ডাকছি না—আমি তাদের আমার যুদ্ধে বাধা না দিতে বলছি।

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু হায়, এখন আমি চাই যে, আমার ছেলেদের মধ্যে অন্ততঃ একজন আমার পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করুক।

আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। ভারতবর্ষে কোন কাজ করতে হ'লে আমার উপস্থিতি প্রয়োজন। আমার স্বাস্থ্য এখন আগের চেয়ে অনেকটা ভাল ; হয়তো সমুদ্রযাত্রায় আরও ভাল হবে। যা হোক, এবার আমেরিকায় কেবল বন্ধু-বান্ধবদের উত্ত্যক্ত করা ছাড়া আর বিশেষ কোন কাজ করিনি।...

আমার জীবনের ভুলগুলি খুবই বড় বটে ; কিন্তু তাদের প্রত্যেকটির কারণ খুব বেশী ভালবাসা। এখন ভালবাসার উপর আমার বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে। হায়! যদি আমার এতটুকু ভালবাসা না থাকত। ভক্তির কথা বলছেন! হায়, আমি যদি নির্বিকার ও কঠোর বৈদান্তিক হ'তে পারতাম! যাক, এ জীবন শেষ হয়েছে ;

পরজন্মে চেষ্টা ক'রে দেখব। আমার দুঃখ এই —বিশেষতঃ আজকাল—আমার বন্ধু-বান্ধবগণ আমার কাছ থেকে আশীর্বাদের চেয়ে অপকারই বেশী পেয়েছে। যে শান্তি ও নির্জনতা চিরদিন খুঁজছি, তা আমার অদৃষ্টে জুটল না।

বহু বছর আগে আমি হিমালয়ে গিয়েছিলাম, আর ফিরব না এই মনে করে। এদিকে আমার বোন আত্মহত্যা ক'রল, সে-সংবাদ আমার কাছে এসে পৌঁছল, আমার সেই দুর্বল হৃদয় আমাকে শান্তির আশা থেকে বিচ্যুত ক'রল। সে দুর্বল হৃদয়ই আবার—আমি যাদের ভালবাসি, তাদের জন্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা করতে আমাকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাই আমি আমেরিকায়! শান্তি আমি চেয়েছি ; কিন্তু ভক্তির আধার আমার হৃদয়টি তা থেকে আমায় বঞ্চিত করেছে। সংগ্রাম ও যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ও সংগ্রাম! যাক, তাই যখন আমার নিয়তি, তখন তাই হোক ; আর যত শীঘ্র এর শেষ হয়, ততই মঙ্গল। লোকে বলে আমি ভাবপ্রবণ, কিন্তু অবস্থার কথা ভাবুন দেখি!

...কাজের শেষটা যেন বড় তমসাচ্ছন্ন ও বড় বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভগবানের দয়ায় মনে করবেন না যে, আমি মুহূর্তের জন্য হাল ছেড়ে দেব? কাজ করে করে অবশেষে রাস্তায় পড়ে মরবার জন্যে ভগবান যদি আমায় তাঁর ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া করে থাকেন, তবে তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ওয়া গুরু কি ফতে, গুরুজীর জয় হোক! হাঁ, যে অবস্থাই আসুক না কেন—সংসার আসুক, নরক আসুক, দেবতারা আসুন, মা আসুন—আমি সংগ্রাম চালিয়েই যাব, কখনও হার মানব না। স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সংগ্রাম করে রাবণ তিন জন্মে মুক্তি লাভ করেছিল। মহামায়ার সঙ্গে সংগ্রাম তো গৌরবের বিষয়![১৮]

লস এঞ্জেলেস, ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯

সম্প্রতি আবার শরীর খারাপ হয়েছিল, তাই চিকিৎসক রগড়ে রগড়ে আমার ইঞ্চি কয়েক চামড়া তুলে ফেলেছে। এখনও আমি তার যন্ত্রণা বোধ করছি।

নিবেদিতার কাছ থেকে একখানি খুব আশাপ্রদ চিঠি পেয়েছি। আমি প্যাসাডেনায় খেটে চলেছি এবং আশা করছি যে, এখানে আমার কাজের কিছু ফল হবে। এখানে কেউ কেউ খুব উৎসাহী। 'রাজযোগ' বইখানি সত্যই এই উপকূলে চমৎকার কাজ করেছে। মনের দিক থেকে খুব ভাল আছি ; সম্প্রতি আমি যেমন শান্তিতে আছি, তেমন কখনও ছিলাম না। যেমন ধরুন, বক্তৃতার ফলে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। এটা একটা লাভ নিশ্চয়! কিছু লেখার কাজও করছি। এখানকার বক্তৃতাগুলি একজন সাঙ্কেতিক লেখক টুকে নিয়েছিল ; স্থানীয় লোকেরা তা ছাপতে চায়।...

বরাবর যেমন হয়ে থাকে—পরিকল্পনাগুলি ক্রমে কাজে পরিণত হচ্ছে ; কিন্তু আমি যেমন ব'লে থাকি, 'মা-ই সব জানেন'। তিনি যেন আমায় মুক্তি দেন এবং তাঁর কাজের জন্য অন্য লোক বেছে নেন!

ভাল কথা, ফলে আসক্তি-না রেখে কাজ করার যে উপদেশ গীতায় আছে, সেটি মনে মনে ঠিক ঠিক অভ্যাস করার প্রকৃত উপায় আমি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছি। ধ্যান, মনোযোগ ও একাগ্রতার সাধন সম্বন্ধে আমি এমন আলো পেয়েছি, যার অভ্যাস করলে আমরা সর্বপ্রকার উদ্বেগ ও দুর্ভাবনার অতীত হয়ে যাব। মনটাকে ইচ্ছানুসারে এক জায়গায় ঘিরে রেখে দেওয়ার কৌশল ছাড়া এটা আর কিছু নয়।...

যন্ত্রণাভোগেও একটা আনন্দ আছে, যদি তা পরের জন্য হয়। তাই নয় কি? মিসেস লেগেট ভাল আছেন, জো-ও তাই ; আর তারা বলছে, আমি ভাল আছি। হয়তো তাদেরই কথা ঠিক। যাই হোক, আমি কাজ ক'রে যাচ্ছি এবং কাজের মধ্যেই মরতে চাই—অবশ্য যদি তা মায়ের অভিপ্রেত হয়। আমি সন্তুষ্ট।[১৯]

লস এঞ্জেলেস, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯

নিবেদিতা, সত্যি আমি চৌম্বক চিকিৎসা-প্রণালীতে 'ম্যাগনেটিক হিলিং' ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছি। মোট কথা, এখন আমি বেশ ভালই আছি। আমার শরীরের কোন যন্ত্র কোনকালেই বিগড়ায়নি—স্নায়বিক দৌর্বল্য ও ডিসপেপসিয়াই আমার দেহে যা-কিছু গোল বাধিয়েছিল।

এখন আমি রোজ খাবারের আগে বা পরে যে-কোন সময়েই হোক মাইলের পর মাইল বেড়িয়ে আসি। আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ভালই থাকব।

এখন চাকা ঘুরছে—মা সেই চাকা ঘোরাচ্ছেন। তাঁর কাজ যতদিন না শেষ হচ্ছে, ততদিন তিনি আমায় যেতে দিচ্ছেন না—এইটি হচ্ছে রহস্য। চারদিকের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ বোধ হচ্ছে, অতএব প্রস্তুত হও।[২০]

লস এঞ্জেলেস, ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৯৯

আমি দ্রুত পয়সা করছি—বর্তমানে দিনে ২৫ ডলার। শীঘ্রই আমি আরও কাজ করব এবং ৫০ ডলার করে দিনে পাব। সানফ্রান্সিসকোতে আমি আরও ভাল করবার আশা রাখি —দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে সেখানে যাব। আরও ভাল খবর অর্থের সবটাই নিজের কাছে রাখছি এবং কোনো অপব্যয় নেই এরপরে হিমালয়ে আমি একটা ছোট্ট জায়গা কিনব—একটা সম্পূর্ণ পাহাড়-- প্রায় ধর ৬০০০ ফিট উচ্চতায়, সেই সঙ্গে চিরতুষারের অপরূপ দৃশ্য। সেখানে

ছোটখাট ঝর্না আর হ্রদ থাকতে হবে। সিডার গাছ—হিমালয়ের সিডার অরণ্যানী—আর ফুল, সর্বত্র ফুল। আমার একটি ছোট্ট কুঠিয়া থাকবে, মাঝখানে আমার সব্জিবাগান, যেটা আমি নিজে করব—আর—আর—আর—আমার বইগুলো— কচিৎ কখনও মানুষের মুখ দেখব। পৃথিবী ধ্বংস হ'য়ে যেতে পারে আমার কানের পাশ দিয়েই, আমি মাথা ঘামাব না। অনেক কাজ হল, এবার বিরাম। আমি! সারাজীবন কত যে অশান্ত হ'য়েছি! জন্মেছি যাযাবর হয়ে। জানি না, বর্তমানে এই আমার অনুভূতি। ভবিষ্যত এখনও আসেনি। আশ্চর্য—নিজের সুখের ব্যাপারে আমার সমস্ত স্বপ্ন ব্যর্থ হতে বাধ্য ; কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে—তারা সত্য হবেই।[২১]

লস এঞ্জেলেস, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯০০

নিবেদিতা, যে শান্তি ও বিশ্রাম আমি খুঁজছি, তা আসবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না। তবে মহামায়া আমাকে দিয়ে অপরের—অন্ততঃ আমার স্বদেশের—কথঞ্চিৎ কল্যাণ করাচ্ছেন ; আর এই উৎসর্গের ভাব-অবলম্বনে নিজ অদৃষ্টের সঙ্গে একটা আপস করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। আমরা সকলেই নিজের নিজের ভাবে উৎসর্গীকৃত। মহাপূজা চলছে ; একটা বিরাট বলি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এর অর্থ পাওয়া যায় না। যারা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দেয়, তারা অনেক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায়। আর যারা বাধা দেয়, তাদের জোর ক'রে দাবানো হয়, এবং তাদের দুর্ভোগও হয় বেশী। আমি এখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে বদ্ধপরিকর।[২২]

লস এঞ্জেলেস, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯

ধীরামাতা, আমার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে অনেক ভাল আছে এবং আবার কাজ করবার মতো যথেষ্ট শক্তি পেয়েছি। ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছি এবং সারদানন্দকে কিছু টাকা (১৩০০ টাকা) পাঠিয়েছি, মামলার খরচা বাবদ, ...দরকার হ'লে আরও পাঠাব।

...বেচারা ছেলেরা! আমি মাঝে মাঝে তাদের প্রতি কত রূঢ় ব্যবহারই না করি! এ-সব সত্ত্বেও তারা জানে যে, আমি তাদের সকলের চেয়ে বড় বন্ধু। ...আমি তিন সপ্তাহ আগে তাদের তার ক'রে জানিয়েছি যে, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। আমি যদি আরও অসুস্থ না হয়ে পড়ি, তবে যেটুকু স্বাস্থ্য এখন আছে, তাতেই চলে যাবে। আমার জন্য মোটেই ভাববেন না, আমি উঠে-পড়ে কাজে লেগে গেছি।

আমি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শান্তিতে আছি এবং বুঝতে পেরেছি

যে, এই শান্তি বজায় রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরকে শেখানো। কাজই হচ্ছে আমার একমাত্র সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্‌। আমার দরকার হচ্ছে শুধু পরিষ্কার মাথাওয়ালা জনকয়েক লোকের। আমার পক্ষে কাজ করা তখনই সম্ভব হয়, যখন আমাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই আমার শক্তি খোলে বেশী। মা-র যেন তাই অভিপ্রায়। জো-এর বিশ্বাস এই যে, মায়ের মনে অনেক সব বড় বড় ব্যাপারের পরিকল্পনা চলছে—তাই যেন হয়! জো ও নিবেদিতা যেন সত্যি সত্যি ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা হয়ে পড়েছে দেখছি! আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমি জীবনে যা-কিছু ঘা খেয়েছি, যা-কিছু যন্ত্রণা ভোগ করেছি—সবই সানন্দ আত্মত্যাগে পরিণত হবে, যদি মা আবার ভারতের দিকে মুখ তুলে চান।...

আমি শীঘ্রই ক্যালিফোর্নিয়াতে কাজ করতে যাচ্ছি। ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়ে যাবার সময়ে আমি তুরীয়ানন্দকে ডেকে পাঠাব এবং তাকে প্রশান্তমহাসাগরের উপকূলে কাজে লাগাব। আমার নিশ্চিত ধারণা এখানে একটা বড় কর্মক্ষেত্র আছে।

জো একজন মহিলা-চিকিৎসককে খুঁজে বের করেছে ; তিনি 'হাতঘষা' চিকিৎসা করেন। আমরা দুজনেই তাঁর চিকিৎসায় আছি। জো-এর ধারণা যে, তিনি আমাকে বেশ চাঙ্গা ক'রে তুলেছেন। আর সে নিজে দাবি করে যে, তার নিজের উপর অলৌকিক ফল ফলেছে। 'হাতঘষা' চিকিৎসার ফলেই হোক, ক্যালিফোর্নিয়ার 'ওজোন্‌' বাষ্পের ফলেই হোক, অথবা বর্তমান কর্মের দশা কেটে যাবার ফলেই হোক, আমি সেরে উঠছি। পেটভরা খাবার পরেও তিন মাইল হাঁটতে পারা একটা বিরাট ব্যাপার নিশ্চয়![২৩]

লস এঞ্জেলেস, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯

এখানে এখন ঠিক উত্তরভারতের মতো শীত, কেবল মাঝে মাঝে কয়েকটা দিন একটু গরম ; গোলাপ ফুলও আছে, পামগুলি চমৎকার। ক্ষেতে বার্লি ফলেছে, গোলাপ এবং অন্যান্য নানা জাতের ফুল ফুটেছে আমার কুটিরের চারপাশে। গৃহস্বামিনী মিসেস ব্লজেট চিকাগোর মহিলা—স্থূলাঙ্গী, বৃদ্ধা এবং খুবই রসিকা ও বাক্‌চতুরা। চিকাগোতে তিনি আমার বক্তৃতা শুনেছেন এবং খুব মাতৃস্বভাবা।

ঠিক এখনই আমি সুখী এবং বাকী জীবনও সুখী থাকার আশা করছি।

বেশ কিছু টাকা করতে পারলে খুব খুশী হবো। কিছু কিছু করছি। মার্গটকে ব'লো, আমি বেশ কিছু টাকা ক'রে ফেলছি এবং জাপান, হনুলুলু, চীন ও জাভার

পথে দেশে ফিরব। তাড়াতাড়ি টাকা করার পক্ষে এটা চমৎকার জায়গা ; এবং শুনছি স্যান ফ্র্যান্সিস্কো এর চেয়েও ভাল।[২৪]

প্যাসাডেনা, ১৭ জানুয়ারী, ১৯০০

মিস্ ম্যাকলিয়ড় এবং মিসেস লেগেটের সাহায্যে আমি সারদানন্দকে ২০০০ টাকা দিতে পেরেছি। তাঁরা যথাসাধ্য দিয়েছেন, বাকীটা বক্তৃতার মাধ্যমে।

এখানে বা অন্য কোথাও বক্তৃতার দ্বারা বিশেষ কিছু হবে ব'লে আশা করি না। ওতে আমার খরচই পোষায় না। শুধু তাই নয়, পয়সা খরচের সম্ভাবনা ঘটলেই কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। এদেশে বক্তৃতার ক্ষেত্রটাকে বেশী চষে ফেলা হয়েছে, আর লোকেরা বক্তৃতা শোনার মনোভাব কাটিয়ে উঠেছে।

আমি শারীরিকভাবে ভাল। সারাইকারীর মনে হচ্ছে যে কোন জায়গায় যাবার স্বাধীনতা আমার আছে। এটা চলতে থাকবে এবং আর কয়েকমাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হব। উনি ভাবছেন আমি সুস্থ, বাকীটা প্রকৃতি-নির্ভর।

...আমি এখানে প্রধানতঃ স্বাস্থ্যের জন্য এসেছিলাম ; আর আমি তা পেয়েছি। উপরন্তু, আমি ২০০০ টাকা পেয়েছি, যা মামলার ব্যয় নির্বাহের কাজে লাগবে। ভাল।

...এখন আমার মনে হচ্ছে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে কাজ করার পালা আমার ফুরিয়ে গেছে ; ঐ জাতীয় কাজ ক'রে আর আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ করা নিষ্প্রয়োজন।

এখন আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, মঠের সব ভাবনা আমাকে ত্যাগ করতে হবে... এবং একসময়ে আমাকে গর্ভধারিণী মায়ের কাছে ফিরে যেতে হবে। আমার দরুন তাঁর অনেক দুর্দশা হয়েছে। তাঁর শেষ দিনগুলি আমি মসৃণ করতে চেষ্টা করব। জান কি শঙ্করাচার্য্যকে এরকম করতে হয়েছিল। মায়ের শেষ সময়ে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হয়।

আর আমার কাছে এই সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগের আহ্বানও আসছে—আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নেতৃত্ব ও যশের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হবে। আমার মন প্রস্তুত হয়ে আছে এবং আমার এ-তপস্যা করতে হবে। ...মঠের একটা ট্রাস্ট-দলিল করতে চাই সারদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও তোমার (ধীরামাতা) নামে।

শরতের কাছ থেকে কাগজপত্র পেলেই তা ক'রে ফেলব। তারপর আমি শান্ত হবো। আমি চাই বিশ্রাম, একমুঠো অন্ন, খানকয়েক বই এবং কিছু লেখাপড়ার কাজ। মা এখন আমাকে এই আলোক স্পষ্ট দেখাচ্ছেন।

এখন দেখা যাচ্ছে, ১৮৮৪ সালে আমার মাকে ছেড়ে আসা মহা ত্যাগের বিষয় ছিল—মায়ের কাছে ফিরে যাওয়া আরও ত্যাগের বিষয় হবে। মনে হয়

সেকালে মহা আচার্য (শঙ্কর) যা করেছিলেন জগন্মাতা চান আমিও তাই করি।

আমি এখন শিশু বই কিছু নই। আমার কি কাজ? আমার সমস্ত শক্তি আপনাতে সমর্পিত। বেশ দেখছি।

বুঝতে পারছি যে, আমি আর বক্তৃতামঞ্চ থেকে বাণী প্রচার করতে পারব না। এতে আমি খুশী। আমি বিশ্রাম চাই। আমি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তা নয় ; কিন্তু এর পরবর্তী অধ্যায়—কথা নয়, অলৌকিক স্পর্শ, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল।[২৫]

লস এঞ্জেলেস, ১৭ই জুন, ১৯০০

সারা জীবন আমি জগতের জন্য খেটেছি, কিন্তু আমার দেহের এক খাবলা মাংস কেটে না নেওয়া পর্যন্ত জগৎ এক টুকরো রুটিও আমাকে ছুঁড়ে দেয়নি।[২৬]

লস এঞ্জেলেস, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০০

নিবেদিতা, যাই হোক আমি এখন খুব শক্ত হয়েছি—আগের চেয়ে আমার দৃঢ়তা খুব বেড়েছে—আমার হৃদয়টা যেন লোহার পাত দিয়ে বাঁধানো হয়ে গেছে। আমি এখন সন্ন্যাস-জীবনের অনেকটা কাছাকাছি যাচ্ছি।

তুমি গল্পগুলি পেয়েছ জেনে খুশি হলাম। ভাল বিবেচনা করতো তুমি নিজে এগুলো আবার নতুন করে লেখো। কোন প্রকাশক যদি পাও তাকে দিয়ে ওগুলো ছাপিয়ে প্রকাশ করে দাও ; আর যদি বিক্রি করে কিছু লাভ হয়, তোমার কাজের জন্য নাও। আমার নিজের দরকার নেই। আমি এখানে কিছু অর্থ পেয়েছি। আসছে সপ্তাহে স্যান ফ্রান্সিস্কোয় যাচ্ছি ; সেখানে সুবিধা করতে পারব—আশা করি।...

আমি ক্রমশঃ ধীর, স্থির, শান্তপ্রকৃতি হয়ে আসছি—যাই ঘটুক না কেন, আমি প্রস্তুত। এইবার যে কাজে লাগা যাবে, প্রত্যেক আঘাতে বেশ কাজ হবে—একটিও বৃথা যাবে না—এই হচ্ছে আমার জীবনের আগামী অধ্যায়।[২৭]

প্যাসাডেনা, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০

প্রিয় মেরী, মিঃ হেলের দেহত্যাগের বেদনাদায়ক সংবাদ বহন ক'রে তোমার চিঠিখানা গতকাল পৌঁছেছে। আমি মর্মাহত হয়েছি, সন্ন্যাসের শিক্ষা সত্ত্বেও আমার হৃদয়বৃত্তি এখনও বেঁচে আছে। তার পর যেসব মহাপ্রাণ মানুষ আমি দেখেছি, মিঃ হেল তাঁদের একজন।

জীবনে আমি অনেক সয়েছি, অনেককে হারিয়েছি, আর সেই বিয়োগের সবচেয়ে বিচিত্র যন্ত্রণা হল—আমার মনে হয়েছে, যে চলে গেল আমি তার যোগ্য

ছিলাম না। পিতার মৃত্যুর পর মাসের পর মাস এই যন্ত্রণায় কেটেছে—আমি তাঁর কতই না অবাধ্য ছিলাম!

যতই আমরা বই পড়ি বা বক্তৃতা শুনি, বা লম্বা লম্বা কথা বলি, শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতাই একমাত্র শিক্ষক, সেই শুধু চোখ ফোটায়। অভিজ্ঞতা যে ভাবে হয়, সেই ভাবেই তা সবচেয়ে ভাল। আমরা শিখি হাসির আলোয়, শিখি চোখের জলে। জানি না কেন এমন হয়, কিন্তু তা যে হয়, তা দেখতেই পাই। সেটাই যথেষ্ট।... আমরা সকলে যদি স্বপ্নে ডুবে থাকতে পারতাম!

জীবনে এতদিন পর্যন্ত তুমি নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছ, আর আমাকে জ্বলতে, কাঁদতে হয়েছে সারাক্ষণ। এখন ক্ষণকালের জন্য তুমি জীবনের অপর দিকটা দেখতে পেলে। এ ধরনের অবিরাম আঘাতে আঘাতে আমার জীবন তৈরি হয়েছে, এর চেয়েও শতগুণ ভয়ঙ্কর আঘাত— দারিদ্র্যের, বিশ্বাসঘাতকতার আর আমার নিজের নির্বুদ্ধিতার যন্ত্রণা। একি নৈরাশ্যবাদ? এখন তুমি বুঝবে, কেমন ক'রে তা আসে। ঠিক, ঠিক, তোমাকে আর কি ব'লব মেরী, কথা তো সবই তোমার জানা। শুধু একটি কথা বলি এবং তার মধ্যে এতটুকু ভেজাল নেই, যদি আমাদের দুঃখ বিনিময় করা সম্ভব হ'ত, এবং তোমাকে দেবার মতো আনন্দ-ভরা মন যদি আমার থাকত, তা হ'লে নিশ্চয় বলছি, চিরদিনের জন্য তোমার সঙ্গে তা বিনিময় ক'রে নিতাম।[২৮]

ক্যালিফোর্নিয়া, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০

বাক্যি-যাতনা, শাস্ত্র-ফাস্ত্র, মতামত—আমার এ বুড়ো বয়সে বিষবৎ হয়ে যাচ্ছে। যে কাজ করবে, সেই আমার মাথার মণি—ইতি নিশ্চিতম্। মিছে বকাবকি চেঁচামেচিতে সময় যাচ্ছে—আয়ুক্ষয় হচ্ছে, লোকহিত একপাও এগোচ্ছে না।[২৯]

স্যান ফ্রান্সিস্কো, ২রা মার্চ, ১৯০০

প্রিয় মেরী, আমি এখন টাকা যোগাড় করতে ব্যস্ত ; তবে বেশি কিছু ক'রে উঠতে পারছি না। হ্যাঁ, যে-কোন উপায়েই হোক, দেশে যাওয়ার খরচটা তোলার মতো টাকা আমায় করতেই হবে। এখানে একটা নূতন ক্ষেত্র পেয়েছি—শত শত উৎসুক শ্রোতা আসছে, আমার বই পড়ে এরা আগে থেকেই প্রস্তুত ও উদ্‌গ্রীব ছিল।

অবশ্য টাকা যোগাড় করার ব্যাপারটা যেমন মন্থর, তেমনি বিরক্তিকর। কয়েক-শ যোগাড় করতে পারলেই আমি খুব খুশি হবো।

আমার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু পূর্বের বল এখনও ফিরে পাইনি ; কিন্তু এতটুকু শক্তির জন্য অনেকখানি পরিশ্রম করতে হবে। অন্তত কয়েকটা

দিনের জন্যও যদি বিশ্রাম ও শান্তি পেতাম।

মা-ই-সব জানেন, আমার সেই পুরানো কথা—তিনিই ভাল জানেন। গত দু-বছর বিশেষ খারাপ গেছে। মনের দুঃখে বাস করেছি। এখন কিছুটা আবরণ সরে গেছে, এখন আমি সুদিনের—আরও ভাল অবস্থার আশায় আছি।[৩০]

স্যান ফ্রান্সিস্কো, ৪ঠা মার্চ, ১৯০০

নিবেদিতা, আমি আর কাজ করতে চাই না—এখন বিশ্রাম ও শান্তি চাই। স্থান ও কালের তত্ত্ব আমার জানা আছে ; কিন্তু আমার বিধিলিপি বা কর্মফল আমায় নিয়ে চলেছে—শুধু কাজ, কাজ! আমরা যেন গরুর পালের মতো কসাইখানার দিকে চালিত হচ্ছি ; কসাইখানা অভিমুখে তাড়িত গরু যেমন পথের ধারের ঘাস এক এক খাবলা খেয়ে নেয়, আমাদের অবস্থাও ঠিক সেই রকম। আর এই হচ্ছে আমাদের কর্ম বা আমাদের ভয়—ভয়ই হচ্ছে দুঃখ ব্যাধি প্রভৃতির আকর। বিভ্রান্ত ও ভয়চকিত হয়ে আমরা অপরের ক্ষতি করি। আঘাত করতে ভয় পেয়ে আমরা আরও বেশি আঘাত করি। পাপকে এড়িয়ে চলতে একান্ত আগ্রহান্বিত হয়ে আমরা পাপেরই মুখে পড়ি।

আমাদের চারপাশে কত অকেজো আবর্জনা-স্তূপই না আমরা সৃষ্টি করি! এতে আমাদের কোন উপকারই হয় না, বরং যাকে আমরা পরিহার করতে চাই, তারই দিকে—সেই দুঃখেরই দিকে আমরা পরিচালিত হই।...

আহা! যদি একেবারে নির্ভীক, সাহসী ও বেপরোয়া হতে পারা যেত!...[৩১]

স্যান ফ্রান্সিস্কো, ৪ঠা মার্চ, ১৯০০

আমার স্বাস্থ্য প্রায় একরকমই আছে—আমি তো কোন ইতরবিশেষ দেখছি না। সম্ভবতঃ স্বাস্থ্যের উন্নতিই হচ্ছে—যদিও অজ্ঞাতসারে। আমি ৩০০০ শ্রোতাকে শোনাবার মত উঁচু গলায় বক্তৃতা দিতে পারি ; ওকল্যান্ডে আমাকে দুবার তাই করতে হয়েছিল। আর দু ঘণ্টা বক্তৃতার পরেও আমার সুনিদ্রা হয়।[৩২]

স্যান ফ্রান্সিস্কো, ৭ই মার্চ, ১৯০০

আমার শরীর এক-রকম চলে যাচ্ছে। টাকা নেই, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, অথচ ফল শূন্য! লস্ এঞ্জেলেসের চেয়েও খারাপ! কিছু না দিতে হ'লে তারা দল বেঁধে বক্তৃতা শুনতে আসে—আর কিছু খরচ করতে হ'লে আসে না ; এই তো ব্যাপার![৩৩]

স্যান ফ্রান্সিস্কো, ১৭ই মার্চ, ১৯০০

ডাঃ হিলার ও মিসেস হিলার শহরে ফিরে এসেছেন ; মিসেস মিল্টনের

চিকিৎসায় তাঁরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। আমার বেলায় (তাঁর চিকিৎসায়) বুকে অনেকগুলি বড় বড় লাল লাল দাগ ফুটে উঠেছে। আরোগ্যের ব্যাপারে কতদূর কি হয়, পরে বিস্তারিত আপনাকে জানাব।

এখানে আমি চুপচাপ সহ্য করার নীতি অবলম্বন ক'রে যাচ্ছি, এ পর্যন্ত ফল মন্দ হয়নি।

তিন বোনের মেজটি মিসেস হ্যান্স্‌বরো এখন এখানে। সে আমাকে সাহায্য করবার জন্যে অবিরাম কাজ খেটে চলেছে। প্রভু তাদের হৃদয় আশীর্বাদে ভরিয়ে দিন। তিনটি বোন যেন তিনটি দেবী!

এখানে ওখানে এ-ধরনের আত্মার সংস্পর্শ পাওয়া যায় বলেই জীবনের সকল অর্থহীনতার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।[৩৪]

স্যান ফ্রান্সিস্কো, ২২শে মার্চ, ১৯০০

মেরী, তুমি ঠিকই বলেছ যে, ভারতবাসীদের বিষয় ছাড়া আমার আরও অনেক কিছু চিন্তা করবার আছে, কিন্তু গুরুদেবের কাজই আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য, তার তুলনায় ঐসবই গৌণ।

এই আত্মত্যাগ যদি সুখকর হ'ত! তা হয় না, ফলে স্বভাবতই কখন কখন মনে তিক্ততা আসে ; কিন্তু জেনো মেরী, আমি এখনও মানুষই আছি—এবং নিজের সব কিছু একেবারে ভুলে যেতে পারি না ; আশা করি, একদিন তা পারব।

আর আমার কথা যদি বলো, আমি এই অবিরাম ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই ঘরে ফিরে শান্তিতে কাটাতে চাই। আর কাজ করতে চাই না। জ্ঞানপতস্বীর মতো নির্জনে জীবন যাপন করাই আমার স্বভাব। সে অবসর কখনও জুটলো না! প্রার্থনা করি, এবার তা যেন পাই। এখন আমি ভগ্নস্বাস্থ্য, কর্মক্লান্ত! হিমালয়ের আশ্রম থেকে যখনই মিসেস সেভিয়ারের কোন চিঠি পাই, তখনই ইচ্ছা হয়—যেন সেখানে উড়ে চলে যাই। প্রতিনিয়ত প্ল্যাটফর্মে বক্তৃতা ক'রে, অবিরত ঘুরে বেড়িয়ে আর নিত্যনতুন মুখ দেখে দেখে আমি একেবারে ক্লান্ত।[৩৫]

স্যান ফ্রানিস্কো, ২৫শে মার্চ, ১৯০০

নিবেদিতা, আমি আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি এবং ক্রমশঃ বল পাচ্ছি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, খুব শীঘ্রই যেন মুক্তি পাব। গত দু-বছরের যন্ত্রণারাশি আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে। ব্যাধি ও দুর্ভাগ্য পরিণামে আমাদের কল্যাণই সাধন করে, যদিও তখনকার জন্য মনে হয়, বুঝি আমরা একেবারে ডুবে গেলাম।[৩৬]

স্যান ফ্রানিস্কো, ২৮শে মার্চ, ১৯০০

আমি খুব খাটছি—আর যত বেশী খাটছি, ততই ভাল বোধ করছি। শরীর অসুস্থ হয়ে আমার একটা বিশেষ উপকার হয়েছে, নিশ্চয়। আমি এখন ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি, অনাসক্তি মানে কি ; আর আমার আশা—অতি শীঘ্রই আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হবো।

আমরা আমাদের সমুদয় শক্তি একদিকে প্রয়োগ ক'রে একটা বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ি ; আর এই ব্যাপারেরই আর যে একটা দিক আছে, যেটা সমভাবে কঠিন হলেও সেটির দিকে আমরা খুব কমই মনোযোগ দিয়ে থাকি—সেটি হচ্ছে, মুহূর্তের মধ্যে কোন বিষয় থেকে অনাসক্ত হবার— নিজেকে আলগা ক'রে নেবার শক্তি। এই আসক্তি ও অনাসক্তি—দুই-ই যখন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন মানুষ মহৎ ও সুখী হয়।

সব জিনিসকেই ঘুরে আসতে হবে—বৃক্ষরূপে বিকশিত হ'তে হ'লে বীজকে কিছুদিন মাটির নীচে পড়ে পচতে হবে। গত দু-বছর চলছিল যেন এইরূপ মাটির নীচে পচা। মৃত্যুর করালগ্রাসে পড়ে আগেও যখনই আমি ছটফট করেছি, তার পরেই সমগ্র জীবনটা যেন প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

এইভাবে একবার রামকৃষ্ণের কাছে উপনীত হই, আর একবার ঐরকম হবার পর যুক্তরাষ্ট্রে আসতে হ'ল। শেষটিই হয়েছে অন্য সবগুলির মধ্যে বৃহৎ ব্যাপার। সে-ভাব এখন চলে গেছে—এখন আমি এমন স্থির শান্ত হয়ে গেছি যে, সময়ে সময়ে নিজেরই আশ্চর্য বোধ হয়। আমি এখন সকাল-সন্ধ্যা খুব খাটি, যখন যা পাই খাই, রাত্রি বারোটায় শুতে যাই, আর কি গভীর নিদ্রা! আগে কখনও আমার এমন ঘুমোবার শক্তি ছিল না।[৩৭]

স্যান ফ্রান্সিস্কো, ৭ই এপ্রিল, ১৯০০

আমি এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মহানন্দে খুব খাটছি। কর্মেই আমার অধিকার, বাকি মা জানেন।

দেখ, এখানে যতদিন থাকব ব'লে মনে করেছিলাম, তার চেয়ে বেশী দিন থেকে কাজ করতে হবে দেখছি। সেজন্য বিচলিত হয়ো না ; আমার সব সমস্যার সমাধান আমিই ক'রব। আমি এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, আলোও দেখতে পাচ্ছি। হয়তো সাফল্য আমাকে বিপথগামী করত এবং আমি যে সন্ন্যাসী—এই সত্যটাই হয়তো মনে রাখতে পারতাম না। তাই 'মা' আমাকে এই অভিজ্ঞতা দিচ্ছেন।[৩৮]

আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া, ২০শে এপ্রিল, ১৯০০

সোমবার চিকাগো যাত্রা করব। এক সহৃদয় মহিলা তিনমাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে, নিউ ইয়র্কের এমন একখানা রেলওয়ে পাস আমাকে দিয়েছেন। 'মা'ই আমাকে দেখবেন। সারা জীবন আগলে থাকার পরে তিনি নিশ্চয়ই এখন আমাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দেবেন না।[৩৯]

আলামেডা, ২৩শে এপ্রিল, ১৯০০

আজই আমার যাত্রা করা উচিত ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে যাত্রার পূর্বে ক্যালিফোর্নিয়ার বিশাল রেড উড বৃক্ষরাজির নীচে তাঁবুতে বাস করার লোভ আমি সংবরণ করতে পারলাম না। তাই তিন-চার দিনের জন্য যাত্রা স্থগিত রাখলাম। তা ছাড়া অবিরাম কাজের পরে এবং চারদিনের হাড়ভাঙা ভ্রমণে বেরোবার আগে ঈশ্বরের মুক্ত বায়ুতে শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন আমার ছিল।

আগামী কাল বনের দিকে যাত্রা করছি। উফ! চিকাগো যাবার আগে ফুসফুস ওজোন (ozone)-এ ভরে নেবো।[৪০]

আলামেডা, ৩০শে এপ্রিল, ১৯০০

আকস্মিক অসুস্থতা ও জ্বরের জন্য এখনও চিকাগো যাত্রা করতে পারিনি। দীর্ঘ ভ্রমণের ধকল সহ্য করার মতো বল পেলেই রওনা হবো।[৪১]

আলামেডা, ২রা মে, ১৯০০

আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম—মাসখানেক ধরে কঠোর পরিশ্রমের ফলে আবার রোগের আক্রমণ হয়েছিল। যাই হোক, এতে আমি এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে, আমার হার্ট বা কিডনিতে কোন রোগ নাই, শুধু অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্নায়ুগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং আজ কিছু দিনের জন্য গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছি এবং শরীর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকব।[৪২]

স্যান ফ্রান্সিস্কো, ১৮ই মে, ১৯০০

শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন মানুষের কাছে ঘুরে বেড়ানো কাজটা সন্ন্যাসীর জন্য নয়। সন্ন্যাসীর জন্য হচ্ছে নিঃসঙ্গতা এবং এমন নির্জনতা যে, সে কদাচিৎ মানুষের মুখ দেখতে পায়।

এখন আমি তার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, অন্ততঃ শরীরের দিক থেকে—যদি অবসর গ্রহণ না করি, তবে প্রকৃতি আমাকে তা করতে বাধ্য করবে।[৪৩]

নিউ ইয়র্ক, ১৩ই জুন, ১৯০০

উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই। যেমন লিখেছিলাম, আমি আগেকার চেয়ে

সুস্থ ; কিডনি সম্পর্কে পুরনো সমস্ত ভয়ও দূরীভূত। আমার একমাত্র রোগ উদ্বেগ, এটাও আমি দ্রুত জয় করছি।[৪৪]

নিউ ইয়র্ক, ২৩শে জুন, ১৯০০

খুব ভাল আছি, সুখী আছি— যেমন থাকি। জোয়ারের আগে ঢেউ আসবেই।

সবরকম ভাবালুতা ও আবেগ দূর করতে আমি বদ্ধপরিকর, আমাকে আর কখনও আবেগবিহ্বল হ'তে দেখলে আমার গলায় দড়ি দিও। আমি হলাম অদ্বৈতবাদী ; জ্ঞান আমাদের লক্ষ্য—ভাবাবেগ নয়, ভালবাসা নয়, কিছু নয়, —কারণ ঐসব জিনিস ইন্দ্রিয় বা কুসংস্কার বা বন্ধনের অন্তর্ভুক্ত। আমি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ।

'মা' আমাকে দেখছেন। ভাবাবেগের নরক থেকে তিনি আমাকে উদ্ধার ক'রে আনছেন, উত্তীর্ণ ক'রে দিচ্ছেন বিশুদ্ধ যুক্তিবিচারের আলোকে।

আমার উপরে কারও কোন অধিকার নেই, কারণ আমি আত্মস্বরূপ। কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার নেই।

সবসময়ে আমার অনাসক্তি ছিলই। এক মুহূর্তেই আবার তা এসে গিয়েছে। শীঘ্রই আমি এমন জায়গায় দাঁড়াচ্ছি, যেখানে কোন ভাবালুতা বা হৃদয়াবেগ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।[৪৫]

নিউ ইয়র্ক, ১১ই জুলাই, ১৯০০

লম্বা চুল কেটে ফেলার জন্য আমি সকলের কাছে তিরস্কৃত হচ্ছি।

ডেট্রয়েট গিয়েছিলাম, গতকাল ফিরে এসেছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্রান্সে যেতে চেষ্টা করছি, সেখান থেকে ভারতে।[৪৬]

নিউ ইয়র্ক, ১৮ই জুলাই, ১৯০০

প্রিয় তুরীয়ানন্দ, ডেট্রয়েটে মাত্র তিন দিন ছিলাম। নিউইয়র্কে এখন ভয়ঙ্কর গরম।

প্রায় এক সপ্তাহ আগে কালী পাহাড়ে চলে গেছে। সেপ্টেম্বরের আগে ফিরতে পারবে না। আমি একেবারে একা... আমি তাই ভালবাসি।[৪৭]

নিউ ইয়র্ক, ২৪শে জুলাই, ১৯০০

আগামী বৃহস্পতিবারে ফরাসী জাহাজ 'লা শ্যাম্পেন'-এ আমার যাত্রা করার কথা আছে।[৪৮]

ফ্রান্স

ফ্রান্স সুন্দর দেশ—চীনের কতক অংশ ছাড়া এমন দেশ আর কোথাও নেই।[৪৯]

পাশ্চাত্যে স্নান মানে কি—মুখটি মাথাটি ধোয়া, হাত ধোয়া—যা বাইরে দেখা যায়। আবার কি! প্যারিস, সভ্যতার রাজধানী প্যারিস, রঙ-ঢঙ ভোগবিলাসের ভূস্বর্গ, বিদ্যা-শিল্পের কেন্দ্র প্যারিস, সেই প্যারিসে এক বৎসর এক বড় ধনী বন্ধু নিমন্ত্রণ ক'রে আনলেন। এক প্রাসাদোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে তুললেন—রাজভোগ খাওয়া-দাওয়া, কিন্তু স্নানের নামটি নেই। দুদিন ঠায় সহ্য ক'রে—শেষে আর পারা গেল না। শেষে বন্ধুকে বলতে হল—দাদা, তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমার এখন 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' হয়েছে। এই দারুণ গরমিকাল, তাতে স্নান করবার জো নেই, হন্যে কুকুর হবার যোগাড় হয়েছে। তখন বন্ধু দুঃখিত হয়ে চটে বললেন যে, এমন হোটেলে থাকা হবে না, চল ভাল জায়গা খুঁজে নিইগে। বারোটা প্রধান প্রধান হোটেলে খোঁজা হ'ল, স্নানের জায়গা কোথাও নেই। আলাদা স্নানাগার সব আছে, সেখানে গিয়ে চার পাঁচ টাকা দিয়ে একবার স্নান হবে। হরিবোল হরি! সে দিন বিকালে কাগজে পড়া গেল—এক বুড়ী স্নান করতে টবের মধ্যে বসেছিল, সেইখানেই মারা পড়েছে। কাজেই জন্মের মধ্যে একবার বুড়ীর চামড়ার সঙ্গে জলস্পর্শ হতেই কুপোকাত!! এর একটি কথা অতিরঞ্জিত নয়।[৫০]

প্যারিস, ২৩ শে আগস্ট, ১৯০০

মঠের হিসাবের খসড়া এই সবে এসেছে। পড়েছি, খুবই আনন্দজনক! আমি খুশী।

আমি হাজার বা ততোধিক কপি ছাপতে দিচ্ছি ইংলন্ডে, আমেরিকাতে আর ভারতে বিতরণের জন্য। শুধু শেষে আমি একটা ভিক্ষার আবেদন সংযোজন করব।[৫১]

প্যারিস, ২৫শে আগস্ট, ১৯০০

আমি মিসেস বুলকে মঠ থেকে টাকা তুলে নেবার সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি ও-বিষয়ে কিছু বললেন না, আর এদিকে ট্রাস্টের দলিলগুলি দস্তখতের জন্য পড়ে ছিল ; সুতরাং আমি ব্রিটিশ কনসালের অফিসে গিয়ে

সই ক'রে দিয়েছি। কাগজপত্র এখন ভারতের পথে। এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর নেই, কারণ কার্যব্যাপারে আমার আর কোন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা পদ রাখিনি। রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির পদও আমি ত্যাগ করেছি।

এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া রামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ এখন সভাপতি হলেন, তারপর ওটা প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর ক্রমে ক্রমে পড়বে।

এখন এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মাথা থেকে এক মস্ত বোঝা নেমে গেল! আমি এখন বিশেষ সুখী বোধ করছি।

কুড়িটি বছর রামকৃষ্ণের সেবা করলাম—তা ভুলের ভিতর দিয়েই হোক বা সাফল্যের ভিতর দিয়েই হোক—এখন আমি কাজ থেকে অবসর নিলাম। বাকী জীবন আপনভাবে কাটাব।

আমি এখন আর কারও প্রতিনিধি নই বা কারও কাছে দায়ী নই। বন্ধুদের কাছে আমার একটা অস্বাভাবিক বাধ্যবাধকতা-বোধ ছিল। এখন আমি বেশ ক'রে ভেবে-চিন্তে দেখলাম—আমি কারও কিছু ধার ধারি না। আমি তো দেখছি, প্রাণ পর্যন্ত পণ ক'রে, আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেছি, পরিবর্তে পেয়েছি তর্জন-গর্জন, অনিষ্ট চেষ্টা ও বিরক্তিকর ঝামেলা। এখানে এবং ভারতে সবার সঙ্গে আমার ইতি।

আমি কিন্তু তোমাকে চিরদিনের জন্য জানিয়ে রাখছি—আমার অন্য যে-কোন দোষ থাক না কেন, জন্ম থেকেই আমার ভিতর ঈর্ষা, লোভ বা কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা নেই।[৫২]

প্যারিস, ২৮শে আগস্ট ১৯০০

নিবেদিতা, এই তো জীবন—শুধু কঠোর পরিশ্রম! আর তা ছাড়া কীই বা আমাদের করবার আছে? কঠোর পরিশ্রম কর! একটা কিছু ঘটবে, একটা পথ খুলে যাবে। আর যদি তা না হয়—হয়তো কখনও হবে না —তা হ'লে তার পর কী? আমাদের যা কিছু উদ্যম সবই হচ্ছে সাময়িক ভাবে সেই চরম পরিণতি মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা! অহো, মহান্ সর্বদুঃখহর মৃত্যু! তুমি না থাকলে জগতের কী অবস্থাই না হ'ত!

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, বর্তমানে প্রতীয়মান এই জগৎ সত্য নয়, নিত্যও নয়। এর ভবিষ্যৎই বা আরও ভাল হবে কি করে? সেও তো বর্তমানেরই ফলস্বরূপ ; সুতরাং আরও খারাপ না হলেও ওই ভবিষ্যৎ বর্তমানেরই অনুরূপ হবে।

স্বপ্ন, অহো! কেবলই স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখে চল! স্বপ্ন—স্বপ্নের ইন্দ্রজালই এ জীবনের হেতু, আবার ওর মধ্যেই এ জীবনের প্রতিবিধানও নিহিত রয়েছে। স্বপ্ন, স্বপ্ন, কেবলই স্বপ্ন! স্বপ্ন দিয়েই স্বপ্ন ভাঙো।

আমি ফরাসী ভাষা শিখতে চেষ্টা করছি এবং এখানে —র সঙ্গে কথা বলছি। অনেকে ইতিমধ্যেই প্রশংসা করছেন। সারা দুনিয়ার সঙ্গে এই অন্তহীন গোলকধাঁধার কথা, অদৃষ্টের এই সীমাহীন লাটাই-এর কথা—যার সুতার শেষ কেউ পায় না, অথচ প্রত্যেকে অন্ততঃ তখনকার মতো মনে করে যে, সে তা বের ক'রে ফেলেছে আর তাতে অন্ততঃ তার নিজের তৃপ্তি হয়। কিছুকালের মতো সে নিজেকে ভুলিয়ে রাখে—এই তো ব্যাপার?

ভাল কথা, এখন বড় বড় কাজ করতে হবে। কিন্তু বড় কাজের জন্য মাথা ঘামায় কে? ছোট কাজই বা কিছু করা হবে না কেন? একটার চেয়ে অন্যটা তো হীন নয়। গীতা তো ছোটর মধ্যে বড়কে দেখতে শেখায়। ধন্য সেই প্রাচীন গ্রন্থ!

শরীরের বিষয় চিন্তা করবার খুব বেশী সময় আমার ছিল না। কাজেই শরীর ভালই আছে—ধরে নিতে হবে। এ সংসারে কিছুই চিরদিন ভাল থাকে না। তবে মাঝে মাঝে আমরা ভুলে যাই—ভাল হচ্ছে শুধু ভাল হওয়া ও ভাল করা।

ভালই হোক আর মন্দই হোক, আমরা সকলেই এ সংসারে নিজ নিজ অংশ অভিনয় ক'রে যাচ্ছি। যখন স্বপ্ন ভেঙে যাবে এবং আমরা রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাব, তখন এ-সব বিষয়ে আমরা শুধু প্রাণ খুলে হাসব। এই কথাটুকুই আমি নিশ্চিতভাবে বুঝেছি। [৫৩]

প্যারিস, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০০

আমার আর ঘুরে ঘুরে মরতে ইচ্ছা বড় নাই। এখন কোথাও বসে পুঁথিপাটা নিয়ে কালক্ষেপ করাই যেন উদ্দেশ্য। ফরাসী ভাষাটা কতক আয়ত্ত হয়েছে, কিন্তু দু-একমাস তাদের সঙ্গে বসবাস করলে বেশ কথাবার্তা কইতে অধিকার জন্মাবে।

এ ভাষাটা আর জার্মান—এ দুটোয় উত্তম অধিকার জন্মালে এক-রকম ইউরোপী বিদ্যায় যথেষ্ট প্রবেশ লাভ হয়।...এদেশ (ফ্রান্স) হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার শীর্ষ। পারি নগরী পাশ্চাত্য সভ্যতার রাজধানী।

আমার শরীর কখনো ভাল, কখনো মন্দ। মধ্যে আবার সেই মিসেস মিল্টনের হাতঘষা চিকিৎসা হচ্ছে। সে বলে, তুমি ভাল হয়ে গেছ 'অলরেডি'!

এই তো দেখছি যে—এখন পেটে বায়ু হাজার হোক—চলতে হাঁটতে চড়াই করতেও কোন কষ্ট হয় না। প্রাতঃকালে খুব ডন-বৈঠক করি। তারপর কালা জলে এক ডুব!!

কাল যার কাছে থাকব, তার বাড়ি দেখে এসেছি। সে গরীব মানুষ— স্কলার ; তার ঘরে একঘর বই, একটা ছ-তলার ফ্ল্যাটে থাকে। তায় এদেশে আমেরিকার মত লিফট্ নেই—চড়াই-ওতরাই। ওতে কিন্তু আমার আর কষ্ট হয় না।

সে বাড়িটির চারিধারে একটি সুন্দর সাধারণ পার্ক আছে। সে লোকটি ইংরেজী কইতে পারে না, সেইজন্য আরও যাচ্ছি। কাজে কাজেই ফরাসী কইতে হবে আমায়। এখন মায়ের ইচ্ছা। বাকি তাঁর কাজ, তিনিই জানেন। ফুটে তো বলেন না, 'গুম্ হোকে রহতী হ্যায়', তবে মাঝখান থেকে ধ্যান-জপটা তো খুব হয়ে যাচ্ছে দেখছি।[৫৪]

প্যারিস, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০০

প্যারিসে আমি মোহিত হ'য়ে যাচ্ছি। মঁ জুল বোয়া নামে একজন ফরাসী বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গে আছি। ইনি আমার কাজের গুণমুগ্ধ।

ইংরিজীতে খুব কম কথা বলেন। ফলস্বরূপ আমাকে আমার অস্পষ্ট ফরাসী ভাষা দিয়ে তালে তাল দিতে হয় এবং তিনি বলেন যে ভালই উত্তীর্ণ হচ্ছি। যখন তিনি ধীরে ধীরে কথা বলেন তখন আমি বুঝতে পারি।

পরশু আমি ব্রিটানিতে যাব, সেখানে আমার আমেরিকান বন্ধুরা সমুদ্রের হাওয়া উপভোগ করছে—সেইসঙ্গে অঙ্গসংবাহন।

এম্, বয়েসের সঙ্গে আমি যাব একটা ছোট্ট দর্শনের জন্য, তারপরে আমি জানি না কোথায় যাব। আমি যথেষ্ট ফঁরাসীয় হ'চ্ছি? সঙ্গে ব্যাকরণও শিখছি এবং যথেষ্ট পরিশ্রম করছি।... কয়েক মাসের মধ্যে আমার ফঁরাসীয় হওয়া উচিত, কিন্তু ইংলণ্ডে বসবাসের ফলে আমি সবই ভুলে যাব।[৫৫]

প্যারিস, আগস্ট, ১৯০০

হরিভাই, এক্ষণে ফ্রান্স দেশের সমুদ্রতটে অবস্থান করছি। কংগ্রেস অফ হিস্ট্রি অফ রিলিজিয়ন হয়ে গেছে। সে কিছুই নয়. জন কুড়ি পণ্ডিতে পড়ে শালগ্রামের উৎপত্তি, জিহোবার উৎপত্তি ইত্যাদি বক্‌বাদ করেছে। আমিও খানিক বক্‌বাদ তায় করেছি।[৫৬]

ঐ যে ইউরোপী পণ্ডিত বলছেন যে, আর্যেরা কোথা হ'তে উড়ে এসে ভারতের 'বুনো'দের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন—ও-সব

আহাম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ—আবার ঐ সব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শোনানো হচ্ছে। এ অতি অন্যায়।

আমি মূর্খ মানুষ, যা বুঝি তাই নিয়েই এ পারি-সভায় বিশেষ প্রতিবাদ করেছি। এদেশী এবং স্বদেশী পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করছি। সময় পেলে আরও সংশয় ওঠাবার আশা আছে।[৫৭]

প্যারিস, ১৪ই অক্টোবর, ১৯০০ (মূলটি ফরাসীতে)

"মঁ জুল বোয়া নামে একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখকের সঙ্গে আছি। আমি তাঁর অতিথি। লেখা থেকে জীবিকা অর্জন করতে হয় তাঁকে, তাই তিনি ধনী নন, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক উচ্চ উচ্চ চিন্তার ঐক্য আছে এবং আমরা পরস্পরের সাহচর্যে বেশ আনন্দে আছি।

বছর কয়েক আগে তিনি আমাকে আবিষ্কার করেন, এবং আমার কয়েকটি পুস্তিকা ইতিমধ্যেই ফরাসীতে অনুবাদ ক'রে ফেলেছেন।

মাদাম কালভে, মিস ম্যাকলাউড ও মঁ জুল বোয়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। খ্যাতনামা গায়িকা মাদাম কালভের অতিথি হবো।

কনস্তান্তিনোপল্, নিকট প্রাচ্য, গ্রীস এবং মিশরে যাব আমরা। ফেরার পথে ভেনিস দেখে আসব।

ফিরে আসার পর প্যারিসে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে পারি, কিন্তু সেগুলি দেবো ইংরেজীতে, সঙ্গে দোভাষী থাকবে।

এ বয়সে একটা নূতন ভাষা শেখার মতো সময় বা শক্তি আর নেই। আমি এখন বুড়ো মানুষ, কি বলো?

আমেরিকায় উপার্জিত সব টাকা ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি মুক্ত, পূর্বের মতো ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী, মঠের সভাপতির পদও ছেড়ে দিয়েছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি মুক্ত! এ ধরনের দায়িত্ব আর আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে না। 'গাছের শাখায় ঘুমন্ত পাখি রাত পোহালে যেমন জেগে উঠে গান করে' আর উড়ে যায় গভীর নীলাকাশে, ঠিক অমনিভাবেই আমার জীবনের শেষ।

তাই মনে হচ্ছে, আমার জীবনের এক নূতন অধ্যায় খুলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, 'মা' আমাকে সন্তর্পণে সস্নেহে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। বিঘ্নসঙ্কুল পথে হাঁটবার চেষ্টা আর নয়, এখন পাখির পালকের বিছানা।

আমার যাবৎ লব্ধ জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, ঐকান্তিকভাবে আমি যা চেয়েছি সর্বদা তা পেয়েছি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কখনও

অনেক দুঃখের পরে তা পেয়েছি, কিন্তু তাতে কি আসে যায়! পুরস্কারের মধুর স্পর্শ সব কিছু ভুলিয়ে দেয়।[৫৮]

প্যারিস, ২২শে অক্টোবর, ১৯০০

কামানের ব্যাপারে বেজায় নামী মিঃ ম্যাক্সিম আমার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। ওঁর চীন ও চীনাদের সম্পর্কের ওপর লেখা ওঁর আগামী বইতে আমেরিকাতে আমার কাজ সম্বন্ধে কিছু লিখতে চান।...ইংলণ্ডেও আমার কাজের সম্বন্ধে ক্যানন্ হাউয়েসও (রেভারেণ্ড্ হিউ রেজিনাল্ড্ হাউয়েস্) খবরাখবর রাখেন।...এমন হ'তে পারে যে মা এবার আমার আদি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনায় প্রাণসঞ্চার করাবেন।

এমন মনে হয় যে আমার শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ভগ্নদশার পরে একটা আন্তর্জাতিক স্তরের কাজের সুযোগ খুলে যাবে। মা-ই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আমার সমস্ত জীবনেই একের পর এক উত্থান ও পতন। সেই জন্যে, আমি বিশ্বাস করি যে, সবার জীবনই বোধ হয় এমন। তাই পতন হলে আমি অখুশী হই না। আমি সবই বুঝতে পারি, তবুও, আমি কষ্ট পাই এবং রেগে গিয়ে গজগজ করি!![৫৯]

আমাদের দেশে বলে, পায়ে চক্কর থাকলে সে লোক ভবঘুরে হয়। আমার পায়ে বোধ হয় সমস্তই চক্কর।

ফল কিন্তু সাক্ষাৎ—এত মনে করলুম যে, পারি-তে ব'সে কিছুদিন ফরাসী ভাষা ও সভ্যতা আলোচনা করা যাবে ; পুরানো বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ ক'রে, এক গরীব ফরাসী নবীন বন্ধুর বাসায় গিয়ে বাস করলুম,—(তিনি জানেন না ইংরেজী, আমার ফরাসী—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার!) বাসনা যে, বোবা হয়ে বসে থাকার না-পারকতায়—(কাজে কাজেই) ফরাসী বলবার উদ্যোগ হবে, আর গড়্গড়িয়ে ফরাসী ভাষা এসে পড়বে। [তা নয়] কোথায় চললুম ভিয়েনা, তুরকি, গ্রীস, ইজিপ্ত, জেরুসালেম পর্যটন করতে! ভবিতব্য কে ঘোচায় বলো। তোমায় পত্র লিখছি মুসলমান প্রভুত্বের অবশিষ্ট রাজধানী কনস্টান্টিনোপল হ'তে।

সঙ্গের সঙ্গী তিনজন—দুজন ফরাসী, একজন আমেরিক। আমেরিক তোমাদের পরিচিতা মিস্ ম্যাক্লাউড, ফরাসী পুরুষ বন্ধু মসিয়ে জুল বোওয়া—ফ্রান্সের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্যলেখক ; আর

ফরাসিনী বন্ধু জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদ্‌মোয়াজেল কালভে।

অতি দরিদ্র অবস্থায় তাঁর জন্ম হয়। দুঃখ দারিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই! সে শৈশবের অতি কঠিন দারিদ্র্য দুঃখ কষ্ট—যার সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ ক'রে কালভের এই বিজয়লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে।

এদের সঙ্গে আমার বিশেষ লাভ এই যে, ঐ এক আমেরিক ছাড়া এরা কেউ ইংরেজী জানে না ; ইংরেজী ভাষায় কথা একদম বন্ধ, (পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে একটি রীতি এই—একটি দলের মধ্যে সকলেই যে ভাষা জানে, একত্র অবস্থানকালে সেই ভাষায় কথা না কওয়া অসভ্যতার পরিচায়ক) কাজেই কোন রকমে ক'রে আমায় কইতে হচ্ছে ফরাসী এবং শুনতে হচ্ছে ফরাসী।

যাত্রার ঠিক হ'ল—প্যারিস থেকে রেলযোগে ভিয়েনা, তারপর কনস্টান্টিনোপল, তারপর জাহাজে এথেন্স, গ্রীস, তারপর ভূমধ্য-সাগরপার ইজিপ্ত, তারপর আশিয়া মাইনর, জেরুসালেম, ইত্যাদি।

পূর্বে আমার বোধ ছিল, ঠাণ্ডা দেশের লোক লঙ্কার ঝাল খায় না, ওটা কেবল উষ্ণপ্রধান দেশের কদভ্যাস। কিন্তু যে লঙ্কা খাওয়া হঙ্গারিতে আরম্ভ হ'ল ও রোমানী বুলগারী প্রভৃতিতে সপ্তমে পৌছল, তার কাছে বোধ হয় মান্দ্রাজীও হার মেনে যায়।

বেলা দশটার সময় কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ। এক রাত্রি এক দিন সমুদ্রে। সমুদ্র বড়ই স্থির। ক্রমে গোল্ডেন হর্ন ও মারমোরা। দ্বীপপুঞ্জ মারমোরার একটিতে গ্রীক ধর্মের মঠ দেখলুম।

সন্ধ্যার পর এথেন্স পৌছলুম। এক রাত্রি কারানটাইনে থেকে, সকালবেলা নাববার হুকুম এল! বন্দর পাইরিউসটি ছোট শহর। বন্দরটি বড়ই সুন্দর।

চতুর্থ দিন বেলা দশটার সময় রুশী স্টীমার 'জার'-আরোহণে ইজিপ্ত-যাত্রী হওয়া গেল। ঘাটে এসে জানলুম স্টীমার ছাড়বে ৪টার সময়—আমরা বোধহয় সকাল সকাল এসেছি অথবা মাল তুলতে দেরী হবে। অগত্যা ৫৬৭ হ'তে ৪৮৬ খৃঃ পূর্বে আবির্ভূত এজেলাদাস এবং তাঁর তিন শিষ্য ফিডিয়াস মিরন ও পলিক্লেটের ভাস্কর্যের কিছু পরিচয় নিয়ে আসা গেল। এখুনি খুব গরম আরম্ভ। [৬০]

পোর্ট টিউফিক, ২৬শে নভেম্বর, ১৯০০

জাহাজখানির আসতে দেরি হচ্ছে, তাই অপেক্ষা করছি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আজ জাহাজ পোর্ট সৈয়দে খালের মধ্যে ঢুকেছে। তার মানে,

সব ঠিক ঠিক চললে সন্ধ্যায় জাহাজ এখানে (পোর্টে) পৌঁছবে।

অবশ্য এ দুদিন নির্জন কারাবাস চলেছে ; আর আমি কোনরকমে ধৈর্য ধরে আছি। কিন্তু এরা বলে পরিবর্তনের মূল্য তিনগুণ বেশী। মিঃ গেজের এজেন্ট আমায় সব ভুল নির্দেশ দিয়েছিল। প্রথমতঃ আমায় স্বাগত জানানো তো দূরের কথা, কিছু বুঝিয়ে দেবার মতো কেউই এখানে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ আমায় কেউ বলেনি যে, অন্য জাহাজের জন্য আমাকে এজেন্টের আফিসে গিয়ে গেজের টিকিটখানি পালটে নিতে হবে—আর তা করবার জায়গা সুয়েজ, এখানে নয়। সুতরাং জাহাজখানির দেরি হওয়ায় এক হিসাবে ভালই হয়েছিল। এই সুযোগে আমি জাহাজের এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম ; আর তিনি আমায় নির্দেশ দিলেন, আমি যেন গেজের পাসখানি পালটিয়ে যথারীতি টিকিট ক'রে নিই।

আজ রাত্রে কোন এক সময়ে জাহাজে উঠব, আশা করি। আমি ভাল আছি ও সুখে আছি, আর এ মজাটা উপভোগ করছি খুব। [৬১]

আমি বিশ্বাস করি

আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, মানুষকে বিশ্বাস করি ; দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্য নরকে যেতে প্রস্তুত হওয়া—আমি খুব বড় কাজ বলে বিশ্বাস করি।[১]

আমি কোন গুরুতর অপরাধ করলে, যদি বাস্তবিক কারও উপকার হয়, তবে আমি নিশ্চয় এখনই তা ক'রে অনন্ত নরকভোগ করতে প্রস্তুত![২]

আমাকে আবার জন্মাতে হ'তে পারে কারণ আমি মানুষের প্রেমে পড়ে গেছি। [৩]

যে ধর্ম বা যে বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। [৪]

বাহ্য অনুষ্ঠান বা মতবাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মই যে

মানবজীবনের সর্বস্ব এবং সব কিছুর ভেতরেই যে ধর্ম আছে, তাই দেখানো আমার জীবনব্রত। [৫]

কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব এই যে, সে মননশীল জীব ; পশুদের সঙ্গে আমাদের এটাই প্রভেদ। মানুষের এই মনন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, অতএব আমাদের অবশ্য মনের চালনা করতে হবে। এই জন্যই আমি যুক্তিতে বিশ্বাস করি এবং যুক্তির অনুসরণ করি, শুধু লোকের কথায় বিশ্বাস করে কি অনিষ্ট হয়, তা বিশেষরূপে দেখেছি ; কারণ আমি যে দেশে জন্মেছি, সেখানে এই অপরের বাক্যে বিশ্বাস করার চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। [৬]

যদি কখনও কোন আদর্শ ধর্ম প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাকে এরকম উদার এবং প্রশস্তহৃদয় হতে হবে, যাতে তা এইসব বিভিন্ন মনের উপযোগী খাদ্য যোগাতে পারে। ঐ ধর্ম জ্ঞানীর হৃদয়ে দর্শন-সুলভ দৃঢ়তা এনে দেবে, এবং ভক্তের হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত করবে। আনুষ্ঠানিককে ঐ ধর্ম উচ্চতম প্রতীকোপাসনালভ্য সমুদয় ভাবরাশিদ্বারা চরিতার্থ করবে, এবং কবি যতখানি, হৃদয়োচ্ছ্বাস ধারণ করতে পারে, কিংবা আর যা কিছু গুণরাশি আছে, তার দ্বারা সে কবিকে পূর্ণ করবে। এইরকম উদার ধর্মের সৃষ্টি করতে হলে আমাদের ধর্মসমূহের অভ্যুদয়কালে ফিরে যেতে হবে এবং ঐগুলি সবই গ্রহণ করতে হবে।

অতএব গ্রহণই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত—বর্জন নয়। কেবল পরমতসহিষ্ণু নয়—তা অনেক সময়ে ঈশ্বর-নিন্দারই নামান্তর মাত্র ; সুতরাং আমি ওতে বিশ্বাস করি না। আমি 'গ্রহণে' বিশ্বাসী। আমি কেন পরধর্মসহিষ্ণু হতে যাব? পরধর্মসহিষ্ণুতার মানে এই যে, আমার মতে আপনি অন্যায় করছেন, কিন্তু আমি আপনাকে বেঁচে থাকতে বাধা দিচ্ছি না। তোমার আমার মতো লোক কাউকে দয়া করে বাঁচতে দিচ্ছে, এইরকম মনে করা কি ভগবদ্বিধানে দোষারোপ করা নয়?

অতীতে যত ধর্মসম্প্রদায় ছিল, আমি সবগুলিই সত্য বলে মানি এবং তাদের সবার সঙ্গেই উপাসনায় যোগদান করি। প্রত্যেক সম্প্রদায় যে ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে, আমি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ঠিক সেই ভাবে তাঁর আরাধনা করি। আমি মুসলমানদের মসজিদে যাব, খ্রীষ্টানদের গির্জায় প্রবেশ করে ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সামনে নতজানু হব, বৌদ্ধদের বিহারে প্রবেশ করে বুদ্ধের ও তাঁর ধর্মের শরণ এবং অরণ্যে গমন করে সেই-সব হিন্দুর পাশে

ধ্যানে মগ্ন হব, যাঁরা সবার হৃদয়-কন্দর-উদ্ভাসকারী জ্যোতির দর্শনে সচেষ্ট!

শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে যে-সব ধর্ম আসতে পারে তাদের জন্যও আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখব। ঈশ্বরের বিধিশাস্ত্র কি শেষ হয়ে গিয়েছে, অথবা তা চিরকালব্যাপী অভিব্যক্তিরূপে আজও আত্মপ্রকাশ করে চলেছে? জগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিসমূহের এই যে লিপি, এ এক অদ্ভুত বই। বাইবেল, বেদ ও কোরান এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ যেন ঐ বইয়ের এক একখানি পাতা এবং তার অসংখ্য পাতা এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে। সেই সব অভিব্যক্তির জন্য আমি এ-বই খুলে রাখব। আমরা বর্তমানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের অনন্ত ভাবরাশি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকব। অতীতে যা কিছু ঘটেছে, সে-সবই আমরা গ্রহণ করব, বর্তমানের জ্ঞানালোক উপভোগ করব এবং ভবিষ্যতেও যা উপস্থিত হবে, তা গ্রহণ করবার জন্য হৃদয়ের সব বাতায়ন উন্মুক্ত রাখব। অতীতের ঋষিকুলকে প্রণাম, বর্তমানের মহাপুরুষদের প্রণাম এবং যাঁরা ভবিষ্যতে আসবেন, তাঁদের সকলকে প্রণাম।[৭]

আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীবনেও এটা প্রত্যক্ষ করেছি যে, সদুদ্দেশ্য অকপটতা ও অনন্ত প্রেম বিশ্ব বিজয় করতে সক্ষম। ঐসব গুণশালী একজন মানুষ কোটি কোটি কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্বুদ্ধি নাশ করতে সক্ষম।[৮]

দেখ, আমার পক্ষে এটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই যে, কোথাও এমন এক বিরাট শক্তি নিশ্চয় আছেন, যিনি নিজেকে কখন কখন নারীরূপে কল্পনা করেন এবং তাঁকে লোকে 'কালী' এবং 'মা' বলে ডাকে। আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাস করি। আর আসল ব্যাপারটা কি সব সময় ঠিক ঐরকমই নয়?...যেমন সংখ্যাতীত জীব-কোষের সমষ্টিতেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়, যেমন একটি নয়—বহু মস্তিষ্ক-কোষের সমবায়ে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, ঠিক তেমনি নয় কি? একত্ব মানেই বৈচিত্র্য। এটাও ঠিক সেইরকম। ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বা ভিন্ন ব্যবস্থা কেন? ব্রহ্মই আছেন, তিনিই একমাত্র সত্তা, কিন্তু তবু তিনিই আবার বহু দেবতাও হয়েছেন।[৯]

কালী-উপাসনা ধর্মের কোন অপরিহার্য সোপান নয়। ধর্মের যাবতীয় তত্ত্বই উপনিষদ থেকে পাওয়া যায়। কালী-উপাসনা আমার বিশেষ খেয়াল ; আমাকে এর প্রচার করতে তুমি কোনদিন শোননি, বা ভারতেও তা প্রচার করেছি বলে পড়োনি। সকল মানবের পক্ষে যা কল্যাণকর, আমি তাই প্রচার করি। যদি কোন অদ্ভুত প্রণালী তাকে, যা শুধু আমার পক্ষেই খাটে, তা আমি গোপন

রেখে দিই এবং সেখানে তার ইতি। কালী-উপাসনা কি বস্তু, সে তোমার কাছে কোনমতেই ব্যাখ্যা ক'রব না, কারণ কখন কারও কাছে তা করিনি।

খাঁটি উপনিষদের তত্ত্ব ও নীতিই আমাদের ধর্ম, তাতে আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীক ইত্যাদির কোন স্থান নেই। অনেকে মনে করে, আচার-অনুষ্ঠানাদি তাদের ধর্মানুভূতির সহায়তা করে। তাতে আমার আপত্তি নেই।

শাস্ত্র, আচার্য, প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ অথবা ত্রাণকর্তাদের উপর ধর্ম নির্ভর করে না। এই ধর্ম ইহজীবনে বা অন্য কোন জীবনে অপরের উপর আমাদের নির্ভরশীল ক'রে তোলে না। এই অর্থে উপনিষদের অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম। তবে শাস্ত্র, অনুষ্ঠান, প্রেরিত পুরুষ বা ত্রাণকর্তাদেরও স্থান আছে। সেগুলি অনেককে সাহায্য করতে পারে, যেমন কালী-উপাসনা আমাকে আমার 'ঐহিক কাজে' সাহায্য করে। এগুলি স্বাগত।[১০]

আমি যা খুশী তা করতে পারি, আমি স্বাধীন। কখনও আমি হিমালয় পর্বতে বাস করি, কখনও বা শহরের রাস্তায়। পরের বারের খাবার কোথায় জুটবে, তা আমি জানি না। আমার কাছে কোন টাকা পয়সা থাকে না। চাঁদা তুলে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।

এটা তো একটি উৎকৃষ্ট পোশাক। দেশে আমি সামান্য কাপড় ব্যবহার করি। জুতাও পরি না।' 'জাতিভেদ একটি সামাজিক প্রথা। ধর্মের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আমি সব জাতির লোকের সঙ্গে মেলামেশা করি।[১১]

আপনি নিজে প্রত্যক্ষ কি অনুভব করেছেন, তাই প্রশ্ন। ঈশা, মুশা, বুদ্ধ কি করেছেন, বললে কি হবে—তাতে আমাদের কিছুই হবে না, যতদিন না আমরা নিজেরাও সেগুলি জীবনে পরিণত করছি। আপনি যদি একটা ঘরের দরজা বন্ধ করে চিন্তা করেন, মুশা এই এই খেয়েছিল, তাতে তো আপনার ক্ষুধা মিটবে না। সেইরকম মুশার এই প্রকার মত ছিল—জানলেই আপনার উদ্ধার হবে না। এ-সবের বিষয়ে আমার মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কখন কখন মনে হয়, এই-সব প্রাচীন আচার্যগণের সঙ্গে যখন আমার মত মিলছে, তখন আমার মত অবশ্যই সত্য। আবার কখন কখন ভাবি, আমার সঙ্গে যখন তাঁদের মত মিলছে, তখন তাঁদের মত ঠিক। আমি স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাস করি। এই-সব পবিত্রস্বভাব আচার্যগণের প্রভাব হতেও একেবারে মুক্ত থাকতে হবে। তাঁদের পরিপূর্ণভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করুন, কিন্তু ধর্মকে একটা স্বাধীন গবেষণার বস্তু রূপে গ্রহণ করুন। তাঁরা যেভাবে জ্ঞানালোক পেয়েছিলেন, আমাদেরও

তেমনি নিজের চেষ্টায় জ্ঞানালোক লাভ করতে হবে। [১২]

উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন হও ; সর্বদা দুটো পথের দিকেই দৃষ্টি রাখ। যখন আমি উচ্চমার্গে থাকি তখন বলি, 'শিবোঽহম্, শিবোঽহম্ : আমিই সে, তিনিই আমি! কিন্তু যখন আমার পেটব্যথা হয়, আমি বলি, মা আমাকে দয়া কর।[১৩]

লোকালয় থেকে দূরে—নিভৃতে নীরবে পুঁথিপত্র নিয়ে পড়ে থাকার সংস্কার নিয়েই আমি জন্মেছি, কিন্তু মায়ের ইচ্ছা অন্যরূপ ; তবু সংস্কারের অনুবৃত্তি চলেছে। [১৪]

যদিও মাঝে মাঝে আমি অদ্ভুত কথা বলি এবং রাগের কথাও বলি, তবুও মনে রেখো যে হৃদয় থেকে আমি ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই প্রচার করি না। সব জিনিসই ঠিক হয়ে যাবে যখনি বুঝতে পারব যে আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। [১৫]

স্বার্থপরতা দূর করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। জীবনে যখনই কোন ভুল করেছি, তখনই দেখেছি, তার মূল কারণ হল আমি আমার স্বার্থবুদ্ধিকে তার মধ্যে এনেছিলাম। যেখানে আমার স্বার্থ ছিল না, সেখানে আমার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হয়েছে।[১৬]

যদি আমি পিঁপড়ের চাইতে আমাকে বড় ভেবে থাকি, তাহলে আমি অজ্ঞ। [১৭]

এক জি সি (গিরিশচন্দ্র) দেখেছি যথার্থ নির্ভর, ঠিক দাসভাব ; মাথা দিতে প্রস্তুত, তাই না ঠাকুর তার আমমোক্তারনামা নিয়েছিলেন। কি নির্ভর। এমন আর দেখলুম না ; নির্ভরতা তার কাছে শিখেছি। [১৮]

যুক্তিকে অনুসরণ করতে প্রথম বাধা সত্যের প্রতি আমাদের অনীহা। আমরা চাই সত্য আমাদের কাছে আসুক। পরিব্রাজক জীবনে অধিকাংশ লোক আমাকে বলেছে : "তুমি যে ধর্মের কথা বলছ তা স্বস্তিকর আরামদায়ক নয়। আমাদের আরামদায়ক ধর্ম দাও।"

আমি জানি না এই "আরামদায়ক ধর্ম" বলতে তারা কি বোঝে। আমি জীবনে কখনও কোনো স্বচ্ছন্দ ধর্ম শিক্ষা করিনি। আমি সত্যকেই ধর্ম হিসেবে চাই। সেটা স্বচ্ছন্দ কি না, তার তোয়াক্কা আমি করি না। সত্য কেন সবসময়েই আরামদায়ক হবে? আমরা সবাই নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সত্য অনেক সময়েই কঠোর আঘাত করে। ক্রমশঃ দীর্ঘ সংস্পর্শ থেকে, আমি

বুঝতে পেলাম এই মার্কামারা শব্দটি দ্বারা কি বোঝাতে চায়। এইসব লোক একটা গভীর খাতে রয়েছে, আর তারা তার থেকে বেরিয়ে আসতে সাহস পায় না। সত্যকে তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হতে হবে।

একবার এক ভদ্রমহিলার দেখা পেয়েছিলাম, তিনি সন্তানদের এবং তাঁর অর্থের এবং সবকিছুর প্রতি তাঁর খুব টান। যখন আমি তাকে ধর্মোপদেশ দিতে শুরু করলাম যে ভগবানের কাছে যাবার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে সবকিছু পরিত্যাগ করা, পরদিন থেকে তিনি আসা বন্ধ করে দিলেন। পরে একদিন এসে তিনি আমাকে বললেন যে, তার দূরে থাকবার কারণ হ'চ্ছে, যে ধর্মের উপদেশ আমি দিচ্ছিলাম তা খুব অপছন্দ। "তোমার কাছে কি জাতীয় ধর্ম স্বস্তিকর লাগবে?" আমি তাকে বাজাবার জন্য প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন : "আমি আমার শিশুদের মধ্যে আমার অর্থের মধ্যে আমার হীরেগুলোর মধ্যে ভগবানকে দেখতে চাই।"

"খুব ভাল মহাশয়া," আমি বললাম। "আপনি এখন সবকিছুই পেয়েছেন। এবং আপনাকে এই জিনিসগুলো আরও বহু লক্ষ বছর দেখতে হবে। তারপরে আপনি কোথাও ধাক্কা খাবেন এবং তখন যুক্তিতে আসবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সময় না আসে, আপনি কখনও ভগবানের নিকটবর্তী হতে পারবেন না। ইতিমধ্যে, আপনার শিশুদের মধ্যে, আপনার বিত্তের মধ্যে, হীরেগুলোর মধ্যে এবং আপনার নৃত্যের মধ্যে ভগবানকে দেখতে থাকুন।[১৯]

আমেরিকায় একজন বিখ্যাত বক্তা (রবার্ট ইঙ্গারসোল) আছেন—তিনি খুব ভাল লোক। ধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন, ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই, পরলোক নিয়ে মাথা ঘামাবার আমাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নেই। তাঁর মত বুঝাবার জন্য তিনি এই উপমাটি প্রয়োগ করেছিলেন ; জগৎরূপ এই কমলালেবুটি আমাদের সামনে রয়েছে, তার সব রসটা আমরা বার করে নিতে চাই। আমার সঙ্গে তাঁর একবারমাত্র সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁকে বলি, আমিও আপনার সঙ্গে একমত, আমারও কাছে একটি ফল রয়েছে—আমিও তার সব রসটুকু খেতে চাই। তবে আমাদের মতভেদ কেবল ঐ ফলটি কি, এই নিয়ে। আপনি তাকে কমলালেবু মনে করেছেন—আমি ভাবছি আম। আপনি মনে করেন, জগতে এসে খেতে পরতে দেখলেই যথেষ্ট হল এবং কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানতে পারলেই চূড়ান্ত হল ; কিন্তু আপনার বলবার কোনই অধিকার নেই যে, ওটা ছাড়া মানুষের আর কিছু কর্তব্য নেই। আমার পক্ষে ঐ ধারণা একেবারে কিছুই নয়।

আপেল ভূমিতে কিভাবে পড়ে, অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহ কিরূপে স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, যদি কেবল এইটুকু জানাই জীবনের একমাত্র কাজ হয়, তবে তো আমি এখনই আত্মহত্যা করি। আমার সংকল্প—সকল বস্তুর মর্মস্থল অনুসন্ধান করব—জীবনের প্রকৃত রহস্য কি, তা জানব। তোমরা প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের আলোচনা কর, আমি প্রাণের স্বরূপ জানতে চাই। আমার দর্শন বলে—জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্যই জানতে হবে, যদিও এই পৃথিবীর মতো ঐগুলির ব্যবহারিক সত্তা রয়েছে। আমি এই আত্মার আন্তরাত্মাকে জানব—তার প্রকৃত স্বরূপ কি তা জানব। শুধু ওটা কিভাবে কাজ করছে এবং তার প্রকাশ কি, তা জানলেই আমার তৃপ্তি হবে না। আমি সব জিনিসের 'কেন?' জানতে চাই ; 'কেমন করে হয়?' এ অনুসন্ধান বালকেরা করুক। [২০]

আমি বৌদ্ধ নই, তথাপি একভাবে আমি বৌদ্ধ। [২১]

অবশ্য আমি তাঁর সব মত সমর্থন করি না। আমার নিজের জন্যই আমি দার্শনিক বিচারের যথেষ্ট আবশ্যকতা বোধ করি। অনেক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মতভেদ আছে, কিন্তু মতভেদ আছে বলেই যে আমি তাঁর চরিত্রের, তাঁর ভাবের সৌন্দর্য দেখব না, এর কি কোন অর্থ আছে?

আমি যদি বুদ্ধের অপূর্ব হৃদয়বত্তার লক্ষভাগের একভাগেরও অধিকারী হতাম, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। হতে পারে বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, হয়তো বিশ্বাস করতেন না, এসব আমার চিন্তার বিষয় নয়। কিন্তু অপরে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণ অবস্থা লাভ করে, তিনিও তাই করেছিলেন। [২২]

আমি সারা জীবন বুদ্ধের অত্যন্ত অনুরাগী, অন্য সব চরিত্রের চেয়ে এঁর চরিত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অধিক। আহা, সেই সাহসিকতা, সেই নির্ভীকতা, সেই গভীর প্রেম! মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁর জন্ম! সবাই নিজের জন্য ঈশ্বরকে খুঁজছে, কত লোকই সত্যানুসন্ধান করছে ; তিনি কিন্তু নিজের জন্য সত্যলাভের চেষ্টা করেননি। তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে। কেমন ক'রে মানুষকে সাহায্য করবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। সারা জীবন তিনি কখনও নিজের ভাবনা ভাবেননি। [২৩]

বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁর ঈশ্বরবাদ নেই—তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি বিশ্বাস করি।[২৪]

আমার একটা কুসংস্কার আছে—অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত কুসংস্কার

ছাড়া আর কিছুই নয়—যিনি একসময়ে বুদ্ধরূপে এসেছিলেন, তিনিই পরে খ্রীষ্টরূপে এসেছেন।[২৫]

প্রশ্ন : বুদ্ধের মত কি এই যে, বহুত্ব সত্য এবং একত্ব (আত্মা) মিথ্যা? আর হিন্দু (বেদ) মতে একই সত্য, বহুত্ব মিথ্যা।

—হ্যাঁ, এবং এর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং আমি যা যোগ করেছি, তা এই যে, একই নিত্য বস্তু একই মনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়ে এক ও বহুরূপে প্রতিভাত হয়।[২৬]

প্রভু বলেছিলেন যে তিনি আবার অবতীর্ণ হবেন অন্ততঃ দু'শ বছরের মধ্যে—এবং আমি তাঁর সঙ্গে আসব। যখন প্রভু আসেন, তখন তিনি তাঁর আপন লোকদের সঙ্গে আনেন।[২৭]

দেব নহি, আমি নাহি পশু কিংবা নর,
দেব নহি, মন নহি, নারী বা পুরুষ,

শাস্ত্র স্তব্ধ সবিস্ময়ে আমা পানে চাহি,
আমার প্রকৃতি ঘোষে—'আমি সেই' বাণী।

সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের জন্মিবার আগে
ছিনু আমি, যবে নাহি ছিল পৃথ্বী ব্যোম,
নাহি ছিল মহাকাল, 'সে'ও নাহি ছিল,
ছিলাম, রয়েছি আমি, রবো চিরকাল।
দুই নয়, বহু নয়, এক—শুধু এক,
তাইতো আমার মাঝে আছে সব 'আমি',
অনিবার তাই প্রেম—ঘৃণা অসম্ভব ;
'আমি' হ'তে আমারে কি সারানো সম্ভব?

স্বপ্ন হ'তে জেগে ওঠ, বন্ধ কর নাশ
হও অভী, বলো বীর : নিজ দেহ-ছায়া
ভীত আর নাহি করে, ওগো মৃত্যুঞ্জয়
আমি ব্রহ্ম, এই চির সত্য জ্যোতির্ময়।[২৮]

বিদায়বেলার বাণী

বেলুড় মঠ, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯০০

জো, পরশু রাত্রে আমি এখানে পৌঁছেছি। কিন্তু হায়! এত তাড়াহুড়া ক'রে এসেও কোন লাভ হ'ল না। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বেচারা কয়েক দিন পূর্বেই দেহত্যাগ করেছেন। এভাবে দুজন মহাপ্রাণ ইংরেজ আমাদের জন্য—হিন্দুদের জন্য আত্মদান করলেন। শহীদ কোথাও থাকে তো—এঁরাই।[১]

বেলুড় মঠ, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯০০

মা, কয়েকদিন আগে এখানে পৌঁছেছি। আমার আগমন একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল, সকলেই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আমার অনুপস্থিতি-কালে যতটা আশা করেছিলাম, কাজ তার চেয়েও ভালভাবে চলেছে ; শুধু মিঃ সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। এটা সত্যই একটা প্রচণ্ড আঘাত।[২]

বেলুড় মঠ ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯০০

নিবেদিতা, আমি হচ্ছি ঋতুর সঙ্গে বিচরণকারী একটি বিহঙ্গম।

আনন্দমুখর ও কর্মচঞ্চল প্যারিস, দৃঢ়গঠিত প্রাচীন কনস্তান্তিনোপল্, চাকচিক্যময় ক্ষুদ্র এথেন্স, পিরামিড-শোভিত কায়রো—সবই পেছনে ফেলে এসেছি ; আর এখন আমি এখানে, গঙ্গার তীরে মঠে আমার ঘরে বসে লিখছি। চতুর্দিকে কি শান্ত নীরবতা! প্রশস্ত নদী দীপ্ত সূর্যালোকে নাচছে ; শুধু ক্বচিৎ দু-একখানা মালবাহী নৌকার দাঁড়ের শব্দে সে স্তব্ধতা ক্ষণিকের জন্য ভেঙে যাচ্ছে।

এখানে এখন শীতকাল চলেছে ; কিন্তু প্রতিদিন মধ্যাহ্ন বেশ উষ্ণ ও উজ্জ্বল। এ হচ্ছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার শীতেরই মতো। সর্বত্র সবুজ ও সোনালী রঙের ছড়াছড়ি, আর কচিঘাসগুলি যেন মখমলের মতো। অথচ বাতাস শীতল, পরিষ্কার ও আরামপ্রদ।[৩]

বেলুড় মঠ, ডিসেম্বর, ১৯০০

আমার হৃদযন্ত্র খুব দুর্বল হ'য়ে গেছে। আমি মনে করি না বায়ুপরিবর্তনে কোনো ফল হবে। গত ১৪ বছরে আমি মনে করতে পারি না কোনো জায়গায় টানা তিন মাস স্থির থেকেছি। যদি কোনো সুযোগে কয়েক মাস কোথায়ও থাকতে পারি, আমার মনে হয় সেটা আমার পক্ষে ভালই হবে। আমি মনে

করি এই জীবনের কাজ আমার করা হয়ে গিয়েছে। ভাল-মন্দ ব্যথা-আনন্দের মধ্য দিয়ে আমার জীবন-তরী বয়ে চলেছে। আমার জীবনে একটা মহৎ শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছে যে জীবন দুঃখময়, দুঃখ ছাড়া কিছু নয়। মা-ই জানেন কি সবচাইতে ভাল। আমাদের প্রত্যেকেই কর্মের হাতে। এই কর্ম নিজের খেয়ালে কাজ করে, একে না বলার উপায় নেই। একমাত্র একটি বিষয় আছে যা যে কোনো মূল্যে সংগ্রহ করা যায়—তার নাম ভালবাসা। সীমাহীন প্রেম, আকাশের মত বিস্তৃত এবং মহাসাগরের মত গভীর। এটাই জীবনের মূল্যবান লাভ। যে পায় সে ভাগ্যবান।[৪]

বেলুড় মঠ, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০০

জো, আমাদের প্রিয় বন্ধু মিঃ সেভিয়ার—আমি পৌঁছবার আগেই দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের পাশ দিয়ে যে নদীটি প্রবাহিত, তারই তীরে হিন্দুরীতিতে তাঁর সৎকার করা হ'য়েছে। ব্রাহ্মণেরা তাঁর পুষ্পমাল্যশোভিত দেহ বহন করে নিয়েছিল এবং ব্রহ্মচারীরা বেদধ্বনি করেছিল।

আমাদের আদর্শের জন্য ইতিমধ্যেই দু-জন ইংরেজের (মিঃ সেভিয়ার ও মিঃ গুডউইন) আত্মদান হয়ে গেল। এর ফলে প্রিয় প্রাচীন ইংলণ্ড ও তার বীর সন্তানগণ আমার আরও প্রিয় হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ শোণিতধারায় ভবিষ্যৎ ভারতের চারাগাছটি মহামায়া যেন বারিসিঞ্চিত করছেন—মহামায়ারই জয় হোক।

আমি নিজে দৃঢ় এবং শান্ত আছি। আজ পর্যন্ত কোন ঘটনা কখনও আমাকে বিচলিত করতে পারেনি ; আজও মহামায়া আমাকে অবসন্ন হ'তে দেবেন না।

শীতাগমের সঙ্গে সঙ্গে এ স্থান বেশ আরামপ্রদ হয়ে উঠেছে। অনাচ্ছাদিত তুষারাবরণে হিমালয় আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।[৫]

বেলুড় মঠ, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০০

সম্মুখে পশ্চাতে চেয়ে দেখি
সব ঠিক, সকলি সার্থক।
বেদনার গভীরে আমার
জ্বলে এক চিন্ময় আলোক।[৬]

আমিও কাল মায়াবতী যাচ্ছি। সেখানে আমার একবার যাওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।[৭]

মায়াবতী, ৬ই জানুয়ারী, ১৯০০

ধীরামাতা, এ স্থানটি অতি সুন্দর এবং তারা (আশ্রমবাসীরা) একে খুব মনোরম ক'রে তুলেছে। কয়েক একর পরিমিত বিশাল স্থানটি সযত্নে রাখা হয়েছে। আশা করি মিসেস সেভিয়ার ভবিষ্যতে এটা রক্ষা করতে পারবেন। অবশ্য তিনি বরাবরই এরূপ আশা করছেন।...

কলকাতার প্রথম দিনের ছোঁয়াচেই আমার হাঁপানি আবার দেখা দিয়েছিল। সেখানে যে দু-সপ্তাহ ছিলাম, প্রতি রাত্রেই রোগের আক্রমণ হ'ত। হিমালয়ে বেশ ভাল আছি! এখানে খুব বরফ পড়ছে, পথে প্রবল হিমঝঞ্ঝার মধ্যে পড়েছিলাম ; কিন্তু ঠাণ্ডা তত বেশী নয়। এখানে আসার পথে দুদিন ঠাণ্ডা লাগায় খুব উপকার হয়েছে ব'লে মনে হয়।

আজ মিসেস সেভিয়ারের জমিগুলি দেখতে দেখতে বরফের উপর দিয়ে মাইলখানেক চড়াই করেছি। সেভিয়ার সব জায়গায় সুন্দর রাস্তা তৈরি করেছেন। প্রচুর বাগান মাঠ ফলগাছ এবং দীর্ঘ বন তাঁর দখলে। থাকবার কুটিরগুলি কি সাদাসিদে পরিচ্ছন্ন সুন্দর এবং সর্বোপরি কাজের উপযোগী!

...চারদিকে ছ-ইঞ্চি গভীর বরফ পড়ে আছে, সূর্য উজ্জ্বল ও মহীয়ান্, আর মধ্যাহ্নে বাইরে বসে আমরা বই পড়েছি। আমাদের চারধারেই বরফ! বরফ থাকা সত্ত্বেও শীতকাল এখানে বেশ মৃদু। বায়ু শুষ্ক ও স্নিগ্ধকর, এবং জল প্রশংসার অতীত।[৮]

বেলুড় মঠ, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯০১

বাংলাদেশে, বিশেষত, মঠে যে মুহূর্তে পদার্পণ করি, তখনি আমার হাঁপানির কষ্টটা ফিরে আসে, এ জায়গা ছাড়লেই আবার সুস্থ।

আগামী সপ্তাহে আমার মাকে নিয়ে তীর্থে যাচ্ছি। তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করতে কয়েক মাস লাগবে। তীর্থদর্শন হ'ল হিন্দু বিধবার প্রাণের সাধ ; সারা জীবন আত্মীয়স্বজনদের কেবল দুঃখ দিয়েছি। তাঁদের এই একটি ইচ্ছা অন্তত পূর্ণ করতে চেষ্টা করছি।[৯]

ঢাকা, ২০শে মার্চ, ১৯০১

অবশেষে আমি পূর্ববঙ্গে। এই প্রথম আমি এখানে এলাম। জানতাম না বাংলা এত সুন্দর। এখনকার নদীগুলি তোমার দেখা উচিৎ সদাসর্বদা তাজা

পরিষ্কার সমুদ্রের প্রবাহিত জল, আর সব জিনিস কি সবুজ। সমস্ত ভারতের মধ্যে এই কৃষকরাই সবচাইতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং দৃষ্টিনন্দন।...আমি শান্ত এবং সমাহিত—আর প্রতিদিন বুঝতে পারছি আমার পক্ষে সেই পুরোনো ভিক্ষাবৃত্তি এবং চরৈবেতি জীবনই ভাল।...

সব চলছে, যেমন প্রকৃতিগতভাবে চলে। আমার মধ্যে বৈরাগ্য এসেছে।[১০]

ঢাকা, ২৯শে মার্চ, ১৯০১

আমার মা ও তাঁর সঙ্গিনীরা পাঁচদিন আগে ঢাকা এসেছেন ব্রহ্মপুত্রে পবিত্র স্নানের যোগে। যখনই কয়েকটি গ্রহের বিশেষ সংযোগ ঘটে, যা খুবই দুর্লভ, তখন কোন নির্দিষ্ট স্থানে নদীতীরে বিপুল লোকসমাগম হয়। এ বছর এক লক্ষেরও বেশী লোক হয়েছিল ; মাইলের পর মাইল নদী নৌকাতে ঢাকা ছিল।

যদিও নদী সেখানে এক মাইল চওড়া, তবু কর্দমাক্ত। কিন্তু (নদীগর্ভ) শক্ত থাকায় আমরা স্নান পূজা ইত্যাদি করতে পেরেছি।

ঢাকা তো বেশ ভালই লাগছে। আমার মা ও আর সব মেয়েদের নিয়ে চন্দ্রনাথ যাচ্ছি ; সেটা পূর্ববাংলার শেষপ্রান্তে একটি তীর্থস্থান।[১১]

ঢাকা, ৩০শে মার্চ, ১৯০১

পূর্ববঙ্গে এসে এই অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান আহরণের যে সুযোগ দিয়েছেন তার জন্যে আমি আনন্দিত।

প্রথমতঃ পূর্ব বাংলায় এসে দেশের এই প্রান্তের সম্বন্ধে গভীরভাবে জানার জন্য, যে ব্যাপারে পাশ্চাত্যের বহু সুসভ্য সভ্যতার মধ্য দিয়ে আমি ভ্রমণ করেছি, তবু আমি যথার্থই পিছিয়ে ছিলাম। এ অঞ্চলের মহান নদীসমূহ, শস্যশ্যামলা মাঠঘাট এবং ছবির মত গ্রামগুলি, আমার নিজের দেশ এই বাংলা এর আগে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি জানতাম যে আমার দেশে, এই বাংলায় মাঠঘাট এবং জলাজমিতে—এত সৌন্দর্য আর এত আকর্ষণ আছে। কিন্তু এইমাত্র আমার লাভ হয়েছে যে, পৃথিবীর বহু দেশ দেখার পরে এখন আমি আমার আপন দেশের সৌন্দর্যকে আরও অনুভব করতে পারছি।

ধর্মের সন্ধানেও, একই ভাবে আমি বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরেছি—এদের কেউ কেউ বিদেশ থেকে তাদের আদর্শ গ্রহণ করে তা নিজেদের মতন করে নিয়েছে। আমিও অপরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করেছি, জানতাম না আমার নিজের ধর্মেই এমন সৌন্দর্য ও বৈভব রয়েছে। বহু বছর হয়ে গেল, আমি

দেখছি যে হিন্দুধর্ম হচ্ছে সবচাইতে পরিতৃপ্তিকতর ধর্ম। সুতরাং খুব দুঃখ হয় যখন দেখি আমার আপনজনরা নিজের ধর্মের প্রতি এত উদাসীন—তবে যে প্রতিকূল জাগতিক অবস্থার মধ্যে তারা জীবন কাটায় সে সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।[১২]

দেশ কিছু মন্দ নয়, মাঠে দেখলুম খুব ফসল ফলেছে। আবহাওয়াও মন্দ নয় ; পাহাড়ের দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শোভা অতুলনীয়। আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো বেশ মজবুত ও কর্মঠ। তার কারণ বোধ হয়, মাছ-মাংসটা খুব খায় ; এরা যা করে, খুব গোঁয়ে করে। খাওয়া-দাওয়াতে খুব তেল-চর্বি দেয় ; ওটা ভাল নয়। তেল-চর্বি বেশি খেলে শরীরে মেদ জন্মায়।

ধর্মভাব সম্বন্ধে দেখলুম—দেশের লোকগুলো বড় 'কনজার্ভেটিভ'; উদারভাবে ধর্ম করতে গিয়ে আবার অনেকে 'ফ্যানাটিক' হয়ে পড়েছে। ঢাকার মোহিনীবাবুর বাড়িতে একদিন একটি ছেলে একখানা কার ফটো এনে আমায় দেখালে এবং বললে, 'মহাশয়, বলুন, ইনি কে, অবতার কি না?' আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, 'তা বাবা, আমি কি জানি?' তিন-চার বার বললেও সে ছেলেটি দেখলুম কিছুতেই তার জেদ ছাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হ'ল, 'বাবা, এখন থেকে ভাল ক'রে খেয়ো-দেয়ো, তা হ'লে মস্তিষ্কের বিকাশ হবে। পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে।' এ-কথা শুনে বোধ হয় ছেলেটির অসন্তোষ হয়ে থাকবে। তা কি ক'রব বাবা, ছেলেদের এরকম না বললে তারা যে ক্রমে পাগল হয়ে দাঁড়াবে।

গুরুকে লোকে অবতার বলতে পারে, যা ইচ্ছা তাই ব'লে ধারণা করবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ভগবানের অবতার যখন-তখন যেখানে-সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুনলুম, তিন-চারটি অবতার দাঁড়িয়েছে।

অমন মহাপুরুষ! এতদূর গিয়ে তাঁর জন্মস্থান দেখব না? নাগ-মহাশয়ের স্ত্রী আমায় কত রেঁধে খাওয়ালেন। বাড়িখানি কি মনোরম—যেন শান্তি-আশ্রম! ওখানে গিয়ে পুকুরে সাঁতার কেটে নিয়েছিলুম। তারপর, এমন নিদ্রা দিলুম যে বেলা ২টা। আমার জীবনে যে-কয় দিন সুনিদ্রা হয়েছে, নাগ-মহাশয়ের বাড়ির নিদ্রা তার মধ্যে এক দিন। ঘুম থেকে উঠে প্রচুর আহার। নাগ-মহাশয়ের স্ত্রী একখানা কাপড় দিয়েছিলেন। সেইখানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় রওনা হলুম। নাগ-মহাশয়ের ফটো পুজো হয় দেখলুম। তাঁর সমাধিস্থানটি বেশ ভাল ক'রে রাখা উচিত। এখনও—যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয়নি।

ও-সব মহাপুরুষকে সাধারণে কি বুঝবে? যারা তাঁর সঙ্গে পেয়েছে, তারাই ধন্য।

শিলং পাহাড়টি অতি সুন্দর। সেখানে চীফ কমিশনার কটন সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'স্বামীজী! ইওরোপ ও আমেরিকা বেড়িয়ে এই দূর পর্বতপ্রান্তে আপনি কি দেখতে এসেছেন?' কটন সাহেবের মতো অমন সদাশয় লোক প্রায় দেখা যায় না। আমার অসুখ শুনে সরকারী ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুবেলা আমার খবর নিতেন। সেখানে বেশী লেকচার-ফেকচার করতে পারিনি ; শরীর বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। রাস্তায় নিতাই খুব সেবা করেছিল।

কামাখ্যা তন্ত্রপ্রধান দেশ। 'হঙ্কর'দেবের নাম শুনলুম, যিনি ও-অঞ্চলে অবতার ব'লে পূজিত হন। শুনলুম, তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত। 'হঙ্কর'দেব শঙ্করাচার্যেরই নামান্তর কি না বুঝতে পারলাম না। ওরা ত্যাগী—বোধ হয়, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিংবা শঙ্করাচার্যেরই সম্প্রদায়বিশেষ।

ও-দেশে আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড় গোল ক'রত। ব'লত—ওটা কেন খাবেন, ওর হাতে কেন খাবেন, ইত্যাদি। তাই বলতে হ'ত—আমি তো সন্ন্যাসী-ফকির লোক, আমার আবার আচার কি? তোদের শাস্ত্রেই না বলছে, 'চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিমপি ম্লেচ্ছকুলাদপি'—মাধুকরী ভিক্ষা ম্লেচ্ছজাতি হতেও গ্রহণ করবে।[১৩]

শিলং, এপ্রিল, ১৯০১

যাক, মৃত্যুই যদি হয়, তাতেই বা কি আসে যায়? যা দিয়ে গেলুম, দেড় হাজার বছরের খোরাক।[১৪]

বেলুড় মঠ, ১৫ই মে, ১৯০১

আমি সবেমাত্র পূর্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণ ক'রে ফিরেছি। অন্যান্যবারের মতো এবারেও আমি অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ভেঙে পড়েছি।[১৫]

বেলুড় মঠ, ৩রা জুন, ১৯০১

আমার মেজাজ চিরকালই খারাপ, তায় আজকাল রোগে পড়ে মধ্যে মধ্যে বড্ডই ভয়ঙ্কর হয়—কিন্তু নিশ্চিত জেনো যে, সে ভালবাসা যাবার নয়।[১৬]

বেলুড় মঠ, ১৪ই জুন, ১৯০১

জো, আসামে একটু অক্ষম হয়ে পড়েছিলাম। মঠের আবহাওয়া এখন আমাকে কিছুটা চাঙা ক'রে তুলছে। আসামের পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস শিলং-এ

আমার জ্বর, হাঁপানি ও এলবুমেন বেড়েছিল এবং শরীর দ্বিগুণ ফুলে গিয়েছিল। যা হোক, মঠে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই রোগের লক্ষণগুলি হ্রাস পেয়েছে। এ বছর ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে ; তবে একটুখানি বৃষ্টি নেমেছে এবং আশা হয়, শীঘ্রই পূর্ণবেগে মৌসুমী এসে যাবে। এখনই আমার কোন পরিকল্পনা নেই, শুধু বম্বে প্রদেশ আমাকে দারুণভাবে চাইছে এবং শীঘ্রই সেখানে যাবার কথা ভাবছি, এই যা। সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমরা বম্বে অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য যাত্রা শুরু করবার কথা ভাবছি।

জীবনকে আমরা যথেষ্টই দেখেছি, তাই নয় কি, জো? জীবনের কোন অনিত্য বস্তুকেই তাই আমরা আর গ্রাহ্য করি না। মাসের পর মাস আমি সমস্ত ভাবপ্রবণতা ঝেড়ে ফেলার অভ্যাস করছি; অতএব এখানেই বিরত হলাম। এখন বিদায়। আমরা একসঙ্গে কাজ ক'রব—এ 'মায়ে'র আদেশ। এতে ইতিমধ্যেই বহু লোকের কল্যাণ হয়েছে ; আরও অনেক লোকের কল্যাণ হবে ; তাই হোক। মতলব আঁটা, উঁচুতে ওঠা, সবই বৃথা 'মা' তাঁর নিজের পথ ক'রে দেবেন ...তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।[১৭]

বেলুড় মঠ, জুনের শেষ, ১৯০১

আমার দেশের তীব্র উত্তাপ আমি সাহসিকতার সঙ্গে সহ্য করার পরে এখন আমি দেশের বর্ষা দেখছি। জান কি, আমি এখন কিভাবে বিশ্রাম নিচ্ছি? আমার কয়েকটি ছাগল, ভেড়া, গরু, কুকুর আর সারস আছে : সারাদিন আমি তাদের যত্ন নিই। এটা আনন্দে থাকবার প্রচেষ্টা নয় ; আমরা অখুশিও থাকব না কেন? দুটোই তো অর্থহীন? চিন্তা কোরো না, উতলা হয়ো না "মা"-ই আমাকে রক্ষা করবেন, আশ্রয় দেন।[১৮]

বেলুড় মঠ, ১৯০১

এই কালীই লীলারূপী ব্রহ্ম। ঠাকুরের কথা, 'সাপ চলা, আর সাপের স্থির ভাব'—শুনিস নি? এবার ভাল হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পূজো ক'রব।

মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন।[১৯]

বেলুড় মঠ, ১৯০১

কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখলুম ; আমাকে বিলাত-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ ব'লে জেনেও মন্দিরের অধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধাই দেননি ; বরং পরম সমাদরে মন্দিরমধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ যেরকম ইচ্ছা পুজো করতে সাহায্য করেছিলেন।'[২০]

পাশ্চাত্য পরিদর্শন করে আমি যখন ভারতে ফিরে গেলাম, তখন পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমার মেলামেশা ও আমি যে গোঁড়ামির নিয়মাবলী ভঙ্গ করেছি, এটা নিয়ে কয়েকজন প্রাচীনপন্থী খুব আন্দোলন করেছিলেন।[২১]

বেলুড় মঠ, ৫ই জুলাই, ১৯০১

মেরী, আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ যাচ্ছে। কিছুদিনের জন্য ভাল হই, তারপরেই আসে অবশ্যম্ভাবী ভাঙন। যাই হোক এই হল রোগটার প্রকৃতি।

সম্প্রতি আমি পূর্ববাংলা ও আসাম পরিভ্রমণ করেছিলাম। কাশ্মীরের পরেই আসাম ভারতে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা, কিন্তু খুবই অস্বাস্থ্যকর। দ্বীপময় বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ পাহাড়-পর্বতের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে, এ দৃশ্য দেখবার মত।[২২]

বেলুড় মঠ, ৬ই আগষ্ট, ১৯০১

"মা সত্যিই জানেন" আমিই একমাত্র জানি যে মা শুধু জানেনই না, তিনিই সবকিছু করেন।--আমার জন্য আগামী দিনেও ভাল কিছু করবেন। তোমার মতে এই পৃথিবী আমার জন্যে সবচেয়ে ভাল কি হতে পারে? রূপো? সোনা? ধুর্! তার থেকে ঢের ভাল কিছু আমি পেয়েছি।[২৩]

বেলুড় মঠ, ২৭শে আগষ্ট, ১৯০১

তুমি যেমন চেয়েছিলে, আমার শরীরের অবস্থা যদি তেমন থাকত—দিন দিন শরীর আরও খারাপের দিকে চলেছে এবং সে ছাড়াও কত সব জটিল ও বিরক্তিকর উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। সে সব লক্ষ্য করা আমি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।

আমি এখন মৃত্যুপথযাত্রী। ভাঁড়ামি করবার সময় আমার নেই।

এক অর্থে আমি এখন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি ; 'আন্দোলন' কি রকম চলছে, তার অনেক কিছুরই আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখি না ; তবে 'আন্দোলন' জোরালো হচ্ছে—একজন লোকের পক্ষে তার সব কিছু খুঁটিনাটি জানা সম্ভব নয়।

আহার ও নিদ্রার চেষ্টা ছাড়া এখন আর কিছুই করছি না, বাকী সময়টা শরীরের শুশ্রূষা ক'রে কাটাই।[২৪]

বেলুড় মঠ, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯০১

আমি খুব সুখী। বঙ্গভূমি আমাকে যখন তখন হাঁপানি দেয়। কিন্তু সেটাও ক্রমশ পোষ মানছে। দুটি ভয়াবহ আপদ—ব্রাইটস্ ডিজিজ আর ডায়াবিটিস পুরোপুরি পালিয়েছে। কোনো শুকনো আবহাওয়াতে হাঁপানি চিরকালের জন্য

বন্ধ হবে, এবিষয়ে আমি নিশ্চিত। প্রবল রোগের তাড়নায় আমি খুব রোগা হ'য়ে যাই। কিন্তু তারপরে একটু সুস্থ হলেই খুব কম সময়ের মধ্যে কয়েকপ্রস্থ চর্বি জমে যায়। আমার অনেকগুলো গরু, ছাগল, কয়েকটা ভেড়া, কুকুর, হংসী, পাতিহাস এবং একটা পোষা সুন্দর হরিণ আছে। খুব শীঘ্রই কয়েকটা দুধেলা মোষও পাচ্ছি। এরা তোমার আমেরিকার বাইসনের মত নয়, কিন্তু আকারে বিশাল—রোমহীন অর্ধজলমগ্ন থাকার অভ্যেস আছে এবং প্রচুর পরিমাণে ঘন দুধ দেয়। গত কয়েকমাসের মধ্যে বাংলার দুটি স্যাঁতসাঁতে পাহাড়ী জায়গায় গিয়ে আমার হাঁপানি হয়েছে—আমি বাংলার কোনো পাহাড়ে যাবার চেষ্টাও করছি না।[২৫]

বেলুড় মঠ, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১

গত তিন দিন এখানে দিনরাত বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের দুটি গরুর বাচ্চা হয়েছে।[২৬]

বেলুড় মঠ, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১

নিবেদিতা, বর্ষার কথা বলতে গেলে বলতে হয় পূর্ণবেগে তা এসে গেছে, আর দিনরাত চলেছে মুষলধারে বর্ষণ, কেবল বৃষ্টি—বৃষ্টি—আর বৃষ্টি। নদী সব ফুলে উঠে দু-কুল ভাসিয়ে চলেছে, দীঘি-পুকুর সব ভরপুর।

মঠের জমিতে যে বর্ষার জল দাঁড়ায়, তার নিষ্কাশনের জন্য একটা গভীর নর্দমা কাটা হচ্ছে। সেই কাজে খানিকটা খেটে আমি এইমাত্র ফিরলাম। কোন কোন জায়গায় বৃষ্টির জল কয়েক ফুট দাঁড়িয়ে যায়। আমার সেই বিশালকায় সারসটি এবং হংস-হংসীগুলি খুব স্ফূর্তিতেই আছে। আমার পোষা কৃষ্ণসার (হরিণ)-টি মঠ থেকে পালিয়েছিল এবং তাকে খুঁজে বের করতে আমাদের দিন-কয়েক বেশ উদ্বেগে কাটাতে হয়েছে। আমার একটি হংসী দুর্ভাগ্যক্রমে কাল মারা গেছে। প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমাদের এক হাস্যরসিক বৃদ্ধ সাধু তাই বলছিলেন, 'মশায়, এই কলিযুগে যখন জল-বৃষ্টিতে হাঁসেরও সর্দি লাগে, আর ব্যাঙও হাঁচতে শুরু করে, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ নেই।'

একটি রাজহংসীর পালক খসে যাচ্ছিল। আর কোন প্রতিকার জানা না থাকায় একটা টবে খানিকটা জলের সঙ্গে একটু কার্বলিক এসিড মিশিয়ে তাতেই কয়েক মিনিটের জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল—উদ্দেশ্য ছিল যে, হয় সেরে উঠবে, না হয় মরে যাবে ; তা হংসীটি এখন ভাল আছে।[২৭]

বেলুড় মঠ, ৮ই নভেম্বর, ১৯০১

পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণের পর থেকে শয্যাগত আছি বললেই হয়। দৃষ্টিশক্তির হ্রাস—এই আর একটি উপসর্গ জোটায় এখন আমি আগের চেয়েও খারাপ। [২৮]

বেনারস, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০২

ছোটোখাটো একটু ভ্রমণে মিঃ ওকাকুরা বেরিয়ে পড়েছেন—

বারাণসীর এক সুশিক্ষিত ধনী যুবা—যার বাবার সঙ্গে ছিল আমাদের অনেক দিনের বন্ধুত্ব—গতকাল এই শহরে এসেছে। শিল্প সম্বন্ধে তার বিশেষ আগ্রহ ; লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্প পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রচুর অর্থব্যয় করছে। মিঃ ওকাকুরা চলে যাবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাঁকে শিল্পময় ভারত (অর্থাৎ যতটুকু অবশিষ্ট আছে) দেখাবার সে-ই উপযুক্ত লোক এবং শিল্প সম্বন্ধে ওকাকুরার নির্দেশে সে নিশ্চয়ই বিশেষ উপকৃত হবে।

ওকাকুরা এখানে ভৃত্যদের ব্যবহারের একটি সাধারণ টেরাকোটার জলের পাত্র দেখতে পেয়েছিলেন। সেটির আকৃতি ও ক্ষোদিত কারুকার্য দেখে তিনি একেবারে মুগ্ধ। কিন্তু এটি একটি সাধারণ মৃৎপাত্র এবং পথের ধাক্কা সহ্য করার অনুপযোগী, তাই তিনি আমাকে অনুরোধ করে গিয়েছেন, পিতল দিয়ে অবিকল সেরূপ আর একটি তৈরি করাতে। কি করা যায় ভেবে ভেবে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে আমার যুবক বন্ধুটি আসে, সে সেটা ক'রে দিতে রাজী তো হয়েছেই, আবার বলেছে, ওকাকুরার পছন্দ ওই জিনিসটির চেয়ে বহুগুণ ভাল ক্ষোদিত কারুকার্যবিশিষ্ট কয়েক-শ টেরাকোটার পাত্র সে দেখাতে পারে।

সেই অপূর্ব পুরাতন শৈলীতে আঁকা প্রাচীন চিত্রাবলীও সে দেখাবে বলেছে। প্রাচীন রীতিতে আঁকতে পারে, এরূপ একটি মাত্র পরিবার বারাণসীতে টিকে আছে। তাদের মধ্যে একজন একটি মটর-দানার উপর শিকারের একটি সম্পূর্ণ ছবি এঁকেছেন—খুঁটিনাটি বর্ণনাসহ একেবারে নিখুঁত কাজ।

আমার এখনও কিছু স্থির হয়নি ; শীঘ্রই এ জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পারি। [২৯]

বেনারস, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০২

যদি একজনের মনে—এ সংসার-নরককুণ্ডের মধ্যে একদিনও একটু তখনও শান্তি দেওয়া যায়, সেইটুকুই সত্য, এই তো আজন্ম ভুগে দেখছি—বাকি সব ঘোড়ার ডিম। [৩০]

বেনারস, ৪ঠা মার্চ, ১৯০২

এখন রাত্রিবেলা—উঠে বসে চিঠি লেখার শক্তি নেই। এইটাই না আমার শেষ চিঠি হয়ে যায়। আমার অবস্থা তেমন সঙ্গিন নয়, কিন্তু পরিস্থিতি যে কোন সময় খারাপ হতে পারে। ঘুষ ঘুষ জ্বর আমাকে ছাড়ছে না, এর অর্থ কি জানি না, সেই সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট।

আমার আসবার কয়েক সপ্তাহ আগে রামকৃষ্ণানন্দ এসেছিলেন, এবং প্রথমেই আমার পায়ে ৪০০৲ টাকা রাখলেন। কয় বছর প্রাণান্ত পরিশ্রম করে এই টাকা সংগ্রহ করেছেন!! আমার জীবনে এই জাতীয় ব্যাপার প্রথম ঘটল। আমি অতি কষ্টে কান্না সংবরণ করেছি। ওঃ মা!! মাগো! কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা, ইত্যাদি মানবিক কর্ম এখনও সম্পূর্ণ মৃত হয়নি!! বাছা,—এই পৃথিবীকে আবার বনভূমি বানাতে একটি বীজই যথেষ্ট।[৩১]

বেলুড় মঠ, ২১শে এপ্রিল, ১৯০২

মনে হচ্ছে যেন জাপান যাবার সঙ্কল্পটা ফেঁসে গেল।

...লোকে বলে, আমি বেশ আছি, কিন্তু এখনও বড় দুর্বল, আর জল-পান একেবারে নিষিদ্ধ। তবে এইটুকু হয়েছে যে, রাসায়নিক বিশ্লেষণে অনেকটা উন্নতি দেখা গেছে। পায়ের ফোলা প্রভৃতি একেবারে গেছে।[৩২]

বেলুড় মঠ, ১৫ই মে, ১৯০২

আমি অনেকটা ভালই আছি, অবশ্য যতটা আশা করেছিলাম, তার তুলনায় কিছুই নয়। নিরিবিলি থাকার একটা প্রবল, আগ্রহ আমার হয়েছে—আমি চিরকালের মতো অবসর নেবো, আর কোন কাজ আমার থাকবে না। যদি সম্ভব হয় তো আবার আমার পুরাতন ভিক্ষাবৃত্তি শুরু ক'রব।[৩৩]

বেলুড় মঠ, ২১শে জুন, ১৯০২

যে ভাবেই হোক ভাল হ'চ্ছি এবং যথেষ্ট সবল হয়েছি। খাবার সম্পর্কে, আমি বুঝতে পারছি আমাকে সংযত হতে হবে। ডাক্তার যে বলেছে যা খুশি খাও তা চলবে না। ওষুধ পত্তর অবশ্য চলছে। ছেলেদের জিজ্ঞেস করবে যে মায়াবতীতে "আমলকী" ফল পাওয়া যায় কিনা। সমভূমিতে আমরা পাই না আজকাল। ওগুলো কাঁচা খেলে ওগুলোর ভাঁজে ভাঁজে টক। কিন্তু গোটা ফল দিয়ে মার্মালেড তৈরি করলে খুবই সুস্বাদু। ফার্মেনটেশনের পক্ষে খুব ভাল।[৩৪]

এ শরীর আর সারবে না। এই খোলটা ছেড়ে আবার একটা নতুন শরীর নিয়ে আসতে হবে। এখনো বহু কাজ বাকি রয়ে গেল।[৩৫]

আমি মুক্তি-ফুক্তি চাই না। যতক্ষণ পর্যন্ত সকলে মুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ আমার নিস্তার নেই। বারবার আসতে হবে।[৩৬]

বেলুড় মঠ, ১৯০২

আমি চল্লিশ পেরোবো না। যে-বাণী দেওয়ার ছিল, তা আমি দিয়ে দিয়েছি। আমাকে যেতে হবেই! 'বড় গাছের ছায়ায় ছোট ছোট গাছগুলো বাড়তে পারে না। তাদের জায়গা করে দেবার জন্যই আমাকে যেতে হবে।[৩৭]

মৃত্যু আমার শিয়রে, কাজকর্ম ও খেলা ঢের করা গিয়েছে, যে কাজ করে দিয়েছি তাই এখন জগৎ নিক, তাই বুঝতে এখন ঢের দিন লাগবে।[৩৮]

বেলুড় মঠ, ২রা জুলাই, ১৯০২

আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি! একটা মহা তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করেছে এবং আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।[৩৯]

বেলুড় মঠ, ৪ঠা জুলাই, ১৯০২

যদি এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকত, তাহা হলে সে বুঝতে পারত, বিবেকানন্দ কি করেছে!! কিন্তু কালে কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করবে।[৪০]

যখনই মৃত্যু কাছে আসে, আমার সব দুর্বলতা চলে যায়। তখন আমার ভয় বা সন্দেহ বা বাহ্য জগতের চিন্তা এ-সব কিছুই থাকে না। আমি শুধু নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে ব্যস্ত থাকি। তখন আমি এইরকম শক্ত হয়ে যাই কারণ, আমি শ্রীভগবানের পাদস্পর্শ করেছি।[৪১]

বস্তুর অসারতা যদি কারও কাছে ধরা পড়ে থাকে, সে মানুষ এখন আমি। এইতো জগতের চেহারা—একটা কদর্য পশুর মৃতদেহ। যে মনে করে, এ জগতের উপকার ক'রব, সে একটা আহাম্মক। তবে ভাল হোক, মন্দ হোক, কাজ আমাদের ক'রে যেতে হবে—আমাদের বন্ধন ঘোচাবার জন্য। আশা করি, সে কাজ করেছি। এখন প্রভু আমাকে অপর পারে নিয়ে চলুন।[৪২]

আমার যা কিছু ছিল, তার যথাসর্বস্ব আমি সে দেশে (পাশ্চাত্যে) রেখে এসেছি। ওদেশে বক্তৃতা দেবার সময় শরীর থেকে একটা শক্তি বের হয়ে শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যেত।

আমি যদি আবার কৌপীন ধারণ করে এখানকার ভরণপোষণের সব চিন্তাভাবনা ত্যাগ করে, গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রবৃত্ত হই, তাহলে হয়তো

নির্বিকল্প সমাধির বরদানে সক্ষম হতে পারি। কিন্তু আমেরিকাতে বক্তৃতা দিতে দিতে সে শক্তি চাপা পড়ে গেছে বা একেবারে হারিয়ে গেছে।[৪৩]

প্রাণ ঢেলে খেটেছি। আমার কাজের মধ্যে সত্যের বীজ যদি কিছু থাকে, কালে তা অঙ্কুরিত হবেই।

আমি যে 'নিষ্কর্মা সাধু' হয়ে থাকিনি, সে বিষয়ে অন্তর থেকে আমি নিঃসন্দেহ। একটা লেখবার খাতা আমার আছে। এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরেছে। দেখছি সাত বৎসর পূর্বে এতে লেখা রয়েছে : এবার একটি একান্ত স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু তা হ'লে কি হয়, এই সব কর্মভোগ বাকি ছিল।[৪৪]

...আমি নিজে তো বেশ সন্তুষ্ট আছি। আমি আমার স্বদেশবাসীদের অনেককে জাগিয়েছি ; আর আমি চেয়েছিলামও তাই। জগৎ আপন ধারায় চলুক এবং কর্মের গতি অপ্রতিরুদ্ধ হোক। এ জগতে আমার আর কোন বন্ধন নেই। সংসারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে, এর সবখানিই স্বার্থপ্রণোদিত—স্বার্থের জন্য জীবন, স্বার্থের জন্য প্রেম, স্বার্থের জন্য মান, সবই স্বার্থের জন্য। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং দেখতে পাই, আমি এমন কোন কাজ করিনি যা স্বার্থের জন্য—এমনকি আমার কোন অপকর্মও স্বার্থপ্রণোদিত নয়, সুতরাং আমি সন্তুষ্ট আছি। অবশ্য আমার এমন কিছু মনে হয় না যে, আমি কোন বিশেষ ভাল বা মহৎ কাজ করেছি। কিন্তু জগৎটা বড়ই তুচ্ছ, সংসার বড়ই জঘন্য এবং জীবনটা এতই হীন যে, এই ভেবে আমি অবাক হই, মনে মনে হাসি যে, যুক্তিপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কেমন ক'রে এই স্বার্থের—এই হীন ও জঘন্য পুরস্কারের পেছনে ছুটতে পারে! এই হ'ল খাঁটি কথা। আমরা একটা বেড়াজালে পড়ে গেছি এবং যে যত শীঘ্র বেরিয়ে যেতে পারে, ততই মঙ্গল। আমি সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি ; এখন দেহটা জোয়ার-ভাটায় ভেসে চলুক—কে মাথা ঘামায়?[৪৫]

পৃথিবীর কোনো কিছু বোঝা বেশ দুষ্কর। আর জীবনভর পরিশ্রম করবার পর মনে হ'চ্ছে যে, আমি একটু আধটু বুঝতে পাচ্ছি। ওপর থেকে ডাক আসছে, চলে এসো, স্রেফ চলে এসো—কাউকে শিক্ষা দেবার কথা ভেবো না।[৪৬]

কি ব'লব আপসোস—যদি আমার মত দুটা তিনটা তোদের মধ্যে থাকত ধরা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম।[৪৭]

আমি এখন চাচ্ছি একটু শান্তি ; আর কাজকর্মের বোঝা বইবার শক্তি যেন নাই। বিরাম এবং শান্তি—যে কটা দিন বাঁচব, সেই কটা দিন।

লেকচার-ফেকচার কিছু নয়। শান্তিঃ! [৪৮]

অর্থ, নারী ও যশ উপেক্ষা করে আমি যেন আমার শ্রীগুরুর মত প্রকৃত সন্ন্যাসীর মৃত্যু বরণ করতে পারি। এগুলার মধ্যে যশের আকাঙ্ক্ষাই হল সর্বাধিক শত্রু।[৪৯]

তোরা ভাবিস, আমি মলে বুঝি আর 'বিবেকানন্দ' হবে না।...

...দরকার হলে 'বিবেকানন্দে'র অভাব হবে না। কোথা থেকে কত কোটি কোটি এসে হাজির হবে তা কে জানে? এ বিবেকানন্দের কাজ নয় রে ; তাঁর কাজ—খোদ রাজার কাজ। একটা গভর্নর জেনারেল গেলে তার জায়গায় আর একটা আসবেই। [৫০]

গাছের শাখায় ঘুমন্ত পাখি রাত পোহালে যেমন জেগে উঠে গান করে, আর উড়ে যায় গভীর নীলাকাশে, ঠিক তেমনিভাবেই আমার জীবনের শেষ।

জীবনে অনেক কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়েছি, বিরাট সাফল্যও পেয়েছি কখনও কখনও, কিন্তু এই সব বাধা ও বেদনা মূল্যহীন হয়ে গেছে আমার শেষ প্রাপ্তির কাছে—আমি পেয়ে গিয়েছি আমার লক্ষ্যকে ; আমি যে মুক্তার সন্ধানে জীবনসমুদ্রে ডুব দিয়েছিলাম, তা তুলে আনতে পেরেছি। আমার পুরস্কার আমি পেয়েছি ; আমি আনন্দিত।

মেঘ হালকা হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—আমার দুষ্কৃতির মেঘ ; আর সুকৃতির জ্যোতির্ময় সূর্য উঠছে। [৫১]

এখন আমি স্থির ও প্রশান্ত হয়ে গেছি, আগে কখনও এমনটি ছিলাম না।

আমার তরী ক্রমশঃ সেই শান্তির বন্দরের নিকটবর্তী হচ্চে, সেখান থেকে সে আর বিতাড়িত হবে না। জয়, জয় মা। আর আমার নিজের কোন আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাভিলাষ নাই। মায়েরই নাম ধন্য হক। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। আমি যন্ত্র মাত্র—আর কিছু জানি না, জানবার আকাঙ্ক্ষাও নেই।[৫২]

'মা' আবার প্রসন্না হচ্ছেন ; অবস্থা অনুকূল হয়ে আসছে—তা হতেই হবে।

কর্ম চিরকালই অশুভকে সঙ্গে নিয়ে আসে। আমি স্বাস্থ্য হারিয়ে সঞ্চিত অশুভরাশির ফলভোগ করেছি। এতে আমি খুশি, এতে আমার মন হালকা

হয়ে গেছে—আমার জীবনে এমন একটা স্নিগ্ধ কোমলতা ও প্রশান্তি এসেছে, যা এর আগে কখনও ছিল না। আমি এখন কেমন করে একই কালে আসক্ত ও অনাসক্ত থাকতে হয়, তাই শিখছি এবং ক্রমশঃ নিজের মনের উপর আমার প্রভুত্ব আসছে।

মায়ের কাজ মা-ই করছেন ; সেজন্য এখন বেশি মাথা ঘামাই না। আমার মত পতঙ্গ প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার মরছে ; কিন্তু মায়ের কাজ সমভাবেই চলছে। জয় মা...মায়ের ইচ্ছাস্রোতে গা ভাসিয়ে একলা আজীবন চলে এসেছি। যখনই এর ব্যতিক্রম করেছি, তখনই আঘাত পেয়েছি।

আমি সুখে আছি, নিজের মনের সব দ্বন্দ্ব কাটিয়ে শান্তিতে আছি ; আমার অন্তরের বৈরাগ্য আজ আগের চেয়ে অনেক সমুজ্জ্বল। আত্মীয়স্বজনের প্রতি ভালবাসা দিন দিন কমে যাচ্ছে, আর মায়ের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। দক্ষিণেশ্বরের বটবৃক্ষমূলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সেই যে আমরা দীর্ঘ রাত্রি জেগে কাটাতাম, তারই স্মৃতি আবার মনে জাগছে। আর কর্ম? কর্ম আবার কি? কার কর্ম? আর কার জন্যই বা কর্ম ক'রব?

আমি মুক্ত। আমি মায়ের সন্তান। মা-ই সব কর্ম করেন, সবই মায়ের খেলা। আমি কেন মতলব আঁটতে যাব? আর কি মতলবই বা আঁটব? আমার পরিকল্পনার অপেক্ষা না রেখেই মা-র যেমন অভিরুচি, তেমনি ভাবে যা-কিছু আসবার এসেছে ও চলে গেছে।[৫৩]

ঐ চরণে জ্ঞানিগণের জ্ঞানের সার্থকতা। ঐ চরণে প্রেমিকের প্রেমের সার্থকতা। কোথায় যাবে জগতের নরনারী—ঐ চরণে আসতেই হবে।

জগতের মানুষগুলো পাগলামি করে সমস্ত দিন মারামারি কাটাকাটি করছে। সারাটা দিন কি আর এইভাবে চলে? সন্ধ্যায় মায়ের কোলে আসতেই হবে।[৫৪]

প্রিয় জো, লড়াইয়ে হার-জিত দুইই হ'ল—এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা ক'রে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নেইয়া'—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভু।

যতই যা হোক, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা-কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র।

আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর!—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত ক'রে তুলছে। বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে। জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান! —যাই, প্রভু, যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক—তুই (ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু পিছু চলে আয়!' —যাই, প্রভু, যাই!

হাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময়ে সময়ে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তির পারাবার—মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্যন্ত যার শান্তিভঙ্গ করছে না!

আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশি ; এত যে কষ্ট পেয়েছি, তাতেও খুশি ; জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুশি ; আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশি। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না ; অথবা এমন বন্ধন আমিও কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরানো 'বিবেকানন্দ' কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে—আর ফিরছে না!

শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!...

তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত ব'লে মনে হয়। এখন আবার সেইভাবে গা ভাসান দিয়েছি। উপরে সূর্য তাঁর নির্মল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদশালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিনের উত্তাপে সব প্রাণী ও পদার্থ কত নিস্তব্ধ, কত স্থির, শান্ত!—আর আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর-স্থিরভাবে, নিজের ইচ্ছা আর বিন্দুমাত্র না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলেছি! এতটুকু হাত-পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙতে আমার প্রবৃত্তি বা সাহস হচ্ছে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙে যায়! প্রাণের এই শান্তি ও নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়া ব'লে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়!...

আহা, কি স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলি পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন্

এক দূর, অতি দূর অন্তস্তল থেকে মৃদু বাক্যালাপের মতো ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। আর শান্তি—মধুর, মধুর শান্তি—যা-কিছু দেখছি শুনছি, সব কিছু ছেয়ে রয়েছে!—মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিস দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মতো অবাস্তব মনে হয়—ভয় থাকে না, তাদের প্রতি একটা ভালবাসা থাকে না, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভাল-মন্দ ভাব পর্যন্ত জাগে না—আমার মনের এখনকার অবস্থা যেন ঠিক সেইরকম, কেবল শান্তি, শান্তি! চারপাশে কতকগুলো পুতুল আর ছবি সাজানো রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে ; আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নেই। ঐ আবার সেই আহ্বান!—যাই প্রভু, যাই।

এ অবস্থায় জগৎটা রয়েছে, কিন্তু সেটাকে সুন্দরও মনে হচ্ছে না, কুৎসিতও মনে হচ্ছে না।—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভূতি হচ্ছে, কিন্তু মনে 'এটা ত্যাজ্য, ওটা গ্রাহ্য'—এমন ভাবের কিছুমাত্র উদয় হচ্ছে না। আহা, এ যে কি আনন্দের অবস্থা, তা কি ব'লব! যা-কিছু দেখছি, শুনছি, সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে ; কেন না নিজের শরীর থেকে আরম্ভ ক'রে তাদের সকলের ভিতর বড়-ছোট, ভাল-মন্দ, উপাদেয়-হেয় ব'লে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চ-নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে! আর, সব চেয়ে উপাদেয় ব'লে এই শরীরটার প্রতি এর আগে যে বোধটা ছিল, সকলের আগে সেইটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে! ওঁ তৎ সৎ! [২৫]

আমি যেন ঐ অসীম নীলাকাশ ; মাঝে মাঝে সে আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হলেও আমি সর্বদা সেই অসীম নীল আকাশই রয়েছি।

এই হাড়মাসের খাঁচা এবং সুখ-দুঃখের মিথ্যা স্বপ্ন—এগুলি আবার কি? আমার স্বপ্ন—এগুলি আবার কি? আমার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে। ওঁ তৎ সৎ। [২৬]

অশুভ অদৃষ্টের আবরণ তো দুর্ভেদ্য কালো। কিন্তু আমিই তো সর্বময় প্রভু! যে মুহূর্তে আমি ঊর্ধ্বে হাত তুলি—সেই মুহূর্তেই ঐ তমসা অন্তর্হিত হয়ে যায়! এ সবই অর্থহীন এবং ভীতিই এদের জনক। আমি ভয়েরও ভয়, রুদ্রেরও রুদ্র। আমি অভীঃ, অদ্বিতীয়, এক। আমি অদৃষ্টের নিয়ামক, আমি কপালমোচন। [২৭]

হাঃ! হাঃ! সবই ভাল! যত সব বাজে। কিছু ভাল, কিছু মন্দ। ভাল-মন্দ

দুই-ই আমার উপভোগ্য। আমিই ছিলাম যীশু এবং আমিই ছিলাম জুডাস ইস্কারিয়ট ; দুই-ই আমার খেলা, আমারই কৌতুক।

সাহসী হও, সব কিছুর সম্মুখীন হও ; ভাল আসুক মন্দ আসুক—দুটিকেই বরণ ক'রে নাও, দুই-ই আমার খেলা। আমার লভ্য ভাল বস্তু কিছুই নেই, ধরে থাকবার মতো কোন আদর্শ নেই, পূর্ণ করবার মতো উচ্চাভিলাষও নেই ; আমি হীরের খনি, ভাল-মন্দের নুড়ি নিয়ে খেলা করছি। মন্দ তুমি এস, ভালর জন্য ; ভাল, তুমিও এস। আমার সামনে দুনিয়াটা উল্টে-পাল্টে গেলেই বা আমার কি আসে যায়? আমি বুদ্ধির অতীত শান্তি ; বুদ্ধি আমাদের কেবল ভাল-মন্দই দিতে পারে। আমি তার বাইরে, আমি শান্তি।[৫৮]

এই দুনিয়ার সুখদুঃখের পূতিগন্ধময় বাষ্পের ঊর্ধ্বে আমি উঠে যাচ্ছি, এগুলি আমার কাছে অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। এটা একটা স্বপ্নের রাজ্য, এখানে আনন্দ-উপভোগই বা কি, আর কান্নাই বা কি ; সে-সব স্বপ্ন বই তো নয়। তাই অচিরেই হোক, বিলম্বেই হোক সেগুলি ভাঙবেই।...

কোন-কিছুর জন্যই আর দুঃখিত হ'তে পারি না। সকল বোধের অতীত এক শান্তি আমি লাভ করেছি, তা আনন্দ বা দুঃখের কোনটাই নয়, অথচ দুয়েরই ঊর্ধ্বে।...

এখন আমি সেই শান্তির—সেই চিরন্তন নীরবতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সকল বস্তুকে তার নিজের স্বরূপে আমি দেখছি, সব কিছুই সেই শান্তিতে বিধৃত, নিজের ভাবে পরিপূর্ণ। 'যিনি আত্মতুষ্ট, যিনি আত্মরতি, তাঁরই যথার্থ শিক্ষালাভ হয়েছে'—এ জগতে এই বড় শিক্ষাটি আমাদের জানতে হয় অসংখ্য জন্ম এবং স্বর্গ ও নরকের মধ্য দিয়ে—আত্মা ছাড়া আর কিছুই কামনা বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু নেই। 'আত্মাকে লাভ করাই হ'ল শ্রেষ্ঠ লাভ,' 'আমি মুক্ত', অতএব আমার আনন্দের জন্য দ্বিতীয় কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। 'চির একাকী, কারণ আমি মুক্ত ছিলাম, এখনও মুক্ত এবং চিরকাল মুক্ত থাকব'—এই হ'ল বেদান্তবাদ। এতকাল আমি এই তত্ত্বটি প্রচার করছি। তবে আঃ, কী আনন্দ!—এখন প্রতিটি দিন তা উপলব্ধি করছি। হ্যাঁ, তাই—'আমি মুক্ত'। আমি একা—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।[৫৯]

এমনও হতে পারে যে, আমি হয়তো বুঝব—এই দেহের বাইরে চলে যাওয়া, এই দেহকে জীর্ণ পোশাকের মতো ফেলে দেওয়াই আমার পক্ষে হিতকর। কিন্তু আমি কোনদিন কর্ম হতে ক্ষান্ত হব না। যতদিন না সমগ্র

জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব অনুভব করছে, ততদিন আমি মানুষের মনে প্রেরণা জাগাতে থাকব।[৬০]

শেষের চিঠি

বেলুড় মঠ, ১৪ই জুন, ১৯০২

মা (মিসেস ওলি বুল), অনেক কিছু লিখব ভেবেছিলাম, কিন্তু শরীর বড় দুর্বল।...এই সমস্ত জাঁকজমক নিতান্ত নিষ্ফল, শুধু আত্মার বন্ধন স্বরূপ। আমার জীবনে এর চেয়ে স্পষ্টতরভাবে জগতের নিষ্ফলতা কখনো অনুভব করিনি। ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলেই মায়ামুক্ত হোক—এই আমার চিরপ্রার্থনা।[৬১]

শেষ চিঠি

বেলুড়মঠ, ২১শে জুন, ১৯০২

স্নেহের ক্রিশ্চিন, আমার জন্য উদ্বিগ্ন হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই তোমার...।[৬২]

শেষ কথা

[চিঠিপত্র, কথাবার্তায়, সভাসমিতিতে অনেক কথা বলা হলেও তাঁর অন্তরের অন্তরতম কথাগুলি লেখা হয়েছে 'সখার প্রতি' কবিতায়। এই রচনার প্রথম প্রকাশ ১৫ মাঘ ১৩০৫ (ইংরিজি ২৮শে জানুয়ারী, ১৮৯৯), চারটি পঙ্ক্তি কিন্তু বাদ পড়ে গিয়েছিল। সখাটি কে? তা নিয়ে আজও নানা জল্পনা, কেউ বলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ, কেউ বলেন গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দ বা রামকৃষ্ণানন্দ। আজকাল মনে হয়, পরান সখাটি তিনি নিজেই। নিজের মনের সব কথা আর কোথাও এইভাবে বলা হয়নি। 'আমি বিবেকানন্দ বলছি'-র শেষ কথা হিসেবে কবিতাটি ছাপা হল। এই কবিতাটি কোন অজানা কারণে 'আঁধারে আলো' হিসেবেও কোথাও কোথাও মুদ্রিত হয়েছে।]

সখার প্রতি

আঁধারে আলোক-অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান ;
প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান্?
দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান ;
'স্বার্থ' 'স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার?
সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময়—কেবা পারে ছাড়িতে সংসার?
কর্ম-পাশ গলে বাঁধা যায়—ক্রীতদাস বল কোথা যায়?
যোগ-ভোগ, গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস, জপ-তপ, ধন-উপার্জন,
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার ;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন ;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান ;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্মর-মূরতি তা কি সয়?
হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।
বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মতো, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;
ধর্ম তরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধ'রে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন?

শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম ; 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।

জীব ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর, ভূত-প্রেত-আদি দেবগণ,
পশু-পক্ষী কীট-অণুকীট—এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
'দেব' 'দেব'—বলো আর কেবা? কেবা বলো সবারে চালায়?
পুত্র তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে—প্রেমের প্রেরণ!!

হয়ে বাক্য-মন-অগোচর, সুখ-দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
রোগ-শোক, দারিদ্র্য-যাতনা, ধর্মাধর্ম, শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বলো কেবা কিবা করে?

ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।

পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম?
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল ;
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয় ;
হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।
ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
'দাও, দাও'—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।

ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।[৬৩]

পরিশিষ্ট

আরও কিছু কথা

হাইজিন ও পশ্চিমী ম্যানার্স

আঙ্গুলগুলো সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখবে, নখে যেন ময়লা থাকে না। বড় নখ হলে কেটে ফেলবে। দেখ, আমার জামার পকেটে বা ট্রাঙ্কের ভেতর একটা লোহার রিং করা নখ কাটবার অনেক রকম যন্ত্র আছে। নখ কাটবার, নখ ঘসবার সব রকম যন্ত্র আছে। আমায় নখ কাটবার জন্য আমেরিকায় একজন দিয়েছিল।[১]

মাথার চুল সব সময় বুরুশ করে রাখবে। চুল যেন উস্‌কো-খুস্‌কো হয় না, তা'হলে এ দেশের লোক বড় ঘৃণা করে। জামা ইজের সর্বদা বুরুশ করতে হয়। সর্বদা ফিট্-ফাট্ সেজে থাকবে, নইলে লোকে ঘৃণা করবে। একেই তো ইণ্ডিয়ানস্ বলে লোকে অবজ্ঞা করে, তার উপর যদি ফিট্-ফাট্ হয়ে না থাকতে পার তা'হলে লোকে আরও ঘৃণা করবে।[২]

মহিম, টাই খুলে বসবার ঘরে ঢুকতে নাই। গলার কলারটা ময়লা হয়ে গেছে, সপ্তাহে দুবার করে বদলাবে।[৩]

ময়লা কলার ব্যবহার করলে দেখতে খারাপ হয়। সর্বদা চুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। কোট, ভেষ্ট প্রভৃতি সর্বদা পরিষ্কার রাখবে। ভদ্র-পরিচ্ছদ, ভদ্র আচার এইটিই প্রথম বিষয়। তা না হলে লোকে ঘৃণা করে।[৪]

কনসেনট্রেটেড ফুড্ খাওয়া চাই। কতকগুলো ভাত ঠেসে খাওয়া কেবল কুড়েমির গোড়া। জাপানীরা দিনে দুবার তিনবার ভাত আর দালের ঝোল খায়। কিন্তু খুব জোয়ান লোকেরাও অতি অল্প খায়, বারে বেশি। আর যারা সঙ্গতিপন্ন, তারা মাংস প্রত্যহই খায়। আমাদের যে দুবার আহার কুঁচকি-কণ্ঠা ঠেসে। এক গাদা ভাত হজম করতে সব এনার্জি চলে যায়।[৫]

অনেকে বলে— তামাকটা খাওয়া ভাল নয় ; আমিও ছাড়বার চেষ্টা করছি।[৬]

মঠ যদি পরিষ্কার না রাখতে পার, তবে গাছতলায় থাকলেই তো হয়। মঠ যখন হয়েছে, তখন ঠিক ঠিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।[৭]

বাঁ হাতে ধরতে নেই, ডান হাতে ছুরি ধরতে হয়, আর বাঁ হাতে কাঁটা দিয়ে মুখে তুলতে হয়। অত বড় বড় গরস করে না, ছোট ছোট গরস করবি। খাবার সময় দাঁত জিভ বার করতে নেই, কখনও কাশবি না, ধীরে ধীরে চিবুবি। খাবার সময় বিষম খাওয়া বড় দূষণীয় ; আর নাক ফোঁস ফোঁস কখনও করবে না।[৮]

পরিব্রাজক অবস্থায় সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশের নানারকম দূষিত জল পান করতে হয় ; তাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ কাটানোর জন্য তাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরস প্রভৃতি খেয়ে থাকে। আমি তাই এত লঙ্কা খাই।[৯]

গোলগাল চেহারা—এটাই আমার ফেমিন ইনসিওরেন্স—যদি পাঁচ-সাত দিন খেতে না পাই, তবু আমার চর্বি আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। (কিন্তু) তোমরা একদিন না খেলেই সব অন্ধকার দেখবে।[১০]

তোমাদের প্রথম কর্তব্য নিজেদের শরীরটাকে মজবুত করে গড়ে তোলা। তোমরা দৈহিক বলে বলীয়ান হও, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হও।

তোমাদের বাঁ হাতে গীতা থাকুক, ক্ষতি নেই। কিন্তু ডান হাতে যেন ফুটবল থাকে। যারা শারীরিকভাবে দুর্বল, তারাই সহজে প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে ; কিন্তু যারা শক্তিমান ও তেজীয়ান, তাদের লোভ জয়ের সামর্থ্য, আত্মসংযমের ক্ষমতা রোগাপ্যাংলা দুর্বল মানুষগুলোর চেয়ে অনেক বেশি।[১১]

মন্তব্যাবলী:

ভিখারি এলে যদি সাধ্য থাকে তো যা হয় কিছু দেওয়া ভাল। দেবে তো দু-একটা পয়সা ; তার জন্য সে কিসে খরচ করবে, সৎব্যয় হবে কি অপব্যয় হবে, এসব নিয়ে এত মাথা ঘামাবার দরকার কি? আর সত্যিই যদি সেই পয়সা গাঁজা খেয়ে ওড়ায়, তাহলেও তাকে দেওয়ায় সমাজের লাভ ছাড়া লোকসান নেই। কেন না, তোমার মতো লোকেরা তাকে দয়া করে কিছু কিছু না দিলে, সে তো তোমাদের কাছ থেকে চুরি করে নেবে। তার চেয়ে দু-পয়সা ভিক্ষা করে গাঁজা টেনে সে চুপ করে বসে থাকে, তা কি তোমাদেরই ভাল নয়? অতএব ঐ রকম দানেও সমাজের উপকার বই অপকার নেই।[১২]

আমি মনে করি, এ জগৎটা একটা সার্কাস, আর আমরা এক একটা ভাঁড় হয়ে সেখানে ডিগবাজি খাচ্ছি। কারণ, আমরা ডিগবাজি খেতে ভালবাসি। তারপর যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন আমরা এই জগৎ থেকে বিদায় নিই।[১৩]

তথ্যসূত্র

ক১	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা		১ম খণ্ড
ক২	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা		২য় খণ্ড
ক৩	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা		৩য় খণ্ড
ক৪	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা		৪র্থ খণ্ড
ক৫	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা		৫ম খণ্ড
ক৬	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা		৬ষ্ঠ খণ্ড
ক৭	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা		৭ম খণ্ড
ক৮	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা		৮ম খণ্ড
ক৯	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা		৯ম খণ্ড
ক১০	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা		১০ম খণ্ড
খ১	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ	স্বামী সারদানন্দ	১ম খণ্ড
খ২	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ	স্বামী সারদানন্দ	২য় খণ্ড
গ১	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত	শ্রীম-কথিত	১ম ভাগ
গ২	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত	শ্রীম-কথিত	২য় ভাগ
গ৩	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত	শ্রীম-কথিত	৩য় ভাগ
গ৪	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত	শ্রীম-কথিত	৪র্থ ভাগ
ঘ১	যুগনায়ক বিবেকানন্দ	স্বামী গম্ভীরানন্দ	১ম ভাগ
ঘ২	যুগনায়ক বিবেকানন্দ	স্বামী গম্ভীরানন্দ	৩য় ভাগ
চ	স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি	ভগিনী নিবেদিতা	
ছ১	পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ—নতুন তথ্যাবলী	মেরি লুইজ বার্ক	১ম খণ্ড
ছ২	পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ—নতুন তথ্যাবলী	মেরি লুইজ বার্ক	২য় খণ্ড
ছ৩	পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ—নতুন তথ্যাবলী	মেরি লুইজ বার্ক	৩য় খণ্ড
ছ৪	পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ—নতুন তথ্যাবলী	মেরি লুইজ বার্ক	৪র্থ খণ্ড
জ	স্মৃতির আলোয় স্বামীজি	স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত	
ঝ	স্বামী বিবেকানন্দ	মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত	
ট	বিবেকানন্দ চরিত	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	
ঠ	স্বামী বিবেকানন্দ	প্রমথনাথ বসু	১ম ভাগ
ঢ	আদালতে বিপন্ন বিবেকানন্দ	চিত্রগুপ্ত	
ণ	দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস্ অফ স্বামী বিবেকানন্দ		ভল্যুম্ নাইন
ত	স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ		

থ	স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায়	ডঃ বেণীশঙ্কর শর্মা	
দ১	লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ	মহেন্দ্রনাথ দত্ত	১ম খণ্ড
দ২	লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ	মহেন্দ্রনাথ দত্ত	২য় খণ্ড
ধ	স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি	অ্যালিস এম হ্যান্সব্রো	
ন	পত্রাবলী	স্বামী বিবেকানন্দ	

নির্দেশিকা

আমার ছোটবেলা

১) ক ৯—৫৪
২) ক ৫—৪৩৩
৩) গ
৪) গ
৫) গ
৬) চ—১৫৯, ১৬০
৭) ক ৪—১০৪, ১০৫
৮) খ ২—২/৪৫, ৪৬
৯) ক ১—৯৯, ১০০
১০) খ ২—২/৩৯, ৪০
১১) ক ৫—৪৪২
১২) গ
১৩) ক ৯—৪৬৯
১৪) খ ২—২/৫৭
১৫) ঠ ১—২৬
১৬) ক ৯—৭২, ৭৩
১৭) ঘ ১—৪৫
১৮) ঘ ১—৪৮
১৯) ক ৫—৪৪৩
২০) ঘ ১—৪৮
২১) খ ২—২/৩৮
২২) খ ২—২/৪৪
২৩) ক ৩—১৯৩, ১৯৪
২৪) ক ৫—২৪৩

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়

১) ক ১০
২) ক ৯—৪৩৩
৩) ক ১০ ১৬১-১৬৩
৪) ক ৮—৩৯৯, ৪০০
৫) গ ৩—২৭২, ২৭৩
৬) ঝ—৪০, ৪১
৭) ঝ—৪১, ৪২
৮) গ ৩—২৭২
৯) ঝ—৪২-৪৪
১০) ক ৯—১৩৮-১৪০
১১) খ ২—৭৪
১২) গ ৩—২৬৯
১৩) গ ৩—২৭৫
১৪) ক ৩—২০৪
১৫) গ ৩—২৭২
১৬) গ ৩—২৬৮
১৭) গ ৩—২৬৯
১৮) খ ২—১/৯৩
১৯) খ ১—২/৩
২০) ঝ—৬১
২১) ক ৮—৪০০, ৪০১
২২) ক ৮—৪৩১
২৩) ক ২—৩৮৫
২৪) খ ২—২/৭৬, ৭৭
২৫) খ ২—২/৪৫
২৬) গ ৩—২৬৭
২৭) খ ২—২/১১৪
২৮) খ ২—২/১১৫, ১১৬
২৯) গ ৩—২৬৮
৩০) খ ২—২/১১৭-১২৩
৩১) গ ৩—২৭৫
৩২) খ ২—২/১২৪
৩৩) ক ১০—২৮৭, ২৮৮
৩৪) চ—১০
৩৫) গ
৩৬) গ ১—২৫৩, ২৫৫
৩৭) গ ৩—২৪২
৩৮) গ ৩—২৪৩, ২৪৪
৩৯) গ ৪—২৯৩
৪০) গ ২—২৪০
৪১) গ ৩—২৬৮
৪২) ক ৯—৯৯
৪৩) ক ৯—১৮৩
৪৪) গ ৩—২৭৪
৪৫) ক ১০—১৬৩, ১৬৪
৪৬) ক ৮—৪১২, ৪১৩
৪৭) ক ৫—১০৭
৪৮) ক ৫—৩৬৫
৪৯) ক ৪—৪০৪, ৪০৫
৫০) ক ৯—১৯৩
৫১) ক ৯—৬৫
৫২) ক ৬—৩২১
৫৩) ক ৯—৬৩
৫৪) গ
৫৫) ক ৫—২০৮, ২০৯
৫৬) ক ৯—২৫৩, ২৫৪
৫৭) ক ৯—১৪৬
৫৮) ক ৯—১৪৫, ১৪৬
৫৯) ক ৯—৬৩
৬০) ক ৭—১৬১, ১৬২

শ্রীরামকৃষ্ণই আমার প্রভু

১) ক ৬—৪, ৫, ৬
২) ক ৬—৪৩৭

৩) ক ৫–১৬১
৪) ক ৮–৩৮৩-৩৯০
৫) ক ৯–২০৪
৬) ক ৯–৪০৪
৭) ক ৮–৩৯০-৩৯৩
৮) ক ১০–১৬৫, ১৬৬
৯) ক ৮–৩৯৫-৩৯৮
১০) ক ৯–৪১৭, ৪১৮
১১) ক ১০–১৯২
১২) চ–১৯০, ১৯১
১৩) ক ৪–৮৫
১৪) ক ৯–২৪৩
১৫) খ ১–৩/৫০
১৬) ক ৪–২২৭, ২২৮
১৭) ক ৮–৪০৬-৪০৮
১৮) ক ১০–৩২
১৯) ক ৯–১৫৩
২০) ক ৯–১৮০, ১৮১
২১) ক ৯–১৭৬
২২) ক ৯–৪৭৭
২৩) ক ৮
২৪) ক ৬–২৪৭
২৫) ক ৬–২৪৭
২৬) ক ৭–১২২
২৭) ক ৫–১৬১, ১৬২
২৮) ক ৯–২১
২৯) ক ৯–২২
৩০) ক ৭–৫০
৩১) ক ৭–৭৫, ৭৬
৩২) ক ৯–১৯১
৩৩) ক ৭–৭৭
৩৪) ক ১০–২৮৮
৩৫) ক ১০–২৮৫
৩৬) ক ৯–২৫১, ২৫২
৩৭) ক ৯–২৩০-২৩২
৩৮) ক ৯–২০৪
৩৯) ক ৪–১১৯
৪০) ক ৭–২৪৩
৪১) ক ৭–৪৪, ৪৫
৪২) ক ৮–৪১৪
৪৩) ক ৯–২৫৩
৪৪) ক ৬–১২, ১৩
৪৫) ক ৮–৩৯৮
৪৬) ক ৫–১২৪
৪৭) ক ৭–১৪, ১৫
৪৮) ক ৯–৪৩৪
৪৯) ক ৪–২৭, ২৮
৫০) ক ৪–৩২
৫১) ক ৪–৩৩৯
৫২) ক ৯–১৮৫
৫৩) ক ৯–১৮৬
৫৪) ক ১০–১৭৮
৫৫) ক ৭–২০৭
৫৬) ক ৮–৪০৪, ৪০৫
৫৭) ছ ৩–৫৬৬-৫৬৮
৫৮) ক ৭–২০০
৫৯) ক ৮–১০৮

আদি মঠ বরানগর এবং আমার পরিব্রাজক জীবন

১) ক ১০–১৬৪
২) ক ৯–২৩৭-২৩৯
৩) ক ৭–৬৪
৪) ক ১০–১৬৪-১৬৮
৫) ক ৯–২৪০
৬) ক ৯–২৪৮
৭) ক ৬–৩৮৭
৮) ক ৯–২৫১
৯) ক ৯–১৬৭
১০) ক ৭–১৪৪
১১) ক ৮–৪০৮
১২) ক ১০–১৭২
১৩) ক ৬–৩৯৩, ৩৯৪
১৪) ক ৬–৩৯৫, ৩৯৬
১৪ক) ট–৯১-৯৪
১৫) গ ৩–২৬৯
১৬) গ ৩–২৭৫, ২৭৬
১৭) গ ২–২৪৬
১৮) চ–১৫৫, ১৫৬
১৯) ক ৬–২৮২
২০) ক ৬–২৮৩, ২৮৪
২১) ক ৬–২৮৪
২২) ক ৬–২৮৫, ২৮৬
২৩) ক ৬–২৮৮
২৪) ক ৬–২৯২
২৫) ক ৬–২৯৪
২৬) ক ৬–২৯৮
২৭) ক ৬–৩০০
২৮) ক ৬–৩০৪
২৯) ক ৬–৩০৬
৩০) ক ৬–৩০৭
৩১) ক ৯–২৩১, ২৩২
৩২) ক ৩–৪২৬
৩৩) ক ১–৩৯৩
৩৪) ক ৮–৩৭৩-৩৭৫
৩৫) ক ৬–৩১১
৩৬) ক ৬–৩১২
৩৭) ক ৬–৩১৮
৩৮) ক ৬–৩১৯-৩২১
৩৯) ক ৬–৩২৪
৪০) ক ৬–৩২৫, ৩২৬
৪১) ক ৬–৩২৮-৩৩০
৪২) ক ৬–৩৩২-৩৩৪
৪৩) ক ১০–১৯৯
৪৪) ক ২–৩৮০, ৩৮১
৪৫) ক ৩–১১১, ১১২
৪৬) ক ২–৫৭, ৫৮
৪৭) ক ৯–২৪০, ২৪১

৪৮) ক ১—৩৯৪, ৩৯৫
৪৯) ক ৯—৯৭
৫০) ক ৪—২৬১
৫১) ক ৯—৮৫-৮৭
৫২) ক ৯—৮৭, ৮৮
৫৩) ক ৩—৪০০, ৪০১
৫৪) ক ৩—৪০১-৪০৩
৫৫) ক ৩—৪১৪
৫৬) ক ৯—২৫, ২৬
৫৭) ক ৯—৪৯৪
৫৮) ক ৯—৩৯৭
৫৯) খ—২২৪, ২২৫
৬০) ত—১৫৩
৬১) ঘ ১—২৭০
৬২) ত—৪৪১, ৪৪২
৬৩) ঘ ১—১৩১
৬৪) ক ৬—৩৪৪
৬৫) ক ৬—৩৫০
৬৬) ক ৬—৩৪৮, ৩৪৯
৬৭) ক ৬—৩৫২

দৈব আহ্বান ও বিশ্বধর্মসভা

১) ঘ ১—২২৮
২) চ—১৯৩
৩) ক ৬—৩৬৫
৪) ক ৭—৫২
৫) ক ৬—৪৫২
৬) চ—২০৪
৭) ক ৭—১৫৩
৮) ক ৭—১৫৪
৯) ক ৭—১৫৪
১০) ক ৭—১৫১
১১) ক ৭—৪৬
১২) ছ ১—৬২
১৩) ক ৭—২২৪
১৪) ক ৭—২২৫
১৫) ক ১০—১৬৯
১৬) ক ৫—১১৩
১৭) ক ৬—৩৫৩-৩৫৮
১৮) ক ৬—৩৬০-৩৬৯,
১৯) ক ৫—৪১৬
২০) ক ৫—৯৫-৯৭
২১) ক ১—৮৬-৮৮
২২) ছ ১—১৮
২৩) ক ৫—৪৪০
২৪) ক ৫—৪৩১
২৫) ক ৬—৩৭৫-৩৭৮
২৬) ক ৬—৩৭৮
২৭) ক ৬—৩৭৯
২৮) ক ৬—৩৮০-৩৮৬
২৯) ক ১—৯, ১০
৩০) ক ১—২৯
৩১) ক ১—২৩
৩২) ছ ১—১১৩, ১১৪
৩৩) গ
৩৪) ক ৬—৫০৭-৫১০
৩৫) ক ৭—৬৫
৩৬) ক ৯—৪৬২
৩৭) ক ৭—৩৯

ঘটনার ঘনঘটা

১) ক ৫—২০৬
২) ক ৭—৩৭, ৩৮, ৩৯
৩) ক ৬—৪১০, ৪১১
৪) ক ৫—৪২১
৫) ক ৮—৩৩২
৬) ক ৫—৭৫
৭) ক ৩—৪৫৯
৮) ক ৫—৪২৩
৯) চ—২৩১
১০) ক ৬—৫০৬, ৫০৭
১১) ক ৭—৩-৬
১২) গ
১৩) গ
১৪) ক ৬—৪০৩
১৫) ক ৬—৪০৪, ৪০৫
১৬) গ
১৭) ক ৬—৪০৬
১৮) ক ৬—৪০৬
ছ ২—৯০, ৯১
১৯) ক ৬—৪০৮-৪১৪
২০) ক ৬—৪৫৩-৪৫৭
২১) ক ৯—৩৯৫
২২) ক ৯—২৪৩, ২৪৪
২৩) ক ৫—৪৫৭, ৪৫৮
২৪) ক ৬—৪১৬, ৪১৭
২৫) ক ৬—৪১৭, ৪১৮
২৬) ক ৭—২৩, ২৪
২৭) গ
২৮) ক ৯—৩৯৮, ৩৯৯
২৯) ক ৬—৪২০, ৪২১
৩০) ক ৬—৪২২, ৪২৩
৩১) ক ৬—৪২৪, ৪২৫
৩২) গ
৩৩) ক ৬—৪২৭
৩৪) ক ৬—৪২৯, ৪৩০
৩৫) ক ৬—৪৩২, ৪৩৩
৩৬) ক ৭—৫৫
৩৭) ক ৬—৪৩৩-৪৩৮
৩৮) ক ৬—৪৪৭-৪৫১
৩৯) গ
৪০) ক ৬—৪৬০, ৪৬১
৪১) ক ৬—৪৫৮, ৪৫৯
৪২) গ
৪৩) ক ৬—৪৬৪, ৪৬৫

৪৪) ক ৬–৪৬৬-৪৬৯
৪৫) ক ৬–৪৭০, ৪৭১
৪৬) গ
৪৭) ক ৮–২০৫, ২০৬
৪৮) গ
৪৯) গ
৫০) ক ৬–৪৭৫
৫১) গ
৫২) ক ৬–৪৭৮, ৪৭৯
৫৩) ক ৬–৪৭৯
৫৪) ক ৬–৪৮০
৫৫) ক ৬–৪৮২-৪৮৫
৫৬) ক ৬–৪৯২, ৪৯৩
৫৭) ক ৬–৪৯৬, ৪৯৭
৫৮) ক ৬–৪৫৯, ৪৬০
৫৯) ক ৬–৪৯৯, ৫০০
৬০) ক ৬–৫০১
৬১) ক ৭–৩১
৬২) ক ৭–৮, ৯, ১১
৬৩) গ
৬৪) ক ৭–২১
৬৫) ক ৭–২৪
৬৬) ক ৭–৬২
৬৭) ক ৮–২০৭
৬৮) ক ৭–৬৫, ৬৬, ৬৭
৬৯) ক ৭–৬৯
৭০) ক ৭–৮৬, ৮৭
৭১) ক ৭–৮২-৮৬
৭২) ক ৭–৮৮
৭৩) ক ৭–৯০, ৯১, ৯২
৭৪) গ
৭৫) ক ৫–৭৩, ৭৪
৭৬) ক ৯–৭৩, ৭৪
৭৭) ক ৯–৭৪, ৭৫
৭৮) ক ১০–২৮০, ২৮১
৭৯) ক ৭–১২২, ১২৩
৮০) ক ৫–৭৮-৮০
৮১) ক ১০
৮২) ক ১০
৮৩) ক ১০–২৮০
৮৪) ক ৮–২০৮, ২০৯
৮৫) ক ৭ ১০১-১০৩
৮৬) ক ৭–১২৫
৮৭) ক ৭–১২৬, ১২৭
৮৮) ক ৭–১০৩, ১০৪
৮৯) ক ৭–১০৬, ১০৭
৯০) ক ৭–১০৯, ১১০
৯১) ক ৭–১১২-১১৪
৯২) ক ৮–২০৯
৯৩) গ
৯৪) ক ৭–১১৮
৯৫) ক ৭–১২৪
৯৬) ক ৮–২২০
৯৭) ক ৭–১২৯, ১৩০
৯৮) ক ৭–১৩১, ১৩২
৯৯) ক ৭–১৩৮, ১৩৯
১০০) গ
১০১) ক ৭–১৪৯
১০২) ক ৭–১৫০, ১৫১
১০৩) ক ৭–১৪১, ১৪২
১০৪) ক ৭–১৪৫, ১৪৬
১০৫) ক ৭–১৫৩
১০৫ক) ন–৩৬৯
১০৫খ) ন–৩৮২, ৩৮৩
১০৫গ) ন–৫১৯, ৫২০
১০৬) ক ৫–২০৬
১০৭) ক ৭–১৫৯, ১৬০
১০৮) ক ৩–৪৫৮, ৪৫৯
১০৯) ক ৭–১৬০
ছ ৩–২৪৫, ২৪৬
১১০) ক ৭–১৬১-১৬৩
১১১) ক ৭–১৬৪, ১৬৫
১১২) ক ৭–১৫৫
১১৩) ক ৭–১৭৩, ১৭৪
১১৪) ছ ৩–৩৪৮-৩৫০
১১৫) ক ৯–৪৩৪-৪৩৬
১১৬) গ
১১৭) ক ৭–৬৩
১১৮) ক ৭–১৭৮, ১৭৯
১১৯) ক ৭–১৮০
১২০) ক ৯–৪৯৬
১২১) ক ৪–২৯৩, ২৯৪
১২২) ক ৯–৩৯৭
১২৩) ক ৭–১৮৪
১২৪) ক ৭–১৮৩, ১৮৪
১২৫) ক ৯–৩৯৩
১২৬) গ
১২৭) ক ৭–১৮৫, ১৮৬
১২৮) ক ৭–১৮৯-১৯১
১২৯) ক ৯–৪৩৭, ৪৩৮
১৩০) ক ৭–১৪৬, ১৪৭
১৩১) ক ৭–২১১, ২১২
১৩২) ক ৭–২১৩, ২১৪
১৩৩) ক ৭–৮০, ৮১
১৩৪) গ
১৩৫) ক ৭–২২৫, ২২৬
১৩৬) ক ৭–২২৬, ২২৭
১৩৭) ক ৭–২৩০, ২৩১
১৩৮) ক ১০
১৩৯) ক ৭–২৪৫
১৪০) ক ৮–২২২
১৪১) ক ৭–২৪৬, ২৪৭
১৪২) ক ৭–২৪৮, ২৪৯
১৪৩) ক ১০–১৭৯, ১৮০
১৪৪) ক ৯–৩৯, ৪০
১৪৫) ক ৯–৪৭২
১৪৬) ক ৯–৪৬৩
১৪৭) ক ৯–৪৭০-৪৭২
১৪৮) ক ৭–২৫১, ২৫২
১৪৯) ক ৭–২৫৭
১৫০) ক ৭–২৫৫-২৫৭

১৫১) ক ৭—২৬০
১৫২) ক ৭—২৬০
১৫৩) ক ৭—২৭৮
১৫৪) গ
১৫৫) ক ৭—২৬৬, ২৬৭
১৫৬) ক ৭—২৭১
১৫৭) ক ৭—২৭৩-২৭৫
১৫৮) ক ৭—২৭৭
১৫৮ক) ক ৭— ২৭৫, ২৭৬
১৫৯) ক ৭—২৭৯
১৬০) ক ১০—১৮৪
১৬১) ক ৭—২৮১, ২৮৪
১৬২) ক ৭—২৯০, ২৯১
১৬৩) ক ৭—২৯৬, ২৯৭
১৬৪) ক ৭—৩০৪-৩০৬
১৬৫) ক ৭—৩০৭, ৩০৮
১৬৬) ক ৭—৩১০
১৬৭) ক ৭—৩১৪, ৩১৫
১৬৮) ক ৯—৪৩০
১৬৯) ক ৭—৩৬১-৩৬৩
১৭০) ক ৯—৪৬১
১৭১) ক ৯—৪৬৩, ৪৬৪
১৭২) ক ৬—৭৬
১৭৩) ক ৯—৪০৯, ৪১০
১৭৪) ছ ৩—১৩৩
১৭৫) ত—২৫৩
১৭৬) ক ৬—৬২
১৭৭) ক ৭—১২৩
১৭৮) ক ৯—২১
১৭৯) ক ৩—৩৮৩

ভারতে ফিরে এলাম

১) চ—৯৫
২) ক ৫—২০৫
৩) ক ৬—৪৫৬, ৪৫৭
৪) ক ৬—৪৮৯
৫) ক ৭—২৭৭, ২৭৮
৬) গ
৭) ক ৫—৩৪, ৩৫
৮) ক ৭—৩১৬
৯) ক ৬—৯০
১০) ক ৫—৯৩-১১৭
১১) ক ৭—৩১৭
১২) ক ৭—৩১৮
১৩) জ—১৩৪
১৪) ন—৫২৮
১৫) ক ৭—৩২৪
১৬) ক ৭—৩২২
১৭) ক ৭—৩৩০-৩৩৩
১৮) ক ৯—৬০-৬৩
১৯) ক ৯—৬৭, ৬৮
২০) ঘ ২—১৪
২১) ক ৭—৩৩৪-৩৩৬
২২) ক ৭—৩৩৬, ৩৩৭
২৩) ক ৭—৩৩৯
২৪) ক ৭—৩৪০-৩৪২
২৫) ক ৭—৩৪৮-৩৫০
২৬) ক ৭—৩৫৪, ৩৫৫
২৭) ক ৭—৩৫৬
২৮) ক ৭—৩৬০
২৯) ক ৭—৩৬১-৩৬৫
৩০) ক ৭—৩৬৮, ৩৬৯
৩১) ক ৭—৩৭৩
৩১ক) ক ৭—৩৭৩, ৩৭৪
৩২) ক ৭—৩৭৮-৩৮১
৩৩) ক ৭—৩৮৪, ৩৮৫
৩৪) ক ৭—৩৮৫, ৩৮৬
৩৫) ক ৭—৩৮৭, ৩৮৮
৩৬) ক ৭—৩৯০
৩৭) ক ৭—৩৯০-৩৯২
৩৮) ক ৭—৩৯৩
৩৯) ক ৭—৩৯৫
৪০) ক ৭—৩৯৫
৪১) ক ৮—৩
৪২) ক ৮—৮, ৯, ১০
৪৩) ক ৮—১৩, ১৪
৪৪) ক ৮—১৪, ১৫
৪৫) ক ৮—১৫
৪৬) ক ৮—১৭
৪৬ক) ক ৮—১৮, ১৯
৪৭) ক ৮—২৬-২৮
৪৮) ক ৮—২৮
৪৮ক) ক ৮—২৯
৪৯) ক ৮—৩১, ৩২
৫০) ক ৮—৩৩
৫১) ক ৮—৩৪, ৩৫
৫২) ক ৮—৩৬, ৩৭
৫৩) গ
৫৪) ক ৮—৪১
৫৫) গ
৫৬) গ
৫৭) ক ৮—৪৪
৫৮) ক ৮—৪৫
৫৯) চ—১০৬
৬০) চ—১০৯, ১১০
৬১) ত—২১
৬২) ক ৯—৯০, ৯১
৬৩) গ
৬৪) ক ৯—৯৬, ৯৭
৬৫) ক ৮—৫১
৬৬) থ—৯৯, ১০০
৬৭) ক ৯—১১১-১১৩
৬৮) ক ৮—৫২
৬৯) গ
৭০) ত—৩৯৬
৭১) ক ৮—৫৫
৭২) ক ৮—৫৫-৫৭
৭৩) গ
৭৪) ক ৯—৪১৮
৭৫) ক ৯—৪১৩-৪১৫

এদেশে আমি কি করতে চাই

১) ক ৫–৩৭৩-৩৭৫
২) গ
৩) ক ৭–৬, ৭
৪) ক ৫–২৬৯, ২৭০
৫) ক ৫–২৮৪
৬) ক ৫–১১৬
৭) ক ৯–১২, ১৩
৮) ক ৯–১৫৮
৯) চ–৩০
১০) ছ ৪–১৫৩
১১) ক ৫–২১২
১২) ক ৭–৪১
১৩) ক ৭–১৭, ১৮
১৪) ক ৭–৯৫, ৯৬
১৫) ক ৫–২১৮-২২০
১৬) চ–১৯৭
১৭) ক ৯–৮৮, ৮৯
১৮) ক ৫–৩৫৩, ৩৫৪
১৯) ক ১০–১৬৯-১৭৬
২০) ক ৬–৩৯১
২১) ক ৫–৪৬৫, ৪৬৬
২২) ক ৭–২৭
২৩) ক ৫–১৩২
২৪) ক ৭–৩২৬, ৩২৭
২৫) ত–৪৪২
২৬) ক ৯–১৫৯
২৭) ক ৯–১৬৩, ১৬৪
২৮) গ
২৯) ক ১০–২৭৫
৩০) ক ৯–১৭০, ১৭১
৩১) চ–১৪১
৩২) ক ১০–২৯১, ২৯২
৩৩) ক ৯–৪৭৬-৪৭৮
৩৪) ক ১০–১৮০, ১৮১
৩৫) ক ৯–১২৮, ১২৯
৩৬) ক ৯–২৫৩
৩৭) ক ৯–১৬৫
৩৮) ক ৫–২১০
৩৯) ক ৫–২১১
৪০) ক ৫–২১১, ২১২
৪১) ক ৬–৩৯৭, ৩৯৮
৪২) ক ৯–২১৭
৪৩) ক ৯–২৩৫-২৩৭
৪৪) ক ৭–৪৫, ৪৬
৪৫) ক ৫–৪৬৬
৪৬) ছ ২–৩৯১
৪৭) ক ৯–২২৮
৪৮) ত–৪০৮
৪৯) জ–২৩৪
৫০) ক ৬–৪৫৭

পাশ্চাত্যে দ্বিতীয়বার

১) ক ৬–৬১-১১৭
২) গ
৩) ক ৮–৫৮, ৫৯
৪) ন–৬৫৩, ৬৫৪
৫) ক ৮–৬০, ৬১
৬) ক ৮–৬৪
৭) ক ৮–৬৫, ৬৬
৮) ক ৮–৬৫
৯) গ
১০) ক ৮–৭৩
১১) গ
১২) গ
১৩) ক ৮–৭৪
১৪) গ
১৫) ক ৮–৮২
১৬) ক ৮–৮৩, ৮৪
১৭) গ
১৮) ক ৮–৮৫-৮৭
১৯) ক ৮–৮৮, ৮৯
২০) ক ৮–৯০
২১) গ
২২) ক ৮–৯৬
২৩) ক ৮–৯০-৯২
২৪) ক ৮–৯৩, ৯৪
২৫) ক ৮–৯৪-৯৬
২৬) ক ৮–১৪২
২৭) ক ৮–৯৭, ৯৮
২৮) ক ৮–৯৯, ১০০
২৯) ক ৮–১০৩
৩০) ক ৮–১০৪, ১০৫
৩১) ক ৮–১০৬
৩২) ক ৮–১০৫
৩৩) ক ৮–১০৭
৩৪) ক ৮–১১২, ১১৩
৩৫) ক ৮–১১৪, ১১৫
৩৬) ক ৮–১১৬
৩৭) ক ৮–১১৬
৩৮) ক ৮–১২৪
৩৯) ক ৮–১৩৬
৪০) ক ৮–১৩৬, ১৩৭
৪১) ক ৮–১৩৭
৪২) ক ৮–১৩৮
৪৩) ন–৭৩১
৪৪) গ
৪৫) ক ৮–১৪৩, ১৪৪
৪৬) ক ৮–১৪৪, ১৪৫
৪৭) ক ৮–১৪৫
৪৮) ক ৮–১৪৭
৪৯) ক ৬–১৯১
৫০) ক ৬–১৬৯
৫১) গ
৫২) ক ৮–১৫১, ১৫২
৫৩) ক ৮–১৫৩, ১৫৪
৫৪) ক ৮–১৫৫, ১৫৬

৫৫) গ
৫৬) ক ৮–১৫০
৫৭) ক ৬–২০৯, ২১০
৫৮) ক ৮–১৬২, ১৬৩
৫৯) গ
৬০) ক ৬–১১৮-১৪২
৬১) ক ৮–১৬৪, ১৬৫

আমি বিশ্বাস করি

১) ক ৬–৫০৫
২) চ–২৭
৩) গ
৪) ক ৬–৫০৪
৫) ক ৯–৪৫২
৬) ক ২–২৬৮
৭) ক ৩–১৯১, ১৯২
৮) ক ৭–৩২৪
৯) ক ১০–২৮৮, ২৮৯
১০) ক ৮–১৪০, ১৪১
১১) ক ১০–১১, ১২
১২) ক ৪–১৪৫, ১৪৬
১৩) গ
১৪) ক ৭–৩৫১
১৫) গ
১৬) ক ১০–২৯০
১৭) গ
১৮) ক ৯–৪১৩
১৯) গ
২০) ক ২–১৬২, ১৬৩
২১) ক ১–৩০
২২) ক ৮–৩১৮, ৩১৯
২৩) ক ৮–৩৩১, ৩৩২
২৪) ক ৬–৩১৫
২৫) চ–২৮
২৬) ক ১০–২৮৫
২৭) গ
২৮) ক ১০–২২৮-২৩০

বিদায়বেলার বাণী

১) ক ৮–১৬৫
২) ক ৮–১৬
৩) ক ৮–১৬৬, ১৬৭
৪) গ
৫) ক ৮–১৭২
৬) ক ৭–৪২৮
৭) ক ৮–১৭১
৮) ক ৮–১৭৩-১৭৫
৯) ক ৮–১৭৬
১০) গ
১১) ক ৮–১৭৯, ১৮০
১২) ক ৫–৩৫৮-৩৬০
১৩) ক ৯–১৯৩-১৯৬
১৪) ঘ ২–৩২১
১৫) ক ৮–১৩০
১৬) ক ৮–১৮২
১৭) ক ৮–১৮৪, ১৮৫
১৮) গ
১৯) ক ৯–২১৬
২০) ক ৯–২২৭
২১) ক ৩–৩৮৫
২২) ক ৮–১৮৭, ১৮৮
২৩) গ
২৪) ক ৮–১৮৯-১৯১
২৫) গ
২৬) ক ৮–১৯৩
২৭) ক ৮–১৯৩, ১৯৪
২৮) ক ৮–১৯৪
২৯) ক ৮–১৯৭, ১৯৮
৩০) ক ৮–২০০
৩১) গ
৩২) ক ৮–২০২
৩৩) ক ৮–২০২
৩৪) গ
৩৫) ত–৪৪০
৩৬) ত–৪৪০
৩৭) ভ–৩০১, ৩০২
৩৮) ছ ৪–৫৫২
৩৯) চ–৩২৯
৪০) ট–২৬৩
৪১) চ–৩২৯
৪২) ক ৮–১৪২
৪৩) ছ ৪–৫৫২
৪৪) ক ৭–৮০, ৮১
৪৫) ক ৭–৩৫০, ৩৫১
৪৬) গ
৪৭) ক ৭–২১০, ২১১
৪৮) ক ৮–১০৯
৪৯) ক ১০–২৭৫
৫০) জ–১৩৭
৫১) ক ৮–১৬৩, ১৬৪
৫২) ক ৮–১২৪
৫৩) ক ৮–১২৯
৫৪) জ–২৩৬
৫৫) ক ৮–১৩১-১৩৪
৫৬) ক ৮–১১৬
৫৭) ক ৮–১৩৯
৫৮) ক ৮–২২৪, ২২৫
৫৯) ক ৮–২২৩, ২২৪
৬০) ক ১০–২৭৫
৬১) ন–৭৯১
৬২) গ
৬৩) ক ৬–২৬৭-২৬৯

পরিশিষ্ট

১) দ ১–২৫
২) দ ১–২৫, ২৬
৩) দ ১–১১৯
৪) দ ২–১৫৬
৫) জ–১৪৮, ১৪৯
৬) জ–৩২
৭) জ–৫৮
৮) দ ১–২৩, ২৪
৯) ত–৩৮
১০) ত–৩৭
১১) জ–১২১
১২) ত–৩৬
১৩) ধ

এই আশ্চর্য সংগ্রহে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নিজের মুখে নিজের কথা বলেছেন। চিঠিপত্রে, আলাপ-আলোচনায়, স্মৃতিচারণে, সভাসমিতিতে, বিভিন্ন রচনার হাজার-হাজার পাতায় যে আত্মকথা এতদিন লুকিয়েছিল, বাংলায় এই প্রথম তা বিপুল নিষ্ঠায় ও অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে খুঁজে বার করা হল।

নিজের ভাষায় স্বামীজির নিজের জীবনের যে-ছবি এখানে ফুটে উঠেছে তা একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে তেমন বেদনাবিধুর। 'আমি বিবেকানন্দ বলছি' নিঃসন্দেহে বিচিত্র এক বিবেকানন্দের সঙ্গে নতুন যুগের পাঠক-পাঠিকাদের নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেবে।...

শংকর

ISBN : 81-7267-033-8

Price : Rs. 125/-